ভগবদ্‌গীতা

ও

বিশ্বজনীন বার্তা

(আধুনিক চিন্তাধারা ও চাহিদার আলোকে গীতাভাষ্য)

ভগবদ্‌গীতা
ও
বিশ্বজনীন বার্তা

(আধুনিক চিন্তাধারা ও চাহিদার আলোকে গীতাভাষ্য)

তৃতীয় খণ্ড

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

অনুবাদক ঃ
স্বরাজ মজুমদার ও মিতা মজুমদার



উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক :

স্বামী মুমুক্ষানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা ৭০০ ০০৩

প্রথম প্রকাশ :
শ্রীমা সারদাদেবীর ১৫৭তম জন্মতিথি
২২ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬
8 December, 2009
2M2C

ISBN 978-81-8040-519-8 (set)
978-81-8040-539-6 (vol.III)

অক্ষরবিন্যাস : উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ

মুদ্রক :
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩০
দূরভাষ : ২৫৫৭ ৪৪১৯

প্রকাশকের নিবেদন

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়াত ত্রয়োদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরমপূজ্য শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের 'Universal Message of the Bhagavad Gita : An Exposition of the Gita in the Light of Modern Thought and Modern Needs' নামক তিন খণ্ডে সমাপ্ত গীতা গ্রন্থ ভারতে ও বহির্ভারতে বহু সমাদৃত। এই তিন খণ্ডে সমাপ্ত বৃহদ্গ্রন্থের শেষ তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ এতদিনে প্রকাশ করা সম্ভব হলো। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভপদার্পণ তিথি ১৪১২ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ২০০৫-এর জুন মাসে)। অনুবাদক ছিলেন ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশন তারিখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দের অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে (মে ২০০৮)। অনুবাদক ছিলেন প্রধানত রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচারের মাসিক 'বুলেটিন'-এর সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত স্বরাজ মজুমদার।

পূজ্যপাদ মহারাজজীর বৃহদায়তন ইংরেজি গীতা-মহাগ্রন্থের তিনটি খণ্ডের সম্পূর্ণ অনুবাদ করা বড় সহজ কাজ নয়। কোন লিখিত পুস্তক রূপে এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয় নাই। মহারাজজীর রবিবাসরীয় আলোচনায় অডিও এবং ভিডিও ক্যাসেটে বিধৃত স্বতোৎসারিত (extempore) ধারাবাহিক বক্তৃতা দেখে পুস্তকটির ইংরেজি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল। মহারাজজী স্বয়ং কয়েকজন সুযোগ্য বিদ্বান সন্ন্যাসী সেবকের সহায়তায় সে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনাও করেছিলেন। মহারাজজীর কথনভঙ্গি বরাবরই ছিল সহজবোধ্য ও সাবলীল। এরূপ আলোচনার অনুবাদও অনুরূপ সহজবোধ্য ও সাবলীল হওয়া উচিত। এরূপ অনুবাদ কার্যে শ্রীযুক্ত স্বরাজ মজুমদার ইতোমধ্যে অভিজ্ঞতা ও সমাদর লাভ করেছেন। তার নিদর্শন এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড এবং 'বাস্তব জীবনে আধ্যাত্মিকতা' শীর্ষক উদ্বোধন প্রকাশিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'বাস্তবজীবনে আধ্যাত্মিকতা' পুস্তকটি ইংরেজি 'Practical Spirituality' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। সে অনুবাদ কার্যটি করেছিলেন শ্রীযুক্ত স্বরাজ মজুমদার ও শ্রীযুক্তা মিতা মজুমদার উভয়েই। তাঁদের দুজনেরই এইরূপ অনুবাদকর্মে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আছে। বর্তমান গ্রন্থেরও অনুবাদক তাঁরা দুজনই। তাঁদের উভয়কেই আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ন্যায় এই তৃতীয় খণ্ডেরও প্রকাশনা কার্যে নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমাদের প্রকাশন বিভাগের স্বেচ্ছাসেবী কর্মিবৃন্দ, সর্বশ্রী সুহাস রায়, উৎপল মুখোপাধ্যায়, অজিত কুমার দাস, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। অনূদিত গ্রন্থের নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজ করেছেন অন্য এক স্বেচ্ছাব্রতী শ্রীতারকনাথ দে। তাঁরা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত এই খণ্ডের প্রকাশনা যথেষ্ট দুঃসাধ্য হতো।

মহারাজজীর গীতাব্যাখ্যানের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশনের পর বহু জিজ্ঞাসু পাঠক তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশনার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থখানি তাঁদের জ্ঞানস্পৃহা পরিতৃপ্ত করুক এবং দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে শক্তি, সাহস, প্রেরণা দান করুক—ভগবদ্‌সমীপে এই প্রার্থনা। ইতি

শ্রীমা সারদাদেবীর ১৫৭তম জন্মতিথি
৮ ডিসেম্বর, ২০০৯
উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা—৩

নিবেদক
স্বামী মুমুক্ষানন্দ
প্রকাশক

সূচীপত্র

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

ভক্তির পথ

এখন আমরা দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। অর্জুনের একটি প্রশ্ন দিয়েই এই অধ্যায়ের শুরু।

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে ।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

অর্জুন বললেন—'যেসব অনন্যশরণ ভক্ত এভাবে আপনার উপাসনা করেন এবং যাঁরা অবিনাশী, অব্যক্ত [ব্রহ্মের] উপাসনা করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে?'

গীতার আগের অধ্যায়গুলিতে শ্রীকৃষ্ণ নানা জায়গায় ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনার কথা বলেছেন, আবার জ্ঞানপথে নৈর্ব্যক্তিক, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথাও বলেছেন। তা সত্ত্বেও এখানে দুটি প্রসঙ্গের অবতারণা করে অর্জুন জানতে চাইছেন—দুটি পথের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? *এবং সততযুক্তা যে,* 'এভাবে নিরন্তর শরণাগত হয়ে'; *ভক্তাঃ ত্বাং পর্যুপাসতে,* 'যেসব ভক্ত আপনার উপাসনা করেন'; এবং *যে চাপি অক্ষরম্ অব্যক্তম্,* 'যাঁরা *অক্ষরম্ অব্যক্তম্,* অর্থাৎ অব্যক্ত ও অবিনাশিরূপে' বা 'নির্গুণ ব্রহ্মরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করেন'; *তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ,* 'এই দুইধরনের ভক্তের মধ্যে যোগীশ্রেষ্ঠ কে?' অর্জুন এই প্রশ্ন তুলেছেন।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২॥

শ্রীভগবান বললেন—'যাঁরা আমাতে মন নিবিষ্ট করে, পরম শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস সহকারে নিরন্তর আমার ভজনা করেন, আমার মতে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ যোগী।'

এখানে একটি সাধারণ মন্তব্য করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, *ময্যাবেশ্য মনো যে মাম্*, 'যাঁরা আমার ওপর মন নিবিষ্ট করে'; *নিত্যযুক্তা উপাসতে*, 'ভক্তির সঙ্গে নিরন্তর উপাসনা করেন'; *শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাঃ*, 'পরম শ্রদ্ধাসহকারে'; *পরয়া* মানে 'পরম'; অর্থাৎ কিনা সেই সেই পূজায় পরম শ্রদ্ধা মিশে থাকে। *তে মে যুক্ততমা মতাঃ*, 'আমার মতে তাঁরাই *যুক্ততমাঃ'*। *যুক্ত* মানে 'যোগী' এবং *তম* কথাটির অর্থ 'পরম'। দুটিই সংস্কৃত শব্দ। *তর* বলতে তুলনামূলকভাবে 'আরো বেশি' বোঝায় এবং *তম* হলো 'সবচেয়ে বেশি'। *যুক্ততর* হলো একের তুলনায় বেশি এবং *যুক্ততম* হলো বহুর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ববাচক। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, আমার মতে তাঁরাই ভক্তশ্রেষ্ঠ।

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে ।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩॥

—'কিন্তু যাঁরা অবিনশ্বর, অবর্ণনীয়, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্যনীয়, অপরিবর্তনীয়, অটল, শাশ্বত [ব্রহ্মের] উপাসনা করেন।'

অন্যদিকে, 'যাঁরা উপাসনা করেন', *পর্যুপাসতে*, সেই *অক্ষরম্*, অর্থাৎ 'অবিনাশী সত্যকে' [ব্রহ্মকে]; *অনির্দেশ্যম্*, এটা বা ওটা বলে 'যাঁকে নির্দেশ করা যায় না'—কারণ তা দেখানোর বস্তু নয়। তিনি নাম ও রূপের অতীত। *অব্যক্তম্*, অর্থাৎ 'অপ্রকাশিত'। জগৎ প্রকাশিত, কিন্তু তিনি অপ্রকাশিত। সেই নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম সত্তা *সর্বত্রগম্*, 'সর্বব্যাপী'; *অচিন্ত্যং চ*, 'সকল চিন্তার অতীত'—আমরা মন ও বুদ্ধি দিয়ে তাঁর নাগাল পাই না। যখনই মনের সাহায্যে তাঁকে ধরতে যাই, তখন বড় জোর তাঁর সম্পর্কে মনগড়া একটা ধারণা হয়; কিন্তু খোদ ঈশ্বরকে আমরা পাই না। ঈশ্বর সম্পর্কে যত কল্পনাই করি না কেন, শেষপর্যন্ত তা কল্পনাই থেকে যায়; ঈশ্বর তাতে বাঁধা পড়েন না—তা দিয়ে ঈশ্বরকে ধরা যায় না। বেদান্তের এ এক প্রগাঢ় সত্যদৃষ্টি। কিছু খ্রিস্টান ও সুফি মরমিয়া সাধক ছাড়া আর অন্য কোথাও এই সর্বোচ্চ গভীরভাবের সন্ধান মেলে না। বেদান্তবাদীদের মতো তাঁরাও এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঈশ্বর বাক্যমনাতীত; মন ও কথা দিয়ে সেই অধরাকে ধরা যায় না। তিনি সবকিছুর পারে।

আমাদের 'অষ্টাবক্র গীতা'-য় এ বিষয়ে সুন্দর একটি শ্লোক আছে, (১২/৭), যেখানে বলা হয়েছে ঃ

অচিন্ত্যং চিন্ত্যমানোঽপি চিন্তারূপং ভজত্যসৌ।

অর্থাৎ 'অচিন্ত্যনীয়কে চিন্তা করলেও, চিন্তার একটি রূপই কেবল আপনার মানসলোকে ভেসে ওঠে।' যা চিন্তার অতীত, তার কথা চিন্তা করে আপনি কী পাবেন? একটুকরো ভাবনা বই তো কিছু নয়! অতএব, ব্রহ্ম সম্বন্ধে চিন্তা না করে ব্রহ্মই হয়ে যান। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করুন। উপলব্ধি করুন আপনিই সেই ব্রহ্মবস্তু, যা টেবিল-চেয়ারের মতো নামরূপাত্মক কোন স্থূল জড়বস্তু নয়, যাকে আপনি আঙুল উঁচিয়ে দেখাতে পারেন। এই হলো সেই অবিনাশী সত্তার স্বরূপ।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ।। ৪।।

—'যাঁরা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে, সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে সকল জীবের কল্যাণে নিযুক্ত, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।'

কীভাবে তাঁরা ঐ [নির্গুণ, নিরাকার] ব্রহ্মের উপাসনা করেন? *সংনিয়ম্য ইন্দ্রিয়গ্রামং*, 'পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে সংযত করে'; *সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ*, 'সর্বত্র তাঁদের *সমবুদ্ধি*, অর্থাৎ সমদৃষ্টি'; তাঁদের দৃষ্টিতে উঁচু বা নীচু, বড়-ছোট, নারী বা পুরুষ বলে কিছু নেই—সবই এক। এই একত্ববোধের অভ্যাস আমাদের গড়ে তুলতে হবে। *তে প্রাপ্নুবন্তি মাম্ এব*, 'তাঁরা কেবল আমাকেই লাভ করেন'; *সর্বভূত হিতে রতাঃ*, 'এবং নিরন্তর তাঁরা সর্বজীবের কল্যাণে নিযুক্ত।' তাঁদের নিজেদের চাইবার কিছুই নেই। এই জ্ঞানীরা সকলকে সুখী করেন এবং সকলের কল্যাণের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। এটি জ্ঞানমার্গ বা জ্ঞানীদের পথ। এটি শাস্ত্র অনুমোদিত একটি বৈধ পথ। সাধনপথ হিসাবে জ্ঞান ও ভক্তি—দুয়েরই উপযোগিতা আছে, যদিও দুয়ের মধ্যে সামান্য একটু পার্থক্য আছে। পরের শ্লোকে সেই প্রসঙ্গ আসছে।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ।। ৫।।

—'অব্যক্ত [নির্গুণ ব্রহ্মে] যাঁদের মন নিবিষ্ট, তাঁদের কষ্ট আরো বেশি, কারণ দেহাভিমানীদের পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের লক্ষ্যে পৌঁছানো খুব কঠিন।'

অব্যক্তে মন স্থির করা 'খুব শক্ত'—বলা হচ্ছে ক্লেশকর; মোটেই সহজসাধ্য নয়। সহজ যে নয় তা আমরা বেশ বুঝতে পারি। যদি আমরা নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মের চিন্তা করতে যাই তো বুঝেই উঠতে পারি না কোথায় এবং কিভাবে মনকে অভিনিবিষ্ট করতে হবে। তাই বলা হচ্ছে, *ক্লেশোঽধিকতরঃ তেষাম্,* 'তাঁদের ক্লেশ আরো বেশি।' কাদের? *অব্যক্তাসক্ত চেতসাম্,* 'যাঁদের মন অব্যক্ত অর্থাৎ নির্গুণ, নিরাকার, অবিনাশী ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট'। *অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিঃ অবাপ্যতে,* 'যাঁদের দেহাভিমান বা দেহ-সচেতনতা আছে, তাঁদের পক্ষে এই অব্যক্তের পথ নিদারুণ কষ্টদায়ক ও কঠিন।' যখন আমরা দেহবোধের ঊর্ধ্বে উঠতে পারি, তখনই এই অব্যক্তে মন নিবিষ্ট করা সম্ভব। কিন্তু সে তো সহজে হওয়ার নয়। তাই, যখনই দেহবোধ আসে, সাকার, সগুণ, ব্যক্তি-ঈশ্বরের চিন্তা করতে হয়। তখনই আমরা ঠিকঠিকভাবে তাঁর উপাসনা করতে পারি। তাই বলা হচ্ছে, *দুঃখম্,* অর্থাৎ প্রভূত 'কষ্ট' করে আমরা ঐ অব্যক্তের পথ অনুসরণ করতে পারি। কিন্তু তুলনামূলকভাবে ভক্তিপথ অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরের চিন্তা করা সহজ। যে-রূপেই তাঁর পূজা বা উপাসনা করি না কেন, তিনি সেইরূপেই আমাদের সামনে আবির্ভূত হন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মই ব্যক্তি-ঈশ্বর রূপে আমাদের কাছে প্রকট হচ্ছেন। এই শ্লোকে *দেহবদ্ভিঃ* বলে যে শব্দটি পাচ্ছি, সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদ্বৈত জ্ঞানে প্রথম যে ধারণাটি পাকা করতে হবে তা এই—'আমি এই দেহ নই'। 'আমি যে দেহ নই'—এটি বোঝা কত কঠিন, তা একবার ভেবে দেখুন! শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন, 'লোকে *অব্যক্ত,* ব্রহ্ম, নৈর্ব্যক্তিক সত্তা ইত্যাদি নানা গালভরা কথা বলে; তারা জানে না, একটু এদিক-ওদিক হলেই পতন অনিবার্য।' তাই তিনি বলতেন, যতক্ষণ তোমার *দেহ* আছে, ঐ দেহই তোমাকে দ্বৈতভূমিতে টেনে নামাবে। এই কারণে একমাত্র দেহবোধবর্জিত গভীর সমাধি অবস্থাতেই ঐ অব্যক্ত-ভূমিতে স্থিতি সম্ভব। কিন্তু তখনও, যদি দেহ অসুস্থ হয়, তার ভিতর মনকে টেনে নামানোর প্রবণতা জাগে। তাই ভক্তি বিশ্বজনীন ধর্ম; বিশ্বের সর্বত্রই এই ধর্মের এত সমাদর। জ্ঞানপথ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য। তাঁরা ঐ পথে গিয়ে, অনুভূতিলাভ করে, ঐ পথের সত্যতা সিদ্ধ করেছেন। কিন্তু সকলের পক্ষে ঐ পথ অনুসরণীয় নয় কারণ ঐ পথে সাফল্যলাভ করা অতি কঠিন।

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬॥

'কিন্তু যাঁরা আমাতেই সর্ব কর্ম সমর্পণ করে, আমাকেই পরম উপাস্য মনে করে, একনিষ্ঠ যোগের দ্বারা আমার ধ্যান করে আমার উপাসনা করেন,'

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭॥

—'... হে পার্থ, [এইভাবে] যাঁদের মন আমাতে নিবদ্ধ, এই মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে আমি অচিরেই তাঁদের উদ্ধারকর্তা হই।'

ভগবান স্বয়ং নিজের মুখে এখানে বলছেন, *যে তু,* 'কিন্তু যাঁরা'; *সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য,* 'সব কর্ম আমাকে সমর্পণ করে'; *মৎপরাঃ,* 'আমাকে তাঁদের পরম লক্ষ্য মনে করে'; *অনন্যেনৈব যোগেন, 'অনন্য-যোগ* বা একাগ্র ভক্তির দ্বারা'; *মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে,* 'ধ্যান করতে করতে আমার উপাসনা করেন'; *তেষাম্,* 'এইসব ব্যক্তির কাছে'; *অহং সমুদ্ধর্তা ভবামি,* জাগতিকতা থেকে 'উদ্ধারের যন্ত্রস্বরূপ হই আমি'। কী ধরনের জাগতিকতা? *মৃত্যু সংসার-সাগরাৎ,* 'জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর থেকে।' সংসারকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করে ভগবান বলছেন—এই সমুদ্র থেকে আমি তাঁদের টেনে তুলি। *ভবামি,* 'আমি হই'। কী হই? যেহেতু তাঁরা আমার প্রতি অনুরক্ত, অধ্যাত্মজীবন বিকাশের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, তাই আমি এই সংসার থেকে তাঁদের উদ্ধারের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে থাকি। *ন চিরাৎ,* 'খুব শীঘ্র'—বিলম্বে নয়। *চির* মানে 'দেরি'; *ন চির* মানে 'খুব দেরি করে নয়', অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র; *পার্থ,* 'হে অর্জুন'; *ময্যাবেশিত চেতসাম্* 'যাঁদের *চেতস্* বা চিত্ত অথবা মন আমাতে *আবেশিত,* অর্থাৎ নিবিষ্ট, তাঁদের।' তাঁদের সাংসারিক জীবন থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমার। ভক্তিধর্মকে এইভাবে অপেক্ষাকৃত এত সহজ করে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, বেশিরভাগ মানুষই ইহজীবনেই কিছু না কিছু মূল্যবান পাথেয় অর্জন করতে পারেন। ঈশ্বর আছেন; তাঁর ব্যক্তিসত্তাও রয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারি, তিনিও আমাদের ডাকে সাড়া দেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাঁকে *পুরুষোত্তম* অর্থাৎ পরম পুরুষ বলে বর্ণনা করা হবে। আমরা সবাই পুরুষ, আর তিনি হলেন *পুরুষোত্তম।* পরে সেকথা আসবে।

এখানে আমরা ভক্তিযোগের মহৎ শিক্ষাটি এবং সুন্দর সুন্দর ভাবগুলি পাচ্ছি। প্রশ্ন হচ্ছে—কী করে ভক্ত হওয়া যায়? আমরা তো 'ভগবান, ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ' প্রায়শই মুখে উচ্চারণ করি; কিন্তু কিছুই হয় না। শ্রীকৃষ্ণের

কাছ থেকে কোনও সাড়াই পাই না। কিন্তু এই সাড়াটি পেতে হবে। তুলসী দাস তাই আক্ষেপ করে বলছেন, 'আমি রাম, রাম করে যাই, কিন্তু আমার কিছুই হয় না। রাম যদি একবার "তুলসী, তুলসী" বলে ওঠেন, তাহলে আমি অচিরেই উদ্ধার হয়ে যাই।' কিন্তু তাঁকে কেমন করে আমাদের নাম ধরে ডাকাবো? সেটাই আমাদের কাজ। সেটিই ভক্তিপথের সাধনা।

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যাঁদের দেহে আমিত্ববোধ অর্থাৎ *দেহাত্মবোধ* আছে, তাঁদের পক্ষে জ্ঞানপথ খুব কঠিন। কিন্তু ভক্তিপথ সকলের জন্য খোলা। এ পথে আমরা কী করি? সব কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে আমাদের পূর্ব পূর্ব সংস্কারকে শুদ্ধ করে তুলি। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, *তেষামহং সমুদ্ধর্তা ভবামি,* 'আমি তাঁদের উদ্ধারকর্তা হয়ে যাই', অর্থাৎ উদ্ধার করি। কীসের থেকে? *মৃত্যু সংসার সাগরাৎ,* 'এই মৃত্যুময় সংসার থেকে'—অর্থাৎ স্বরূপত যে আমি জন্ম-মৃত্যুহীন তা উপলব্ধি করে আমরা এই সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাই। শরীরটাই মরে, আত্মা নয়। ভক্তিপথের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনা করে আমরা এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। এভাবে ভক্তির অনুশীলন করলে ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে ঐ আধ্যাত্মিক সচেতনতা ও অধ্যাত্মশক্তি জেগে ওঠে। ভক্তিপথ সহজসাধ্য। তাই এখানে আমাদের ভক্তির কথা বলা হচ্ছে। জ্ঞানপথের শুরুতেই এই সচেতনতা থাকা দরকার যে, 'আমি এই শরীর নই'; কিন্তু এই দেহবোধ থেকে মুক্ত হয়ে সাধন আরম্ভ করতে গেলে তো আমাদের অনন্তকাল অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এই কারণেই পৃথিবীর সব দেশের অধিকাংশ মানুষই ভক্তিপথের পথিক এবং ঐ পথে সাধন করেই বহু ভক্ত ঈশ্বরকে অনুভব করেছেন এবং মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করে কৃতার্থ হয়ে গেছেন। সেই আনন্দ তাঁদের গানে এবং অন্যান্য রচনায় ঝরে পড়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে এত করে ধাপে ধাপে ভক্তিপথে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন, জ্ঞানীকে ইন্দ্রিয়ের প্রতি যত আসক্তি সব ঝেড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু বললেই তো আর আসক্তি ঝেড়ে ফেলা যায় না। আসক্তি থেকেই যায়। শ্রীরামকৃষ্ণও তা বিলক্ষণ জানতেন। তাই এক ভক্তকে তিনি বলছেন—বাসনা ত্যাগ করার কী দরকার? কেবল 'ঈশ্বরের দিকে বাসনার মোড় ফিরিয়ে দাও'। তা যদি দেওয়া যায়, তাহলে ধীরে ধীরে আমরা বাসনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব। এভাবেই নানা শাস্ত্রে সর্বসাধারণের জন্য *ভক্তিযোগ*-কে অপেক্ষাকৃত সহজপথ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বলা হয়েছে, যাঁর সংসারের প্রতি খুব একটা আসক্তি নেই, আবার চরম ত্যাগের

ভাবটিও নেই, তাঁর পক্ষে ভক্তিপথই প্রশস্ত; ঐ পথ দিয়েই তিনি পূর্ণতালাভ করতে পারেন। তিনি হয়তো কোথাও যাচ্ছেন, পথে দেখলেন কোথাও হরিকথা হচ্ছে। তিনি বসে পড়লেন। ভগবান সম্পর্কে কিছু সুন্দর ভাবপূর্ণ কথা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করলো। ব্যাপারটা হয়তো হঠাৎই ঘটে গেলো। কিন্তু সেদিন থেকেই তিনি ভক্ত হয়ে গেলেন। তিনি হয়তো তখন তখনই শুদ্ধ, পবিত্র হয়ে গেলেন না, তখনও হয়তো তাঁর ভিতর আসক্তি রয়ে গেছে। তা থাকুক। তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে যাত্রা তো শুরু করেছেন, প্রথম পদক্ষেপটি তো নিয়েছেন। যদি তিনি ঐ পথে ক্রমাগত চলতে থাকেন, তবে একদিন না একদিন, এই জীবনেই চরম ভক্তিলাভ করে ধন্য হবেন (১১/২০/৮)। ভাগবত বলছেন ঃ

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ
জাতশ্রদ্ধাস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো
ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥

অর্থাৎ, যাঁরা এ ধরনের মানুষ, ভক্তিযোগ তাঁদের পক্ষে *সিদ্ধিদঃ*—'সিদ্ধি বা উপলব্ধিপ্রদায়ী'। তাঁরা কী ধরনের মানুষ? তার উত্তরে বলা হয়েছে—*যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধাস্তু যঃ পুমান্,* 'আমার কথা শুনে যাঁর চিত্ত অধ্যাত্মজীবনের প্রতি, ভগবানের প্রেমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।' *ন নির্বিণ্ণো,* 'তাঁর মধ্যে চরম ত্যাগের ভাব নেই'; *নাতিসক্তো,* 'আবার সংসারের প্রতি তাঁর তীব্র আসক্তিও নেই'; *ভক্তি যোগো অস্য সিদ্ধিদঃ,* 'ভক্তিযোগ এইসব মানুষকে ধীরে ধীরে চরম অনুভূতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

এবার গীতার এই অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮॥

—'একমাত্র আমাতেই মন স্থাপন কর; তোমার বুদ্ধিকে নিবিষ্ট কর; তাহলে [দেহান্তে] এরপর আমাতেই বাস করবে, সন্দেহ নেই।'

ময্যেব মন আধৎস্ব, 'তোমার মন কেবল আমার ওপর স্থাপন কর'। ভগবানে মন সমাহিত করার অভ্যাস কর। *ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়,* 'তোমার বুদ্ধিও আমাতে প্রবিষ্ট হোক।' সেটাই তার উপযুক্ত স্থান। বুদ্ধি হলো বিচারশক্তি বা

বিবেক; সেই বুদ্ধিকে ঈশ্বরভাবনার দ্বারা অনুরঞ্জিত করতে হবে। তবেই তা জীবনের ইতিবাচক শক্তিতে পরিণত হবে। *নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং,* 'মৃত্যুতে শরীর নষ্ট হলে তখন তুমি নিশ্চিতভাবে আমাতেই বাস করবে।' বাস্তবিক, আপনার একটা স্থূল শরীর আছে, কিন্তু তার ভিতরেই আর একটা শরীর আছে যাকে আমরা সূক্ষ্মশরীর বলি। মৃত্যুকালে স্থূল শরীরটিই নষ্ট হয়, সূক্ষ্মশরীরটি বিরাজ করে ঈশ্বরে। ভগবান বলছেন, *ন সংশয়ঃ,* 'এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯॥

—'তুমি যদি অব্যাহতভাবে আমাতে মন স্থির করতে না পারো, তাহলে, হে অর্জুন, অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পেতে চেষ্টা কর।'

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্, 'যদি তুমি অবিচলিতভাবে মন স্থির করতে না পারো', তাহলে পরের ধাপটি, অর্থাৎ *অভ্যাসযোগ* অবলম্বন কর। ক্রমাগত অভ্যাস করলে সবকিছুই সহজ হয়ে আসে। যেমন, আপনি যদি রোজ মুগুর ভাঁজেন, আপনার হাতের পেশিগুলি সুঠাম হবেই হবে। অবশ্য রোজ করা চাই। *অভ্যাসযোগও* সেইরকম। প্রথম দিন একটু শক্ত মনে হবে। দ্বিতীয় দিনেও হয়তো তাই। কিন্তু কয়েকদিন গেলে একটু একটু করে অবস্থার উন্নতি হবে। এভাবেই অধ্যাত্মজীবনে ক্রমোন্নতি হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, *অভ্যাসযোগেন ততো মাম্ ইচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়,* 'এই অভ্যাসযোগের দ্বারা আমার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা কর।'

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০॥

—'যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, আমার উদ্দেশ্যে কর্ম কর। আমার কাজ করলেও তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।'

অভ্যাস যদি তোমার কাছে কঠিন মনে হয়, তাহলে পরবর্তী ধাপে যাও ঃ *মৎকর্ম পরমো ভব,* 'যা কিছু কাজ, সব আমার উদ্দেশ্যেই কর', ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর; *মৎ কর্ম,* 'আমার উদ্দেশ্যে কর্ম'। ভক্তের ভাব এই—আমি যে কাজই করি না কেন, তা ঈশ্বরের প্রীতির জন্যই করি। এটিই তাঁর সাধন, কারণ

তিনি ভগবানলাভ করতে চান, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে চান। কর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনার এই ভাবটি বড় সুন্দর।

এক স্প্যানিশ ক্যাথলিক মরমিয়া সাধক ভারী সুন্দর একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'কর্ম হলো দেহের মাধ্যমে ধ্যান।' বাস্তবিক, কর্ম দেহ দিয়ে ধ্যান ছাড়া আর কী? জপের সাহায্যে ধ্যান—সেটি এক ধরনের। আবার দেহের মাধ্যমে ধ্যান করা—সেটি আর এক রকম। দেহ দিয়ে যে ধ্যান, সেটি হলো কর্ম। আমার সব কাজ আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে দিই। *মৎকর্ম পরমঃ,* 'আমার, অর্থাৎ ঈশ্বরের কর্মে নিযুক্ত।' এই ভাব নিয়ে আমরা সব কাজ করতে পারি।

মহাভারতে কসাই-এর কাহিনি আছে। সে পশু হত্যা করে, মাংস বিক্রি করে পেট চালিয়েও মহাযোগী হয়েছিল। এক যোগী গৃহিণী এক ব্রাহ্মণ তপস্বীকে কিছু উপদেশ দেওয়ার পর এই ব্যাধের কাছেই যোগ শিখতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীকে বলেছিলেন—'ওঁর কাছে গিয়ে ধর্মশিক্ষা কর'। প্রশ্ন হতে পারে ঃ যে কসাই, মাংস বেচে, সে আবার কী ধর্ম শেখাবে? তার উত্তর এই, কোনও কাজই বড় বা ছোট নয়; কাজের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই আসল। ব্যাধের মনপ্রাণ ছিল ঈশ্বরে সমর্পিত এবং তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সেবা করতেন। তাতেই তিনি যোগী হতে পেরেছিলেন। আর ঐ গৃহিণী—তিনিও তাই। সংসারের সব কাজ ঈশ্বরে নিবেদন করে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে বলছেন, *মদর্থম্, অপি কর্মাণি কুর্বন্,* 'এমনকি আমার, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম করেও' মানুষ অধ্যাত্মজীবনে পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১॥

—'আর যদি এটিও না করতে পার, তাহলে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে, আমাকে আশ্রয় করে সব কর্মের ফলত্যাগ কর।'

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি, 'যদি তুমি এটিও না করতে পার'; *কর্তুম্ মদ্‌যোগম্ আশ্রিতঃ,* '[তাহলে] আমাকে আশ্রয় করে *মদ্‌যোগ* অবলম্বন কর'; *আশ্রিতঃ* মানে 'নির্ভর করে'; তারপর, *সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্,* 'আত্মসংযত হয়ে, সব কাজের ফল ত্যাগ করে কর্ম কর।' কাজের সময় আমরা

ঈশ্বরকে মনে করতে পারি না; তাই কাজ শেষ করে কাজের সব ফল ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করা উচিত। কাজ করতে করতে আমি হয়তো ঈশ্বরকে স্মরণ করতে পারিনি, কিন্তু কাজের শেষে তো আমি ঈশ্বরকে স্মরণ করে সব কর্মফল নিবেদন করতে পারি। এই কয়েকটি শ্লোকে কি করে ধাপে ধাপে মনকে ভক্তিভাবে অনুসিক্ত করতে হয়, শ্রীকৃষ্ণ তা আমাদের বলে দিচ্ছেন। বলছেন— তোমার সব কর্মের ফল আমাকে দিয়ে যত খুশি কাজ কর। *যতাত্মবান্‌* মানে 'সংযতেন্দ্রিয়', আত্মসংযত। তা যদি হও, তাহলেও তুমি পূর্ণতা লাভ করবে।

পরবর্তী শ্লোকে, আগের কয়েকটি শ্লোকের সারসংগ্রহ করে, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥ ১২॥

—'(অন্ধ) অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান উৎকৃষ্ট; (শুকনো) জ্ঞানের চেয়ে (জ্ঞানমিশ্রিত) ধ্যান আরো ভালো; ধ্যানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ কর্মফলত্যাগ; ত্যাগের অব্যবহিত পরেই শান্তি আসে।'

বিভিন্ন সাধনের কথা এখানে একের পর এক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমে বলা হচ্ছে, *শ্রেয়ো হি জ্ঞানম্‌ অভ্যাসাৎ*, 'অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান উৎকৃষ্ট'। শ্রেয়ঃ মানে 'উৎকৃষ্ট [বা হিতকর]'। বিচার-বিহীন অভ্যাসের কোন দাম নেই। তাই অভ্যাসের চেয়েও জ্ঞান বড়। *জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে*, 'জ্ঞানের চাইতেও ধ্যান আরো ভালো।' সবশেষে, *ধ্যানাৎ কর্মফল ত্যাগঃ*, 'ধ্যানের মাধ্যমে কর্মফলত্যাগ আসে'; ভগবানের চরণে 'আমরা সব কর্মফল সঁপে দিই।' এই যে কর্মের ফল ত্যাগ করা, তা ধ্যানের অভ্যাসের মধ্য দিয়েই এসে থাকে। *ত্যাগাৎ শান্তিঃ অনন্তরম্‌*, 'এবং যখন সেই ত্যাগ আসে, মন তখন শান্ত, প্রশান্ত, প্রসন্ন হয়ে যায়'। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এখানে পর পর কয়েকটি সাধনক্রমের কথা বলা হয়েছে—*অভ্যাস, জ্ঞান, ধ্যান এবং কর্মফলত্যাগ।* কর্মফলত্যাগের ভাব আসতেই হবে, কারণ সেটিই আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। সবকিছু ঈশ্বরের; আমি কেবল তাঁর হাতের যন্ত্র। ধ্যান এবং জ্ঞানের মধ্য দিয়ে এই মনোভাব জাগবেই জাগবে। যদি তা না জাগে, তাহলে সবকিছুই যেন নিরর্থক হয়ে গেল। [কিন্তু তা হয় না, ঐ ভাব আসবেই আসবে] এবং তা এলেই *শান্তিঃ অনন্তরম্‌।* সব কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে দিলেই শান্তি এলো।

১৩ সংখ্যক শ্লোক থেকে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে যথার্থ ভক্তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আমার সত্যিকারের ভক্ত কে?—শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নের জবাব নিজেই সেখানে দেবেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও ভক্তের সুন্দর সব বর্ণনা আছে। ভাগবতে ভগবান একজায়গায় বলছেন ঃ

মষ্যর্পিতাত্মনঃ পুংসাং, ময়ি সংন্যস্য চেতসঃ।
ন পশ্যামি পরং যোগম্ অকর্তুঃ সমদর্শনাৎ॥

'যিনি আমাতেই সমর্পিত হৃদয়, তিনি সব কাজ করলেও, সব কর্মের ফল আমাকেই সমর্পণ করেন। এরকম মানুষ বস্তুত কোন কর্মই করেন না, কারণ সমর্পণের এই মনোভাব হেতু সর্বদাই তিনি বিশ্রামসুখ অনুভব করেন। সেইজন্যই এইরকম ব্যক্তি আমার প্রিয়। তিনি সমদর্শী, সকলের প্রতি সমমনোভাবসম্পন্ন।'

ভাগবতে এজাতীয় শ্লোক অনেক আছে, আছে গীতাতেও। সাধারণত কাজের সময় আমরা মনের গতি তলিয়ে দেখি না। কাজ করে মনের কি উন্নতি হচ্ছে? তা কি ক্রমশ শুদ্ধ ও সমৃদ্ধ হচ্ছে? এসব প্রশ্ন আমরা নিজেদের করি না। আমরা যন্ত্রের মতো কাজ করে যাই এবং বাহ্য ফলের প্রতীক্ষা করি। আজ আমি হয়তো কুড়িটি গর্ত খুঁড়েছি। ভালো কথা। অনেক কাজ করেছি। অথবা, অনেক কাগজপত্র পরীক্ষা করে তার ওপর আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। ব্যস্। ঐখানেই আমার কাজ শেষ। কিন্তু এসব হলো *বাইরের* কাজ। *মনের* কী হচ্ছে? সচরাচর আমরা একথা নিজেদের জিজ্ঞাসা করি না এবং তাইতেই মানুষের এতো দুর্দশা! নিজেদেরই প্রশ্ন করতে হবে—*আচ্ছা, এই যে আমি কাজ করছি, তাতে কি আমার মানসিক উন্নতি হচ্ছে? মন কি শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হচ্ছে? মনের পিছনে যে আত্মা রয়েছেন, মন কি ক্রমশ তাঁর ঘনিষ্ট হচ্ছে?* অর্থাৎ, সোজা কথায়, *আমার কি আধ্যাত্মিক উন্নতি হচ্ছে?* মানুষ যদি এই প্রশ্ন করে, তাহলে তার নিজেরই কল্যাণ। আজকাল এখানে-ওখানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চৈতন্যকে (মনকে) বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগে চৈতন্যকে আমরা আমলই দিতাম না। এখন দিন বদলাচ্ছে। বাস্তবিক, চৈতন্যই সক্রিয়; বাহ্যজগতের যত পরিবর্তন তা চৈতন্যের দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এ প্রশ্ন আমাদের মনে ওঠে না যে, চৈতন্যের নিজের কী হচ্ছে? এটি বর্তমান বিশ্বের দুর্ভাগ্য! বিজ্ঞানের দৃষ্টি কেবল বস্তুর ওপরই নিবদ্ধ। কিন্তু যিনি বিজ্ঞানী, তাঁর তো চৈতন্য আছে। সেই চৈতন্যের কী হলো? তা নিয়ে বিজ্ঞানীর কোনও

মাথাব্যথা নেই। তিনি জবাব দেবেন—আমার কাজ বস্তু নিয়ে, চৈতন্য-ফৈতন্য আমার কাজের আওতায় পড়ে না! এই বিংশ শতাব্দীতেই কেবল চৈতন্য সম্বন্ধে, তার গুরুত্ব সম্পর্কে যা একটু আধটু সচেতনতা এসেছে; চৈতন্যকে অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু করার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে প্রশ্ন উঠছে—আমরা কি চৈতন্যকে বিকশিত করতে পারি? তার বিস্তার ঘটাতে পারি? তাকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারি? নৈতিক ও অধ্যাত্মজগতের এইসব প্রশ্ন আজ ক্রমশ মাথা তুলছে। তুলবেই, কারণ জড়বিজ্ঞান যখন তার সব কেরামতি প্রায় দেখিয়ে ফেলেছে, যখন সে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আর ভোগের নিত্য-নতুন উপকরণের অতিরিক্ত মূল্যবান আর কিছুই দিতে পারছে না, তখন এ প্রতিক্রিয়া আসতে বাধ্য। সেই প্রতিক্রিয়াই শুরু হয়েছে। চৈতন্য (মন) তাই আজকাল গুরুত্ব পাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, কর্মের মাধ্যমে যদি আমরা ভক্তির অনুশীলন করি, তাহলে আমাদের মানসিক প্রসার হবে। তাই মনকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে হবে এবং তাকে সঠিক পথে চালিত করতে হবে। এটি করা আমাদের সকলের কর্তব্য। মনকে অবহেলা করে আমরা হয়তো অনেক কাজ করতে পারি, প্রভূত বিত্ত ও সম্পদ অর্জন করতে পারি; কিন্তু তাতে আমাদের অধ্যাত্ম জীবনের কোনও উন্নতিই হবে না—না জাগবে অন্তরের শক্তি, না আসবে মনের শান্তি।

গীতার এই দ্বাদশ অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ততম। মাত্র ২০টি শ্লোক এতে। কিন্তু অতি সুন্দর, বিশেষ করে শেষের শ্লোকগুলি ভাব-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। অনেকে অধ্যায়টি মুখস্থ করেন। আবৃত্তি করতেও খুব ভালো লাগে। যখন আপনি একা আছেন, এই শ্লোকগুলির কথা মনে মনে চিন্তা করুন। এই শ্লোকগুলি যখন আমরা পড়ি, তখন স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে 'এই বর্ণনার সঙ্গে আমার কতটা মিল আছে?' ভগবান তো বলে যাচ্ছেন, যাঁদের এই এই গুণ আছে তাঁরা আমার অতি প্রিয়। আমিও তো ভগবানের প্রিয় পাত্র হতে চাই। কিন্তু হব কী করে? তার উত্তর এই, 'ধাপে ধাপে এইসব গুণগুলি আয়ত্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তবেই একদিন ভগবানের পাদপদ্মে আমাদের সর্বোচ্চ শরণাগতি আসবে।'

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ।। ১৩।।

—'যিনি কাউকে দ্বেষ করেন না, সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং দয়ালু, যিনি "আমি ও আমার" ভাববর্জিত, সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন এবং ক্ষমাশীল।'

শ্লোকের শুরুটি চমৎকার। *অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং,* 'কোন প্রাণীর প্রতি শত্রুভাব নেই'। ভগবানের একথা বলার তাৎপর্য এই, আমার ভক্ত কারো প্রতি শত্রুভাব পোষণ করবেন না। *মৈত্রঃ,* 'তিনি সকলের বন্ধু'। শুধু যে বৈরিতা নেই তাই নয়, মিত্রভাবাপন্নও বটে। *করুণ এব চ,* 'এবং দয়ালু'। *নির্মমো,* "এটা আমার, এটা আমার", এই ভাব থেকে মুক্ত। মমত্ববর্জিত। *নিরহংকারঃ,* 'অহংবোধ থেকে মুক্ত'। তাঁর মধ্যে আমিত্বের ঝাঁজ নেই; যে-আমি আছে তা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'বিনম্র আমি', 'পাকা আমি', 'ভক্তের আমি', 'দাস-আমি'। সেখানে আমিত্বের এমন রূপান্তর ঘটে গেছে যে, পুরনো কাঁচা-আমিকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। *সম দুঃখ সুখঃ ক্ষমী,* 'সুখ এবং দুঃখে সমভাবাপন্ন এবং ক্ষমাশীল।' সুখ অথবা দুঃখ এলে সাধারণ মানুষের মন আলোড়িত হয়। কিন্তু প্রতিকূল ও অনুকূল দুটি পরিস্থিতিতেই এই ভক্ত মনের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করবেন। সেই সঙ্গে তিনি *ক্ষমী,* অর্থাৎ 'ক্ষমাশীল' হবেন; অসাধারণ সহ্যশক্তি থাকবে তাঁর। সামান্য ব্যাপারে তিনি উত্তেজিত হবেন না, কারো প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাস্তি দেবেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন আমরা অন্তর্নিহিত দিব্যগুণগুলিকে বিকশিত করার সাধনায় রত হয়েছি; তাই বাইরের কাজকর্ম ও আচরণে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা যাবে। যদি আমি সংসারে আকণ্ঠ ডুবে থাকি, তাহলে কখনও কখনও আমার আচরণে অন্যের প্রতি দ্বেষ বা বৈরিতা প্রকাশ পাবে, ক্ষেত্রবিশেষে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে আমার। এইরকম আমাকে অনেক কিছুই করতে হতে পারে। কিন্তু এখন আমি সংসারে থাকলেও সংসারী নই; এখন আমি ঈশ্বরের দিকে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছি। স্বভাবতই শ্রীকৃষ্ণ এখানে যেসব গুণের কথা বলেছেন, তার কিছু কিছু আমার মধ্যে ফুটে উঠবেই।

সহ্যশক্তি বা তিতিক্ষা এক অসাধারণ গুণ; অসামান্য শক্তি নিহিত আছে তার মধ্যে। আমার সঙ্গে কেউ হয়তো অতীতে মন্দ আচরণ করেছিল। সেই তিক্ত স্মৃতি আমি সযত্নে মনে লালন করছি। কুড়ি বছর পরেও আমি তা ভুলতে পারিনি। সাধারণ মানুষ এই ধরনেরই হয়ে থাকে। কিন্তু অধ্যাত্মজীবনে যিনি প্রবেশ করেছেন, তিনি মনে মনে বলবেন—'আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। আমার মন অসন্তোষের জঞ্জাল জমিয়ে রাখার পাত্র নয়, তার একটা মহত্তর লক্ষ্য আছে, মহৎ উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করতে হবে।' যাঁরাই অধ্যাত্ম বা ধর্মজীবন যাপন করেন, তাঁদের মধ্যেই এ ধরনের উৎকর্ষ চোখে পড়ে। অনেক দিন আগে কোনও এক ইংরেজি পত্রিকায় একটি কথা পড়েছিলাম। তাতে ছিল, 'যে হৃদয়

ক্ষোভ পুষে রাখে না, সে হৃদয় ধন্য।' কিন্তু আমরা কী করি? মনের মধ্যে ক্ষোভের পাহাড় জমিয়ে তুলি; যত ক্ষোভ সব মনের ভিতর জমিয়ে রাখি! কুড়ি বছর পরেও পুরনো দুঃখ ভুলতে পারি না! এই তো আমাদের দুরবস্থা। কিন্তু হৃদয়ের এ দুর্দশা কেন? আগেও উল্লেখ করেছি, এর কারণ হলো আমাদের দেহ-মন সংঘাত বা দেহ-মনরূপ যন্ত্রটি 'অভিজ্ঞতার শোধনাগার' হয়ে উঠতে পারেনি। যখন তা হবে, তখন যত সব ক্ষোভ রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ঈশ্বর-ভাবনা দিয়ে আমরা সেগুলিকে পরিবর্তিত করে ফেলব, রূপান্তরিত করে নেব। সে সামর্থ্য আমাদের আছে। আমরা কেবল সেই যোগ্যতার কথা ভুলে গিয়ে বাঁধাধরা গৎ আউড়ে যাচ্ছি; বলছি ঃ 'দূর হ! দূর হ!' অথবা 'ঐ লোকটি আমার ক্ষতি করেছে; আমি ওকে শায়েস্তা করবো, শেষ করবো।' আমাদের এখনকার মনোভাব এইরকমই এবং এটিই মানুষের যত দুঃখের মূল। মহাভারতে এধরনের দুঃখ-দুর্বিপাকের ছড়াছড়ি। সেখানে দেখতে পাই, একটার পর একটা ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে শেষে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। তাই বলছিলাম—এধরনের জিনিস হওয়া উচিত নয়। যুদ্ধের প্রশস্তি করার জন্য ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেননি; ঘৃণা, হিংসা এবং ঐ জাতীয় আবিলতা মানুষের জীবনে কি সর্বনাশ ডেকে আনে, সেটি দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ঐ মহাকাব্যের শেষ দিকে, পুত্র শুককে মহাভারতের সারসংক্ষেপ দিতে গিয়েও ব্যাসদেব এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। সেখানে তিনি সাবধান করে দিয়ে বলেছেন—বাসনা, লোভ ইত্যাদিকে মনের মধ্যে কখনও প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়; সে উপক্রম হলেই সর্বশক্তি দিয়ে মনের রাশ টেনে ধরতে হবে—ওগুলিকে মনের ভিতর কোনওমতে ঢুকতে দেওয়া চলবে না। এভাবেই ক্রমশ চিত্তকে পরিশুদ্ধ ও নির্মল করে তুলতে হবে। সেটিই ভিতরের শিক্ষা, অন্তরের অনুশীলন। বাইরে আমরা সকলকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারি, কিন্তু আন্তর-শুদ্ধি ঘটাতেই হবে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন ঃ

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥

সংস্কৃতে একটি কথা আছে—*ক্ষমা বীরস্য ভূষণম্*, 'ক্ষমা বীরের অলংকার'। কখনও ভাববেন না ক্ষমা ভীরুর ধর্ম। যেহেতু আমি দুর্বল, সেহেতু আমি ক্ষমা করে দিলাম। না, ওটা কোনও ক্ষমাই নয়। যথার্থ *ক্ষমা* চরিত্রের এক মহান ঐশ্বর্য এবং একমাত্র প্রচণ্ড শক্তিমানের পক্ষেই ক্ষমাপরায়ণ হওয়া সম্ভব। আপনি

যদি দুর্বল হন—'আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম'—ও কথা আপনার মুখে সাজে না। কারণ যে আপনার চেয়ে শক্তিমান, তাকে আপনি ক্ষমা করবেন কী করে? করতে পারেন না। কিন্তু আপনি যদি শক্তিধর হন, তাহলে ক্ষমা করা আপনার পক্ষে আবশ্যিক গুণ। তাই, আপনার ভিতর যদি প্রতিরোধের শক্তি থাকে, তাহলে সর্বদা ক্ষমা অভ্যাস করুন। এমন চরিত্রের মানুষ যে-সমাজে বেশি পরিমাণে থাকেন, সে-সমাজে জীবন আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। আমরা চাই এমন শক্তিমান অথচ ক্ষমাশীল মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাক। এভাবেই সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে। মানুষ যদি এসব অসাধারণ গুণগুলির অনুশীলন করে এবং তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে সমাজে শুভশক্তির প্রভাবে অশুভ শক্তিগুলি স্বভাবতই দমে যাবে। ভালো, মন্দ দুটিই মনের সৃষ্টি; দুটির জন্মই মনে। তাই কর্মজগতে মন কিরকম আচরণ করছে, সেদিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া সকলের পক্ষেই অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে, যেমন সামাজিক জীবন, তেমনি গোষ্ঠীগত জীবন, তেমনি দাম্পত্য জীবন—সবই বিপর্যস্ত হবে। কারণ সকলেই আমরা অষ্টপ্রহর বাইরের দিকেই তাকিয়ে আছি। অথবা একজন যদিও বা মনের দিকে তাকান, অন্য জন ঐ পথের ধারপাশ দিয়েও যান না। আমাদের মনের কি দুর্দশা হয়েছে, সে-কথা আমাদের ভাবতে হবে। যাঁদের মন শুধুই বহির্মুখী, তাঁরা ভেবেও দেখেন না কেন তাঁদের মন এত উন্মত্ত, অথবা কিভাবে বেপথু মনকে সঠিক পথে চালনা করা যায়। এই কারণেই জগতের মানুষ এত অসুখী। এত দুঃখকষ্টে ভোগে। কিন্তু আমরা যদি কাজকর্ম করার সময় একটু যত্ন নিয়ে মনকে এবং সেই সঙ্গে বাইরের জগৎকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি, তাহলেই এসব অবাঞ্ছিত দুঃখকষ্ট এড়ানো সম্ভব।

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ।। ১৪।।

—'যিনি সদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, আত্মসংযত, [আত্মবিষয়ে] দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং যাঁর মন ও বুদ্ধি আমাতেই অর্পিত—এমন যে ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়।'

ভারতীয় অধ্যাত্মজীবনের যে পরম্পরা, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো প্রফুল্লতা। ধর্মজীবন আনন্দ ও সুখের—হাহুতাশ বা দুঃখের নয়। সাধারণত মানুষ ভাবেন এবং আজও সে ধারণা সক্রিয় যে, ধর্মজগতের মানুষ দুঃখী, তাঁদের জীবন দুঃখে পরিপূর্ণ। এটা তাঁদের মস্ত ভুল। এই ভুল ধারণা থেকেই, আমাদের

ব্রহ্মচারীরা যখন গৃহস্থের দরজায় ভিক্ষার জন্য যান, তাঁরা প্রশ্ন করেন, 'তোমার কী হয়েছে, বাবা? কোন্ দুঃখে পড়ে তুমি এই পথ বেছে নিয়েছ?' এইরকম আরো নানা প্রশ্ন তাঁরা করেন। তাঁদের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে আমার কিলিয়ানি-র (Kiliani) কথা মনে পড়ছে। দুবছর আগে সে দেহ রেখেছে। প্যারিস ও মিউনিখ্-এর কাছে একটি গ্রামে আমি তার সঙ্গে ছিলাম। গ্রীসের বিখ্যাত জাহাজ ব্যবসায়ী ওনাসিস (Onassis)-এর চারটি মেয়ের দেখাশোনা করতো সে। মেয়েগুলি একে একে বড় হতে লাগলো। কুড়ি থেকে তেইশ বছর যখন তাদের বয়স হলো, তাদের বিয়ে-থা সব হয়ে গেল। ওনাসিস পরিবারে কুড়ি বছর কাজ করার পর কিলিয়ানিও অবসর নিল। ভগবানের কথা বা ধর্মের কথা কখনও সে ভাবেনি। সে প্যারিসে চলে আসে। কিন্তু প্যারিসে সে করবেটা কী? এক শনিবার সে কাগজে দেখলো যে গ্রেৎস্ (Gretz)-এ 'রামকৃষ্ণ-বেদান্ত সেন্টার' বলে একটা সংস্থা আছে এবং সেখানে একটি বক্তৃতা হবে। সে ভাবলো 'বক্তৃতাটি শুনেই আসা যাক'। এতদিন কিন্তু এসব কথা তার কখনও মনে ওঠেনি। সে যাই হোক, সুন্দর আশ্রমটিতে সে এলো। দেখলো—অনেক মানুষ জড়ো হয়েছেন। চোখে পড়লো তার 'কথামৃত'-র ইংরেজি অনুবাদ 'দ্য গস্পেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থখানি। বইখানি কিনেই সে পড়তে শুরু করে। তার কাছে এ সব নতুন কথা, নতুন ভাব। বইখানি পড়ে সে অভিভূত! উদ্দীপিত! যখন তার সাথে আমার দেখা হয়, ততদিনে সে আমার 'দ্য ম্যাসেজ অফ দ্য উপনিষদস্' (উপনিষদের সন্দেশ) বইখানিও পড়ে ফেলেছে। দেখা হতেই সে তার জীবনবৃত্তান্ত আমাকে বলে। সে আমাকে ধরে বসলো, তাকে একটি সংস্কৃত নাম দিতে হবে। আমি বললাম—তোমার নাম 'কল্যাণী'। নামের মানেটাও বলে দিলাম। যে কথাটি সব থেকে মূল্যবান তা হলো এই, সে আনন্দে ভরপুর হয়ে আছে। আক্ষেপের সুরে বললো—'অধ্যাত্মজীবনের এই সত্য না জেনে কেন আমি মিছিমিছি জীবনের সত্তরটা বছর জলে দিলাম?' ব্যাপারটা কি আশ্চর্যের নয়? সে যা হোক, গল্পের আরও একটু বাকি আছে। একদিন শ্রীমতী ওনাসিস লন্ডন থেকে কল্যাণীকে ফোনে বললেন, 'মিস কিলিয়ানি, তোমার কী হয়েছে? তুমি সুস্থ আছ তো?' কল্যাণী তার উত্তরে বলে, 'হ্যাঁ, ম্যাডাম, আমি খুব ভালো আছি।' শ্রীমতী ওনাসিস যারপরনাই বিস্মিত হয়ে বললেন, 'না, না, তুমি একটা আশ্রমে রয়েছ! ভালো আছ বললেই হবে? কোন একটা বিপদে না পড়লে তুমি কখনওই ওখানে থাকতে পার না।' কল্যাণী আমাকে বলে, 'আমি যে কী আনন্দে আছি, তা কি করে ওদের বোঝাই বলুন তো! এখন বুঝতে পারছি জীবনের

সত্তরটা বছর আমি নষ্ট করেছি। এই সব ধর্মের ভাব যদি আগে পেতাম, তাহলে কী ভালোই না হতো!'

এই হলো কিলিয়ানির আত্মকথা। শত শত মানুষের জীবনেও এই একই ঘটনা ঘটে চলেছে। এর একটাই কারণ—ধর্ম যে আনন্দের, একথা তারা জানে না।

বাস্তবিক, ধর্ম যে আনন্দের, শ্রীরামকৃষ্ণ তা তাঁর নিজের জীবন দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণও আনন্দঘন পুরুষ ছিলেন। যিশুখ্রিস্টও তাই। তাঁর সত্যিকারের জীবন ছিল আনন্দে ভরা। কিন্তু খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বে তাঁকে দুঃখী করে চিত্রিত করা হয়েছে। 'নিউ টেস্টামেন্ট' পড়ে দেখুন। তাহলেই দেখতে পাবেন তিনি কতটা আনন্দময় পুরুষ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে উপদেশছলে বলছেন : *সন্তুষ্টঃ সততং যোগী,* 'যোগী, যিনি সর্বদাই সুখী ও তৃপ্ত'। কেন? না, তিনি পরম সত্যের সান্নিধ্য পেতে চলেছেন। তাহলে আর তিনি দুঃখী হতে যাবেন কেন? *যতাত্মা,* 'মনকে ঠিক জায়গায় ধরে রাখার ব্যাপারে সদা যত্নশীল।' *দৃঢ়নিশ্চয়ঃ,* 'দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত মন নিয়ে'। তাঁর ভাব এই—আমি এই পথে চলছি, এই পথের আনন্দ পেতে আমি এই পথের শেষ দেখে ছাড়ব। *ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ,* 'যাঁর মন ও বুদ্ধি আমাতে সমর্পিত'; *যো মদ্ভক্তঃ,* 'আমার এমন যে ভক্ত'; *স মে প্রিয়ঃ,* 'তিনি আমার অতি প্রিয়।'

এরপর এমন একটি আদর্শের কথা বলা হচ্ছে যা সচরাচর ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রেই দেখা যায়। কী সেই আদর্শ? এই আদর্শের একদিকে আছে শক্তির ধারণা, অন্য দিকে নিঃশঙ্কতা ও করুণার ভাব। সাধারণত আমরা দেখি যে, কেউ যদি শক্তিমান হন তো তিনি সকলের ভয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু এখানে যে শক্তির কথা বলা হবে, তা ভিন্ন ধরনের। এই শক্তি সকলের মনে আনন্দ আনে, নিরাপত্তা জোগায়। এই শক্তি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের শক্তি, এর মহিমা আলাদা। বিখ্যাত পরবর্তী এই শ্লোকে বলা হয়েছে :

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫॥

—'যাঁর দ্বারা জগৎ উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি নিজেও জগতের দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না, যিনি অতিরিক্ত হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় এবং উদ্বেগ থেকে মুক্ত—তিনি আমার প্রিয়।'

যস্মাৎ ন উদ্বিজতে লোকঃ; লোকঃ মানে 'জগৎ-সংসার'; *ন উদ্বিজতে,* 'উদ্বিগ্ন হয় না'; যস্মাৎ, 'যাঁর থেকে'; 'সেই ব্যক্তি যাঁর থেকে এই সংসার উদ্বিগ্ন হয় না', কারণ তিনি এতটাই সরল, শান্তিপূর্ণ ও শান্ত। এমন মানুষ কী করে অন্যের উদ্বেগের কারণ হবেন? এই শ্লোকে ভক্তের যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে, এটি তার প্রথমটি। চরিত্রের দ্বিতীয় গুণটি আরো গুরুত্বপূর্ণ ঃ *লোকাৎ ন উদ্বিজতে চ যঃ,* 'জগৎও যাঁকে উদ্বিগ্ন করতে পারে না'। তিনি এমন শক্তিধর ও নির্ভীক যে সংসার তাঁকে উত্তেজিত বা সংক্ষুব্ধ করতে পারে না। আবার সেই সঙ্গে এতটাই শান্ত ও নম্র যে, জগৎ তাঁর দ্বারা উদ্বেজিত হয় না। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মৃদুতা ও শক্তির কী মনোহর সংমিশ্রণ, যা সংসারে সুদুর্লভ। এটি প্রকৃত ভক্তের বিশেষ লক্ষণ।

গান্ধীজীর এই গুণটি ছিল। তাঁর কাছ থেকে কারো কোনও ভয়ের কারণ ছিল না, আবার তাঁকেও কেউ ভয় দেখাতে পারতো না। অধ্যাত্মজীবনের গভীরে প্রবেশ করলে এইসব গুণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে শুরু করে। আমি চরম নির্ভয়, আবার আমার কাছেও কারো ভয় নেই। ভারতীয় মন্দিরের দেব-দেবীর মূর্তিগুলির মতো—সর্বদা সকলকে হাত তুলে অভয় দিচ্ছেন, যেন বলছেন ঃ ভয় নেই, সব ভয় ঝেড়ে ফেলো। আমি তো রয়েছি! একে *অভয়-মুদ্রা* বলে। ভারতীয় দেব-দেবীর মূর্তিগুলিতে দুটি মুদ্রা খুবই প্রচলিত—একটি *বর-মুদ্রা,* যা আমাদের কাছে ডাকে; দ্বিতীয়টি *অভয়-মুদ্রা,* যা বলে নিঃশঙ্ক হও। এই বই-এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি আর একটি মুদ্রার উল্লেখ করেছি। সেটিকে বলে *জ্ঞান-মুদ্রা।* মূর্তিনির্মাণশৈলীতে আমরা এই সব চিন্তাভাবনাগুলি অন্বিত করেছি।

এখন প্রশ্ন, কেন ভক্ত অন্য আর পাঁচজনের ভয়ের কারণ হন না? কারণ, জগতের সকলের সঙ্গে তিনি একাত্মতা বোধ করেন। তাঁর হৃদয়ে প্রেম ছাড়া আর অন্য কিছুই থাকে না। তা না হয় হলো। কিন্তু জগৎ তাঁকে ডরাতে পারে না কেন? তার কারণ, ভক্ত ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে পরম শক্তিমান হয়ে যান। তাঁকে ভীত করবে কে? কোনও কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তাই, যত আপনি ভগবানের দিকে এগোবেন ততই এই দুটি গুণ আপনার ভিতর ফুটে উঠবে। প্রথম প্রথম হয়তো ভক্তজীবনে এই গুণাবলী পূর্ণরূপে বিকশিত হয় না। তা না হোক, এই ভাবের একটুখানি স্ফুরণ হলেও হেউঢেউ হয়ে যায়। বাস্তবিক, আমি অন্যের ভয়ের কারণ হতে যাব কেন? আমরা সভ্য

জগতে বাস করি। সকলের হাতে হাত মিলিয়ে কেন আমরা বন্ধুর মতো দুটো কথা বলতে পারব না? এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা অধ্যাত্মজীবন গড়ে তুলি, তাহলে ক্রমশ আমরা যে ভয়কে জয় করব তাই নয়, সকলের ভয় দূর করার সামর্থ্যও আমরা অর্জন করব। শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই ধরনের ভক্তির কথাই বলছেন। এতো গেলো ভয়ের দিক। অনুরূপভাবে, ভক্ত *হর্ষ* ও *অমর্ষ* থেকেও মুক্ত। *হর্ষ* হলো 'অতিরিক্ত উল্লাস'; *অমর্ষ* হলো 'অসহিষ্ণুতা'। ভয় ও উদ্বেগের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। এগুলি থেকে যিনি *মুক্তঃ,* যিনি এসবের বাইরে গেছেন; *যঃ* 'তা, তিনি যেই হোন না কেন'; *স চ মে প্রিয়ঃ,* 'তিনি আমার প্রিয়'। প্রকৃত ভক্তের কী অসাধারণ একটি ছবি! তারপর বলা হচ্ছে—

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ।। ১৬।।

—'যিনি স্বনির্ভর, পবিত্র, তৎপর, উদাসীন, অবিড়ম্বিত, সকল কর্মের উন্মাদনা ত্যাগ করেছেন—এমন যে ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়।'

এবার প্রকৃত ভক্তের আরো কয়েকটি অনবদ্য গুণের কথা বলা হচ্ছে। *অনপেক্ষঃ,* 'বাইরের কোনও কিছুর ওপর কখনও নির্ভর করেন না'; *অপেক্ষা* মানে 'নির্ভরতা'; *শুচিঃ,* 'পবিত্র'; *দক্ষঃ* মানে 'প্রচণ্ড কর্মকুশলতা'। যখন কাউকে সুচারুভাবে কোনও কিছু করতে দেখি, আমরা বলি ঃ ইনি *দক্ষ।* ভক্ত হলেই যে অকর্মণ্য, গোবেচারাগোছের হতে হবে, তা নয়; তিনি কর্মকুশল ও প্রচণ্ড পরিশ্রমী হবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি *উদাসীনঃ,* 'সম্পূর্ণ অনাসক্ত', কিছুতেই যেন তাঁর কিছু আসে যায় না। বড় বড় কাজ করছেন, কিন্তু অচঞ্চলভাবে। ভারতবর্ষে আজ ধীরে ধীরে 'ম্যানেজমেন্ট' বা পরিচালনা সংক্রান্ত একটা দর্শন বা চিন্তাভাবনা গড়ে উঠছে। অনেকে অনেক বইপত্রও লিখছেন। যে নির্লিপ্ত কর্মকুশলতার কথা গীতা বলছেন, এই ম্যানেজমেন্ট দর্শনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কী করে? এই জন্য যে, যে কোনও কাজের জন্য আপনি সর্বদাই প্রস্তুত, আপনি প্রভূত পরিশ্রম করছেন—কিন্তু মাথার ওপর কাজের বোঝা চেপে রয়েছে, এ অনুভব আপনার হচ্ছে না, কারণ আপনি সম্পূর্ণ 'নির্লিপ্ত'। *উদাসীনঃ* মানে 'যা চারপাশে ঘটছে, তার প্রতি আপনি অনাসক্ত'। এ দুটি আপাতবিরুদ্ধ ভাবকে আয়ত্ত করা, সমন্বিত করা চারটিখানি কথা নয়। চীন দেশে এবং ভারতবর্ষে এই মহৎ ভাবদুটি অনুশীলিত হয়েছে—আপনি শান্ত,

স্থির হয়ে প্রচুর কাজ করে চলেছেন, কিন্তু এই ভাব নিয়ে যেন আপনি আদৌ কিছুই করছেন না। এই হচ্ছে *উদাসীনঃ* কথাটির তাৎপর্য। তারপর, *গতব্যথঃ,* 'ব্যথা, যন্ত্রণা, দুঃখ— সব কিছু থেকে মুক্ত।'

সর্বারম্ভ পরিত্যাগী, অহং তৃপ্তির জন্য এটা-ওটা করার পরিকল্পনা এবং 'অন্তরের সংক্ষুব্ধ আবেগ বর্জন করে'। *আরম্ভ* মানে 'নতুন কর্মোদ্যোগ'; *পরিত্যাগী* অর্থাৎ 'বর্জনকারী'। তাৎপর্য এই, যে-কাজ করতে হবে, তা তিনি করবেন, কিন্তু 'আমি নতুন একটা কিছু করছি', এই ভাব সেখানে থাকবে না। কাজ থাকবে, কিন্তু কাজের জন্য মানসিক উদ্বেগ থাকবে না। *যো মদ্ভক্তঃ,* 'যিনি আমার এরকম ভক্ত'; *স মে প্রিয়ঃ,* 'তিনি আমার বড়ই প্রিয়।'

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ।। ১৭।।

—'যিনি উল্লসিত হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, শুভ ও অশুভ দুটিই পরিত্যাগ করেন, অথচ ভক্তিমান—তিনি আমার প্রিয়।'

যো ন হৃষ্যতি, 'যিনি উৎফুল্ল হন না'; *ন দ্বেষ্টি,* 'পরিস্থিতি বিগড়ে গেলে যিনি ক্রুদ্ধ হন না', *ন শোচতি,* 'শোক করেন না'; *ন কাঙ্ক্ষতি,* 'বাসনাতাড়িত হয়ে নানা বস্তুর পিছনে ছুটে বেড়ান না'; *শুভাশুভ পরিত্যাগী,* 'এটি শুভ, ওটি অশুভ—এই ভাবনার পারে' যিনি গিয়েছেন। অর্থাৎ শুভ ও অশুভ নিয়ে তিনি মোটেই বিচলিত নন। যাঁরা ঈশ্বরকে ভালবাসেন, এসব বিচার তাঁদের কাছে গৌণ হয়ে যায়। চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সব অনায়াসে, স্বাভাবিকভাবেই আসে। *ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ,* 'এমন ভক্ত সত্যিই আমার প্রিয়।' তারপর আসছে ঃ

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ।। ১৮।।

—'যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি এবং মান ও অপমানে একই রকম এবং শীত ও উষ্ণতায়, সুখে ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, যিনি অনাসক্ত'।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ, 'বন্ধু হোক আর শত্রুই হোক, দুজনার প্রতিই ভক্তের সমদৃষ্টি'। সব পার্থক্য তাঁর দৃষ্টি থেকে মুছে গেছে। শত্রু, মিত্র—দুই তাঁর কাছে সমান। *তথা মানাপমানয়োঃ,* 'সেইরকম, সম্মানে ও অসম্মানেও সমবুদ্ধিসম্পন্ন'।

কেউ হয়তো ভক্তকে সম্মান করলেন, আবার কেউ হয়তো অপমান করলেন—দুটি আচরণই তাঁর কাছে সমান। ওসব নিয়ে তাঁর মন মোটেই উদ্বেলিত হয় না। *শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ,* 'ঠাণ্ডায় অথবা গরমে, সুখে অথবা দুঃখে তাঁর মনোভাব একইরকম।' এই সব বিপরীত অবস্থাতেও ভক্তের মন এতটুকু বিচলিত হয় না, আন্দোলিত হয় না। তিনি সর্বদা একরকম। *সঙ্গবিবর্জিতঃ,* 'সব আসক্তি থেকে মুক্ত।'

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯॥

—'যাঁর কাছে নিন্দা ও প্রশংসার একই মূল্য, যিনি সংযতবাক, অল্পেই সন্তুষ্ট, যাঁর নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই, মন স্থির এবং ভক্তিতে পরিপূর্ণ—এমন ব্যক্তি আমার প্রিয়।'

তুল্যনিন্দা স্তুতিঃ, 'নিন্দা এবং প্রশংসায় মন স্থির'। কেউ নিন্দাই করুক অথবা প্রশংসাই করুক, ভক্তের তাতে চিত্তচাঞ্চল্য হয় না। *মৌনী* মানে 'গভীর চিন্তামগ্ন' ব্যক্তি, যাঁর অধিকাংশ মনটা ভিতরেই ঢুকে আছে, বাকি মনের একটু অংশ দিয়ে বাইরের কাজকর্ম করছেন। *মৌনী* যিনি, তিনি 'চিন্তাশীলমানুষ'; কাজে কাজেই তিনি স্বল্পভাষী। এইরকম মানুষ স্বভাবতই চুপচাপ। এই জন্যই আচার্য শঙ্কর *মুনি* বলতে তাঁকেই বুঝিয়েছেন, যিনি *মননশীলঃ,* অর্থাৎ 'সর্বদা গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছেন'। এই ধরনের চিন্তাশীলতা যে-কোনও মানুষের পক্ষেই অসাধারণ গুণ বলে বিবেচিত হতে পারে, কারণ একমাত্র মানুষই চিন্তা করতে পারে, অন্যান্য প্রাণী তা পারে না। তারা চিন্তাশূন্য; কিছু কাজ করে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কিন্তু ভক্ত নীরব হলেও চিন্তাশীল। *সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ,* 'যা পেলেন তাতেই তুষ্ট, তাতেই তৃপ্ত'; *অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ*; *অনিকেতঃ* মানে 'গৃহহীন'। *নিকেতঃ* মানে গৃহ। তাই সন্ন্যাসীকে *অনিকেতঃ* বলা হয়। কিন্তু এখানে ঐ শব্দটির অর্থ—গৃহে বাস করলেও আপনি কখনও ভাবেন না যে, সেটি আপনার বাড়ি, আপনার সম্পত্তি। সেই অনাসক্তি আপনার মধ্যে আছে। কী চমৎকার ভাব, বলুন তো! ১৯৬১ সালে যখন আমি কমিউনিস্ট চেকোশ্লোভাকিয়ায় গিয়েছিলাম, তখন একজন কমিউনিস্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। সেখানে কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। আপনি কোনও বাড়িতে যতদিন খুশি থাকতে পারেন, ইচ্ছে হলে বাড়ি বদলাতেও পারেন; কিন্তু বাড়ির মালিক আপনি হতে পারবেন না। সব শুনে আমি বললাম—এ তো ভারি

চমৎকার ভাব! এরকম পরিস্থিতিতে খুব সহজেই অনাসক্তির অভ্যাস গড়ে তোলা যায়, অবশ্য যদি সেই সঙ্গে অন্যান্য স্বাধীনতা থাকে, তবেই। যদি আপনার সব স্বাধীনতা হরণ করা হয়, তাহলে আপনার অবস্থা হবে গোয়ালের গরুগুলোর মতো! ওরকম হলে চলবে না। আপনার সব স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি সম্পত্তির মালিক হবেন না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়, আর যাইহোক সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। আর মালিকানা নিয়ে উদ্বেগ না থাকলে আপনার ব্লাড প্রেসারও চড়চড়িয়ে বাড়বে না। চারপাশের সবকিছুই আপনি উপভোগ করছেন, কিন্তু কিছুই আপনার নয়। আমি চেক ভদ্রলোককে বললাম—আপনাদের এ ব্যবস্থাটি সুন্দর। এটা ১৯৬১ সালের কথা। সে যাই হোক, এখানে গীতায় ভক্তপ্রসঙ্গে যে-ভাবটির কথা বলা হচ্ছে, তা কিন্তু স্বেচ্ছাবৃত। ভক্ত তাঁর ঐ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছেন। আমি দেহে আছি বটে, কিন্তু দেহের প্রতি আমার আসক্তি নেই। আমি গৃহে থাকি, কিন্তু গৃহের প্রতি আমার কোনও আসক্তি নেই। একটা কোথাও থাকতে হবে তো? তাই থাকা এবং সেখান থেকে সব কাজকর্ম করা। এর বেশি কিছু নয়। এইভাবে আমাদের মধ্যে *অনিকেতঃ* বা গৃহহীনতার ভাবটি গড়ে ওঠে। *স্থিরমতিঃ*, 'যাঁর স্থিরবুদ্ধি'। *ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ*, 'এইরকম ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়।'

পরিশেষে আসছে ২০ সংখ্যক শ্লোকটি, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ দিচ্ছেন ঃ

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০॥

—'এবং যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, আমাকেই পরম লক্ষ্য জ্ঞান করে, পূর্বকথিত এই (সামাজিক স্থিতিস্থাপক ও আত্মপ্রকাশক) শাশ্বত ধর্মকে অনুসরণ করেন এবং আমাকে ভক্তি করেন, তাঁরা আমার অতীব প্রিয়।'

ভক্তাস্তে অতীব মে প্রিয়াঃ, 'সেইসব ভক্ত আমার অতি প্রিয়'। *অতীব* মানে 'অত্যন্ত'। তাঁরা কীরকম ভক্ত? তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *যে তু ধর্মামৃতম্ ইদং যথোক্তং পর্যুপাসতে*, 'যেসব ভক্ত এই শিক্ষা, যা একই সঙ্গে ধর্ম ও অমৃত যথাযুক্তভাবে সাধন করেন।' আমাদের উপাসনা মানে তো সকালে আধঘণ্টা এবং সন্ধ্যায় আধঘণ্টা পূজা; তারপর সব ভুলে যাই। কিন্তু এখানে সাধারণ এই উপাসনার কথা বলা হচ্ছে না; বলা হচ্ছে *পর্যুপাসনা। পরি* মানে *সমন্তাৎ*

—অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টাই আপনি ভগবানের উপাসনা করছেন। কেবল ঘণ্টা নাড়া বা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার সময়ে নয়, আপনি যা কিছু করেন সবই ঈশ্বরীয়। সবই উপাসনা। তাছাড়া আপনি তো আর চব্বিশঘণ্টা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করতে পারেন না। তা অসম্ভব। কিন্তু পূজা-জ্ঞানে সব কিছু করলে চব্বিশ ঘণ্টাই আপনার সাধন হয়ে যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যাঁরা আমার এই শিক্ষা দিনরাত অনুসরণ করেন, অর্থাৎ *পর্যুপাসতে; শ্রদ্দধানা,* 'গভীর শ্রদ্ধা অথবা প্রত্যয়ের সঙ্গে'; *মৎ পরমা,* 'আমাকে চরম লক্ষ্য মনে করে'; *ভক্তাস্তে অতীব মে প্রিয়াঃ* 'এমন ভক্তরা আমার অতি প্রিয়'।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছেন, 'যাঁরা আমার এই শিক্ষা কাজে লাগান', তাঁরা আমার অতি প্রিয়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখব প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তও জুড়ে দিয়েছেন দুটি শব্দের মাধ্যমে। কোনও অনুবাদ গ্রন্থেই, শ্রীকৃষ্ণ যেমনটি চেয়েছেন, সেভাবে শব্দ দুটির অভিপ্রেত অর্থ বা তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়নি। শব্দ দুটি কী? *ধর্ম্যম্* এবং *অমৃতম্*। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমার এই শিক্ষা একই সঙ্গে *ধর্ম্যম্* এবং *অমৃতম্*। সাধারণভাবে শব্দদুটির অর্থ করা হয় 'শিক্ষার অমৃত'। কিন্তু এই শব্দ দুটির মধ্যে এমন গভীর মূল্যবোধ প্রচ্ছন্ন রয়েছে যা কেবল একজন ঈশ্বরাবতারের বাণীর মধ্যেই পাওয়া যায়। কোনও সন্তের দেওয়া শিক্ষার মধ্যে আপনি তা পুরোপুরি নাও পেতে পারেন। হয়তো কেউ একটি দিকের কথাই বললেন, অন্যদিকটি বাদ পড়ে গেল। এই দুটি দিক কী কী? প্রথমটি হলো সামাজিক স্থিতি রক্ষার জন্য কর্ম। মানুষ যাতে সুখী হয়, তার জন্য সমাজকে তো স্থিতিশীল, উন্নতিশীল হতে হবে। একেই *ধর্ম্যম্* বলা হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আমার শিক্ষার যে দিকটি সমাজের স্থায়িত্ব, সকলের সুখ ও কল্যাণ সুনিশ্চিত করে, সেটিই *ধর্ম্যম্।* দ্বিতীয়টি *অমৃতম্* 'যা তোমাকে তোমারই ভিতর নিহিত আত্মাকে উপলব্ধি করার দিকে নিয়ে যায়।' শ্রীকৃষ্ণ বলতে চাইছেন—আমার শিক্ষায় দুটি গুণই বিদ্যমান। এই শিক্ষা একদিকে যেমন সমাজকে উন্নত করবে, তেমনি সকলের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতিতেও সহায়তা করবে। আমার শিক্ষার এটিই বিশেষত্ব। গীতার নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই *ধর্ম্যম্* শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আপনারা যদি এই শিক্ষা মেনে চলেন, তাহলে সুস্থ ও স্থিতিশীল সমাজগঠনে প্রভূত সাহায্য হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর নানা রহস্যজনক ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মনীতি চালু আছে। তার ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের মধ্যে হয়তো কিছু ভক্তিভাব জেগেছে, কিছু মহান সাধুসন্তকেও আমরা পেয়েছি।

কিন্তু তা সমাজকে পুষ্ট না করে দুর্বল করে তুলেছে, হাজার রকমের দুর্বলতা ডেকে এনেছে। শত শত বছর ধরে বৈদেশিক আক্রমণ ঢেউ এর মতো এদেশের বুকে আছড়ে পড়েছে। কেন? কী তার কারণ? তার কারণ এই, *ধর্ম্যম্‌*-এর দিকটা আমরা অবহেলা করেছি। তা যদি না হতো, তাহলে সমাজের স্থায়িত্বরক্ষার ব্যাপারে আমরা সর্বাগ্রে সচেষ্ট হতাম। সমাজ বলিষ্ঠ হলে আমরা সকলেই লাভবান হতাম; আপন আপন জীবনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পথে কোনও বাধাই থাকতো না। কিন্তু তা হয়নি। যা হয়েছে, তা এই ঃ আপনি অর্থ উপার্জন করেছেন, সম্পদ তৈরি করেছেন, এবং বিদেশীরা এসে তা লুটপাট করে নিজেদের দেশে নিয়ে গেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বারবার এই ঘটনাই ঘটেছে। তার কারণ ভারতীয় চিন্তা ও চেতনা থেকে এই ধর্ম্যম্‌-এর এইদিকটি একেবারেই বিদায় নিয়েছিল। আমরা *গীতা* পাঠ করেছি, সে কথা ঠিক, কিন্তু এই বিশেষ ভাবটি কখনও বুঝতে পারিনি। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রিয় ভক্তের রূপরেখাটি এঁকে বলছেন—আমার ভক্ত বাস্তববাদী হবে, কঠোর পরিশ্রমী হবে, সে জানবে কেমন করে সকলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হয়। সমাজের মানুষকে সুখী করার জন্য, যেখানেই দুঃখকষ্ট, যেখানেই প্রয়োজন, সেখানেই সে ছুটে যাবে এবং তাদের দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টা করবে। আমার ভক্তের এটিই কাজ—এই করুণায় দ্রবীভূত হৃদয়, এই সেবার ভাব তার থাকা চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—জীবই শিব; জীবের সেবা করলেই শিবের পূজা করা হলো। এটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ কথা। শ্রীকৃষ্ণও মহাভারতে এবং গীতার নানা জায়গায় অনুরূপ কথা বলেছেন। বিষ্ণুপুরাণ-এর একটি শ্লোকও আমার খুব ভালো লাগে। চলতি সংস্করণগুলিতে এই শ্লোকটি পাইনি। তবে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন—এটি বিষ্ণুপুরাণে আছে। সুন্দর শ্লোকটিতে বলা হয়েছে ঃ

স্বধর্ম কর্ম বিমুখাঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বাদিনঃ।
তে হরের দ্বেষিনো মূঢ়াঃ ধর্মার্থং জন্ম যদ্ধ্যরেঃ ॥

'যেসব ভক্ত মুখে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ করেন, অথচ ভগবান যে *ধর্ম* ও *কর্ম*-এর শিক্ষা দিয়েছেন—এবং ভগবান অবতার হয়ে এসে স্বয়ং যে ধর্ম আচরণ করে দেখিয়ে যান—তা অনুসরণ করেন না এবং কোনও সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন না, তাঁরা শ্রীহরির শত্রু'। কেন? না, এইরকম 'ভক্ত' দেখলে মানুষের হরিভক্তি উবে যায়! তাঁরা ভাবেন, এই যদি ধর্ম হয় তো আমাদের এমন ধর্মের

প্রয়োজন নেই! শুধু তাই নয়, শ্লোকে বলা হচ্ছে, এই ধরনের ধর্মধ্বজীরা *মূঢ়াঃ*, 'নির্বোধ'। ধর্মের প্রকৃত অর্থ তারা বোঝে না। কেন? তার উত্তরে বলা হচ্ছে, *ধর্মার্থং জন্ম যদ্ব্যরেঃ* কারণ 'ধর্মসংস্থাপন ও মানবকল্যাণের জন্য শ্রীহরি, যিনি স্বধামে বিরাজ করেন, মাঝে মাঝে মানবশরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হন'; ধর্ম কি তা নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে যান, কিন্তু আমরা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করি না। আমরা শুধু বলি, 'হে ভগবান, তোমার চোখদুটি কী সুন্দর! তোমার নাকটি কী সুন্দর!' ইত্যাদি। পারিষদরা যেমন রাজাকে স্তুতি করেন, এও অনেকটা সেইরকম। ধর্মের এই অবনতি হওয়াতেই আমরা স্বাধীনতা খুইয়েছিলাম। আমাদের ধর্মশিক্ষা থেকে ঐ *ধর্ম্যম্*-এর দিকটি একেবারেই বাদ পড়ে গিয়েছিলো। *অমৃতম্*-এর ভাবটা একটু বজায় ছিল, আর তাইতেই ধর্মের মাধ্যমে আমরা কিছুটা মানসিক শান্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। তাই বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ এসে এই অবহেলিত *ধর্ম্যম্* দিকটির ওপর এত জোর দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সাথে কঠোর পরিশ্রমের সামর্থ্য অর্জন ও তার মাধ্যমে মানুষের অবস্থার রূপান্তর ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার বলেছেন। স্বামীজী যখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ স্থাপন করলেন তখন উদ্দেশ্য বা আদর্শ হিসেবে এই দুটি মূল্যবোধের ওপরই জোর দিলেন। বললেন ঃ *আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ*, 'আত্মমুক্তি এবং জগতের হিতসাধন', এই সঙ্ঘের আদর্শ। এইটিই আমাদের সকলের জীবনাদর্শ হওয়া উচিত, কর্মনীতি হওয়া উচিত। এই আদর্শের পতাকাতলে আজ সমগ্র জাতিকেই সমবেত হতে হবে—*আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।* যাতে দেশ উপকৃত হয়, তার জন্য আমি কঠোর পরিশ্রম করব; তার ফলে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে আমিও উপকৃত হব, ধন্য হব, লাভবান হব। আমার অধ্যাত্মজীবন বিকশিত হবে। দুটিই হাত ধরাধরি করে চলবে, কারণ দুটি পৃথক বস্তু নয়। তাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শের শেষে চ অর্থাৎ 'এবং' শব্দটি বসানো হয়েছে। জগতের হিতসাধন এবং আত্মমুক্তি দুটিই একসঙ্গে চলবে। এইটিই এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের বিশেষ তাৎপর্য।

আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, দক্ষতার সঙ্গে যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা আমাদের নিজের নিজের কাজ করি, তাহলে দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা এবং অশিক্ষার কালিমা যেমন জাতির বুক থেকে মুছে যাবে, তেমনি আমাদের আধ্যাত্মিক জাগরণও ঘটবে, যার ফলে আমরা ঈশ্বরের অনেক কাছাকাছি চলে যাব। যখন দুটি উদ্দেশ্য, অর্থাৎ নিজের আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং জাগতিক অভ্যুদয়ের কথা মনে রেখে আমরা জীবনের পথ চলি, তখন তা এক পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শনের রূপ

নেয়। তখন দুটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। (গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক শ্লোকে সেই উদ্‌ঘোষণাই করা হয়েছে যা আমরা পরে আলোচনা করব।) একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও সুসমন্বিত দর্শনের মাধ্যমেই একাধারে জাগতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব—একপেশে, খণ্ডিত দর্শনের দ্বারা তা কখনওই সম্ভব নয়। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের মধ্যে এই একদেশী বা একপেশে দর্শনই চালু ছিল। মাত্র বিশ মিনিটের জন্য আমরা ধার্মিক হয়ে উঠতাম। তারপর আবার যে-কে-সেই; স্বমূর্তিধারণ! ভালো, মন্দ, উদাসীন! তখন সব কিছুই করছি। তখন এই ছিল আমাদের তথাকথিত ধর্মের চেহারা। গীতা পড়েও আমরা এতকাল এই বুঝে এসেছি। কিন্তু আজ এই ধারণা বদলাবার দিন এসেছে। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে গীতা অধ্যয়ন করা দরকার। মনে রাখতে হবে এর প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তাই এর মধ্যে যে শিক্ষা রয়েছে তা আমাদের শক্তি জোগাতে বাধ্য, শুদ্ধ ও পবিত্র করতে বাধ্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—যা কিছু দুর্বল করে, তাকে কখনও স্পর্শও কোরো না, কারণ তার মধ্যে কোনও সত্য নেই। যা সত্য তা শক্তিদায়ী, তা পবিত্র, তা জ্ঞান। তাই স্বামীজীর আহ্বান ঃ সত্য ছাড়া আর সব কিছু বর্জন কর। গীতায় আমরা এই বলপ্রদ সত্যের কথাই পাই। এই শিক্ষাকে হজম করে জীবনচর্যায় ফুটিয়ে তুলতে হবে; তবেই আমরা ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হব। ভগবান তখন বলবেন—'তুমি আমার সত্যিকারের ভক্ত।' ভগবানের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি আমাদের প্রত্যেককেই পেতে হবে। আমরা নিজেদের সার্টিফিকেট দিয়ে বলে থাকি, 'আমি ভক্ত'। নিজেদের দেওয়া এই সার্টিফিকেটে কাজ হবে না। যেদিন ভগবান স্বয়ং স্বীকৃতি দিয়ে বলবেন, 'তুমি আমার প্রকৃত ভক্ত', সেদিনই আমরা কৃতার্থ হব। তার আগে নয়। কিন্তু যতদিন না আমরা *ধর্ম্যম্* ও *অমৃতম্*-এর শর্ত পালন করছি ততদিন এই স্বীকৃতি আসতে পারে না।

বিবর্তন সম্পর্কে আধুনিক পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞানের চিন্তাধারার আলোকে এই *ধর্ম্যম্* এবং *অমৃতম্*-এর বিষয়টি স্পষ্টতর হতে পারে। মানুষের শরীর জিন দিয়ে তৈরি, যেগুলি মূলত স্বার্থপর। ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিনস্ (Richard Dawkins) আবার *The Selfish Gene* নামক একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন (পৃঃ ৩) ঃ

'কেবল জিন-সূত্রের নির্মম স্বার্থপরতার ভিত্তির ওপর রচিত মানব সমাজ এত কদর্য হবে যে, তা বাসের অযোগ্য। ... যদি আপনি এমন সমাজ গড়ে

তুলতে চান, যা আমিও চাই, যে, সেখানে মানুষ উদারভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং নিঃস্বার্থভাবে সকলের কল্যাণে নিযুক্ত থাকবে, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখুন, জৈব প্রকৃতি থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা খুবই কম।'

এখানেই বৈদান্তিক শিক্ষার গুরুত্ব। বেদান্ত বলে, যতক্ষণ না আমাদের *দেহাত্মবুদ্ধি*, অর্থাৎ 'দেহে আমি বোধ' না যাচ্ছে, ততক্ষণ নৈতিক এবং মানবিক কোনও মূল্যবোধই জাগ্রত ও প্রকাশিত হতে পারে না। স্যার জুলিয়ান হাক্সলেও তাঁর *Evolution : A New Synthesis* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'আমাদের ভিতরের দুগ্ধপোষ্য জন্তুটা না মরলে ভিতরের মানুষটি বাঁচতে পারে না।' জীববিজ্ঞান বলে, মানুষের দেহ স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজাতিভুক্ত।

জড়বিজ্ঞান মূল্যবোধের উৎসটির সন্ধান জানে না। এই উৎস বহিঃপ্রকৃতি নয়, তার থেকে সৃষ্ট স্থূল মানবশরীরও নয়, জেনেটিক সিস্টেম-এর অধীনস্থ অহংবোধও নয়। আবার মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও এই মূল্যবোধ দেখা যায় না। এই সচেতনতা একমাত্র মানুষেরই থাকতে পারে। একমাত্র বেদান্তই মানুষের গভীরতার সন্ধান করতে গিয়ে মূল্যবোধের শাশ্বত, অবিনাশী এই উৎসটিকে আবিষ্কার করেছে, যার নাম আত্মা।

মানুষের প্রজনন-ধারা বা জেনেটিক সিস্টেমকে কেন্দ্র করে যে অহংবোধ, তাকে ভিত্তি করেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চেতনা বা ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে তার কল্পনাশক্তি, যার সাহায্যে সে অন্যান্য প্রাণীদের ওপর প্রভুত্ব করে। স্নায়ুতত্ত্ববিদ গ্রে ওয়ালটার (Gray Walter) তাঁর *দ্য লিভিং ব্রেন* নামক গ্রন্থে (পৃঃ ২) মন্তব্য করেছেন ঃ 'সিংহ, বাঘ, গণ্ডার ও অন্যান্য শক্তিশালী জন্তুর কল্পনাশক্তি নেই; যদি তা থাকতো, তাহলে আর আমরা এখানে বসে এ-বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পেতাম না।'

মূল্যবোধের যে বিজ্ঞান, তার চেষ্টা হলো কি করে মানুষের এই অহংকে প্রজনন ধারার বজ্র আঁটুনি থেকে মুক্ত করা যায়, কি করে তার কাঁচা-আমিকে পাকা-আমি বা বিকশিত ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করা যায়, যাতে সে সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে তুলে উচ্চতর মানবীয় মূল্যবোধগুলিকে ব্যক্ত করতে পারে। এই যে কাঁচা-আমিকে পাকা-আমিতে রূপান্তরিত করার চিন্তা, এটি বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব অবদান। ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক জাগতিকতা ছেড়ে আধ্যাত্মিক দিব্যতার পথে যাত্রা শুরু করতে হলে এটিই প্রথম পদক্ষেপ। অন্তিম শ্লোকে *ধর্ম্যম্* বলতে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বুঝিয়েছেন। আর *অমৃতম্*

বলতে বোঝাতে চেয়েছেন আরো এগিয়ে গিয়ে, নিজের ভিতর নিত্য, শাশ্বত, দিব্য আত্মাকে উপলব্ধি করে, পূর্ণ আধ্যাত্মিক মুক্তি করায়ত্ত করা। মনুষ্য বিবর্তনের এটিই চরম লক্ষ্য। অন্যভাবে বলতে গেলে প্রবৃত্তির মাধ্যমে *অভ্যুদয়* ঘটানো এবং নিবৃত্তির সাহায্যে *নিঃশ্রেয়স* লাভ, যে কথা আমি প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেছি।

ইতি ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার

আজ আমরা গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রবেশ করব। এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রসঙ্গ শুরু করার আগে একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেটি এই যে, অধ্যাত্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এত গভীর দর্শন ও যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক চিন্তা এই মহাগ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে যার কোন তুলনা নেই, যা একই সঙ্গে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের ক্ষুধা মেটায়। বিশেষত এই অধ্যায়ে প্রচুর বৈজ্ঞানিক উপাদানের সন্ধান মিলবে। চিন্তনীয় এমন সব বিষয়ের আলোচনা, অধ্যাত্মজীবনের ব্যাখ্যা অন্য ধর্মে সুদুর্লভ। যে-কোনও ধর্মের শাস্ত্রগুলি পড়ে দেখুন, গীতার মতো এত উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা ও দর্শনের ছিটে ফোঁটা আর কোথাও পাবেন না। এদিক থেকে এই অধ্যায়টি এবং পূর্ববর্তী সপ্তম অধ্যায়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণের বাণী দিয়েই সাধারণত এই অধ্যায়টি শুরু হয়ে থাকে। কিন্তু গীতার কোনও কোনও সংস্করণে দেখা যায় অর্জুনের প্রশ্ন দিয়েই প্রথম শ্লোকটি আরম্ভ হচ্ছে। শঙ্করাচার্য এবং অন্যান্য ভাষ্যকারদের মতে—এমনকি লোকমান্য তিলকেরও সেই মত—এই তথাকথিত প্রথম শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত, অর্থাৎ অর্জুনের মুখে পরে কোনও সময়ে বসানো হয়েছে। আচার্য শঙ্কর যদি ভেবে থাকেন যে, শ্লোকটি মূল গীতায় ছিল না, তাহলে আমাদের অন্যরকম ভাবার কোনও কারণ নেই। সে যাই হোক, মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত স্বামী স্বরূপানন্দের অনূদিত গীতাতেও এই বিতর্কিত শ্লোকটি স্থান পেয়েছে, যদিও তাতে মূল বক্তব্যের কোনও ইতরবিশেষ হয়নি। শ্লোকে কেবল অর্জুনের মুখে একটি প্রশ্ন বসানো হয়েছে যাতে শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলিকে এই প্রশ্নের উত্তর বলে বোঝা সহজ হয়।

বর্তমান গ্রন্থে যদিও শ্লোকটি দেওয়া হলো, গণনার মধ্যে তাকে আনা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণের উত্তর দিয়েই এই অধ্যায় শুরু, এটি বুঝতে হবে।

অর্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ।।

—অর্জুন বললেন, 'হে কেশব, *প্রকৃতি* এবং *পুরুষ, ক্ষেত্র* এবং *ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান* ও *জ্ঞেয়* —এইগুলি [সম্পর্কে] জানতে ইচ্ছা করি।'

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, 'হে কৃষ্ণ, আমি এই সত্যগুলি সম্পর্কে জানতে চাই। সত্যগুলি কী? *প্রকৃতি* বা আদি প্রকৃতি এবং *পুরুষ* বা আদি চৈতন্য। বিশ্বের পিছনে [এক সত্তার] এই দুটি দিক রয়েছে। আমি এই *প্রকৃতি* এবং *পুরুষ* সম্পর্কে জানতে চাই। আমরা সকলেই পুরুষ, অর্থাৎ চৈতন্য সত্তা; অন্যদিকে এই সমগ্র জগৎ হলো *প্রকৃতি,* যা জড়। তাই, একদিকে রয়েছে *প্রকৃতি* এবং অন্যদিকে *পুরুষ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ,* আমি 'ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ'-র পার্থক্যটিও জানতে চাই। *ক্ষেত্রং* মানে 'ক্ষেত্র'। যেমন জমি, যাতে আপনি বীজ পোঁতেন ও ফসল ফলান। ঠিক সেইরকম, আমাদের দেহ এবং বাইরের জড় জগৎ হলো *ক্ষেত্র* এবং ভিতরের যে চৈতন্যসত্তা এই দেহকে জানে, সেটি *ক্ষেত্রজ্ঞ। জ্ঞ* মানে *ক্ষেত্র*-কে যিনি জানেন, অর্থাৎ ক্ষেত্রর জ্ঞাতা। *ক্ষেত্র* নিজেকে জানে না। কিন্তু এমন একটা বস্তু আছে যিনি *ক্ষেত্র*-কে জানেন; তাঁকেই *ক্ষেত্রজ্ঞ* বলা হয়। *এতং বেদিতুম্ ইচ্ছামি,* 'এই [সত্য]গুলি আমি জানতে ইচ্ছা করি'; *জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ,* 'জ্ঞান এবং *জ্ঞেয়-র* প্রকৃতিও'। *জ্ঞান* মানে আমরা যা জানি, অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়া; *জ্ঞেয়* হলো 'জ্ঞানের বস্তু বা বিষয়' অর্থাৎ যাকে জানি। তিনটি জিনিস আছে—*জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়।* বেদান্তে একে *ত্রিপুটি* বলে। এরা সর্বদা একত্রে থাকে। যখন আমি কোনও কিছু জানি, তখন এই তিনটিই সেখানে উপস্থিত—'আমি', 'জ্ঞানের ক্রিয়া' এবং 'জ্ঞানের বিষয়'। বিশ্লেষণাত্মক অনুসন্ধানের দ্বারা *ত্রিপুটি* লয় করে পরম ঐকাত্ম্যক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বেদান্তের মহৎ অভিপ্রায়। সেখানে শুধু জ্ঞানই আছে; জ্ঞাতা বা জ্ঞানের বিষয় নেই, যা আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক জগতে থাকে। জ্ঞানই একমাত্র সত্য। চৈতন্য, অনুভূতি, জ্ঞান—এই একটি বস্তুরই অস্তিত্ব আছে। বাদবাকি যা কিছু, সবই সেই এক শাশ্বত জ্ঞানের বহুবিধ প্রকাশ। বেদান্তে তাই ঈশ্বরকে *চিৎ* বা শুদ্ধজ্ঞান বলা হয়; আত্যন্তিক সত্যটি *জ্ঞান-স্বরূপ* বা *চিৎ-স্বরূপ।* সেটিই বেদান্তের ঈশ্বর। তাই,

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১॥

—শ্রীভগবান বললেন, 'হে কুন্তীপুত্র, এই দেহকে *ক্ষেত্র* বলা হয় এবং যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন, তাঁকে [ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের] বেত্তারা *ক্ষেত্রজ্ঞ* বলে থাকেন।'

ইদং শরীরং কৌন্তেয়, 'হে অর্জুন, এই দেহ'; *ইদম্* মানে, অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলা হচ্ছে, 'এই'। *ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে,* '*ক্ষেত্র* নামে অভিহিত হয়ে থাকে'; এর নাম *ক্ষেত্র; এতদ্ যো বেত্তি,* 'যিনি এই [ক্ষেত্রকে] জানেন; *তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ,* 'তাঁকে *ক্ষেত্রজ্ঞ* বলা হয়'; *ইতি তদ্বিদঃ,* যে মহান দার্শনিকরা 'এইভাবে বিষয়টিকে জানেন', তাঁদের মতে। যাঁরা এই বিষয়টি জানেন, তাঁরা বলেন যে, ইনি হলেন ক্ষেত্রের জ্ঞাতা। *ক্ষেত্রজ্ঞ* শব্দে যে *জ্ঞ* রয়েছে, তার অর্থ 'জ্ঞাতা'। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এ হলো দুটি দিক।

সপ্তম অধ্যায়ে (৪র্থ শ্লোক) শ্রীকৃষ্ণ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর দিব্য স্বরূপের দুটি দিক আছে—একটি স্থূল বা বস্তুগত দিক, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম বা আধ্যাত্মিক দিক। এই যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান, এগুলি স্থূল প্রকৃতির পর্যায়ভুক্ত। এর মধ্যে মানুষের অহংবোধও পড়ে। সেখানে তিনি বলেছেন, *অপরেয়ম্,* অর্থাৎ 'ওগুলি আমার অপরা প্রকৃতি' বা নিকৃষ্ট প্রকৃতি। ওটি ছাড়াও আমার আরও একটি মহত্তর প্রকৃতি আছে। *প্রকৃতিং মে বিদ্ধি পরাম্,* 'আমার [সেই] পরা প্রকৃতিকে জানো', *যয়েদং ধার্যতে জগৎ,* 'যার দ্বারা এই জগৎ বিধৃত হয়ে আছে।' ঐটিই আমার শ্রেষ্ঠ বা পরা প্রকৃতি। অতএব, এই উভয় প্রকৃতির দ্বারা আমিই এই জগৎ রচনা করেছি। একথার তাৎপর্য—এই বিশ্বে এমন কিছুই নেই যা ঈশ্বর বহির্ভূত। সবকিছুই তাঁর প্রকাশ বা রূপ। এর মধ্যে যেটি তাঁর বাহ্যরূপ, সেটি হলো *অপরা প্রকৃতি* বা নিকৃষ্ট রূপ এবং শুদ্ধ চৈতন্য হলো তাঁর *পরা প্রকৃতি* বা শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি। আমাদের মধ্যেও তাই এবং সেই সত্যটি পরবর্তী শ্লোকে বিবৃত হবে।

এখানে বলা হচ্ছে, 'যিনি *ক্ষেত্র*-কে জানেন, তাঁকে *ক্ষেত্রজ্ঞ* বলা হয়'। সাধারণত আমরা ভাবি যে প্রত্যেক ক্ষেত্রের বুঝি একজন আলাদা *ক্ষেত্রজ্ঞ* বা আত্মা আছেন যিনি *ক্ষেত্র*-কে জানেন। পরবর্তী শ্লোকে এই ভুল ধারণাটি ভেঙে

দেওয়া হবে। সেখানে ভগবান বলবেন, না, তা নয়। 'সব *ক্ষেত্রের* আমিই পরম *ক্ষেত্রজ্ঞ।*'

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ২॥

—'হে ভারত [অর্জুন], সকল ক্ষেত্রেই আমাকে *ক্ষেত্রজ্ঞ* বলে জেনো। *ক্ষেত্র* ও *ক্ষেত্রজ্ঞ-র* যে জ্ঞান, সেটিই আমার মতে যথার্থ জ্ঞান।'

'হে অর্জুন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জেনো, আমিই একমাত্র *ক্ষেত্রজ্ঞ* —বোধ, চৈতন্য অথবা জ্ঞানের এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব'। তারপর এই শিক্ষার উপসংহার টানছেন এই বলে ঃ *ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জ্ঞানং যৎ, তৎ জ্ঞানং মতং মম।* 'এই আমার অভিমত'। কী অভিমত? *ক্ষেত্র* ও *ক্ষেত্রজ্ঞের* সম্মিলিত যে জ্ঞান, সেটিই পূর্ণ জ্ঞান'। শুধু *ক্ষেত্রজ্ঞ* সম্পর্কে জানলেই চলবে না, *ক্ষেত্র*-কেও অবশ্যই জানতে হবে। ভৌত বা জড় বিজ্ঞান বাহ্য জগৎ সম্পর্কে আমাদের যে-জ্ঞান দেয়, তা এই *ক্ষেত্র*-সম্পর্কিত জ্ঞান; এই জ্ঞানকে অস্বীকার করলে চলবে না। এটিকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে চৈতন্য বা দ্রষ্টাকেও ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে; তা না হলে সত্যের পূর্ণ চিত্রটি পাওয়া যাবে না। এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও পাশ্চাত্যের জড় বিজ্ঞান কেবল সত্যের একটি দিক, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎকেই স্বীকার করে তার পর্যালোচনা করেছে। সেখানে একজন দ্রষ্টা বা পর্যবেক্ষক থাকলেও তাকে *ক্ষেত্রে* রূপান্তরিত করা হয়েছে। উনিশ শতকের বস্তুবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা বলতেন, *ক্ষেত্র-ই ক্ষেত্রজ্ঞ*-র আর একটি রূপ, ক্ষেত্রই অন্য এক রূপে ক্ষেত্রজ্ঞ হয়েছেন। কিন্তু, ধীরে ধীরে এই ধারণা পালটাচ্ছে। কারণ, তাঁরা দেখছেন চৈতন্যকে জড় বস্তু-খণ্ডে পরিণত করা অসম্ভব। আবার কোনওরকম জড় শক্তি থেকে চৈতন্য উৎপাদন— তাও অসম্ভব। তাঁদের দৃষ্টি আরো স্বচ্ছ ও পরিণত হলে, গীতায় যে সত্যের কথা বলা হয়েছে, তা তাঁরা স্বীকার করে নেবেন। *ক্ষেত্র* আছে, *ক্ষেত্রজ্ঞও* আছেন। *ক্ষেত্রজ্ঞ* সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গেলে মনে হয় বুঝিবা বহু *ক্ষেত্রজ্ঞ* রয়েছেন, যদিও বাস্তব সত্য এই—*ক্ষেত্রজ্ঞ* একটিই যা প্রতিটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছেন। এই সংহত জ্ঞান, একত্বের জ্ঞান, আসবেই আসবে। বৈচিত্র্য যা কিছু, তা সবই ওপর ওপর—বাহ্য প্রতীতি ছাড়া কিছুই নয়। বাস্তবে কিন্তু বিশ্বের সব দৃষ্ট বস্তুর এবং সকল দ্রষ্টার জ্ঞাতা একটিই—বিশুদ্ধ চৈতন্য। এই চৈতন্যই

বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। তা আপনার, আমার, সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। এই সত্যের ওপর ভিত্তি করেই চৈতন্যের অভিন্নতা ও একত্বের তত্ত্ব ঘোষিত হয়েছে। এক শুদ্ধ পরমাত্মাই সকলের ভিতর রয়েছেন। অনুসন্ধান, পর্যালোচনা এবং অনুভূতির মাধ্যমে বেদান্ত এই তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। *আত্ম একত্ব বিদ্যা প্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদা আরভ্যন্তে,* 'সব উপনিষদের লক্ষ্য শুধু একটিই; এইটি দেখানো যে, এক আত্মা সর্বভূতে বিরাজমান।' একে বলা হয়েছে *আত্ম একত্ব বিদ্যা,* 'আত্মার একত্বের বিজ্ঞান'। চৈতন্যের দ্বৈতভাব নেই। পরমাণু বিজ্ঞানী শ্রোডিংগার (Schrodinger)-এর মন্তব্য আমি আগেই উদ্ধৃত করেছি। এই প্রসঙ্গে তিনিও বলেছেন, 'চৈতন্য এমন একক যার বহু হয় না'। অতএব, আমরা যখন জ্ঞানের প্রক্রিয়া, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞাতা সম্পর্কে সম্যক অনুসন্ধান করব, তখন আমরা পৌঁছে যাব সেই অদ্বৈত *চিৎ স্বরূপ*-এ, এক অনন্ত ব্রহ্মে বা অনন্ত আত্মায়। উপনিষদ্ বলছেন *একম্ এব অদ্বিতীয়তং ব্রহ্ম,* 'ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়'।

ব্রহ্মবুদ্ধি অথবা আত্মবুদ্ধি করলে আমরা সব এক। আমাদের শরীর আলাদা আলাদা হলেও স্বরূপত আমরা অভিন্ন পরমাত্মা। পরমাত্মা যেন মালার সুতোর মতো আমাদের সকলকে ধরে রেখেছে। নর-নারীর মূলগত ঐক্য এখানেই, সত্তার অভিন্নতার ভিত্তি এই সত্যটি। তাই *ক্ষেত্র* ও *ক্ষেত্রজ্ঞ,* দুটিকেই জানতে হবে; একটিকে জানলে চলবে না। দুটিকে জানলে তবেই পূর্ণ জ্ঞান। এই কারণেই আজকের জড় বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ। কারণ সে শুধু ক্ষেত্রটিকেই জানে। *ক্ষেত্রজ্ঞ* সম্পর্কে তার ধারণা, এটি ক্ষেত্রেরই পরিবর্তিত একটি অবস্থা মাত্র—এ যেন অনেকটা রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার মতো। এ সিদ্ধান্ত ধোপে টেকে না; আজকে এই সিদ্ধান্তকে লোকে কিরকম সন্দেহের চোখে দেখছে, তা আমরা সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। অতএব এই যে *ক্ষেত্রজ্ঞ,* জ্ঞাতা, পর্যবেক্ষক—এ এক বাস্তব সত্য। বিজ্ঞানী জগৎ সম্পর্কে গবেষণা করছেন, তাকে পর্যবেক্ষণ করছেন, এ কথা সত্যি, কিন্তু নিজেকে তার মধ্যে আনছেন না। তাঁর ভাব হলো—দৃশ্যমান জগৎই আমার একমাত্র বিচার্য। এই ভেবে নিজেকে তিনি সযত্নে সরিয়ে রাখেন। এইভাবেই একদিন বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়েছিল এবং তার ফলে উনিশ শতকের শেষদিকে বিজ্ঞানীরা এই বিশ্ব সম্পর্কে অনেক কিছুই আবিষ্কার করে ফেলেন। এটা তাঁরা করলেন ঠিকই, কিন্তু নিজেরা এত ক্ষুদ্র হয়ে থাকলেন যেন তাঁরা জড় বস্তু দিয়ে তৈরি! প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞানী কি তাই? এই জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির দাপটে

সেই বিজ্ঞানী যিনি দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, আত্মা—তিনি যেন হারিয়ে গেলেন। আজ অতীতের সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টা চলছে। বাস্তবিক, যিনি দ্রষ্টা বা পর্যবেক্ষক, তিনি অসীম জ্ঞানের উৎস, সব তথ্যই তাঁর ভিতর সঞ্চিত আছে; তাই কোনওমতেই পরিলক্ষিত তথ্যের অংশ ভেবে তাঁর মহিমাকে খাটো করা চলে না। বিজ্ঞানীকে তাই বুঝতে হবে প্রকৃত দ্রষ্টা বা পর্যবেক্ষকটি কে? বিজ্ঞান আজ আর এই উপাদানের গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারে না।

তাই, এই ক্ষেত্র সম্পর্কিত জ্ঞান থেকেই আমরা প্রশ্ন করি—জ্ঞাতব্য বিষয় কে জানছে? কে সেই জ্ঞাতা? বিজ্ঞানী তো পৃথিবীকে জানছেন; কিন্তু এই বিজ্ঞানীটি কে? কে সব কিছু জানছেন? গীতা তার উত্তরে বলছেন যে, একজন *ক্ষেত্রজ্ঞ* আছেন। পরিলক্ষিত তথ্যই সব নয়, একজন পর্যবেক্ষককেও থাকতে হবে। আর, তাই যদি হয়, তবে সেই পর্যবেক্ষকের স্বরূপটি কী? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ জ্ঞান, চৈতন্য, বুদ্ধি, *চিৎ* অথবা *চেতনা*—যে নামই দিই না কেন, ঐটিই পর্যবেক্ষকের স্বরূপ। কোনও দৃষ্ট উপাদানের মধ্যে চৈতন্যের এই মূলতত্ত্বটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। শঙ্করাচার্য তাঁর উপনিষদ্ ও গীতা-ভাষ্যের বহু জায়গায় প্রশ্ন তুলেছেন যে, চোখের যদি নিজস্ব বুদ্ধি বা চেতনা থাকতো, তাহলে সে নাক, কান ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকেও জানতে পারতো। কিন্তু তার চেতনা তার নিজস্ব নয়; তা আসে গভীরতর অন্য একটি উৎস থেকে। চোখ কেবল একটি মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে চৈতন্য কাজ করে। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও একথা সত্য। বস্তুত সব ইন্দ্রিয়গুলিই জড়। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি শক্তি আছে, চেতয়িতা আছে, যার সংস্পর্শে এসেই তারা সক্রিয় হয়। সপ্তম অধ্যায়ে এই শক্তিকে *জীবভূতাম্* অর্থাৎ 'চিৎসত্তা' বলা হয়েছে। এটিই *পরা প্রকৃতি* বা শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি। এই *চিৎশক্তি* সকলের ভিতরেই আছে—মনে হয় যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে আছে। অন্তত আমাদের কাছে বাহ্যত তা এভাবেই প্রতীয়মান হয়। এই 'প্রতীয়মান' শব্দটি শঙ্করাচার্য পরে ব্যবহার করবেন। বাইরে থেকে দেখলে বহু মনে হবে, কিন্তু বস্তুত এক ও অবিভাজ্য সত্তা। এই কথা বারংবার বলা হবে। *ক্ষেত্র* ও *ক্ষেত্রজ্ঞ*-র এই জ্ঞান নিয়েই পূর্ণ জ্ঞান।

কোনও নির্দিষ্ট অধ্যাত্মপথ অনুসরণ করে কেউ অবশ্যই ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করতে পারেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে তাঁর কী ধরনের মনোভাব হওয়া উচিত? এই বাহ্যজগৎও তো ঈশ্বরের একটি প্রকাশ। আমরা তো একে অস্বীকার করতে পারি না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে যদি

আপনি সামগ্রিক সত্তার কথা বলেন, তাহলে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎও তার ভিতর এসে যাবে। কারণ এই জগৎ আমি দেখছি, এর সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, একে আমি অস্বীকার করি কী করে? এটিও তো সেই অদ্বয় দিব্য সত্তার অভিব্যক্তি, যে-সত্তাকে বেদান্ত ব্রহ্ম বা আত্মা বলেছে। বেদান্তের যুক্তি এই, জীবাত্মা যদি ঈশ্বরের প্রকাশ হয়, তাহলে এই জগৎও সেই এক সত্তার প্রকাশ, কারণ *চিৎ* হোক আর *অচিৎ* হোক, চেতন হোক অচেতনই হোক, এই সমগ্র বিশ্বের অধিষ্ঠান একটিই । একটি সত্যই সব কিছুর পিছনে জাজ্বল্যমান।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩॥

—'সেই *ক্ষেত্র* কীরকম, তার বৈশিষ্ট্যগুলি কী, কীরকম বিকারযুক্ত, কোন্ কারণ থেকে কী কার্যের উৎপত্তি হয় এবং তিনি [সেই *ক্ষেত্রজ্ঞ*] কে, কীই বা তাঁর শক্তি, তা সংক্ষেপে আমার কাছ থেকে শোন।'

মে শৃণু, 'আমার কাছে শোন'; *তৎ সমাসেন,* 'তা সংক্ষেপে'; কী? না 'সেই *ক্ষেত্র* কীরকম, তার বৈশিষ্ট্যগুলি কী, তার কীরকম পরিবর্তন হয় এবং কোন্ কারণ থেকে কি কার্যের উদ্ভব হয়। মহাবিশ্বের নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আরম্ভ করে জৈবিক স্তর এবং মানবিক স্তর পর্যন্ত যদি আমরা সমগ্র বিবর্তনের ধারা ও ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, সবটাই *ক্ষেত্র*-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এই দৃশ্যমান জগতের উৎস যে চৈতন্য [যিনি আড়ালে রয়েছেন], তিনিই *ক্ষেত্রজ্ঞ*।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪॥

—'ঋষিদের দ্বারা (এই সত্য) নানাভাবে গীত হয়েছে; বিভিন্ন বৈদিক উক্তিতে এবং ব্রহ্মবিষয়ক পদগুলিতেও যুক্তিপূর্ণ ও সন্দেহাতীতভাবে [ব্রহ্ম] ব্যাখ্যাত হয়েছেন।'

ঋষিরা এই বিষয়টিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর মহিমা কীর্তন করেছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন বৈদিক উক্তিও রয়েছে, আছে ব্রহ্ম-বিষয়ক বহু বাক্য। *ঋষিভির্বহুধা গীতং,* 'ঋষিরা বহুভাবে [এই তত্ত্বের] মহিমা কীর্তন করেছেন'; *ছন্দোভিঃ বিবিধৈঃ পৃথক্,* 'ছন্দগুলিও, অর্থাৎ বৈদিক উক্তিগুলিও'।

ছন্দই বেদের ভাষা; তাই ছন্দ মানে বৈদিক উক্তি। *ব্রহ্মসূত্রপদ,* 'ব্রহ্মার্থবাচক অর্থাৎ ব্রহ্মকে নির্দেশ করে এমন বাক্যসমূহ'; *হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ,* 'যুক্তিযুক্ত ও সংশয়াতীতভাবে'; *হেতুমৎ* মানে 'যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা'; *বিনিশ্চিত,* অর্থাৎ 'বিশ্বাসযোগ্য ভাবে'। এইভাবে বেদান্তের সত্যগুলি নানাভাবে ব্যাখ্যাত অথবা গীত হয়েছে।

এখন শ্রীকৃষ্ণ বিকার্য ক্ষেত্রের পরম্পরাটি দিয়ে বলছেন ঃ

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ।। ৫।।

—'পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি ও মূলা প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয় এবং এক (মন) এবং ইন্দ্রিয়ের পঞ্চবিষয়;'

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ।। ৬।।

—'ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, [দেহ ও ইন্দ্রিয়ের] সমবায়, বুদ্ধি, সাহস—বিকারযুক্ত এই ক্ষেত্র এইভাবে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।'

সাংখ্য মতে, এই বিশ্ব চব্বিশটি তত্ত্বে গড়া। পঁচিশতম তত্ত্বটি হলো *পুরুষ,* যিনি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। চব্বিশটি তত্ত্ব *অচিৎ,* 'অচেতন'; তারা প্রকৃতির বিবর্তিত নানা রূপ। *মহাবিশ্বের বিবর্তন সম্পর্কে ধ্যানধারণা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে এবং সাংখ্যদর্শনে তা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।* পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্যে এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে এই সেদিন—ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এমনকি এখনও তা ভালোভাবে দানা বাঁধেনি। খ্রিস্টান মৌলবাদীরা, এমনকি কিছু কিছু আমেরিকান অধ্যাপকরাও, বিবর্তন সম্পর্কে স্কুলে যেসব আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হয়, তার বিরোধিতা করছেন। তাঁরা বলছেন—তোমরা যদি ছেলেমেয়েদের এই বিবর্তন তত্ত্ব শেখাও, তাহলে সৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলে যে গল্প আছে, অর্থাৎ ঈশ্বর ছয়-সাত দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, তাও শেখাতে হবে। মৌলবাদী সেকেলে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে বর্তমানের যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সংঘর্ষ হওয়ার ফলে এই মুহূর্তে আমেরিকায় একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে।

সৌভাগ্যের কথা, ভারতে তেমনটি হয়নি। আমরা যখন মহাজাগতিক ও

জৈবিক বিবর্তনের কথা বলি, তখন তা আমাদের দর্শনের বিরুদ্ধে যায় না। অন্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের তফাৎটা একবার ভেবে দেখুন! এই বিশ্বের দূরে বা কাছে যা কিছু আছে, সব কিছু সম্পর্কেই ভারতের চিন্তা বিজ্ঞানভিত্তিক। এই কারণে আমরা সর্বদাই বলে এসেছি যে, এই বিশ্ব বিবর্তনের ফল—প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা থেকে তা শুধু ব্যক্ত অবস্থায় এসেছে। সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে শুরু করে এক গুচ্ছ ঘাস—সবকিছুই সেই বিবর্তন প্রক্রিয়া বা ব্যক্ত হওয়ার ফলশ্রুতি।

তাই, *মহাভূতানি*, 'পাঁচটি মহাভূত', যার অর্থ [*তন্মাত্র* অথবা] আগুন, জল ও মাটির মতো 'জড় পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অমিশ্র ভাব'। আগুন, জল, মাটি—এগুলো সবই জড় স্থূল পদার্থ এবং এগুলো দিয়েই আমরা মহাভূতের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে *মহাভূত* হলো তাদের আদি অবস্থা। তারপর, *অহংকারঃ*, 'আমিত্ব'। মহাজাগতিক বিবর্তনে এই 'আমি' চোখে পড়ে না; কিন্তু জৈবিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে, মানুষের স্তরে এই 'আমিত্বের' প্রকাশ ঘটে। *বুদ্ধি*, 'বোধশক্তি' বা যুক্তি; *অব্যক্তম্ এব চ*, 'প্রকৃতির অব্যাকৃত দিকটি'। *ব্যক্ত* মানে 'পৃথকীকৃত' বা বিভক্ত এবং *অব্যক্ত* মানে 'অপৃথকীকৃত' বা অবিভক্ত। *ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ*, 'দশটি ইন্দ্রিয় এবং এক [মন]'। আমাদের হাত, পা ইত্যাদি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং চোখ, কান, নাক ইত্যাদি নিয়ে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই হলো মোট দশটি ইন্দ্রিয়। *একং চ*, 'এবং এক', অর্থাৎ মন বা *মনস্*। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তুলনায় আরো সূক্ষ্ম হলেও মনও কিন্তু একটি ইন্দ্রিয়। *পঞ্চ চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ*, 'এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বিষয়', অর্থাৎ রূপ, শব্দ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ। ইন্দ্রিয়গুলি তাদের নিজের নিজের বিষয় ভোগ করে বলেই জগতে আমাদের পাঁচরকম অভিজ্ঞতা হয়। উদাহরণস্বরূপ, চোখ কেবল *রূপ* দেখে। কান শুধু *শব্দ* শোনে। জিভ *রস* আস্বাদন করে। ত্বক *স্পর্শ* অনুভব করে। নাক কেবল *গন্ধ* নেয়। এইভাবে পাঁচটি ইন্দ্রিয় নির্দিষ্ট পাঁচটি বিষয় ভোগ করে থাকে। তাই বলা হচ্ছে *ইন্দ্রিয়গোচরাঃ*। *গোচর* মানে 'যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।'

ইচ্ছা, 'বাসনা'; দ্বেষ, 'ক্রোধ'; *সুখং-দুঃখং*, 'সুখ-দুঃখ'; *সংঘাতঃ*, 'বিভিন্ন অংশ মিলেমিশে' যে *সংঘাত* সৃষ্ট হয়। *চেতনা*, 'বুদ্ধি'; *ধৃতিঃ*, 'খুব সাহস' অথবা ইচ্ছা শক্তি। *এতৎ ক্ষেত্রং*, 'এগুলি সব *ক্ষেত্র*'; *সমাসেন সবিকারং উদাহৃতম্*, '[আমি] এই বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম'। অতএব, সমগ্র দৃশ্যমান বিশ্বটিই হলো *ক্ষেত্র*, যার মধ্যে আমাদের মন, দেহ, ইন্দ্রিয়গুলি

এবং অন্যান্য সবকিছুই পড়ে যায়। এসবের বাইরে একমাত্র যে বস্তুটি, তা হলো বিশুদ্ধ চৈতন্য বা শুদ্ধ বুদ্ধি, যার ওপর এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত। একটু পরে শ্রীকৃষ্ণ সে সম্পর্কে বলবেন।

এখন জ্ঞানের প্রসঙ্গ উঠছে। *জ্ঞান*, বিশেষত অধ্যাত্ম জ্ঞান বলতে আমরা কী বুঝি? এখানে 'জ্ঞানের উপায়' দিয়ে জ্ঞানের তত্ত্বটি তুলে ধরা হবে। আপনি কী করে প্রকৃত অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করতে পারবেন? তার উত্তরে বলা হচ্ছে—কতকগুলো উপায় আছে। এমন কতকগুলি নৈতিক গুণ আছে যা আপনাকে এই জ্ঞানলাভের লক্ষ্যে এগিয়ে দেবে। পরবর্তী শ্লোকে এই গুণগুলির কথাই বলা হবে, যা আরম্ভ হচ্ছে *অমানিত্বম্* বা বিনয় দিয়ে।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭॥

—'নম্রতা, নিরভিমানতা, অহিংসা, ক্ষমাশীলতা, সরলতা, গুরুসেবা, পবিত্রতা, স্থৈর্য, আত্মসংযম;'

শ্লোকের প্রথম শব্দটি *অমানিত্বম্*, অর্থাৎ 'নম্রতা'; *মান* বা অহংভাব একেবারেই থাকবে না, কারণ বিনয়-নম্র হলে তবেই জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। সেইরকম, *অদম্ভিত্বম্*, 'দম্ভ থেকে মুক্ত'; এর ঠিক বিপরীত হলো *দম্ভ*, অর্থাৎ হামবড়া ভাব। এরপর আসছে *অহিংসা*, যা উচ্চতর জ্ঞানলাভের অন্যতম উপায়। *ক্ষান্তিঃ* হলো 'ক্ষমা' বা সহিষ্ণুতা; *আর্জবম্*, 'সরলতা'; *আচার্যোপাসনং*, 'গুরুসেবা'। গুরুর কাছে জ্ঞান সঞ্চিত আছে; আমি সেই জ্ঞান তাঁর কাছ থেকে পেতে চাই। কী করে তা পাব? গুরুসেবার মাধ্যমে। তাই শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ হলো এই আচার্যসেবা। অতীতে জ্ঞানের খুব কদর ছিল। আজ চাকরি বাকরির জন্যই জ্ঞানের যেটুকু মূল্য! সেই কারণে আজ আমরা না সম্মান করি শিক্ষককে, না জ্ঞানকে। শিক্ষকেরও যে আত্মসম্মান আছে, তাও মনে হয় না। বর্তমান যুগে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানবিতরণ—দুয়েরই অধঃপতন ঘটেছে। এটি এখন ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। কোনওরকম মহান মূল্যবোধের প্রেরণা এর ভিতর আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। *শৌচং* হলো 'পবিত্রতা', দৈহিক ও মানসিক শুচিতা; *স্থৈর্যম্*, 'স্থিরতা'; *আত্ম বিনিগ্রহঃ*, 'আত্মসংযম' বা আত্মনিয়ন্ত্রণ, যার দ্বারা আমার দেহ ও মনের শক্তি আমারই বশে থাকে। আমার অনুমতি ছাড়া তারা একচুলও এদিক ওদিক যেতে পারবে না—এই ধরনের নিখুঁত আত্মসংযম।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮॥

—'ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলির (প্রতি অতি আসক্তি) ত্যাগ এবং সেইসঙ্গে নিরহংকারিতা, [এবং] জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখের অশুভ দিকগুলির কথা বারংবার চিন্তা করা;'

অন্যান্য সদ্‌গুণগুলির কথা এখন বলা হচ্ছে। উচ্চতর জ্ঞান লাভ করতে হলে দেহবোধ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি থেকে নিজেদের তফাৎ করা চাই। তারা আমাদের মনকে সর্বক্ষণ এমন নিচের দিকে টানতে থাকে যে মহৎ জ্ঞানের আলো আমাদের ভিতর প্রবেশ করতে পারে না। তাই 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলির প্রতি অনাসক্তিকে বলা হয়েছে *ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্।* তেমনি আবার *অনহংকার এব চ,* 'অহংকার থেকে মুক্ত' হওয়াও চাই। উচ্চতর জ্ঞানলাভ করতে হলে এটিও এক আবশ্যিক গুণ। অহংকার তীব্র হলে জ্ঞান হয় না। *জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষ অনুদর্শনম্,* 'জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিরূপ দুঃখে নিরন্তর দোষ-দর্শন করা চাই', এগুলি যে দুঃখের উৎস, তা বুঝতে হবে। এগুলি থেকে নিজেদের আলাদা করে নিতে হবে। কী ভাবে? তাদের মধ্যে দোষ দেখে, *দোষ অনুদর্শনম্*। *অনুদর্শনম্* মানে 'নিরন্তর দেখা', অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনাগুলির প্রকৃত সত্যতা খতিয়ে দেখা। বুঝতে হবে এগুলি সব সাময়িক ব্যাপার, কয়েক বছরের জন্য সত্য, তারপর আর নেই। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেই *ক্ষেত্রজ্ঞ* সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য ওগুলির সদ্ব্যবহার করা চাই। মানবশরীর লাভের উদ্দেশ্যই এই জ্ঞানলাভ করা।

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯॥

—'অনাসক্তি, স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে মমত্বের অভাব এবং বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত ঘটনায় মনের নিরবচ্ছিন্ন সাম্যভাব;'

অসক্তিঃ হলো 'অনাসক্তির ভাব'; *অনভিষ্বঙ্গঃ পুত্র-দার-গৃহাদিষু,* 'স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, গৃহ ইত্যাদি বিষয়ে মমত্বের অভাব'। অর্থাৎ 'আমি এসবের মধ্যে আছি, কিন্তু আমি তাদের কেউ নই; আমি সংসারের কয়েদি নই'—এইরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি। *পুত্র* মানে এখানে 'সন্তানাদি'; *দারা* হলো 'স্বামী বা স্ত্রী'; *গৃহ* মানে 'বাড়ি, *আদি* মানে 'ইত্যাদি'। ভাবটা এই, সংসারের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত

অন্ধ আসক্তি থাকবে না; ভালবাসা থাকতে পারে, কিন্তু মমত্ব যেন না থাকে। *নিত্যং চ সম চিত্তত্বম্,* 'সদা মনের সাম্যভাব [অভ্যাস কর]। কারণ মনের ধর্মই হলো তরঙ্গের মতো বিক্ষুব্ধ হওয়া। কিন্তু আমি তো মনকে শান্ত ও স্থির করতে পারি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে *যোগ*-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *যোগ* হলো *সমত্বম্,* অর্থাৎ মনের 'সমতা'। তাই আমাদের *সমচিত্তত্বম্* অথবা সমচিত্ততা লাভের জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে, নিরন্তর এটি অভ্যাস করতে হবে। কখন? *ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু,* 'যখন বাঞ্ছিত অথবা অবাঞ্ছিত কিছু ঘটবে'। মনের প্রকৃতি হলো তরঙ্গায়িত হওয়া, ঢেউ-এর মতো আছড়ে পড়া। কিন্তু আমি এই মত্ত মনকে সংযত করব। তাকে বদলে ফেলব। *আমার* প্রকৃতি মনের *ঐ* প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে শক্তি তার আছে। নারী বা পুরুষ সকলেরই এই ক্ষমতা আছে। তাই, দিনরাত উদ্দাম ভাবাবেগের দাসত্ব করার কোনও প্রয়োজন নেই। বাইরে থেকে এক একটি প্রেরণা আসে, আর অমনি আমার মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এমনি আমার দুরবস্থা! কিন্তু আমি তো হিতাহিতশূন্য এই আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আমাদের এই ধরনের দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার এবং এই আত্মপ্রত্যয় সম্বল করেই আমাদের বাঁচতে হবে, সব কাজকর্ম করতে হবে। তবেই উচ্চতর জ্ঞানলাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। আর তা না করে যদি আমরা ইন্দ্রিয়ের আবেদনকেই বেদবাক্য মনে করি, তাহলে এই জ্ঞান আমাদের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। তাই, *ইষ্ট* এবং *অনিষ্ট,* 'প্রীতিকর' ও 'অপ্রীতিকর' যাই ঘটুক না কেন, আমরা যেন মনের এই সাম্যভাব বা সমচিত্ততা বজায় রাখতে পারি। একটু চেষ্টা করেই দেখুন না কেন। প্রথম প্রথম এই সাম্যভাব হয়তো তেমন জোরদার হবে না; কিন্তু ধীরে ধীরে তা দৃঢ় হবে। মনকে বশে আনার এইটিই পথ।

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০॥

—'অবিচ্ছিন্ন যোগ দ্বারা আমাতে অচলা ভক্তি, নির্জন স্থানে বাসের প্রবণতা, (নিরন্তর) জন-সংসর্গে অরুচি;'

ময়ি চ ভক্তিঃ, 'আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি'; *অনন্য যোগেন,* 'একমুখী নিষ্ঠার দ্বারা'; *অব্যভিচারিণী,* 'অচলা', অর্থাৎ তাতে কোনও ভেজাল নেই। আমাতে এইরকম শুদ্ধাভক্তি যাতে হয়, তার জন্য অভ্যাস করতে হবে। *বিবিক্ত দেশ সেবিত্বম্,* 'একান্তে থাকার অভ্যাস', ভিড়ের মধ্যে নয়; এমন জায়গায় যাবেন,

যেখানে আপনি একলা। সাধারণত সমাজে থাকতে গেলে আমাদের লোকজনপরিবৃত হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু উচ্চতর জ্ঞান লাভ করতে গেলে এই ভিড় থেকে মাঝে মাঝে নিজেকে গুটিয়ে নিতেই হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মাঝে মাঝে নির্জনবাস করা উচিত। তিনি 'একলা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আধুনিক চিন্তাধারাতেও এই শব্দটি গুরুত্ব পাচ্ছে। ওয়াশিংটনে থাকার সময় একটি বিপুলায়তন বই পড়েছিলাম। বইটির নাম 'দ্য আমেরিকান হ্যান্ডবুক অফ সাইকিয়াট্রি' *(The American Handbook of Psychiatry)*। সে সম্পর্কে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বিস্তারিতভাবে লিখেছি। ঐ গ্রন্থে বলা হয়েছে, আমেরিকান শিশুদের মধ্যে যদি সৃজনশীলতার প্রসার ঘটাতে হয়, তাহলে তাদের একটু একলা থাকার সুযোগ দিতে হবে; সর্বদা জনসমুদ্রে ভাসলে চলবে না। জনতার হৈ-হট্টগোলের মধ্যে সৃজনী প্রতিভা বিকশিত হয় না; তা স্ফুরিত হয় তখন, যখন আপনি আপনমনে একলা থাকেন। যখন আপনি শান্ত, কথা কম বলবেন, তখনই আপনার সৃষ্টিশীল মন তার যথার্থ অভিব্যক্তিটি খুঁজে পাবে। 'দ্য আমেরিকান হ্যান্ডবুক অফ সাইকিয়াট্রি'-র মতো হাল আমলের বই-এ এসব কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এসব কথা সব অধ্যাত্ম শিক্ষায় বরাবরই বলা হয়েছে; নর-নারীর মধ্যে সৃজনশীল মনের উন্মীলন ঘটাবার আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে নির্জনবাসের ওপর বিলক্ষণ জোর দেওয়া হয়েছে। বাস্তবিক, ক্রমাগতই এগোনো চাই, এক জায়গায় থেমে থাকলে চলবে না।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *ভক্তিঃ অব্যভিচারিণী,* আমার প্রতি 'অবিচলিত ভক্তি'; *বিবিক্ত দেশ সেবিত্বম্,* 'নির্জন স্থানে বাস'; *বিবিক্ত* মানে 'একলা'; *দেশ* হলো 'স্থান'; *সেবিত্বম্,* 'বাস'। 'নির্জনবাসের ইচ্ছা'—কী চমৎকার একটি ভাব! বার্ট্রান্ড রাসেল-এর মতো অজ্ঞেয়বাদী মানুষও শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, শিশুদের কিছু সময়ের জন্য একলা থাকতে দাও, একাকীত্বের সুখ উপভোগ করতে দাও—তবেই তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা জাগ্রত হবে। হ্যাঁ, তারা অবশ্যই খেলাধূলা করবে, মজা করবে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের নীরবতা ও নিভৃতিরও প্রয়োজন আছে। তাদের দুটিই দিতে হবে। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। এই তো কয়েক সপ্তাহ আগে উত্তর প্রদেশের পন্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'সৃজনশীলতা ও আমাদের শিক্ষা'-বিষয়ক একটি সেমিনারের বড়সড় কার্যবিবরণী হাতে এলো। তাতে দেখলাম অনেক নামকরা লেখক প্রবন্ধ দিয়েছেন। অনেকটাই পড়ে ফেললাম। পরে তা মঠ লাইব্রেরিতে দিয়ে দিলাম। অতএব দেখা যাচ্ছে, একঘেয়েমি কাটিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের কিভাবে

সৃজনমুখী করে গড়ে তোলা যায়, তা নিয়ে এখন বেশ চিন্তাভাবনা চলছে। সৃজনীক্ষমতা সকলের মধ্যেই আছে। কিন্তু সেই শক্তিকে কেমন করে উদ্দীপিত করতে হয় তা আমরা জানি না। আমরা জানি শুধু সেই শক্তির কণ্ঠরোধ করতে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সৃজনশীলতার ওপর এই প্রথম এত বড় একটা সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমাদের দেশের মানুষের ভিতর একটা স্বাভাবিক সৃজনশীলতা আছে; কিন্তু আধুনিক শিক্ষার দৌলতে সেই মন যেন যন্ত্রবৎ হয়ে উঠেছে—আগের সেই উদ্ভাবনীশক্তি যেন দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। বইটি পেয়ে তাই আমি এত খুশি হয়েছি। অধ্যাপক মালব্য, যিনি বিভাগীয় প্রধান এবং যিনি আমাকে বইটি পাঠিয়েছিলেন, তাঁকেও আমি আমার *Divine Grace* বা 'ভগবৎ কৃপা' নামক বইটি উপহার হিসাবে পাঠিয়ে দিলাম। ঐ বইতে '*দ্য আমেরিকান হ্যান্ডবুক অফ সাইকিয়াট্রি*' থেকে নেওয়া কয়েকটি অনুচ্ছেদ ছিল, যার মূল উপজীব্য হলো কেমন করে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো যায়। বাস্তবিক, সৃজনী প্রতিভা—এ এক অদ্ভুত গুণ।

অরতিঃ জনসংসদি, 'লোকের সংসর্গে একটু অস্বস্তি'—'আমি দূরে থাকতে চাই'; এইরকম একটা নিস্পৃহ ভাব। এর মানে এই নয় যে আপনি অন্যদের ঘৃণা করছেন। আপনি কেবল অতিরিক্ত মাখামাখিটা এড়াতে চাইছেন। এই মাখামাখি ভাবটিকে এক আমেরিকান রসিকতা করে বলেছেন 'রাবিং শোল্ডারস্' অর্থাৎ কাঁধ ঘষাঘষি। খুব সত্যি কথা। বেশি মাখামাখিতে স্নায়ুগুলো ঝিমিয়ে পড়ে। তাই অন্তত কিছু সময়ের জন্য একটু সরে থাকা খুব ভালো। *অরতিঃ* মানে 'বীতরাগ'; *জনসংসদি* মানে 'জনসমাগম'। বহু মানুষের মধ্যে দীর্ঘকাল থাকার অনিচ্ছা এবং সেই সঙ্গে নির্জনপ্রিয়তা—এই দুটিই টাকার এপিঠ ওপিঠ। এখানে কাউকে ঘৃণা করার কথা বলা হচ্ছে না। একটা সময় থাকে যখন আমাকে অনেক লোকের মাঝে থাকতে হয়। কিন্তু একটা সময় থাকবে যখন আমি আপন মনে থাকব। লক্ষ্য করে দেখবেন, শিশুরাও অনেক সময় একলা থাকতে চায়। বাবা বা মা যদি তাদের পিছনে সর্বদা ছায়ার মতো লেগে থাকে, তাহলে তারা বলে, 'না! তোমরা যাও! আমি এখন একটু একলা থাকব।' এটা খুব ভালো। এই ভাবটিকে উৎসাহ দেওয়া চাই। থাকুক না তারা একলা। 'একলা থাক'—একথা বলতে হয়। তবেই মন তৈরি হবে, মনের নতুন নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। বাবা-মা, অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একথা জানা দরকার। তাহলেই ধীরে ধীরে শিশুদের সৃজনশীল হতে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হবে।

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১॥

—'প্রতিনিয়ত অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা, যথার্থ জ্ঞানের উদ্দেশ্য বোধ; এগুলিকেই জ্ঞান বলা হয় এবং এর বিপরীত যা কিছু তা অজ্ঞান।'

এখানে আরো দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ *অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্বং*, 'সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞানের অন্বেষণ', আত্মজ্ঞানের অনুসন্ধান। অর্থাৎ, আমার প্রকৃত স্বরূপটি কী? এই মনের পিছনে কী আছে? ইত্যাদি জিজ্ঞাসা। ভেবে দেখুন, কী অসাধারণ এই জিজ্ঞাসা! তাই, ক্রমাগত অন্বেষণ করুন। অন্বেষণই সব সৃজনশীলতার উৎস। আত্মার যত কাছাকাছি যাই আমরা, ততই আমরা সৃজনশীল হয়ে উঠি। সেইরকমই, *তত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শনম্*, 'তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যটি অনুধাবন করা'; *তত্ত্ব* মানে 'একটি বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য'। আরো একটি জিনিস আছে; সেটি হলো *মত*, অর্থাৎ 'অভিমত'। আপনি অথবা আমি একটি বস্তুকে যেভাবে দেখতে চাই, তা হলো *মত*। কিন্তু আমাদের পছন্দ-অপছন্দের বাইরে প্রকৃতপক্ষে বস্তুটি কী? এই যে বস্তুর সত্যিকারের প্রকৃতি, তাকেই *তত্ত্ব* বলা হয়। *তত্ত্বজ্ঞান* হচ্ছে 'সত্যের জ্ঞান'। প্রকৃত দর্শনের উপজীব্য এই 'সত্যের জ্ঞান'। *এতৎ জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্*, 'এগুলিকে জ্ঞান বলা হয়ে থাকে।' কেন? তার কারণ এই, এগুলিই আপনাকে জ্ঞানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জ্ঞান তো আর সহজলভ্য নয়। তার জন্য আপনাকে মনটি প্রস্তুত করতে হবে। তাই, গুণ এবং কৃপা—এগুলি হচ্ছে প্রস্তুতিপর্ব, যার সাহায্যে আমরা বিশুদ্ধ আত্মার জ্ঞানলাভ করতে পারি। *অজ্ঞানং যদতোঽন্যথা*, 'এর বিপরীত যা-কিছু, তা অজ্ঞান'। যে-গুণগুলির কথা পরপর কয়েকটি শ্লোকে বলা হলো, সেগুলি আয়ত্ত না করে যদি আপনি তার বিপরীত গুণগুলির অনুশীলন করেন, তবে আপনি গভীর থেকে গভীরতর অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে যাবেন।

এই অংশে শ্রীকৃষ্ণ এইভাবেই জ্ঞানের বর্ণনা দিয়েছেন। এযাবৎ আমরা *ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ* এবং *জ্ঞান*-এর বর্ণনা পেলাম। এবার আমরা *জ্ঞেয়*, অর্থাৎ 'যা জানতে হবে', সেই প্রসঙ্গে আসছি। প্রশ্ন হলো, কোন্ বস্তুকে জানতে হবে? এই জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য কি? তার উত্তর—চরম সত্যটিকে জানা। কিন্তু সেই সত্যটি কী? সেটিই পরের শ্লোকের আলোচ্য বিষয়।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে ।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২॥

—'আমি সেই জ্ঞাতব্য বিষয় বলব যা জেনে [মানুষ] অমৃতত্ব লাভ করে। সেই অনাদি পরব্রহ্ম—[তাঁকে] সৎও বলা হয় না, অসৎও নয়।'

সপ্তম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত *জ্ঞান* নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা দেখেছি *জ্ঞান* হলো পরম সত্তার জ্ঞান। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ একাদশ শ্লোকটি শেষ করেছেন এই বলে, 'এইটিই *জ্ঞান;* বাকি সব *অজ্ঞান।'* কিন্তু মনে রাখতে হবে, মূল জ্ঞানের কথা ওখানে বলা হয়নি, বলা হয়েছে মানসিক ও হৃদয়ের রূপান্তরের কথা, পবিত্রতা এবং অন্যান্য আবশ্যিক গুণের কথা, যা জ্ঞানলাভের পথে সহায়তা করে। কারণ এতো আর সাধারণ বৌদ্ধিক জ্ঞান নয়, যা আমরা চারিত্রিক রূপান্তর ছাড়াও অর্জন করতে পারি। এ জ্ঞান সর্বোচ্চ জ্ঞান, পরম সত্তার জ্ঞান। তাই *অমানিত্বম্, অদম্ভিত্বম্,* 'অহংশূন্যতা, দম্ভশূন্যতা' ইত্যাদি যেসব গুণের কথা ৭-১১ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া কোনও অধ্যাত্মজ্ঞান আসতে পারে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান, সে আপনি বড় রকমের চারিত্রিক পরিবর্তন ছাড়াই অর্জন করতে পারেন। জীবজন্তুরও কিছু না কিছু সে ধরনের জ্ঞান থাকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান লাভ করতে হলে, শাশ্বত ও অনন্তের জ্ঞানলাভ করতে গেলে, যেসব উৎকর্ষের কথা বলা হয়েছে, তার অনুশীলন আপনাকে করতেই হবে। বেদান্ত এই কথাই বারবার জোর দিয়ে বলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর উপদেশে বলেছেন—পুঁথিপড়া জ্ঞান দিয়ে কী হবে? চারপাশের জগৎ সম্পর্কে গুচ্ছের জেনে কী লাভ? ওতে বড় জোর দৈহিক স্থূল জীবন একটু বেশি সুখের হতে পারে। তার বেশি কিছু নয়। যতক্ষণ আমরা ইন্দ্রিয়গোচর জগতের ঊর্ধ্বে উঠে অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ না করছি, ততক্ষণ আমাদের হৃদয় যথার্থ প্রজ্ঞার আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারে না। সেই পারমার্থিক বা আত্যন্তিক সত্য যাতে আমরা লাভ করতে পারি, সেইজন্যই বিভিন্ন গুণ আয়ত্ত করার কথা এতক্ষণ সবিস্তারে বলা হয়েছে। সে-সব কথা বলার পর এই দ্বাদশ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এখন বলবেন *জ্ঞেয়* বস্তুটি কী, অর্থাৎ 'কী জানতে হবে'। এখানে বস্তু শব্দটি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, তত্ত্বদৃষ্টিতে অধ্যাত্মজ্ঞান কোনও বস্তু হতে পারে না; সেখানে 'জানা' মানে 'হওয়া'।

শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে বলছেন, *জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি*। সংস্কৃতে *জ্ঞান,*

জ্ঞেয় এবং *জ্ঞাতা,* এই তিনটি শব্দ যেন এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে অন্বিত। *জ্ঞাতা,* অর্থাৎ 'যিনি জানছেন'; *জ্ঞেয়* মানে 'জ্ঞানের বিষয়' এবং *জ্ঞান* হলো 'জ্ঞানক্রিয়া'। বেদান্তমতে, চরম তত্ত্ব অনুভূত হলে এই তিনটি একাকার হয়ে যায়। *জ্ঞান, জ্ঞেয়* এবং *জ্ঞাতা* —এই তিনটিকে একত্রে *ত্রিপুটি* বলে। এই তিনের ভেদবোধ দূর হলেই *ত্রিপুটি-ভেদ* হলো। বস্তুত, এক সত্তাই আছেন; তাঁকে জানলেই সব জানা হয়, কারণ তাঁর থেকে পৃথক আর কিছুই নেই, দ্বিতীয় কোনও জ্ঞেয়বস্তু নেই। যা কিছু বৈচিত্র্য, সবই সেই এক জ্ঞানের বাহ্য প্রকাশ। *জ্ঞান* মানে 'শুদ্ধ চৈতন্য'। বেদান্ত এই চৈতন্য বা জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত করেছে যে, চৈতন্যেই সব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার পূর্ণতা। পরম সত্তা বা ব্রহ্মকে আমরা এভাবেই বর্ণনা করি। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের প্রথম দিকে শঙ্করাচার্য বলেছেন—*অনুভব অবসানম্, ব্রহ্ম বিজ্ঞানম্,* অর্থাৎ 'ব্রহ্মানুভূতিতেই ব্রহ্মজ্ঞানের পর্যাবসান'। অতএব, জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় সবই অনন্ত চৈতন্যে লীন হয়ে যায়। এই যে ত্রিপুটির কথা এতক্ষণ বলা হলো, সবই সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যের বিভিন্ন রূপ মাত্র।

সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, *জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি,* 'এখন তোমাকে আমি *জ্ঞেয়,* অর্থাৎ জ্ঞাতব্য সত্য সম্বন্ধে বলব'; *যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ অশ্নুতে,* 'যা উপলব্ধি করে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে'। অন্তর্জীবনে বা অধ্যাত্মজীবনে জানা মানে হওয়া। জাগতিক বা বহির্জীবনে এবং জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। অণুকে জানলে কোনও বিজ্ঞানী অণু হয়ে যান না। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানী ব্রহ্মকে জেনে ব্রহ্মই হয়ে যান। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে *ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি* (৩/২/৯)—'ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হয়ে যান।'

ইন্দ্রিয় এবং মানসিক স্তর পর্যন্ত সব কিছুই নশ্বর, সব কিছুই পরিবর্তনশীল। কেবল ঐ সীমা অতিক্রম করে তবেই মানুষ তার অনন্ত মাত্রার অর্থাৎ তার স্বরূপের অবিনশ্বরতার নাগাল পেতে পারে। এই *জ্ঞেয় বস্তুকে* উপলব্ধি করেই সে অমৃতত্ব লাভ করতে পারে। শ্লোকের অবশিষ্ট অংশে এই জ্ঞেয় বস্তুরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম, 'পরব্রহ্ম—যাঁর স্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য—তিনি *অনাদি'।* কাল তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। বাস্তবিক, যাঁকে কাল ছুঁতে পারে না, তিনিই তো অমর। কালের দ্বারা কবলিত হওয়াকেই তো মৃত্যু বলে। এছাড়া আর মৃত্যু কী? তাই, অমরত্ব কালের সীমানার বাইরে। আমাদের ঋষিরা প্রতিটি

জীবের ভিতর, বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে নিহিত সেই অমরত্বের দিকটি আবিষ্কার করেছিলেন। তফাৎ শুধু এই, মানুষ ছাড়া অন্য কোনও বস্তু তাদের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্তাটিকে উপলব্ধি করতে পারে না। কেবল তাই নয়, মানুষ একদিকে যেমন তার অনন্ত সত্তাটিকে উপলব্ধি করতে পারে, তেমনি আবার বাইরের জগৎকেও বুঝতে পারে। মানুষই একমাত্র প্রকৃতিকে বুঝতে পারে, আবার প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যে সত্য, তাও নিজের ভিতর উপলব্ধি করতে পারে। এই হলো অনাদি, কালাতীত পরম ব্রহ্ম। *ন সৎ তৎ ন অসৎ উচ্যতে,* 'বলা হয়, তা সৎও নয়, অসৎও নয়'। ঋগ্বেদেও আছে, পরব্রহ্ম 'সৎ এবং অসৎ'-এর অতীত তত্ত্ব। *সৎ* মানে 'সত্তা', *অসৎ* মানে 'অসত্তা'। ব্রহ্ম এসব শ্রেণিবিভাগের অতীত। এই জন্যই বলা হয়েছে, শব্দ এবং চিন্তা সেখানে পৌঁছতে পারে না। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২/৪/১) আছে, *যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,* 'ব্রহ্ম সেই সত্য যাঁকে মন ও বাক্য বিষয় করতে না পেরে [অর্থাৎ ধারণা না করতে পেরে] ফিরে আসে'। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে আমরা শব্দ ব্যবহার করি কেন? ধারণা বা কল্পনারই বা দরকার কী? তার উত্তর—কোনও কিছুকে বোঝার জন্য। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাকে বোঝার জন্যই এসবের প্রয়োজন এবং শিক্ষা এ-ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে। কিন্তু ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে যখন আমরা ওগুলিকে ব্যবহার করি, তখন তারা অকেজো, শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

যদিও তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, তবুও অসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মহাপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা বলার সময় একবার তিনি এমন একটি মন্তব্য করেন যা বিদ্যাসাগরের প্রাণে গেঁথে যায়। বিদ্যাসাগর মশাই পণ্ডিত; স্বভাবতই তিনি বেদান্ত জানতেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন ঃ 'সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড় দর্শন—সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম'[১]। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, এক ব্রহ্ম ছাড়া সবকিছুই উচ্ছিষ্ট হয়েছে। ব্রহ্ম কি, তা কেউই কথা বা চিন্তা দিয়ে ব্যক্ত করতে পারেনি। কারণ ব্রহ্ম সবকিছুর পারে। তিনি এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর বলে উঠলেন, 'বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম'[২]।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৫২, উদ্বোধন সং
২ তদেব

এইভাবে, তাঁর অনবদ্য ভঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের মহত্তম সত্যটি তুলে ধরেছিলেন। বাস্তবিক, সর্বোচ্চ এই সত্যটি নীরবতার গভীরে ডুব দিয়েই উপলব্ধি করা সম্ভব। খ্রিস্টান, সুফি, হিন্দু, বৌদ্ধ—সব অতীন্দ্রিয়বাদীরাই বলেছেন আত্যন্তিক বা পরম সত্য বাক্য ও মনের অতীত। কোনও কিছুর সঙ্গে তুলনা করে ব্রহ্ম এইরকম বা ব্রহ্ম ঐরকম বলে আপনি ব্রহ্মের ধারণা করতে পারবেন না। আপনি কেবল ব্রহ্ম *হয়ে* যেতে পারেন; কিন্তু মন ও বুদ্ধি দিয়ে ব্রহ্মকে বুঝতে পারবেন না। 'ব্রহ্ম সৎও নয়, অসৎও নয়'—এর দ্বারা সেই ইঙ্গিতই করা হচ্ছে। নবম অধ্যায়ে (উনিশ সংখ্যক শ্লোকে) অন্য এক প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সৎ অসৎ চ অহম্ অর্জুন*, অর্থাৎ, 'আমি অমৃত, আবার মৃত্যুও এবং সৎ ও অসৎ উভয়ই, "দৃশ্য ও অদৃশ্য" দুই।' এখানে, এই শ্লোকে বলা হচ্ছে, ব্রহ্ম *সৎ* এবং *অসৎ*, 'অস্তি ও নাস্তি'—দুয়েরই ঊর্ধ্বে। বেদান্তে বিভিন্ন অনুষঙ্গে, বিভিন্ন অর্থে, আমরা *সৎ* ও *অসৎ* শব্দ দুটি ব্যবহার করি। এই শব্দ দুটির দ্বারা কার্য ও কারণকেও বোঝানো হয়ে থাকে। এই অর্থে *সৎ* হলো কার্য যা আপনি দেখতে পান, যা আপনি অনুভব এবং স্পর্শ করতে পারেন। *সৎ* তাই দৃশ্যমান। কিন্তু *অসৎ* হলো 'কারণ' যা আপনি দেখতে পান না। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, বীজের মধ্যেই তো গাছ থাকে। কিন্তু বীজের দিকে তাকিয়ে কি আপনি গাছ দেখতে পান? পান না। এখানে গাছটি *অসৎ*। কিন্তু যেই বীজটি মাটিতে পুঁতবেন, কিছুদিনের মধ্যেই তার থেকে একটা চারা বেরুবে; তখন সেটি *সৎ*, অর্থাৎ দৃশ্যমান হলো। অতি সূক্ষ্ম জিনিস আপনি দেখতে পাবেন না; কেবল যা একটু স্থূল, তাকেই আপনি দেখতে পান, তাকে বুঝতে পারেন। তার সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন। এই অর্থেও *সৎ* ও *অসৎ* শব্দ দুটির ব্যবহার আছে। বেদান্ত বলে, পরম সত্যের ক্ষেত্রে এ জাতীয় শ্রেণিবিন্যাস অচল। তাই *নেতি, নেতি,* অর্থাৎ 'এটা নয়, এটা নয়'—এই নঞর্থক পদ্ধতি অনুসরণ করেই চরম সত্যটিকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হয়।

আপনি প্রশ্ন তুলতে পারেন—তাহলে এই যে 'আত্মা', 'ব্রহ্ম' এই সব শব্দ ব্যবহার করা হয়, এসবের অর্থ কী? তার উত্তরে শঙ্করাচার্য বলছেন (যা আমি এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি) : 'পরম সত্তা শুদ্ধচৈতন্য, যা অনন্ত ও অদ্বয়, তাকে কোনও নাম দিয়ে সীমিত করা যায় না, এমনকি আত্মা এবং ব্রহ্ম শব্দ দিয়েও নয়।' কিন্তু বোঝাতে গেলে তো কিছু না কিছু শব্দ ব্যবহার করতেই হয়; তাই আমরা 'আত্মা', 'ব্রহ্ম' এসব শব্দ ব্যবহার করি। ব্যক্তির ক্ষেত্রে আত্মা, সমষ্টি বা মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে ব্রহ্ম—এই বুঝতে

হবে। এও বুঝতে হবে 'এই' এবং 'সেই' বস্তুত একই। আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আত্মা। যেখানে 'আত্মা' শব্দটি ব্যবহার করতে হবে, সেখানে কখনও কখনও উপনিষদ্ 'ব্রহ্ম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, আবার যেখানে 'ব্রহ্ম' শব্দটি প্রযুক্ত হওয়ার কথা, সেখানে 'আত্মা' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। দুটিই অভিন্ন। একই কথা। কারণ যা ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তা আপনার ভিতরেও আছে। পরের শ্লোকগুলিতে এসব কথা আসবে।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই, আমাদের যা জ্ঞেয়, অর্থাৎ পরম সত্তা, তা *সৎ* ও *অসৎ*, দুয়েরই পারে। আমরা সেই সত্য উপলব্ধি করতে চাই। তাকেই *জ্ঞেয়ম্* বলা হয়েছে। এই *জ্ঞেয়ম্* অনন্য সাধারণ ও অনুপম। এটি ছাড়া ব্যক্ত বিশ্বের সব কিছুরই একটা ধারণা আপনি করতে পারেন, তাদের নানা নামে অভিহিত করতে পারেন। বস্তুতপক্ষে শুধুমাত্র বিভিন্ন বস্তুর নাম দিয়ে এবং তাদের সম্পর্কে কল্পনা করেই আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করি এবং জ্ঞান আহরণ করি। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ব্যক্ত বিশ্বের সীমান্তে এসে থমকে দাঁড়ায়। আর এগোতে পারে না, কারণ অসীমের রাজ্যে তার প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে নাম, রূপ, আমাদের সব কল্পনা, সব কিছুই ব্রহ্ম আত্মসাৎ করে নেয়, যেন গিলে ফেলেন। এই হলো বেদান্তে ব্রহ্মের ব্যাখ্যা যা বিশ্বের সব অতীন্দ্রিয় সিদ্ধ মহাপুরুষদের অনুভূতির দ্বারা সমর্থিত। তাঁরা একবাক্যে বলেছেন যে, পরম ঐক্য বাক্য ও মনের অতীত। আপনি কেবল তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে পারেন, অনুভব করতে পারেন। ব্যস্, ঐ পর্যন্তই। তার বেশি নয়। সেই ব্রহ্মবস্তুটি কি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

সমাধির অনুভূতি কিরকম, তা খুলে বলার বহু চেষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ করেছেন; কিন্তু পারেননি। স্বামী সারদানন্দ *লীলাপ্রসঙ্গ*-এ লিখেছেন ঃ 'একদিন ঐরূপে খুব জোর করিয়া বলিলেন, "আজ তোদের কাছে সব কথা বলব, একটুও লুকোব না"—বলিয়া আরম্ভ করিলেন। হৃদয় ও কণ্ঠ পর্যন্ত সকল চক্রাদির কথা বেশ বলিলেন, তারপর ভ্রূমধ্যস্থল দেখাইয়া বলিলেন, "এইখানে মন উঠিলেই পরমাত্মার দর্শন হয় ও জীবের সমাধি হয়। তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে কেবল একটি স্বচ্ছ পাতলা পর্দামাত্র আড়াল (ব্যবধান) থাকে। সে তখন এইরকম দ্যাখে"—বলিয়া যেই পরমাত্মার দর্শনের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিভঙ্গে পুনরায় বলিতে চেষ্টা করিলেন, পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন! এইরূপ বার বার চেষ্টার পর সজল নয়নে আমাদের বলিলেন, "ওরে, আমি তো মনে করি সব কথা বলি, এতটুকুও

তোদের কাছে লুকোব না, কিন্তু মা কিছুতেই বলতে দিলে না—মুখ চেপে ধরলে!"[১] তাঁকে স্পর্শ করা মাত্র আপনি তাঁর মধ্যে গলে যাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন একবার এক নুনের পুতুল ঠিক করলে—সে সমুদ্রের গভীরতা মাপবেই মাপবে। খুব অহংকার ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে সে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলো বটে, কিন্তু যেই না জল ছুঁয়েছে, অমনি সে সমুদ্রে গলে গেলো। তখন আর পুতুল কোথায় যে বলবে সমুদ্র কত গভীর? মনও সেইরকম আত্মার অসীম গভীরতা মাপতে গিয়ে তাতেই লয় হয়ে যায়। জেন (Zen) বৌদ্ধ, তাওবাদী ও বেদান্তবাদীরা বলেন, এমন একটা অবস্থা আছে যখন 'মনের মৃত্যু হয়।' ঐ অবস্থাকে তাঁরা বলেন *মনোনাশ।* ওটি খুব উচ্চ অবস্থা। যে-মন বাইরের জগতের সব কিছু বুঝতে চায়, সেই মনই যখন আত্মার দিকে ঝোঁকে, তখন কিছুদূর এগিয়ে আর এগোতে পারে না; তখন যেন মনের মৃত্যু হয়। তাই এই অবস্থাটিকে বলা হচ্ছে *মনোনাশ।* এসব মরমিয়া সাহিত্যের অপূর্ব চিন্তা এবং আজকের পরমাণুবিজ্ঞানীরা যাঁরা অতি সূক্ষ্মবোধসম্পন্ন, তাঁরা এই চিন্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন। তাঁরা স্বীকার করছেন, সর্বোচ্চ স্তরে আমাদের ধারণা ও চিন্তাগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। যতই প্রকৃতির সূক্ষ্মদিকগুলির গভীরে আপনি প্রবেশ করবেন, ততই দেখবেন আপনার আপাত-পরস্পরবিরোধী নানারকম অভিজ্ঞতা হচ্ছে; মানুষের অন্তর্লোকে ডুব দিলে এই অভিজ্ঞতা আপনার আরো বেশি হবে। এই তো পরিস্থিতি! কিন্তু তা সত্ত্বেও ঋষিরা আত্মতত্ত্বের এই মহান সত্য আমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলেছেন, *শান্তোঽয়ম্ আত্মা,* 'এই আত্মা নীরব'। যেই আপনি বলতে শুরু করলেন, অমনি আপনি আত্মা থেকে সরে এসেছেন। নীরবতার এই মহিমা!

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেও মৌন থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার, কারণ এর একটা দারুণ তাৎপর্য রয়েছে। সাধারণত আমরা বকবক করতে ভালবাসি এবং এই কলকলানির দরুনই আমাদের মন, চিন্তা এবং কাজকর্ম অতি নিম্নমানের। আমাদের মনটি সূক্ষ্ম নয়। কিন্তু নীরব থাকার অভ্যাসটি যখন আমরা গড়ে তুলি, যখন অন্যের বক্তব্য শোনার গুণটি আমরা আয়ত্ত করি, তখন আমাদের মনটি উন্নত হয়; তখন আমরা সত্যের সূক্ষ্ম দিকগুলি আরো ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। পরিশেষে, যেদিন আপনাকে প্রশ্ন করা হবে, 'আপনি কি উপলব্ধি করেছেন?' এবং তার উত্তরে আপনি বলতে

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃঃ ৩৫

পারবেন যে, 'হ্যাঁ, আমি উপলব্ধি করেছি', সেদিনই বোঝা যাবে আপনার জ্ঞান অন্বেষণ শেষ হয়েছে। আপনার মনে তখন আর কোনও প্রশ্ন, কোনও সংশয় থাকবে না। বোধ আর কী? অনুভব করা। আর এই অনুভূতি কাউকে বলে বোঝানো যায় না। এখানে জানা বা উপলব্ধি করা মানে হওয়া। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে এই ধরনের অতি চমৎকার আরো সব ভাব আমরা পাব। তাদের অনেকগুলিই শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক, মুণ্ডক এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ থেকে নেওয়া।

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩॥

—'বিশ্বের সর্বত্র [তাঁর] হাত পা, সর্বত্র [তাঁর] চোখ, মাথা ও মুখ, সর্বত্র [তাঁর] কান—সবকিছু জুড়ে সেই পরব্রহ্ম অবস্থান করছেন।'

এখন সেই বিরাট পুরুষের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। *সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ*, 'সেই আত্মা, সর্বত্র যাঁর হাত পা'; *সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্*, 'চোখ, মাথা এবং মুখ [যাঁর] সর্বত্র'; *সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে*, 'সর্বত্র কান'; *সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি*, 'ইহলোকে তিনিই সব কিছু ব্যাপ্ত করে আছেন'। তিনি আত্মা। একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর *বিশ্বরূপ* দেখিয়েছিলেন। সে এক ভয়ানক অভিজ্ঞতা, যা দেখে অর্জুন মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে অনুনয় করে বলেছিলেন, 'প্রভু! ঢের হয়েছে। এখন আমি আপনার স্বাভাবিক মনুষ্যরূপ দেখতে চাই!' এখানেও অসীম কিভাবে বিশ্বে অভিব্যক্ত হচ্ছেন তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। একটা কথা মনে রাখতে হবে—জগতে দুই বা দুটি সত্তা নেই। জগৎ একদিকে, আর ভগবান অন্য আর এক দিকে—ব্যাপারটা তা নয়। একমাত্র ঈশ্বরই আছেন। ব্রহ্মই আছেন। তিনি অনন্ত চৈতন্য। তাঁর কাছ থেকেই এই বিশ্ব এসেছে, তাঁতেই অবস্থান করছে এবং অন্তিমে তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। ব্রহ্ম সম্পর্কে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ সে কথাই বলেছেন *সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি*, 'তিনি সবকিছুতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।' আকাশের সঙ্গে অনুপম ব্রহ্মের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। ভিতরে, বাইরে সর্বত্র আকাশ—আকাশ সর্বব্যাপী, এমনকি আনাচে কানাচেও। আপনি চারদিকে দেওয়াল তুললেও তার ভিতরে আকাশ থাকবে, কারণ আকাশকে বাঁধা যায় না। আকাশ অখণ্ড, সর্বত্র তার অবস্থান। উপনিষদ্ তাই আত্মা অথবা ব্রহ্মকে বোঝাবার জন্য আকাশের উপমা দিয়েছেন। এটি সার্থক উপমা।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪॥

—'সকল ইন্দ্রিয়ের কাজের দ্বারা তিনি প্রকাশিত, অথচ [নিজে] ইন্দ্রিয়হীন; অনাসক্ত হয়েও সকলের আশ্রয়; নির্গুণ, অথচ সকল গুণের সংবেদক।'

'সকল ইন্দ্রিয়ের কাজের দ্বারা প্রকাশিত', *সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং*; আমাদের চোখ দেখতে পায়, কান শুনতে পায়। ইন্দ্রিয়গুলির এসব ক্ষমতা কোথা থেকে আসে? আত্মা থেকে। আত্মাই এসব ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে নিজেকে ব্যক্ত করেন। কিন্তু এভাবে ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করলেও, তিনি *সর্বেন্দ্রিয় বিবর্জিতম্*, 'ইন্দ্রিয়বিহীন'। আপনার মধ্য দিয়ে, আমার মধ্য দিয়ে, কোটি কোটি প্রাণীর ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়ে এই আত্মা সবকিছু উপলব্ধি করেন। কিন্তু তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় বলতে কিছু নেই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও একথা আছে।

অসক্তং, 'অনাসক্ত'; *সর্বভৃচ্চৈব*, 'যিনি সবকিছুর আশ্রয়'; শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলেছেন—শূন্যের আগে ১ সংখ্যাটি থাকলে তবেই শূন্যের মূল্য, তবেই সে ১০ হয়। আপনি ১ সরিয়ে নিন, তখন শূন্য শূন্যই; শূন্যের পর যত শূন্যই বসানো যাক না কেন, তার কোনও দামই নেই। *নির্গুণং*—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই 'তিন গুণের অতীত', কিন্তু *গুণভোক্তৃ চ*, 'তবুও এই তিনগুণের মাধ্যমে তিনি জগৎকে উপলব্ধি করেন।' আপনার, আমার যেসব অভিজ্ঞতা হয়, তা এই তিনগুণের দ্বারাই সম্ভব হয় এবং তিনিই এটি করছেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গুণাতীত। ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের সামনে যে সত্য উপস্থাপিত করে, তার গভীরে যখন আপনি প্রবেশ করেন তখন এ জাতীয় আপাতবিরোধী সত্যের মুখোমুখি হতে হয় আপনাকে। বিজ্ঞানে, বিশেষত পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানীদেরও এধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে। তাঁরা ফোটনের (photon) আপাতবিরোধী প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে স্তম্ভিত হচ্ছেন। তাঁরা দেখছেন, ফোটন একই সঙ্গে আলোককণিকা (particle) রূপে আবার তরঙ্গরূপে (wave), দুভাবেই আচরণ করে। তাঁদের কাছে এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! মহাকাশের মধ্য দিয়ে সে তরঙ্গের আকারে ছুটে যায়; কিন্তু যখন কোনও লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে, তখন আচরণে সে আলোককণিকা বা পার্টিকল্। এর রকমসকম দেখে তাহলে কী বলা যাবে? পদার্থবিদ্যা তাই এক নতুন শব্দ উদ্ভাবন করেছে—ওয়েভিকল্ (wavicle)। 'ওয়েভ'-এর সঙ্গে 'পার্টিকল্' মিলিয়ে এই শব্দটি তৈরি করা হয়েছে। কেন? না ফোটন হলো ওয়েভ-পার্টিকল্-এর সমন্বয়। কখনও সে তরঙ্গ। কখনও একটি

আলোককণিকা। অর্থাৎ, কখন যে সে কি আচরণ করবে, তা আগে থেকে বলা যাবে না। বাস্তবিক, প্রকৃতির এত সূক্ষ্ম স্তরে আজ আমরা প্রবেশ করেছি যে, সেখানে আমাদের সাধারণ যুক্তির ভাষা কাজ করে না। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে এটি এক মস্ত সমস্যা। ঠিক এই সমস্যার জন্যই আত্মা বা ব্রহ্মকে বর্ণনা করতে গিয়ে আপাতবিরোধী মন্তব্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এর পরও আমরা কয়েকটি আপাতবিরোধী অর্থযুক্ত শ্লোক পাব।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫॥

—'স্থাবর ও জঙ্গম (সকল) ভূতের ভিতরে ও বাইরে; সূক্ষ্মতার দরুন তিনি অবোধ্য; তিনি দূরে এবং নিকটেও।'

বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্, 'তিনি সবকিছুর ভিতরে; আবার সবকিছুর বাইরে'। অর্থাৎ, আত্মা একই সঙ্গে সবকিছুর ভিতরে এবং বাইরে। কিন্তু যুগপৎভাবে ভিতরে এবং বাইরে কোনও কিছু থাকতে পারে কি? থাকলে কীভাবে? তার উত্তর এই, সাধারণ বস্তু থাকতে পারে না, কারণ তারা স্থানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সীমিত। কিন্তু আত্মা তা নন। তিনি এখানে, সেখানে, সর্বত্র থাকতে পারেন। একজন বিখ্যাত পরমাণুবিজ্ঞানী বিদ্যুৎ-পরমাণুর (ইলেকট্রনের) আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, একটি বিদ্যুৎ-পরমাণু পরমাণুর ঘনীভূত অংশ বা নিউক্লিয়াস-এর চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার দিক পরিবর্তন করে। তপ্ত হলে সে এক দিকে যায়, আবার ঠাণ্ডা হলে অন্যদিকে। অর্থাৎ ইলেকট্রন তার কক্ষপথ বদলায়। এখন যেই আপনি বললেন ইলেকট্রন কক্ষপথ পরিবর্তন করে, তখন ধরে নিতে হবে যে, সে আর পাঁচটা সাধারণ ভৌত বস্তুর মতোই। কিন্তু ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে তা বলা চলে না, কারণ পদার্থবিজ্ঞানীরা বলছেন যে, *মধ্যবর্তী স্থানের মধ্য দিয়ে না গিয়েও* সে এক কক্ষপথ ছেড়ে হঠাৎ আর একটি কক্ষপথে উপস্থিত হতে পারে। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও আজকের বিজ্ঞানে এসব কথা বলা হচ্ছে।

কিন্তু সেই কবে পরম সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে সূক্ষ্মদর্শী ভারতীয় ঋষিদের ঠিক এই অভিজ্ঞতাই হয়েছিল। বলা হচ্ছে, *বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্,* 'আত্মা সকল জীবের ভিতরে এবং বাইরে রয়েছেন।' অচরং, 'স্থাবর', অর্থাৎ যা চলে না; চরম্ এব চ, 'তিনি আবার চলেনও'। ভাষাটি লক্ষ্য করুন! এটি ঈশ

উপনিষদ্ থেকে নেওয়া। আত্মা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ঈশ উপনিষদ্ বলছেন, *তৎ এজতি, তৎ ন এজতি,* 'তিনি চলেন, অর্থাৎ ক্রিয়াশীল; তিনি অচল অর্থাৎ স্থাণু'। *এজতি* মানে কম্পন, 'নড়াচড়া করা'; সব কাজই একধরনের *এজন,* 'গতি'। একটা সূক্ষ্ম গতিপ্রবাহ চলেইছে; তাকে বলা হয় *এজ্ কম্পনে;* কম্পন বলতে এই ধরনের মৃদু আন্দোলন বোঝায়। প্রকৃতিতেই দুই-ই আছে; গতি আছে আবার গতিহীনতাও। এক্ষেত্রে আত্মা চলেন, *তৎ এজতি*; চলেন, তা না হলে বিশ্ব অচল হয়ে যেত। *তৎ ন এজতি,* 'তিনি চলেন না', অনড়। অর্থাৎ, আপনি যখন আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করবেন, দেখতে পাবেন তাঁতে কোনও নড়নচড়ন নেই, তিনি সম্পূর্ণভাবে, স্থির ও অচঞ্চল। ঐটিই আত্মার স্বরূপ। ইলেকট্রন বা ফোটন-এর চেয়েও তিনি বহুগুণ সূক্ষ্ম। তাই একই সঙ্গে বলা হচ্ছে, তিনি স্পন্দিত হন না, আবার হনও। তারপর, *তৎ দূরে,* 'তিনি অতি দূরে'; *তৎ উ অন্তিকে,* 'তিনি কাছের থেকেও কাছে'। ভগবান বহু দূরে, আবার ভগবান আমাদের খুবই কাছে—খ্রিস্টান, সুফি, হিন্দু, সব মরমিয়া সাধকদেরই এই অনুভূতি হয়েছে; তাঁরা সকলেই একসুরে এই কথাই বলেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা জড়বস্তুর সূক্ষ্ম দিকের আলোচনা করতে গিয়ে সেই এক কথাই বলছেন।

তাই একথা যেন আমরা কখনও না ভাবি যে, জগৎ সম্পর্কে আমাদের আটপৌরে অভিজ্ঞতাটাই সব এবং সেটিই সত্য নির্ধারণের একমাত্র মানদণ্ড। আদৌ না। সেটি কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা অনাবৃত সত্যের একটি দিক কেবল, যা আপনি আমি সকলেই বোঝার চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু আরো গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, আগে যা ভাবা গিয়েছিল তা তো নয়—এ তো সত্যের অন্যরূপ! সত্যের সূক্ষ্ম যে-সব দিকগুলি নিয়ে পরমাণু বিজ্ঞানে চর্চা চলছে, তাতে বিজ্ঞানীদের এ ধরনের অভিজ্ঞতাই হচ্ছে। কিন্তু বেদান্তের অনুসন্ধান সত্যের সূক্ষ্মতম দিকটি নিয়ে, যার থেকে সূক্ষ্ম আর কিছু হতে পারে না।

অচরং চরম্ এব চ। চর মানে 'চলিষ্ণু', যা চলে। *অচর* মানে 'যা চলে না।' অতএব, এই আত্মা গতিশীল এবং গতিহীন—দুই-ই। এরপর একটি চমৎকার ভাব দেওয়া হয়েছে। *সূক্ষ্মত্বাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ং,* 'অতি সূক্ষ্ম বলে তিনি অবিজ্ঞেয়'; আপনি তাঁকে জানতে পারেন না। *দূরস্থং,* 'তিনি বহু দূরে'; *চ অন্তিকে চ তৎ,* 'এবং তিনি কাছের থেকেও কাছে'।

কত যুগ আগে উপনিষদে এইসব সত্য বলে দেওয়া হয়েছে! আজ যেহেতু

পদার্থবিজ্ঞানীরাও এই ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছেন, তাই বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ উপনিষদের কথা একটু আধটু হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন। 'দ্য তাও অফ ফিজিকস্'-এর লেখক অধ্যাপক ফ্রিৎসফ্ কাপরা (Fritjof Capra) তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ 'আনকমান উইসডম্' *(Uncommon Wisdom)*-এ ওয়ার্নার হেইজেনবার্গ (Werner Heisenberg)-এর সঙ্গে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৪২-৪৩)। হেইজেনবার্গ আধুনিক পদার্থবিদ্যায় এক যুগান্তকারী তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। তত্ত্বটির নাম 'Uncertainty Principle' বা 'অনিশ্চয়তা তত্ত্ব', যেখানে কার্য-কারণের নিয়ম খাটে না। এযাবৎ কার্য-কারণ নীতির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেই আমরা জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছি। নিউটন-এর পদার্থবিদ্যা সম্পূর্ণভাবে এই কার্য-কারণ তত্ত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ তত্ত্ব অনুসারে কার্য ও কারণ অভিন্ন এবং এই জন্যই আমরা সব কিছু বুঝতে পারি। কিন্তু এরই মধ্যে হেইজেনবার্গ অনিশ্চয়তা তত্ত্বটি আবিষ্কার করে সবকিছু যেন ওলোটপালোট করে দিলেন। এই তত্ত্ব অনুসারে, একটি পরমাণুকণার আচরণের মধ্যে আপনি হয় তার *অবস্থান* নয়তো তার *গতি* নিরূপণ করতে পারবেন—কিন্তু একই সঙ্গে দুটি করা অসম্ভব। আর তা যদি না করতে পারেন, তাহলে তার গতিপথ সম্পর্কে কোনও ভবিষ্যদ্‌বাণী করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি যদি পরমাণুকণার অবস্থান জানেন, তাহলে তার গতি সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারবেন না। কথাটা বিপরীত দিক থেকেও সত্য। যাই হোক, তত্ত্বটি আবিষ্কার করে হেইজেনবার্গ সঙ্গে সঙ্গেই তা ছাপেননি। অধ্যাপক কাপরার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় তিনি তাঁর আবিষ্কারের কথা বলেছিলেন; এও বলেছিলেন যে, প্রথমটায় আবিষ্কারটি তাঁর নিজের কাছেই বিদ্‌ঘুটে মনে হয়েছিল। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তা ছাপতে চাননি। তারপর কাপরা তাঁর *Uncommon Wisdom* (পৃঃ ৪২-৪৩)-এ যা লিখেছেন, তা অতি বিস্ময়কর। তিনি লিখছেন ঃ

'১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিথি হয়ে হেইজেনবার্গ কিছুদিন ভারতবর্ষে কাটান। সে সময়ে বিজ্ঞান এবং দর্শন বিষয়ে কবির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে হেইজেনবার্গ প্রভূত শান্তি পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেন... টেগোরের সঙ্গে এসব কথাবার্তার পর, যেসব চিন্তাভাবনাগুলিকে তিনি উদ্ভট মনে করে আসছিলেন, সহসা যেন তারা অর্থবহ হয়ে উঠলো। ঐ আলোচনা আমাকে [হেইজেনবার্গকে] খুব সাহায্য করেছে।'

ব্যাপারটা একবার কল্পনা করুন! তাই পাশ্চাত্যে ফিরেই তিনি মনস্থির করলেন যে, তাঁর ঐ 'বিদ্‌ঘুটে অনিশ্চয়তা তত্ত্বটি' তিনি প্রকাশ করবেন! এইভাবে যতই আমরা গভীরে ঢুকব ততই আমরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্যের সন্ধান পাব এবং অবশেষে যাকে আমরা সূক্ষ্মতম সত্তা বা আত্মা বলি তার মুখোমুখি হব। পাশ্চাত্যের মননশীল মানুষের কাছে ধীরে ধীরে এই সত্য উন্মোচিত হচ্ছে। আত্মার কথা বলতে গিয়ে উপনিষদ্ বলছেন, আত্মা 'সূক্ষ্মের চেয়েও সূক্ষ্ম'—তার চেয়ে সূক্ষ্ম আর কিছু হতে পারে না। কঠোপনিষদে (১/২/২০) বলা হয়েছে ঃ

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্;
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।

কী অসাধারণ শ্লোক এটি! পাশ্চাত্যের মানুষ যখন এইসব কথা শোনেন, যখন এসব তত্ত্বকথা তাঁদের কাছে কেউ ব্যক্ত করেন, তখন তাঁরা মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। যাঁরা রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা। যাঁরা প্রকৃতই বিজ্ঞানমনস্ক, তাঁরা খোলা মনের মানুষ। অতএব যাঁদের মনের দরজা-জানলা খোলা, তাঁরা আত্মার কথা, আত্মার বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হন। আত্মা কীরকম? বলা হচ্ছে—*অণোরণীয়ান্,* 'অণুর থেকেও ছোট'; আবার *মহতো মহীয়ান্,* 'সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও বড়'; *আত্মা অস্য জন্তোঃ নিহিতো গুহায়াম্,* 'এই আত্মা *জন্তু,* অর্থাৎ সাধারণ জীবের হৃদয়ে লুকিয়ে আছেন'। এ কথার কী গভীর ব্যঞ্জনা! সাধারণ বই আমরা সচরাচর যেভাবে পড়ে থাকি সেইভাবে যদি শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ি, তাহলে হবে না। কারণ শাস্ত্র সব গভীর অথচ অনুভবগম্য কথা বলছেন। প্রাচীন ঋষিরা এইসব সূক্ষ্ম সত্য উপলব্ধি করেছিলেন; তাই আমরাও তা উপলব্ধি করতে পারি।

তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *সূক্ষ্মত্বাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ং,* 'অতি সূক্ষ্মতার দরুন তা [আত্মা] অবিজ্ঞেয়, তাঁকে জানা যায় না।' *জ্ঞেয়* মানে 'যে বস্তুকে জানা যায়'। *বিজ্ঞেয়ং* মানে *বিশেষত জ্ঞেয়ং,* 'বিশেষভাবে জানা'। *অবিজ্ঞেয়ং* মানে কোনওভাবেই যা 'জানা সম্ভব নয়'। *দূরস্থং,* অর্থাৎ 'অতি দূরবর্তী'; *চ অন্তিকে চ তৎ,* 'তা আবার কাছেও'। দূরে আবার কাছে! একই বস্তু একই সঙ্গে দূরে আবার কাছে থাকে কী করে? এই জন্যই হেইজেনবার্গ রহস্য করে 'crazy' বা উদ্ভট শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সাধারণ যুক্তির দিক থেকে এগুলি উদ্ভট চিন্তাই বটে। ন্যায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হলো, কোনও বস্তুর একই সঙ্গে দুটি

পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি থাকতে পারে না। কোনও কিছুই তার বিপরীত হতে পারে না—হয় এটা হতে হবে, নয় ওটা; একই সাথে দুটি হওয়া চলে না। বেশ ভালো কথা। কিন্তু আপনি যখন সত্যের সূক্ষ্মতম পর্যায়ে এসে পৌঁছবেন, তখন ন্যায়ের এই নীতি কাজ করবে না। উপনিষদের *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য*-এ একথা বলা হয়েছে। সত্যি কথা—অনুভূতির গভীরতম স্তরে ন্যায়ের এই সূত্র বিলকুল অকেজো। কারণ কার্য-কারণ সম্পর্কই যুক্তির মূল ভিত্তি; কিন্তু হেইজেনবার্গ যখন পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণার পর্যালোচনা করেন, তখন এই যুক্তি সেখানে মুখ থুবড়ে পড়ে। সাধারণত আমরা কার্য এবং তার কারণ, এ ব্যাপারটা বুঝি। আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ সব জ্ঞানই এই কার্য-কারণ তত্ত্বের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এখানে সূক্ষ্ম বস্তু বিচারের ক্ষেত্রে ঐ কার্য-কারণ সম্পর্কটি বিপর্যস্ত হয়। এই কারণেই সব যুক্তিতর্কের পারে গিয়ে, বুদ্ধিকে অতিক্রম করে অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করতে হয়। এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্তমান অধ্যায়ের এই শ্লোকটিতে বলা হচ্ছে, *দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ*, 'তিনি একই সঙ্গে দূরে, আবার কাছেও'। বিশ্বের সব অতীন্দ্রিয়বাদীরাই—তাঁদের মধ্যে খ্রিস্টান ও সুফি সাধকেরাও আছেন—এই অদ্ভুত সত্য অনুভব করেছেন এবং অনুভব করে সেই আপাত—'বিদ্‌ঘুটে' সত্যকে সকলের কাছে ব্যক্তও করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ ঐ সূক্ষ্ম সত্য বুঝবে কী করে? তাই গোঁড়া মুসলমানরা বহু সুফি সাধককে হত্যা করেছে। খ্রিস্টান চার্চের গোঁড়া সমর্থক যারা, তারাও সেই চেষ্টা করেছে। হেইজেনবার্গ ধর্মজগতের মানুষ ছিলেন না বলে রেহাই পেয়েছেন, নইলে গোঁড়ার দল তাঁকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হতো না। বিজ্ঞানী ছিলেন, তাই তাঁকে কেউ ঘাঁটায়নি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কট্টরপন্থী ধর্মগুলোর বিপদ হচ্ছে এই যে, সেখানে বাঁধাধরা, ছকে দেওয়া একটি মাত্র পথই খোলা আছে—আপনাকে সেই পথই অনুসরণ করতে হবে। একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া সর্বত্রই এই দশা! ভারতে যত 'বিদ্‌ঘুটে' অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাই আপনার হোক না কেন, তা নিয়ে কেউ আপত্তি তোলে না; তা বোঝবার বা গ্রহণ করার মানসিকতা আমাদের আছে। আমরা খুব ভালো করেই জানি, সত্তার যত গভীরে আপনি প্রবেশ করবেন, ততই আপনার সামনে তার 'বিদ্‌ঘুটে' বিস্ময়কর দিকগুলি উন্মোচিত হতে থাকবে। এই জন্যই ভারতীয়রা অতীন্দ্রিয়বাদীদের হত্যা তো করেই না, উল্টে তাঁদের শ্রদ্ধা করে। কিন্তু খ্রিস্টান ও সুফি মরমিয়া সাধকদের অনেকেই সেই সম্মান পাননি—গোঁড়ারা তাঁদের হত্যা করেছে। মিস্টিসিজম্ বা মরমিয়াবাদের ওপর ইভলীন

আন্ডারহিল (Evelyn Underhill)-এর লেখা বিখ্যাত একটি গ্রন্থ আছে। সেখানে সূসো (Sūso) নামক এক খ্রিস্টান অতীন্দ্রিয়বাদী বলছেন ঃ 'সেই নামহীন অবর্ণনীয় বস্তুটি এতই বিশাল যে তাকে ঈশ্বর বলা যায়, আবার তা আমারই মতো নগণ্য, অতি ক্ষুদ্র।' এখানেও লক্ষ্য করে দেখুন, সেই আপাতবিরোধী হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষা!

আমরা ইন্দ্রিয়ের স্তরেই যেন বেঁচে আছি, মনে করি তাতেই আমাদের সর্বোত্তম সুখ। কিন্তু এই স্তরের যে জ্ঞান, আনন্দ ও সুখ তা ঊর্ধ্বতর স্তরের আনন্দের তুলনায় কিছুই নয়। এটি বেদান্তের মহত্তম ঘোষণা। তাই দেখা যায়, বিরল প্রতিভাবান কিছু মানুষ সেই দিকে গিয়ে মহত্তম আনন্দের অন্বেষণ করেন। একমাত্র মানুষই এই আধ্যাত্মিক আনন্দলাভের অধিকারী। অন্য জীবজন্তুর পক্ষে এই অনুভূতি লাভ করা সম্ভব নয়; কারণ দেহ তথা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেই তারা বাঁধা পড়ে আছে। একমাত্র আমরাই ইন্দ্রিয়তন্ত্র থেকে নিজেদের বিযুক্ত করতে পারি; সে শক্তি আমাদের আছে এবং সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা মহত্তর অনুভূতি করায়ত্ত করতে পারি।

উপনিষদের ঋষিরা তাই করেছিলেন—সেটিই তাঁদের মহৎ কীর্তি। এ বিষয়ের খুঁটিনাটি সব দিক তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করে, সত্য কি তা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সত্যের এই সামগ্রিক রত্নভাণ্ডারটি, যাকে আমরা 'শ্রুতি' বলি, তুলে দিয়ে গেছেন আমাদের হাতে। এই 'শ্রুতি'-র প্রামাণ্যতা অনস্বীকার্য কারণ তার ভিত্তি প্রত্যক্ষ অনুভূতি, যে অনুভূতি চাইলে আপনিও যাচাই করে নিতে পারেন; আপনি নিজেও সেই সত্য অনুভব করতে পারেন। এখানেই শ্রুতির জোর, এখানেই তার প্রাসঙ্গিকতা। এই কারণেই শ্রুতি এতো বিজ্ঞানধর্মী।

আমি এই কথাটিকে বিশেষভাবে এত জোর দিয়ে বলছি এই জন্য যে, আমরা এখন বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। প্রতিদিনই আমাদের সামনে সত্যের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। এমনকি জীববিজ্ঞান এবং প্রজননবিদ্যার যত গভীরে আমরা প্রবেশ করছি, সেখানেও সত্যের অতি সূক্ষ্মদিকগুলি আমাদের চোখে পড়ছে। আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই যখন জীববিজ্ঞানের দৃষ্টি চেতন বস্তুর গভীরতর স্তরে গিয়ে অনুসন্ধান চালাবে, তখন ঈশ্বরই জানেন, আরো কত নতুন নতুন আবিষ্কারই না সম্ভব হবে! আমি বরাবরই বলে এসেছি যে, 'মলিকিউল' বা অণুই ক্ষুদ্রতম বস্তুসত্তা নয়। অণুর পিছনে সূক্ষ্মতর যে

সত্তাটি আছে তা হলো পরমাণু বা 'এ্যাটম্'। আজকের আণবিক জীববিদ্যা এখনও সেই পারমাণবিক স্তরে পৌঁছতে পারে নি। কিন্তু যেদিন পদার্থবিজ্ঞানের মতো জীববিদ্যাও আণবিক স্তর অতিক্রম করে সত্তার আরো সূক্ষ্মতর ভূমিটি স্পর্শ করবে, সেদিনের সেই গবেষণার ফলে আরো কত মূল্যবান সব আবিষ্কার হবে! এবং তখনই বেদান্তের সত্যগুলি বিজ্ঞানের সাহায্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। স্বামীজী সেইজন্যই বলেছিলেন ঃ "হিন্দু যুগ যুগ ধরিয়া যে-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে, সেই ভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নূতনতর আলোকে আরও জোরালো ভাষায় প্রচারিত হইবার উপক্রম দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইতেছে।"[১]

বাস্তবিক, বেদান্ত বিজ্ঞানকে ভয় করে না, কারণ বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে তারই লাভ। বেদান্ত যা চিরকাল সত্য বলে ভেবে এসেছে, বিজ্ঞান আজ তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি এই হলো বেদান্তের মনোভাব। পাশ্চাত্যে কিন্তু তা নয়। সেখানে খ্রিস্টীয় ঈশ্বরতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে কখনও উৎসাহিত তো করেইনি, বরং তার রাশ টেনে তাকে থামানোর চেষ্টা করেছে। এমনকি কিছু বৈজ্ঞানিককে হত্যা করতেও সে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু তা হলে কি হয়, সত্য শক্তিমান; সে প্রকাশ পাবেই। আমাদের মুণ্ডক উপনিষদ্-এ তাই বলা হয়েছে—*সত্যমেব জয়তে,* 'একমাত্র সত্যই জয়ী হয়'। তাই দেখা গেলো, কয়েকটি সুপরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্যের ধাক্কাতেই খ্রিস্টধর্মের ভিত্তিহীন মতবাদগুলি ধরাশায়ী হলো। এতো গেলো পাশ্চাত্যের অবস্থা। হিন্দুধর্ম কিন্তু বিজ্ঞানের বিরোধী নয়। আমরা বিজ্ঞানকে চাই; বিজ্ঞানের যত অগ্রগতি হয় ততই আমাদের আনন্দ। আমাদের এখনও অনেক কিছু আবিষ্কার করতে হবে। আমাদের ঋষিরা আপন আপন অনুভূতির আলোকে এই আবিষ্কারের সাধনাই করে গেছেন, দিয়ে গেছেন নানা অমূল্য ইঙ্গিত, বহু মূল্যবান সংকেত। আধুনিক বিজ্ঞানের বহুমুখী আবিষ্কারের ফলে সেই সব সংকেতের ভিত্তি যে আরো সুদৃঢ় হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

পরের শ্লোকগুলিও সমান সুন্দর এবং গভীর অর্থবহ যা আমাদের অনুধ্যানে উদ্বুদ্ধ করে এবং তা যদি আমরা করি তাহলে সূক্ষ্ম সত্যের অন্তত কিছুটা স্পন্দনও আমাদের কাছে আসবেই। এই অধ্যায়ের এটিই সৌন্দর্য। আগের অধ্যায়গুলির মধ্যে একমাত্র সপ্তম অধ্যায় ছাড়া আর কোথাও আমরা এত

---

১ বাণী ও রচনা, ১খণ্ড, পৃঃ ১৮

গভীর বিজ্ঞানসম্মত উপস্থাপনার সম্মুখীন হইনি। এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৩, ১৪ এবং ১৫ সংখ্যক শ্লোকে যে চরম সত্য বা সত্তার কথা বলা হয়েছে, যা এই বিশ্বের একমাত্র উৎস এবং যা আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম, তা এতক্ষণ আলোচনা করা হলো। পরবর্তী দুটি শ্লোকেও দেখব শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যে সেই একই সুর ঝংকৃত হচ্ছে।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ।। ১৬।।

—'অবিভক্ত হয়েও যেন বিভক্তরূপে সর্বভূতে তিনি অবস্থান করেন; তাঁকে সর্বভূতের পালক, সংহারক ও সৃষ্টিকর্তা বলে জানতে হবে।'

আপনি, আমি, এখানে সবকিছু আলাদা আলাদা, বহুভাবে বিভক্ত। কিন্তু ব্রহ্ম *অবিভক্তং*, 'অখণ্ড'; *ভূতেষু বিভক্তম্ ইব চ স্থিতম্*, 'সবকিছুর মধ্যে যেন বিভক্ত হয়ে অবস্থান করছেন'। এই শ্লোকটি উপনিষদের প্রতিধ্বনি করে বলছেঃ সমস্তকিছুই সেই ব্রহ্ম থেকে এসেছে, তাঁতেই অবস্থান করছে এবং প্রলয়কালে তাঁতেই ফিরে যায়। পরের শ্লোকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলা হচ্ছেঃ

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ।। ১৭।।

—'সেই জ্যোতি সকল জ্যোতিরও জ্যোতি; বলা হয় তিনি সকল অন্ধকারের অতীত; (তিনি) জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানের লক্ষ্য (এবং) সকলের হৃদয়ে বাস করেন।'

এই যে *জ্ঞেয় বস্তু*, যাঁকে আত্মা বা ব্রহ্ম বলা হয়, তিনি *জ্যোতিষাম্ অপি তৎ জ্যোতিঃ*, 'সকল জ্যোতিরও জ্যোতি'। এ জগতে যতরকমের আলো আমরা দেখতে পাই, সে সবই আসছে আত্মা বা ব্রহ্মের আলো থেকে। তাই তাঁকে 'সকল জ্যোতির জ্যোতি' বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এ নিয়ে অসাধারণ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছে। অন্যান্য উপনিষদ্‌গুলিতে, বিশেষত কঠ উপনিষদেও, এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই যে অদ্বয়, পরম শুদ্ধচৈতন্য, যাঁকে আমরা আত্মা বলছি, তাঁকে কীভাবে বর্ণনা করা যায়? কঠ উপনিষদের (২/২/১৫) বর্ণনাশৈলীটি একবার লক্ষ্য করুনঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

'সেই স্বপ্রকাশ আত্মাকে সূর্য আলোকিত করতে পারে না, চন্দ্রও না, তারকারাও না, বিদ্যুৎও না, গৃহের এই সাধারণ অগ্নির আর কথা কি! আত্মা দীপ্তিমান বলেই এইসব আলোকিত। তাঁর আলোতেই সমগ্র বিশ্ব বিভাসিত।'

তস্য ভাসা, 'তাঁর *ভাসা*', অর্থাৎ আলোয়; *ইদং সর্বম্*, 'এই সমস্ত ব্যক্ত জগৎ'; *বিভাতি*, 'আলোকিত'। আত্মাকে তাই বলা হচ্ছে *জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ*, 'সকল জ্যোতির জ্যোতি'। আমাদের কাছে আলোর একটি উৎস হলো সূর্য। কিন্তু সেই সূর্যালোকও আত্মার আলো থেকে উদ্ভুত—আত্মার আলোই সূর্যের ভিতর দিয়ে, বস্তুত আলোর প্রতিটি উৎস দিয়েই বিচ্ছুরিত হচ্ছে। একমাত্র শুদ্ধচৈতন্যই আপন স্বরূপে দীপ্তিমান। বাকি সবকিছুই জড় বস্তু—নির্জীব এবং নিষ্প্রাণ। অতএব সব আলোই আত্মার, যাঁর স্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য। শুদ্ধ চৈতন্য সর্বদাই আলোক, আপন স্বরূপে দীপ্তিমান এবং তিনি জড় স্থূলবস্তুগুলিকেও আলোকিত করতে পারেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ-এ একটি অসামান্য উক্তি আছে ঃ *যস্য তেজসা বিদ্ধঃ সূর্যো তপতি*, 'আত্মার আলোয়', ব্রহ্মের তেজে 'সমৃদ্ধ হয়ে এই সূর্য আলোক বর্ষণ করে'। শুরু থেকেই ঋষিরা একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছিলেন। প্রশ্নটি এই—জগৎ যে-আলোয় আলোকিত তার প্রকৃত উৎসটি কী? *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*-এর একটি গোটা অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। প্রশ্ন এই—'কীভাবে আপনি বেঁচে আছেন, কাজকর্ম করছেন? কোন্ আলোর সাহায্যে?' এখনকার মানুষ আমরা বলবো, 'কেন, ইলেকট্রিক আলোয়, টর্চের আলোয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।' কিন্তু আমরা একবার ভেবেও দেখিনা যে এই সব আলোর শক্তি সূর্যের কাছ থেকেই নেওয়া। তাই, শেষপর্যন্ত সৌরশক্তিরই দ্বারস্থ হতে হয় আমাদের। কিন্তু তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যায়—সৌর শক্তির পিছনে কোন্ শক্তি কাজ করছে? তার উত্তরে *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্* (৪/৩/৬) বলেছেন, *আত্মনৈব অয়ং জ্যোতিষা তে পল্যয়তে, কর্ম কুরুতে*, 'আত্মার আলোতেই আমরা অস্তিত্ববান, চলাফেরা ও কাজকর্ম করি।' শুধু এই সত্যটি আমরা জানি না, এই যা। কিন্তু কেন জানি না? তার কারণ এই, চোখের সামনে যেসব আলো

জ্বলছে, সেগুলি স্থূল; তাই সেগুলি সম্পর্কে আমরা সচেতন। কিন্তু এই আত্মার আলো এত সূক্ষ্ম যে সহজে তা দেখা যায় না, তাই তার সম্পর্কে আমরা জানতেও পারি না। ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম ঃ সৌরশক্তি পরিমাণের দিক থেকে নক্ষত্রগুলির তুলনায় অতি নগণ্য। কিন্তু সূর্য ওঠামাত্রই তারা যেন দৃষ্টিপথ থেকে মুছে যায়। তখন আর তাদের আমরা দেখতে পাই না। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের চারপাশের ক্ষুদ্র আলোগুলো, তার মধ্যে আমাদের সীমিত বুদ্ধিও পড়ে, আত্মার আলোটিকে যেন ঢেকে দেয়। তাই আমরা জীবনধারণের জন্য অন্যান্য আলোর মহিমা কীর্তন করে থাকি। কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি টের পান যে, এইসব ছোটখাট আলোর উৎস অন্য আর একটি বস্তু এবং যখন সেই 'অন্য আর একটি বস্তুর' সন্ধান আপনি করবেন, তখন দেখতে পাবেন—এই বিশ্ব ঈশ্বরের আলোয় উদ্ভাসিত, তিনিই সবকিছু আলোকিত করে রেখেছেন। সূর্যই বলুন, আর নক্ষত্রমণ্ডলীই বলুন, সব আলোর উৎপত্তি-মূল হলেন ব্রহ্ম, যিনি জ্যোতির জ্যোতি। এই আত্মজ্যোতি সম্পর্কে তাই শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে বলছেন, *জ্যোতিষাম্ অপি তৎ জ্যোতিঃ।* তমসঃ পরম্ উচ্যতে, 'বলা হয়, তিনি সকল অন্ধকারের ঊর্ধ্বে'। ব্রহ্মে অন্ধকারের লেশমাত্র নেই—তিনি শুদ্ধ জ্যোতি—*তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বিভাতি,* 'তাঁর আলোয় সমগ্র বিশ্ব বিভাসিত'। ঈশ্বরকে তাই জ্যোতি বা আলো বলা হয়েছে। সচরাচর আলো বলতে আমরা [প্রদীপ, মোমবাতি, ইলেকট্রিক লাইট বা সূর্যের আলোর মতো] জড়, স্থূল আলোই বুঝি। কিন্তু বুদ্ধির আলোও তো আলো! আর আত্মার এই আলো হলো একেবারে শুদ্ধ চৈতন্যের দীপ্তি। সেই আলো যে কেবল বাইরের প্রকৃতিতেই আছে তা নয়, সর্বত্রই আছে, বিশেষ করে মানুষের মধ্যে, কারণ সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি সেই অখণ্ড জ্যোতি থেকেই। আমাদের মতে, বিশুদ্ধ চৈতন্যের আলোক থেকেই এই বিশ্বের উন্মেষ। বেদান্তের ভাষায় বলা যায় যে, বিশ্বের প্রতিটি শক্তিই সেই শুদ্ধ চৈতন্যের যে আলো, তার বাহ্য রূপান্তর। আধুনিক নভোবস্তুবিদ্যাও অনেকটা বেদান্তের সুরেই কথা বলতে শুরু করেছে। আগামী পঞ্চাশ বছরে আরো অনেক কিছু ঘটে যাবার সম্ভাবনা। কারণ এই যে সব মহত্তম উপলব্ধি ও অনুভূতিপ্রসূত সত্য উপনিষদ্ সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছে, তা ধরা পড়েছিল উন্নত চরিত্র, বুদ্ধিমান ও ঊর্ধ্বরেতা ঋষিদের ধ্যানে, স্নায়ুরোগাক্রান্ত দুর্বল মানুষের কল্পনায় নয়।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং, 'জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞানের লক্ষ্য'; এই তিনটিকে আমরা কোথায় পাবো? *হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্,* 'সকলের হৃদয়ে

অধিষ্ঠিত'। *জ্ঞান, জ্ঞেয়ং এবং জ্ঞানগম্যং*—এই তিনটিই আপনার হৃদয়ে রয়েছে। দূরে নয়, আপনার অতি নিকটেই আছে। জার্মান অতীন্দ্রিয়বাদী মেইস্টার একহারট (Meister Eckhart) বলছেন—আমি আমার যতটা কাছে, ঈশ্বর তার চেয়েও অনেক বেশি কাছের। কাঠ বা পাথর—ঈশ্বর তাদেরও ঘনিষ্ঠ, কিন্তু তারা তা জানে না, সেই সত্য বুঝতে পারে না। একমাত্র মানুষেরই সে ক্ষমতা আছে, মানুষই কেবল সেই সত্য উপলব্ধি করতে পারে। ত্রয়োদশ শতকের এই একহারট পুরোদস্তুর অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং সেই কারণেই ক্যাথলিক যাজকদের বিচারসভায় ধর্মগত অপরাধের জন্য তাঁকে তলব করা হলো। বলা হলো—'আসুন। আপনার ধর্মসংক্রান্ত মতামত আমরা যাচাই করে দেখতে চাই।' একহারট-এর কপাল ভালো ছিল; বিচার শুরু হওয়ার আগেই তিনি চোখ বুঁজেছিলেন। না হলে তাঁকে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হতো! তাঁর দোষ? তিনি গভীর উপলব্ধির কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ ব্যক্তি-ঈশ্বর বা সাকার ভগবান সত্য, কিন্তু তারও পারে গেলে দেখা যাবে ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক, অর্থাৎ নিরাকার। নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরকে বোঝানোর জন্য তিনি একটি নতুন শব্দ ব্যবহার করেছেন—Godhood। প্রথমটি ভগবান, কিন্তু দ্বিতীয়, অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক বা Impersonal সত্তাটি Godhood। বেদান্তে যেমন সগুণ ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্ম-এর কথা আছে, সেই কথাই আর কি!

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্, অর্থাৎ 'তিনি সকলের হৃদয়েই অধিষ্ঠিত আছেন'। বেদান্ত মানুষকে কী উচ্চ আসনই না দিয়েছে! বেদান্ত বলে, এই দেহ-মনের পিছনে এক গভীর ও মহামূল্যবান সত্য রয়েছে, শুধু তা আমরা জানি না। জানার চেষ্টা করলে আমাদেরই মঙ্গল। আমাদের দেশের মরমিয়া সিদ্ধ সাধকেরা নানা ভাষায় এই সত্যের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাজস্থানের মরমিয়া কবি-সাধিকা মীরাবাঈ যেমন তাঁর একটি গানে বলেছেন, 'রামরতন ম্যায়নে পায়ো'। অর্থাৎ 'আমার হৃদয়ে রামরূপ রত্নটিকে আমি পেয়েছি।' অন্যান্যরাও তাঁদের আপন আপন ভাষায় একই উপলব্ধির কথা বলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে-ভগবান আমাদের ভিতরেই লুকিয়ে আছেন, তাঁর প্রচণ্ড শক্তির কথা আমরা জানি না এবং জানি না বলেই সুখের সন্ধানে আমরা যত্রতত্র ঘুরে মরছি। অথচ পরম সত্য 'এখানেই', অর্থাৎ আমাদের ভিতরেই রয়েছে! এটিই বেদান্তের মূল শিক্ষা। বৈদান্তিক শিক্ষার সারাৎসার দিতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম যে কথাটি বললেন (*কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ*, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১২৪) তা হলো 'Each soul

is potentially divine', অর্থাৎ জীব স্বরূপত ঈশ্বর। স্বামীজী পর পর যে কথাগুলি বললেন, তা এই ঃ

- 'প্রত্যেক জীবই অব্যক্ত ঈশ্বর।'
- 'আমাদের লক্ষ্য সেই অন্তর্নিহিত দেবত্বকে ব্যক্ত করা'; (কেমন করে?) 'বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।' (অন্তঃপ্রকৃতিও আছে; আমাদের ক্রোধ, অহংকার, দর্প এবং আসক্তি—এগুলো আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে জয় করতে হবে; সেইসঙ্গে বাইরের প্রকৃতিকেও।)
- 'এগুলি কর ... এবং মুক্ত হয়ে যাও।' (অর্থাৎ এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারলে তুমি মুক্ত।)
- 'ধর্মীয় মতবাদ, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মগ্রন্থ, মন্দিরাদি অথবা মূর্তি—এগুলি সবই গৌণ'। আসল কথা বা মুখ্য ব্যাপার হলো—আপনি কি আপনার অন্তর্নিহিত দেবত্বকে প্রকাশ করতে পারছেন? তা যদি পারেন, তাহলে যে উপায়ই আপনি অবলম্বন করুন না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। এইভাবে কয়েকটি কথায় স্বামীজী বেদান্তের সামগ্রিক শিক্ষাটি বলে দিয়েছেন।[১]

সকল জীবের হৃদয়েই ঈশ্বর আত্মগোপন করে আছেন—এই সত্যই সব উপনিষদ্ ঘোষণা করে আসছে। কঠ উপনিষদ্-এ বলা হয়েছে (১/৩/১২)

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো আত্মা ন প্রকাশতে।

অর্থাৎ, 'এই আত্মা প্রত্যেক জীবের ভিতরেই আছেন, তবে লুকিয়ে'। তাঁকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে এবং তা করতে গেলে প্রচণ্ড মনোবল গড়ে তোলা দরকার—এ যেন অনেকটা মাউন্ট এভারেস্টে ওঠার মতো। অতি দুর্গম পথ, তাই সাহস চাই। কঠ উপনিষদ্ বলছেন, *ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া* (১/১/১৪), এ যেন 'ধারালো ক্ষুরের ওপর দিয়ে চলা'। এই আত্ম-সত্য বুঝতে গেলে মনটিও খুব সূক্ষ্ম হওয়া চাই। সব উপনিষদেরই এই এক সুর। উপনিষদের এই বাণীর আলোকেই এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন তথা আমাদের সবাইকেই শিক্ষা দিচ্ছেন। শেষে বলছেন ঃ

---

১ তুলনীয়, বাণী ও রচনা, ১ খণ্ড, পৃঃ ১৬০

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮॥

—'এইভাবে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-র [কথা] সংক্ষেপে বলা হলো। এই [তত্ত্বের কথা] জেনে আমার ভক্ত আমার স্বরূপলাভের যোগ্য হন।'

উক্তং সমাসতঃ, 'আমি সংক্ষেপে বলেছি'; *ক্ষেত্র,* অর্থাৎ 'শরীর'; *জ্ঞান,* 'জ্ঞান'; এবং *জ্ঞেয়,* 'জ্ঞানের বিষয়' বা লক্ষ্য, অর্থাৎ পরমাত্মা সম্পর্কে। এই তিন তত্ত্বের কথাই আমি সংক্ষেপে বলেছি। *মদ্ভক্তঃ,* 'আমার ভক্ত'; *এতৎ বিজ্ঞায়,* 'এই সমস্ত জেনে', অর্থাৎ এই তিনটি তত্ত্ব জেনে; *মদ্ভাবায় উপপদ্যতে,* 'আমার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন।' কারণ, দেহ, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়টি যথার্থভাবে জানলে, যাবতীয় সত্যই উপলব্ধি করা হলো। দেহটি কেবল একটি আধার। তার মধ্যে বহুমূল্য বস্তু সব গচ্ছিত আছে; আবার কিছু নিকৃষ্ট জিনিসও আছে। দেহের গভীরতম স্তরে নিহিত আছে দিব্য স্ফুলিঙ্গ, তার জন্যই দেহের এত মূল্য। মনে করুন একটা কৌটোয় অমূল্য একটি রত্ন আছে; কৌটোটি সাধারণ, কিন্তু ভেতরে ঐ মহার্ঘ রত্নটি থাকায় ওর দাম বেড়ে গেছে। দেহটাও ঐ কৌটোর মতো—তাকে বলা হচ্ছে *ক্ষেত্র* । এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই শ্রীকৃষ্ণ ক্ষেত্রর কথা বলেছেন। *ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে,* 'হে অর্জুন, এই শরীরকে *ক্ষেত্র* বলা হয়', যে-ক্ষেত্রে তুমি কর্মের বীজ বপন করো এবং কর্মফল ভোগ করো। এই কারণেই দেহকে *ক্ষেত্র* বলা হয়। কিন্তু এই দেহের ভিতরেই একজন আছেন যিনি এই ক্ষেত্রটিকে জানেন, একে বুঝতে পারেন; তাঁকেই *ক্ষেত্রজ্ঞ* বলা হয়েছে। অতএব, দুটি জিনিস পাচ্ছি—*ক্ষেত্র* এবং *ক্ষেত্রজ্ঞ* । এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভৌতবিজ্ঞান কেবল *ক্ষেত্রকেই* বুঝতো। *ক্ষেত্রজ্ঞর* জন্য বিজ্ঞানীদের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু আজ পরমাণু বিজ্ঞান *ক্ষেত্রজ্ঞ-র* গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। তাই বিজ্ঞানীদের মুখে 'অবজারভার' (পর্যবেক্ষক) ও 'অবজারভড্' (পর্যবেক্ষিত) এই শব্দ দুটি এখন খুব শোনা যাচ্ছে। এতকাল তাঁরা 'পরিলক্ষিত তথ্য' নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। পরিলক্ষিত তথ্য হলো জগৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। সেই জ্ঞানে পর্যবেক্ষক বা নিরীক্ষককে তেমন কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এখন কিন্তু তাঁরা বলছেন, না, পর্যবেক্ষিত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকেরও এক মস্ত ভূমিকা আছে। কেবল পর্যবেক্ষিত বস্তু থেকেই জ্ঞান আসতে পারে না; জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষকও অংশগ্রহণ করেন। তাই পর্যবেক্ষককে

'participator' বা অংশগ্রহণকারী বলা হচ্ছে, কারণ বিজ্ঞানী ও তাঁর মন পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান-উদ্ভাবনে অংশ নিচ্ছেন। দৃষ্টিভঙ্গির কী অসাধারণ পরিবর্তন! তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে *ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ* এবং *জ্ঞেয়,* অর্থাৎ পরম সত্তার কথা বলেছেন। এই অধ্যায়ের শুরুতেই তিনি আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছিলেন ঃ 'সব ক্ষেত্রর মধ্যে আমাকে *ক্ষেত্রজ্ঞ* বলে জেনো। আমিই সব ক্ষেত্রে একমাত্র *ক্ষেত্রজ্ঞ*।' পর্যবেক্ষক বা 'দ্রষ্টা' একজন; কিন্তু 'পর্যবেক্ষিত' বস্তু বা দৃশ্য বহু। যেহেতু আপনি খণ্ড দৃষ্টিতে, বিভিন্ন বস্তুর মাধ্যমে তাঁকে দেখছেন, তাই তিনি বহু বলে প্রতিভাত হচ্ছেন। পরমাণুবিজ্ঞানী শ্রোডিংগার (Schrodinger) তাঁর *What is Life* নামক গ্রন্থে বিষয়টিকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছেন, 'চৈতন্য একবচন, তার বহুবচন হয় না'। বিজ্ঞানীর ভাষাটি লক্ষ্য করুন! সংস্কৃতে যাকে চিৎসত্তা বা চৈতন্য বলা হয়, বাস্তবিক, সেটি এক ও অখণ্ড। বহু চৈতন্য অকল্পনীয়। চৈতন্যকে এইভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু আপনি যদি ভাবেন, কেন, এই তো এত চেতন মানুষ, এত চেতন জীবজন্তু দেখছি; অতএব চৈতন্য বহু না হয়ে পারে না—তাহলে তার উত্তরে বলতে হয় যে, চৈতন্যকে বহু বলে ভ্রম হওয়ার কারণ চৈতন্য বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য এক ও অবিভাজ্য—কখনওই বহু নয়, যা শ্রোডিংগার তাঁর চরম বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন। এই হলো বেদান্ত, যা জ্ঞানের প্রকৃতি নিয়ে বহু গবেষণা করে পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, অনন্ত বিশুদ্ধ চৈতন্য এক ও অদ্বিতীয়।

আগেও বহুবার বলেছি যে, সৌরজগতের যাবতীয় শক্তি সৌরশক্তিরই প্রকাশ। জগতের বস্তুগুলি বাইরে থেকে পৃথক মনে হলেও একই সৌরশক্তির বিভিন্ন রূপ। সৌরশক্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। এইভাবে, পরিশেষে শ্লোকটির উপসংহারে বলা হয়েছে, *ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ,* 'আমি তোমাকে এইভাবে *ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়* সম্পর্কে সংক্ষেপে বললাম।' এই সত্য উপলব্ধি করলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে এবং আমার স্বরূপলাভ করবে। *মদ্ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায়,* 'আমার ভক্ত এই সত্য উপলব্ধি করে'। কোন্ সত্য? ভক্ত উপলব্ধি করেন যে, তার দেহের মধ্যেই শাশ্বত আত্মা বিরাজ করছেন। এবং তার ফলে, *মদ্ভাবায় উপপদ্যতে,* 'আমার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়।' মানুষের কী বিপুল মহিমা! তার ভিতর যে কেবল অনন্ত, অসীম সত্তা বিরাজমান, তাই নয়, একমাত্র সেই এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে। সেই সামর্থ্য তার আছে। প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্ত বস্তুর মধ্যে এখানেই মানুষের অনন্যতা।

বিবর্তনের পরের পর্যায়টি হলো এই সত্যটি আবিষ্কার করে তা উপলব্ধি করা। এখন তা কেবল এক সম্ভাবনা। একথা আমাদের বুঝতে হবে যে, বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়টি জৈবিক নয়; প্রযুক্তিগত উন্নতি অথবা শিল্পায়নের মাধ্যমে তা কখনই ঘটবে না। কিন্তু মানুষ কি এই সত্যটি বোঝে? সে কি অন্তরের অন্তঃস্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সেই সত্য উপলব্ধি করার অভিলাষী? সে চেষ্টা কি সে করছে? তা যদি করে, তবে সেটিই হবে প্রগতিমূলক বিবর্তন। যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সত্যের অন্তত কিছুটাও অনুভব করতে পারে তাহলে বিশ্বের চেহারাটাই বদলে যাবে। এই হলো বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের দেশের কথাই ধরুন না কেন। যদি এ দেশের দশ শতাংশ মানুষও স্বল্পপরিমাণে এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তাহলে এই জাতির আমূল রূপান্তর ঘটে যাবে। সেই রূপান্তর ঘটে, শিক্ষা, রাজনীতি থেকে শুরু করে, জীবনের সর্বস্তরে মূল্যবোধের জাগরণের মাধ্যমে; এই উপলব্ধির মাধ্যমে যে, আমার মধ্যে যে দিব্য সত্তা বিরাজমান, তিনি অন্যান্য সকলের মধ্যেও রয়েছেন। বস্তুত আমরা সকলেই এক। কিন্তু এই একত্ববোধকে জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

এখন এই একই বিষয় সাংখ্যদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হবে। এযাবৎ বেদান্তের আলোতেই সমস্ত বিষয়টি বিচার করা হয়েছে। এবার আসছে সাংখ্য; তাই নতুন নতুন কিছু পারিভাষিক শব্দ এখানে ব্যবহৃত হবে। একটা কথা শুধু এখানে বলে রাখা ভালো যে, সাংখ্যদর্শনের সব কথা বেদান্ত মানে না। তার একটা কারণ হলো, সাংখ্য দ্বৈতবাদী, আর বেদান্ত [মূলত] অদ্বৈতবাদী। যেমন, সাংখ্যদর্শন বলে যে *প্রকৃতি* এবং *পুরুষ* হলো দুটি পৃথক, স্বাধীন সত্তা। এই দর্শন আরো বলে যে *পুরুষ* অসংখ্য। এই দুটি মত ছাড়া সাংখ্যের অন্যান্য সব শিক্ষাই বেদান্ত স্বীকার করে। গীতায় সাংখ্যদর্শনের অনেক কথাই পাওয়া যায়। পরের অধ্যায়েও দেখবেন সাংখ্যের প্রসঙ্গ আসছে। এই যে *সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ*—তিনটি গুণ—এটি সাংখ্যদর্শনের কথা। *প্রকৃতি এবং পুরুষ* সাংখ্যের পারিভাষিক শব্দ। বেদান্ত ও সাংখ্যের মধ্যে পার্থক্য এই ঃ সাংখ্য বলে, কোটি কোটি পুরুষ বা আত্মা আছে। একত্বের ওপর জোর দিয়ে বেদান্ত এই সাংখ্য মতের বিরোধিতা করে বলে, না পুরুষ বহু নয়, পুরুষ একটিই। সাংখ্য এক *প্রকৃতি*-র মাধ্যমে বিশ্বের ঐক্য প্রতিপাদন করে। চিন্তার রাজ্যে সেটিও অবশ্য এক মস্ত অগ্রগতি। সাংখ্যদর্শন মতে, বিশ্বে প্রকাশিত সব বস্তুর উদ্ভব হয়েছে এক *প্রকৃতি* থেকে। অতএব, প্রকৃতির ব্যাপারে সাংখ্য [একার্থে] অদ্বৈতবাদী; কিন্তু যেই আত্মার প্রসঙ্গ আসছে, সাংখ্য বলছে—আত্মা *বহু*। বেদান্তের বক্তব্য,

'না, পুরুষও একটিই। এবং *পুরুষ* ও *প্রকৃতি* বস্তুত অভিন্ন। তারা একই সত্যের অভিব্যক্তি।'

এর ওপর ভিত্তি করে, সাংখ্যের পরিভাষায় শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিষয়টি আলোচনা করছেন। আমরা দেখতে পাবো *ক্ষেত্র* এবং *ক্ষেত্রজ্ঞ* এখানে *প্রকৃতি* ও *পুরুষ*। প্রকৃতির অর্থ এই জগৎ, যা আপনার অনুভূতিতে ধরা দেয়। এই আদি *প্রকৃতি* বা *অব্যক্ত* বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নানারূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই হচ্ছে সুপ্রাচীন সাংখ্যদর্শন। মহাবিশ্বের বিবর্তন সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষের কাছে এসব কথা ৪০০০ বছরের পুরনো। *প্রকৃতি* এবং *প্রধান* দুটি সমার্থক শব্দ। এবং *পুরুষ* হলো মানুষের আত্মা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখন আমরা *পুরুষ* ও *প্রকৃতিকে* বোঝার চেষ্টা করবো। পরের শ্লোকে বলা হচ্ছে ঃ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি ।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯॥

—'জেনো, প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই অনাদি; এও জানবে যে বিকারাদি এবং সমস্ত গুণ প্রকৃতি সঞ্জাত।'

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধি অনাদি উভৌ অপি, 'জেনো যে, *প্রকৃতি* ও *পুরুষ,* দুয়েরই কোনও আদি নেই'। *আদি* মানে 'আরম্ভ' *অনাদি* মানে যার কোনও 'আরম্ভ নেই'। যতদূর পারেন অতীতের দিকে তাকান, দেখতে পাবেন তখনও তাঁরা আছেন। এই হলো *অনাদি। উভৌ*-এর অর্থ 'উভয়েই'। তারপর, *বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্,* 'জানবে, সমস্ত বিকার এবং গুণ *প্রকৃতি* থেকেই এসেছে'। *বিকারাংশ্চ,* 'এবং বিকার সকল' যা জগতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় ঃ একটা বড় কাঠের টুকরো নিয়ে আপনি তা থেকে একটি টেবিল তৈরি করলেন। একটা নতুন জিনিস তৈরি হলো। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি হলো? তার উত্তর এই, প্রকৃতিই কাঠে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং সেই একই *প্রকৃতি* এখন আবার টেবিলে রূপান্তরিত হলো। অতএব যা কিছু, সব প্রকৃতিরই *বিকার* বা পরিবর্তন। *গুণাংশ্চৈব,* সেইরকম 'গুণগুলিও'—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—*প্রকৃতি*-র অভিব্যক্তি; *বিদ্ধি প্রকৃতি-সম্ভবান্,* 'তাদের, প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বলে জেনো'।

প্রকৃতির বিবর্তন থেকেই এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি। এখন কথা হচ্ছে, তাহলে

এর মধ্যে *পুরুষ*-এর স্থান কোথায়? তার উত্তরে বলা হয়েছে, *পুরুষ* রয়েছেন চৈতন্যরূপে। সাংখ্যদর্শনের প্রবক্তারা খুব চালাক। সাংখ্যমতে *পুরুষ* নিষ্ক্রিয়। কর্ম যা কিছু, তা *প্রকৃতি* করে। প্রকৃতি অচেতন, অন্ধ হয়েও সক্রিয়। অন্য দিকে *পুরুষ* চক্ষুষ্মান, কিন্তু অক্রিয়। এই দুইএর মিলন বা যোগসাজসেই বিবর্তন সম্ভব হয়। কীভাবে? সাংখ্যবাদীরা একটি দৃষ্টান্ত দেন। মনে করুন, দুজন লোক—একজন অন্ধ, চোখে দেখেন না; অন্য জন খঞ্জ, হাঁটতে পারেন না। অথচ দুজনে মিলে বেশ চলেছেন। কীভাবে চলছেন? খঞ্জ যিনি, তিনি অন্ধের কাঁধে চেপে বসলেন—একজন পথ দেখাচ্ছেন, অন্যজন হাঁটছেন। *পুরুষ* এবং *প্রকৃতি* এই গোত্রের। সাংখ্যেরা এভাবেই বিবর্তনের ব্যাখ্যা দেন। বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। বেদান্ত বলে, পুরুষ ও প্রকৃতি আলাদা কিছু নয়; তারা অভিন্ন, একই সত্তা! ব্রহ্ম হলেন *পুরুষ*, শুদ্ধ চৈতন্য। ব্রহ্ম থেকেই *প্রকৃতি* এসেছে এবং যা কিছু বিবর্তন, তা এই প্রকৃতিরই। বিবর্তিত প্রত্যেক বস্তুর ভিতরেই ব্রহ্ম সুপ্ত আছেন। বেদান্ত এভাবেই বিবর্তনকে স্বীকার করে।

কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০॥

—'দেহ ও ইন্দ্রিয় উৎপাদনবিষয়ে প্রকৃতিই কারণ [এ কথা] বলা হয়; [এবং] বলা হয় সুখ-দুঃখের ভোগবিষয়ে পুরুষই কারণ।'

কার্য করণ কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে, 'দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টির ব্যাপারে *প্রকৃতি* হলেন কারণ'। *কার্য* মানে 'দেহ', পরিণাম। *করণ* মানে 'ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রগুলি'; বোধের ক্ষেত্রে করণ মানে হলো 'জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি'। চোখ হলো দেখার যন্ত্র, কান হলো শোনার যন্ত্র, ইত্যাদি। এগুলি উপায়, তাই *করণ* বলা হয়েছে। আর একটি হচ্ছে *কারণ*, যার অর্থ 'হেতু'। যেখানেই *কার্য ও কারণ* আছে, তার মূল কারণ হলো *প্রকৃতি* । অথবা, যেমন বলা হচ্ছে, *কার্য করণ কর্তৃত্বে*, 'কার্য-কারণ সম্বন্ধে যেখানেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোনও কর্ম অনুষ্ঠিত হয়'; *হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে*, তার 'কারণ প্রকৃতি।' আপনি খান এবং খেয়ে তা হজম করেন এবং তাতে আপনি শক্তিলাভ করেন। এখানেও সেই *প্রকৃতি।* এসব ব্যাপারে সর্বত্রই *প্রকৃতি* উপস্থিত। তাহলে *পুরুষ*-এর স্থান কোথায়? *পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে*, 'যেখানেই সুখ-দুঃখের অনুভব, সেখানেই *পুরুষ* বিদ্যমান।' প্রকৃতির সুখ বা দুঃখ নেই, কারণ সে অচেতন জড়বস্তু। *পুরুষ*

আছেন বলেই আপনার সুখ-দুঃখের অনুভব হচ্ছে। চেয়ার বা টেবিলের কোনও সুখ বা দুঃখবোধ নেই। কিন্তু ক্ষুদ্রতম জীবেরও সেই বোধ আছে। সেখানে আপনি *প্রকৃতি* ছাড়াও আরো কিছু হেতু দেখতে পাবেন। ঐ হেতু বা কারণটি হলো *পুরুষ।* তাই, সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি যে, যেখানেই সুখ-দুঃখ দেখবেন, জানবেন সেখানেই পুরুষের উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু যেখানে কেবল বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান, তাকে *প্রকৃতি* বলা হয়। যেমন, সূর্য আছে—সেটি হলো *প্রকৃতি;* নক্ষত্রমণ্ডল রয়েছে—সেটিও *প্রকৃতি*। এগুলো সবই *প্রকৃতি।* কিন্তু জীবের ক্ষেত্রে শুধু *প্রকৃতি* হলে চলবে না, দ্বিতীয় উপাদান বা হেতু, অর্থাৎ *পুরুষকেও* চাই। প্রতিটি জীবের মধ্যে *পুরুষ ও প্রকৃতি* সংযুক্ত হয়ে রয়েছে।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে, 'সুখ ও দুঃখ অনুভবের ক্ষেত্রে পুরুষকেই হেতু বলা হয়।' *ভোক্তৃ* কথাটির অর্থ যিনি অনুভব করেন। কী অসামান্য ব্যঞ্জনা! *ভোগ* মানে অভিজ্ঞতা, আর যিনি অভিজ্ঞতা লাভ করেন তিনি *ভোক্তৃ*। অতি ক্ষুদ্র পোকা-মাকড়ের ভিতরেও এই *ভোক্তৃত্ব* দেখতে পাবেন। একজন কেউ সুখ বা দুঃখ অনুভব করে। *ভোক্তৃ* ছাড়া সুখ বা দুঃখের কোনও অর্থ হয় না। সংস্কৃতে আমরা বলি *অনুভব,* ইংরেজিতে অভিজ্ঞতা। একটি পতঙ্গেরও *অনুভব* আছে; কিন্তু সেই অনুভব কি সূর্যের আছে? কখনই না। সূর্য, চন্দ্র বা নক্ষত্রের কোনও অনুভবশক্তি নেই—কোনও অভিজ্ঞতার বালাই নেই ওদের। জীবকোষের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত অনুভূতির কোনও ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু জীবকোষের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূতি বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা এনে দিল। তার আগে পর্যন্ত সবকিছুই ছিল কেবল *সৎ* অর্থাৎ, অস্তিত্ব বা সত্তামাত্র। সূর্য আছে, নক্ষত্ররা আছে—তাদের অস্তিত্ব আছে। এই শুদ্ধ সত্তাকে আমরা *সৎ* বলি। কিন্তু যেই আপনি জৈবিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ক্ষুদ্র পতঙ্গটির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, তখনই *সৎ*-এর সঙ্গে *চিৎ* অর্থাৎ চৈতন্যও এসে পড়লো। *চিৎ* হলেন সেই *পুরুষ,* যিনি অনুভব করেন। অনুভবের কর্তা না থাকলে আবার অনুভব কী? অনুভব আবার দুঃখেরও হতে পারে, আনন্দেরও হতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মানুভূতির ক্ষেত্রে এই অনুভব সর্বদাই আনন্দের, কারণ *আনন্দ* ব্রহ্মের স্বরূপ। তাই *সৎ-চিৎ-আনন্দ* হলো পরম বা আত্যন্তিক সত্যের স্বরূপ। আমাদের প্রত্যেকের স্বরূপও তাই; শুধু সেই সত্যটি আমাদের জানা নেই, এই যা! আর জানা নেই বলেই আমরা কখনও কাঁদি, নানা দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করি। মুণ্ডকোপনিষদ্ তাই

বলছেন, *অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।* অতি চমৎকার এই শ্লোকে বলা হয়েছে (৩/১/১) ঃ

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥

'একই নামের সুন্দর পালকবিশিষ্ট দুটি বন্ধু পাখি একই গাছে বসে আছে। তাদের মধ্যে একটি পাখি নানা স্বাদের ফল খায় এবং অন্য পাখিটি কিছুই খায় না—শুধু চেয়ে থাকে।' আমাদের দেহটি যেন গাছ, আর পাখি দুটি যথাক্রমে আমাদের কাঁচা-আমি ও পাকা-আমি, অথবা জীবাত্মা ও পরমাত্মা। 'দ্বিতীয় পাখিটি আনন্দে পরিপূর্ণ, কিন্তু প্রথমটি কখনও সুখী, আবার কখনও দুঃখী'। 'আমি', 'আপনি' হলাম এই অহংগ্রস্ত, সীমিত ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট প্রথম বিহঙ্গটি। কিন্তু একবার আমাদের ঊর্ধ্বতন সত্তা, অর্থাৎ চরম সত্যের উপলব্ধি হলে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে যায়। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ যে *সৎ-চিৎ-আনন্দ,* তা উপলব্ধি করে তখন আমরা আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই। শঙ্করাচার্য তাঁর 'নির্বাণষট্‌কম্' নামক কবিতায় যে বলেছেন, '*চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্*', তা এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য যে 'আমরা স্বরূপত সেই শিব, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব'।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *কার্য করণ কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিঃ উচ্যতে,* 'যেখানেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে, পরিবর্তন চলছে এবং এই পরিবর্তনের সহায়ক কারণগুলি বর্তমান এবং তাদের সাহায্যে যখন আপনি কোনও কিছু বুঝতে বা পেতে চেষ্টা করেন, তখনই জানবেন সেখানে *প্রকৃতি* রয়েছে।' কিন্তু যেখানেই সুখ-দুঃখের অনুভব, সেখানেই *পুরুষ* বা চৈতন্যতত্ত্বকে পাবেন। এই *ক্ষেত্র* ও *ক্ষেত্রজ্ঞ*-এর মিলনেই সংসার বা জগৎ। *ক্ষেত্র*-এর সুখ-দুঃখ নেই, ক্ষেত্রজ্ঞ-এর আছে। এই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরই আমরা *প্রকৃতি* এবং *পুরুষ* বলছি।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১॥

—'প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে পুরুষ প্রকৃতিজাত গুণগুলি ভোগ করে; তার সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ এই গুণগুলির প্রতি আসক্তি।'

প্রশ্ন এই—আমরা কষ্ট পাই কেন? তার উত্তরে বলা হচ্ছে, দেহ হলো *প্রকৃতি* এবং *পুরুষ*, এই দেহ, অর্থাৎ প্রকৃতির ভিতর আছেন। *পুরুষ প্রকৃতি*-র ভিতর আছেন, থাকুন; তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু *পুরুষ* যখন *প্রকৃতি*-তে আসক্ত হয়ে পড়েন, তখনই গোল বাধে। তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। *পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি*, 'প্রকৃতির ভিতর অবস্থিত হয়ে পুরুষ'; *ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্*, 'প্রকৃতিজাত গুণগুলি ভোগ করেন।' 'এটা আমার', 'এটা আমার', এই মনে করে পুরুষ গুণগুলি ভোগ করেন।' *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সৎ অসৎ যোনি জন্মসু*, '*সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির* এই তিন গুণের প্রতি আসক্তিই *পুরুষের* বন্ধনের কারণ'। তা না হলে *পুরুষ* তো মুক্ত। *সৎ অসৎ যোনি জন্মসু*, কিন্তু এই আসক্তির জন্য পুরুষকে 'ভালো, মন্দ নানা শরীর ধারণ করতে হয়'; জন্ম জন্ম ধরে এই চলে। যতদিন প্রকৃতির এই গুণগুলির প্রতি আসক্তি থাকবে ততদিন এইরকম জন্ম ও মৃত্যুর প্রবাহ চলতেই থাকবে। প্রকৃতির মধ্যে থাকায় কোন দোষ নেই; কিন্তু যেই আমরা প্রকৃতির *গুণগুলির* প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ি, অমনি আমাদের ওঠাপড়ার, জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা সইতে হয়। প্রকৃতির এই দাসত্ব ঘোচানো চাই। সাংখ্যবাদীরা এই অবস্থাকেই *কৈবল্য* বলেছেন। *কৈবল্য* অর্থাৎ 'একাকীত্ব'; 'আমি স্বতন্ত্র'; 'আমি *প্রকৃতির* সঙ্গে আছি বটে, কিন্তু তার সাথে আমার কোনও লেনাদেনা নেই', 'আমি অনাসক্ত'। সাংখ্যবাদীরা একেই মুক্তির অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। বেদান্তেও *কৈবল্য* শব্দটি আছে, কিন্তু প্রয়োগ ভিন্ন। বেদান্তে *কৈবল্য* বলতে বোঝায় 'চরম মুক্তি', অর্থাৎ 'আমি সব আসক্তি থেকে মুক্ত', 'আমি সব বন্ধন থেকে মুক্ত', 'আমি আমি-ই, আমি অন্য কিছু নই', 'আমি ছাড়া ত্রিভুবনে দ্বিতীয় কোনও সত্তা নেই'। এই হচ্ছে বেদান্তে মুক্তির ধারণা। পরজন্মে নয়, এই জীবনেই বেদান্ত সকলকে মুক্তির এই স্বাদ দিতে চায়। সাংখ্যরা যে-অবস্থাকে *কৈবল্য* বলেন, সে অবস্থাটিকে বোঝানোর জন্য বেদান্তবাদীরা *সাক্ষী* (অথবা দ্রষ্টা) শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তী শ্লোকে এই বিষয়টি বলা হচ্ছে।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২॥

—'এবং এই দেহেই আছেন পরম পুরুষ, যিনি দ্রষ্টা, অনুমোদন কর্তা, পালক, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা বলে কথিত।'

শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে বলছেন, *অস্মিন্ দেহে,* অর্থাৎ 'এই শরীরে'; *পুরুষঃ পরঃ,* 'পরম *পুরুষ*'-ও আছেন, যিনি *উপদ্রষ্টা,* অর্থাৎ 'দ্রষ্টা বা সাক্ষী'; *অনুমন্তা,* 'অনুমোদনকারী'; *ভর্তা,* 'পালক'; *ভোক্তা,* 'ভোগকর্তা'; *মহেশ্বরঃ,* 'পরম ঈশ্বর'; এবং *পরমাত্মা,* 'পরম আত্মা'।

প্রকৃতি-র কবলে পড়ে, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জীব তার দাসে পরিণত হয় এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খায়। জীব তার স্বরূপের কথা, তার মুক্ত স্বভাবের কথা না জানাতেই এই দুর্দশা। স্বরূপত *পুরুষ* বা আত্মা নির্লিপ্ত; কিন্তু আমরা প্রকৃতির বিষয়গুলির প্রতি আসক্ত। উপনিষদে আছে—*অসঙ্গঃ অয়ং পুরুষঃ*। এর অর্থ, 'স্বরূপত এই পুরুষ [বা আত্মা] অনাসক্ত'। কিন্তু আমরা সকলেই আসক্ত, তাই *প্রকৃতি*-র জালে ধরা পড়েছি। এই হলো আমাদের ব্যক্তিত্বের একটি দিকের পরিচয়। কিন্তু বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন আরো একটু গভীরে গিয়ে সত্যকে দেখার চেষ্টা করেছে এবং উপলব্ধি করেছে যে, আমাদের আসক্ত, খণ্ডিত আত্মার পিছনে রয়েছে অখণ্ড, নির্লিপ্ত পরমাত্মা।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে জোর দিয়ে বলছেন যে, আমাদের এই দেহের মধ্যে আমাদের সত্তা বা আত্মার ঊর্ধ্বতর একটি দিকও আছে। প্রকৃতির বশীভূত যে সীমিত সত্তা তা প্রকৃত পরমাত্মা নয়। এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। তার জন্য চেষ্টা চাই। সামান্য একটু অনুভব করতে পারলেও মনুষ্যজীবনের চেহারা বদলে যাবে। চরম উপলব্ধি হলে তো কথাই নেই। ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা যদি অল্প পরিমাণেও আসে, তাহলে অবস্থার কী বিপুল পরিবর্তনই না ঘটবে। আমরা এখন ক্ষুদ্র ও সীমিত ব্যক্তিসত্তা নিয়ে দিন কাটাচ্ছি; তখন আমাদের সত্তার এতটাই বিস্তার হবে যে আমরা সকলের দুঃখে দুঃখবোধ করতে শিখবো, সকলকে ভালবাসতে পারবো। এখনকার ক্ষুদ্র এই জীবাত্মা বা 'সংকীর্ণ আমি' তা করতে পারে না; আমাদের মধ্যে যেটি 'বড় আমি' বা 'পাকা-আমি', অর্থাৎ পরমাত্মা, তিনি পারেন, কারণ তিনি মুক্ত। এই নৈতিক শিক্ষা সব নারী-পুরুষেরই প্রয়োজন, কারণ এই নৈতিক স্তর থেকেই অধ্যাত্মজীবন শুরু হয়। এটিই প্রথম পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপটি না নিলে কোনওরকম আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব নয়। এটিই এই শ্লোকের গুরুত্ব। পরবর্তী শ্লোকে এই সাংখ্য তত্ত্বটিকে শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তের ভাবে ব্যক্ত করে প্রসঙ্গটির উপসংহার করবেন। তিনি বলছেন ঃ

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৩॥

—'যিনি এইভাবে পুরুষকে এবং গুণসমন্বিতা প্রকৃতিকে জানেন, তাঁর জীবন যেরকমই হোক না কেন, তিনি আর জন্মগ্রহণ করেন না।'

য এবং বেত্তি পুরুষং, যে পুরুষের কথা এখনই বলা হলো, 'এই *পুরুষকে* যিনি জানেন' এবং *প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ,* এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ 'গুণবিশিষ্ট *প্রকৃতি*-কে'; এমন ব্যক্তি, *সর্বথা বর্তমানোঽপি,* 'তাঁর জীবনধারা যেমনই হোক'; *ন স ভূয়োঽভিজায়তে,* 'আর জন্মান না'। এই ব্যক্তি বাজারের আনাজবিক্রেতা হতে পারেন, পরিবারের কর্তা বা গৃহিণী হতে পারেন, আবার সন্ত বা বুদ্ধিজীবীও হতে পারেন; সামাজিক পরিচয় যাই হোক না কেন, যদি তিনি এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করে থাকেন, তবে তাঁর আর জন্ম-মৃত্যু নেই। জন্ম বা মৃত্যু কেবল প্রকৃতির জালে বদ্ধ কাঁচা আমি বা সীমিত সত্তার যাকে আমরা জীবাত্মা বলি। পরমাত্মা নিত্যমুক্ত। তাঁর কোনও জন্ম-মৃত্যু নেই। তাই এখানে বলা হচ্ছে, *য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে।* আপনি যেখানেই থাকুন, যে কাজই করুন না কেন, আপনার অন্তরের বিকাশ হতেই পারে। কর্ম আত্মবিকাশের অন্তরায় নয়। কাজকর্ম আপনি সবই করে যাচ্ছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আপনার সচেতনতা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। এইভাবে একদিন আপনি আপনার প্রকৃত স্বরূপ যে পরমাত্মা, তাঁকে অল্প হলেও উপলব্ধি করবেন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে এমন একটি সত্যের কথা বলেছেন যা প্রত্যেকে এই জীবনেই অনুশীলন ও অনুসরণ করতে পারেন। আধ্যাত্মিক অনুভূতি কোনও তত্ত্ব, মতবাদ এবং কুসংস্কারের ব্যাপার নয়; অথবা অনেকে যেমন আধুনিক ভাষায় বলে থাকেন—নিজেকে ধোঁকা দেওয়ার অপপ্রয়াস—তাও নয়। এটি জাজ্বল্যমান সত্য যা সব নারী-পুরুষই অনুভব করতে পারেন। এই অনুভূতি হলে কী হবে? আপনার অধ্যাত্ম সচেতনতা তীক্ষ্ণ হবে, আপনার মহিমা বেড়ে যাবে। এই হলো ঠিক ঠিক *বিকাশ,* যথার্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশ। তখন আপনি সামান্য দেহ-মন-বিশিষ্ট মানুষ নন, তখন আপনার বোধ হয়, দেহ দ্বারা আপাতপরিচ্ছিন্ন দেখালেও স্বরূপত আপনি অখণ্ড আত্মা বা পরমাত্মা।

পরবর্তী দুটি শ্লোকের বক্তব্য হচ্ছে, এই সত্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে এবং তা করার নানা উপায় আছে। আমরা ইতঃপূর্বেই আলোচনা করেছি

যে, আমাদের মধ্যে একটি *পুরুষ* আছে যে *প্রকৃতির* দাস, প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ এবং আর একটি *পুরুষ* আছেন যিনি দ্রষ্টা, সাক্ষী, নিত্যমুক্ত *পরমাত্মা*। কিন্তু সমস্যা এই, প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত জীবাত্মাকে কী করে উপলব্ধি করানো যায় যে স্বরূপত সে পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নয়? ২৪ ও ২৫ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, হ্যাঁ তার অনেক উপায় আছে। এখন তিনি সে উপায়গুলি বলবেন।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪॥

'কেউ ধ্যানের দ্বারা, শুদ্ধ অন্তঃকরণের সাহায্যে নিজের হৃদয়ে, আত্মাকে দর্শন করেন, অন্যেরা জ্ঞানপথের সাহায্যে, আবার কেউ কর্মযোগের দ্বারা।'

কেচিৎ, 'কেউ কেউ'; *'পশ্যন্তি'*, এই সত্য উপলব্ধি করেন; *ধ্যানেন*, 'ধ্যানের দ্বারা', ধ্যানের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয়গুলি এবং মনকে সংযত করে, *সাক্ষি*-রূপ যে পরম সূক্ষ্ম সত্তা আমাদের ভিতরে রয়েছেন তা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে তাঁরা সমস্ত শক্তিকে অন্তর্মুখী করেন। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সেই পরম অনুভূতি লাভ করা অবশ্যই সম্ভব। *ধ্যানেন আত্মনি পশ্যন্তি কেচিৎ; আত্মনি* মানে 'নিজের ভিতর'; *কেচিৎ পশ্যন্তি*, 'কেউ কেউ দর্শন করেন' এই সত্যকে; *ধ্যানেন*, 'ধ্যানের দ্বারা'; *আত্মানম্ আত্মনা*, 'নিজের দ্বারা নিজের সত্যিকারের আত্মাকে আবিষ্কার করেন'। *অন্যে*, 'অন্যরা কেউ কেউ' এই সত্য উপলব্ধি করেন, 'সাংখ্যযোগের মাধ্যমে', *সাংখ্যেন যোগেন*; এবং *অপরে কর্মযোগেন*, 'অন্যেরা কর্মযোগের দ্বারা'। সত্য উপলব্ধির একটিই পথ—একথা আমরা বলি না। তা হবে কেন? অনেক পথই আছে। তবে সাধারণত আমরা চারটি যোগের কথাই বলে থাকি—*ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ* [অর্থাৎ জ্ঞানযোগ], *কর্মযোগ* এবং *ভক্তিযোগ*। সত্যি বলতে কি, উপায় বহু এবং সেই কারণে আমাদের দর্শন যে-কোনও পথ অবলম্বন করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। কিন্তু কথাটা এই—সত্য উপলব্ধি করা চাই। পতঞ্জলির *যোগসূত্র* (*সমাধিপাদ*, ৩৯) আছে ঃ *যথা অভিমত ধ্যানাৎ বা*', 'তোমার অন্তর যেভাবে পরিতৃপ্ত হয়, সেইভাবে ধ্যান কর'। সেই মতো তুমি তোমার পথ অনুসরণ কর। কয়েকটি উপায়ের কথা বলে দিয়ে পতঞ্জলি স্বাধীনতা দিয়ে বলছেন, *যথা অভিমত*, 'যা তোমার মনে ধরে', সেই পথই অনুসরণ কর; কিন্তু উপলব্ধি করা চাই। সত্য উপলব্ধিই আসল কথা। উপায়-রুচি, সুবিধা ও মানসিক গঠন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হতেই পারে।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে ।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫॥

—'আবার অন্য কেউ কেউ এভাবে [আত্মাকে] না জেনে, অন্যের কাছ থেকে শুনে উপাসনা করেন। পরম আশ্রয়স্বরূপ বলে যাঁর কথা তাঁরা শোনেন, তাঁর প্রতি নিষ্ঠার দ্বারা তাঁরাও মৃত্যুর পারে চলে যান।'

এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের সরাসরি *ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ*-এর পথ অনুসরণ করার সামর্থ্য নেই। এমন মানুষ যাঁরা, *এবম্ অজানন্তঃ,* 'এসব উপায়ের কথা না জেনে'; কী করেন তাঁরা? *শ্রুত্বা অন্যেভ্যঃ উপাসতে,* 'তাঁরা অন্যের কাছ থেকে উপদেশ শুনে তা অনুসরণ করেন।' এই উপাসনার ফলে ধীরে ধীরে তাঁদের জ্ঞান ও অনুভূতি হয়। গুরু ও শাস্ত্রনির্ভর এটি হলো ভক্তির পথ। এই পথ অবলম্বন করে ক্রমশ আমরা আমাদের অধ্যাত্মজীবন গড়ে তুলি। *তেঽপি চ অতিতরন্তি এব মৃত্যুম্,* 'তাঁরাও এই *সংসার,* এই জন্ম-মৃত্যু রূপ সাগর, অতিক্রম করবেন', কারণ তাঁরা *শ্রুতিপরায়ণাঃ,* 'শাস্ত্রীয় যে সত্য তাঁরা শুনেছেন, সেই সত্যের প্রতি তাঁরা একনিষ্ঠ।' সেই শ্রুত সত্য সাধন করে তাঁরা নিজেদের অধ্যাত্মজীবন বিকশিত করেন। মৃত্যুকে জয় করা বা অতিক্রম করা মানে জন্মকেও রোধ করা, কারণ যে না জন্মায় তার আর মৃত্যু হয় না।

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬॥

—'হে ভরতশ্রেষ্ঠ, স্থাবর অথবা জঙ্গম যা কিছু, তা *ক্ষেত্র* এবং *ক্ষেত্রজ্ঞ*-র সংযোগ থেকেই উৎপন্ন বলে জেনো।'

যাবৎ সঞ্জায়তে, 'এ সংসারে যা উৎপন্ন হয়'; *কিঞ্চিৎ সত্ত্বং,* 'যে কোনও পদার্থ'; *স্থাবরজঙ্গমম্,* 'স্থাণু ও চলমান'; *স্থাবর* মানে যা 'চলে না' এবং *জঙ্গম* মানে যা 'চলে'; *ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ,* 'হে অর্জুন, জেনো, সেগুলি সবই *ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ*-র সংযোগের ফল'। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটিও *ক্ষেত্র* ও *ক্ষেত্রজ্ঞ* দিয়েই শুরু হয়েছিল। সেখানে সাংখ্যের পরিভাষা, *পুরুষ* এবং প্রকৃতি, এই দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বক্তব্যের উপসংহার টানছেন এই বলে যে, সংসারের এই বহুত্ব বা বৈচিত্র্য এসেছে *প্রকৃতি* ও *পুরুষ*-এর সংযোগের ফলে। এক হাতে তালি বাজে না, দুটি হাত চাই।

প্রকৃতি চাই, আবার *পুরুষ*-ও চাই; কারণ *পুরুষ* হলো চৈতন্যশক্তি। শুধু *প্রকৃতি*—সে তো জড়, অচেতন। তাই কয়েক হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন যে, পুরুষ ও প্রকৃতি—এই দুয়ের সংযোগ চাই। আজকের আধুনিক বিজ্ঞান, বিশেষ করে স্নায়ুতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান এই বিষয়টি বোঝবার চেষ্টা করছে। বাস্তবিক, কেবল একটি উপাদান বা প্রকৃতি দিয়ে কি আমরা মনুষ্যজীবনের সব ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারি? দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়—মস্তিষ্ককে জানলেই কি সব জানা হয়ে গেল? মস্তিষ্ক কি সব কিছুর ব্যাখ্যা দিতে পারে? অথবা জীবদেহের জীন্‌রা। জড়বাদী যাঁরা, তাঁরা ঐরকমই ভাবেন। তাঁরা দাবি করেন 'রসায়ন বা পদার্থবিদ্যা দিয়ে মনুষ্যদেহের সব ক্রিয়াকলাপ তো বটেই, এমনকি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধিরও ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।' কিন্তু সত্য এই যে, স্থূল ও অচেতন জড় বস্তুর দ্বারা এসব ঘটানো অসম্ভব; তার জন্য চাই চৈতন্য। জড় বস্তুর পিছনে চৈতন্যতত্ত্বটিকে থাকতেই হবে। সপ্তম অধ্যায়ে আমি তাই বর্তমান যুগের অন্যতম দুজন শ্রেষ্ঠ স্নায়ুতত্ত্ববিদের উল্লেখ করেছি। তাঁদের একজন হলেন আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের রূপকার স্যার চার্লস শেরিংটন (Sir Charles Sherrington) এবং দ্বিতীয়জন মনট্রিল নিউরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর প্রয়াত বিজ্ঞানী ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড্ (Wilder Penfield)। তাঁরা উভয়েই জোর দিয়ে বলেছেন—মন ও মস্তিষ্ক দুটিরই প্রয়োজন আছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *ক্ষেত্র* ও *ক্ষেত্রজ্ঞ*—দুয়েরই প্রয়োজন। গীতায় যে-বিষয়ের আলোচনা আছে, জীবনের প্রকৃত স্বরূপ বোঝার জন্য আজকের স্নায়ুতত্ত্ববিদরা সেই বিষয় নিয়েই অনুসন্ধান চালাচ্ছেন।

তাই এই শ্লোকে বলা হচ্ছে, *যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্*, 'এ সংসারে উৎপন্ন স্থাবর ও জঙ্গম যাবতীয় বস্তুই'; *ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি*, '*ক্ষেত্র* ও *ক্ষেত্রজ্ঞ*-এর সংযোগের ফল বলে জেনো।' এর তাৎপর্য হলো, এ সংসারে যা কিছু ঘটছে, তার জন্য জড় এবং চৈতন্য দুটিরই দরকার। এই হলো ২৬ তম শ্লোকের মর্মবাণী। এ অধ্যায়ে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক আছে যা আধ্যাত্মিক মহিমায় সমুজ্জ্বল।

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।। ২৭।।

—'যিনি নশ্বর সর্বভূতে অবিনাশী পরমেশ্বরকে সমভাবে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী।'

যঃ পশ্যতি স পশ্যতি, 'যিনি এই সত্য দেখতে পান, তিনি যথার্থই দেখেন।' এই সত্যটি কী? *সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্,* 'সেই পরমেশ্বর বা পরম আত্মা সকল প্রাণীর মধ্যে পূর্ণভাবে বিরাজ করছেন'; *সমং,* 'সমানভাবে' আছেন; আত্মা পূর্ণভাবে আমাদের প্রত্যেকের ভিতর আছেন; *সর্বেষু ভূতেষু,* 'প্রত্যেক জীবের মধ্যে', এমনকি গাছপালা, পশু, এককথায় সবকিছুর মধ্যেই; *তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্,* 'এই পরমেশ্বর উপস্থিত আছেন'; *বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং,* 'যিনি অবিনাশী, তিনি বিনাশশীল পদার্থের ভিতর অবস্থান করছেন।' সবকিছুই নশ্বর, কিন্তু ভিতরে যিনি আছেন তিনি অবিনশ্বর, তাঁর মৃত্যু নেই। এইটিই চরম সত্য। *যঃ পশ্যতি স পশ্যতি,* 'যাঁরা এই সত্য জানেন, তাঁদেরই যথার্থ জ্ঞান হয়েছে।' *সমতা* বিষয়ক এটিই প্রথম শ্লোক। পরে এ ধরনের আরো শ্লোক পাবো আমরা। কী অসাধারণ চিন্তা! এক আত্মা প্রত্যেকের ভিতর সমানভাবে বিরাজ করছেন! আত্মার অংশ হয় না। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, দরিদ্র, ধনী—যিনি যেমনই হোন না কেন, সকলের মধ্যে কিন্তু সেই এক আত্মা। এই সমত্বের ভাবই আমাদের গণতন্ত্রের ধারণায় প্রতিফলিত হয়েছে; সামাজিক প্রতিষ্ঠা যার যেমনই হোক না কেন, গণতন্ত্রে সবার মূল্যই সমান। এই দিক থেকে বিচার করলে বেদান্তের সঙ্গে যথার্থ গণতন্ত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। আত্মাকে যেমন ভাগ করা যায় না, আপনার ভোটপত্রটিকেও তেমনি টুকরো করা যায় না। কারো হাতেই যেমন অর্ধেক ভোটপত্র থাকে না, তেমনি একাধিক ভোটও কারো থাকে না। ভোট সকলেরই একটা। গণতন্ত্রে সকলের মূল্যই সমান। এটি মূলত বেদান্তের শিক্ষা যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে।

সমত্ব ও *সমদর্শিত্ব*-এর এই ভাবনাটি গীতার আরো অনেক জায়গায় প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষত পঞ্চম ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে। কিন্তু দুঃখের কথা এই, এই দেশ সমত্ব ও সমদর্শিত্বের কথা প্রচার করলেও কার্যক্ষেত্রে আমরা এই সত্য থেকে বহুদূর সরে এসেছি। আমরা শত শত বৎসর কেবল ভেদাভেদ ও বৈষম্যই সৃষ্টি করে এসেছি—উঁচু-নিচু, ছোট-বড় এইসব বিচার করে। বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম বললেন, আমরা এবার বেদান্তের শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করবো। এখন আমরা ভারতবর্ষে বৈদান্তিক সমাজ, বৈদান্তিক কৃষ্টি গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছি। আত্মা এক এবং সকলের মধ্যে সমান। আত্মায় কোনও বৈষম্য নেই। কী মহান চিন্তা! অথচ এই সর্বোচ্চ চিন্তা সত্ত্বেও আমাদের পরস্পরের ভিতর কত না বিভেদ, কত না বৈষম্য বাসা বেঁধেছিল! এদেশের মানুষ বেদান্তশাস্ত্র পড়েছে, কিন্তু পড়ার পর তা দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাঁদের

বক্তব্য ঃ ওসব পড়তেই ভালো, কাজে লাগানো যায় না! এমনকি পণ্ডিতরাও বলতেন, 'শাস্ত্র পড়, কিন্তু শাস্ত্রের শিক্ষা অভ্যাস করো না; অনুশীলন করতে হয় তো অস্পৃশ্যতা, জাতপাত ইত্যাদি, যা মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেসবের অনুশীলন কর। কারণ আমরা যেখানে আছি, সেটি *সংসার;* অন্যটি *পরমার্থ*। সংসারে বৈষম্য থাকবেই, এটিই সংসারের দস্তুর'। কিন্তু তাঁদের মনে কখনও এই প্রশ্ন জাগেনি—*সংসারকে পরমার্থের* কাছাকাছি নিয়ে যাই না কেন? এখন অবশ্য আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে শুরু করেছি যে, এটিই, অর্থাৎ বৈষম্যহীনতাই যদি সত্য হয়, তাহলে আমি জীবনে এই সত্য ফুটিয়ে তুলব। আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হব, মিথ্যায় নয়। আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবনে এই ধরনের নবীন সঙ্কল্প ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে। সাধু সঙ্কল্প সন্দেহ নেই। কারণ গণতন্ত্রে সামন্ততান্ত্রিক বৈষম্য বেমানান; ঐ ধরনের ভেদাভেদ সামন্ততান্ত্রিক সমাজেই শোভা পায়। আমাদের তো আর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ নয়। তাই আমরা গণতান্ত্রিক নীতিই অনুসরণ করব। হ্যাঁ, এই আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের পূর্ণ রূপান্তর ঘটতে হয়তো বেশ কয়েক দশক লাগতে পারে, কারণ জাতীয় মনে ভেদাভেদপূর্ণ সামন্তযুগীয় চিন্তাভাবনা এখনও শক্তপোক্তভাবে বাসা বেঁধে আছে। আমি লক্ষ্য করেছি, অনেক মানুষই জনসভায় সাম্যভাবের স্বপক্ষে কথা বলেন, কিন্তু গৃহে পা দেওয়া মাত্রই গোপনে অস্পৃশ্যতা মেনে চলেন। একেই কপটতা বলে, একেই বলে ভাবের ঘরে চুরি! ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে দেওয়া বেদান্তের ওপর একটি বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন, 'ভারতে ঘোর কপটতা প্রবেশ করিয়াছে'।[১] এই একটি কথা থেকেই বোঝা যায় আমাদের কপটতারূপ ব্যাধি তাঁকে কতটা ব্যথিত করেছিল। তাই, যতই আমরা বেদান্তের মহান আদর্শগুলি নিয়ে চর্চা, চিন্তাভাবনা ও মনন করবো, ততই দেশের মানুষের অবস্থা বদলে যাবে, জাতীয় জীবনে এমন অসাধারণ পরিবর্তন আসবে যা ভারতের ইতিহাসে আগে কখনও আসেনি। পুঁথিপত্রে সবই ছিল, কিন্তু সেই আদর্শ মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রূপায়িত হয়নি। তাই স্বামীজী যা বলে গেছেন, সে কথা ভুললে চলবে না। তিনি বলেছেন, ভারতীয় ইতিহাসের বর্তমান পর্বের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য হলো স্বাধীনতা, সাম্য ও পবিত্রতার আদর্শের ভিত্তিতে এমন এক বৈদান্তিক সমাজের উদ্বোধন ঘটানো যেখানে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব হবে। সাহসের সঙ্গে বেদান্তের আদর্শ

---

১ বাণী ও রচনা ৫ খণ্ড, পৃঃ ২৬২

কাজে পরিণত করলে তবেই তা সম্ভব। যুবসমাজকে তাই এই মহান সাম্যের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হবে।

আমরা হয়তো অজ্ঞ, অশিক্ষিত। কিন্তু তাতে কী? আমরা মানুষ তো বটে। কেউ পুরুষ, কেউ বা নারী। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যেই এক আত্মা পূর্ণভাবে বিরাজ করছেন। এই নয় যে আত্মা আমার ভিতর এক-চতুর্থাংশ এবং আপনার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ। কখনও তা নয়। এক সত্য সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। নাগরিকত্বের বেলাতেও ঐ এক কথা প্রযোজ্য—নাগরিকত্বের ভগ্নাংশ হয় না। সকলেই পূর্ণ নাগরিক। তাহলে দেখতে পাচ্ছি, অনুসরণযোগ্য কী সব মহান ভাব ভারতবর্ষে রয়েছে! ভারতের যুবসম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই তাই আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে যে, তাঁরা জীবনে এই সত্যের পথই অনুসরণ করবেন। সত্যনির্ভর জীবন চাই, লোকদেখানো ভাঁওতা-দেওয়া জীবন নয়, যার বিরুদ্ধে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মনস্তত্ত্ববিদরাও আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। আমরা ছেলেমেয়েদের বলি, 'জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নাও'। কিন্তু একথার প্রকৃত অর্থ কী? মনস্তত্ত্ববিদ বলবেন, একথার মানে, 'মিথ্যা জগতের সঙ্গে তোমার মিথ্যা সত্তাকে মিশিয়ে দাও'। এতদিন পর্যন্ত আমরা এ কথাই বলে এসেছি। কিন্তু ও কথা না বলে কেন আমরা বলি না যে, 'তোমার প্রকৃত সত্তাকে সত্য জগতের সঙ্গে একাত্ম করে নাও'? কিন্তু এ কথা আমাদের শেখানো হয়নি। আমাদের বাপ-মা-রা বলে এসেছেন—বৈষম্য ও অবিচারে পরিপূর্ণ জঘন্য সমাজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নাও। এমন সাহসী মানুষ নেই কি, যাঁরা এসব ঘুণধরা চিন্তাধারা ভেঙে চুরমার করে দিতে পারেন? বর্তমানে এই ধরনের বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত, না হলে আমরা অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারব না।

এখানে যেসব শ্লোক পাচ্ছি, তাতে এই প্রেরণাই দেওয়া হয়েছে। এগুলি গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের দ্বারা অনেক কল্যাণ সাধিত হবে। সমাজে মানবিক সম্পর্ক উন্নততর হবে। ভারতবর্ষের সুদিন আসবে। যখন সমস্ত শিক্ষিত মানুষ এই সত্য উপলব্ধি করে তা জীবনে প্রয়োগ করবে, তখন কী বিপুল পরিবর্তনই না আসবে! সেই হবে ঠিক ঠিক বিপ্লব—শুধু ভারতবর্ষের পক্ষে নয়, গোটা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব। কিন্তু ভারতে এর প্রয়োজন সব থেকে বেশি, কারণ ঐক্যের আদর্শ সামনে থাকলেও বৈষম্য আমাদের যারপরনাই পীড়িত করেছে। আজ আমাদের সামনে দিন বদলের সুযোগ

উপস্থিত; বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে আমরা এখন সুস্থ, সবল সমাজ গড়ে তুলতে পারি। মানুষে-মানুষে, শোভন সম্পর্কের সৌধ গড়ে তুলতে পারি। অধ্যাত্মশিক্ষা দিতে গিয়ে গীতা আমাদের এই উপদেশই দিচ্ছে, খুলে দিতে চাইছে এমন প্রজ্ঞাদৃষ্টি আমাদের সমাজে যার গুরুত্ব অপরিসীম। আদর্শ, সুস্থ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা আশীর্বাদস্বরূপ। এটা কর, ওটা কর না—গীতা এধরনের নির্দেশ সম্বলিত কোনও সামান্য গ্রন্থ নয়। মানুষ আচরণবিধি জানার জন্য ব্যগ্র। চিকিৎসকদের আচরণবিধি, পুলিশী ব্যবহারবিধি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ধরাবাঁধা এতসব ফতোয়ার কী দরকার? কজন তা মেনে চলে? তাই, এইসব আচরণবিধির তত প্রয়োজন নেই যত প্রয়োজন আমাদের চিন্তাশক্তির, সৃজনশীল মনের, যা এই জীবনকে ক্রমাগত সুন্দর করে তোলার প্রয়াসী। শুধু আচরণের পরিবর্তন যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যা আচরণে প্রতিবিম্বিত হয়।

সত্যি বলতে কি, আজ গোটা দুনিয়াই সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে; আজ বিশ্বের মানুষ মানুষে-মানুষে সাম্য চায়, বহুর মধ্যে পরম একত্বকে উপলব্ধি করতে চায়, সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করতে আগ্রহী। বেদান্তমতে, এটিই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি। পরের শ্লোকে আরো কিছু কথা যোগ করা হচ্ছে :

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥

—'ঈশ্বরকে সর্বত্র সমানভাবে অবস্থিত দেখে তিনি নিজের দ্বারা নিজেকে আঘাত করেন না; সেই কারণে চরম লক্ষ্যে উপনীত হন।'

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতম্ ঈশ্বরম্, ' যিনি সর্বভূতে সমানভাবে বিরাজ করছেন, সেই ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখে'; *সমং পশ্যন্,* 'সমদৃষ্টি অর্জন করে' বা *সমতা দর্শন* করে। গীতার বহু জায়গায় এই সমদৃষ্টি অর্জন করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই দৃষ্টি অর্জন করলে কী হবে? তখন আর তিনি *ন হিনস্তি আত্মনা আত্মানং,* 'নিজের দ্বারা নিজেকে আঘাত করতে পারেন না'। অন্যের মধ্যে আত্মাকে না দেখলে, আপনি তার তো বটেই, নিজেরও খুব অনিষ্ট করতে পারেন। আবার নিজের ভিতরেও আত্মাকে না দেখলে আপনি আপনার সমূহ ক্ষতি করছেন। সেটা হওয়া উচিত নয়। এখন আপনি আপনার দেহটিকেই

আত্মা বলে মনে করছেন—মনে করছেন দেহটিই বুঝি আপনি! কিন্তু এই দেহবোধ অন্যান্য মানুষদের থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, একটা ভেদের প্রাচীর গড়ে তোলে, যা হওয়া অনুচিত। সকলের মধ্যে যেটি অপরিবর্তনীয়, নিত্য বস্তু, তার ওপরই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, তাকেই গুরুত্ব দিতে হবে। সেই অপরিবর্তনীয় দিব্য স্ফুলিঙ্গ বা সত্তা, যা সকলের ভিতর বর্তমান, তিনিই আত্মা। এই আত্মদৃষ্টি খুলে গেলে তখন আর আপনি নিজে নিজেকে আঘাত করতে পারবেন না। কেন? কারণ, অন্যের ভিতর যে আত্মা, সেই এক আত্মা আপনারও ভিতর। তখন আর আপনি কাউকে আঘাত না দিয়ে সকলের সঙ্গে একাত্মবোধ করবেন। *ততো যাতি পরাং গতিম্*, 'সেই হেতু তিনি পরম লক্ষ্যে পৌঁছে যান'। একত্ব উপলব্ধির এই চরম উৎকর্ষের মাধ্যমেই মোক্ষলাভ সম্ভব। এটিই মানুষের সর্বোচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি।

আমরা বাইরের জিনিসগুলি দেখেই মানুষের মূল্যায়ন করি। এগুলি সবই অনিত্য ও পরিবর্তনশীল। তাতে হরেদরে বাইরের বৈচিত্র্য বা পার্থক্যকেই বড় করে দেখা হয়। পার্থক্যবোধ থেকে আসে বিরোধ ও সংঘাত যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে মলিন করে সব কিছুকে বিকৃত করে উপস্থাপিত করে। বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন যে নেই, তা নয়; আর আমরা তা স্বীকারও করি। কিন্তু যখন আমরা অনিত্য ও পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যকে আমল না দিই, তখনই পরিবর্তনশীল বস্তুগুলির মধ্য থেকে নিত্য ও অপরিবর্তনীয় যে সত্তাটি, তা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে; তখনই আমরা বুঝতে পারি পরিবর্তনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে অপরিবর্তনীয় সত্য, তা উপলব্ধির গুরুত্ব কতখানি! পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন নিয়ে একটি পরিবার—পরিবারের সকলেরই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু এই আপাতপার্থক্য সত্ত্বেও সকলেই মনে করেন তাঁরা একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই একত্ব বোধ করে তাঁরা তৃপ্ত ও আনন্দিত! একে অন্যের অনিষ্ট করেন না। এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিটিকেই সমগ্র বিশ্বে সম্প্রসারিত করতে হবে। বেদান্ত বলে, এটিই সর্বোচ্চ দৃষ্টি বা মানসিকতা। *সমবস্থিতম্*-এর অর্থ সকল প্রাণীর ভিতর 'সমভাবে উপস্থিত'। একটি রাজনৈতিক সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে নাগরিকত্বের ধারণাটি যেমন সমানভাবে উপস্থিত, এও ঠিক তেমনি। আগেই আমি এ কথার উল্লেখ করেছি। ভাষা একই—কেবল একটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, অন্যটি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আধ্যাত্মিক চেতনাটিই রাজনীতির ভাষায় ব্যক্ত হয়ে থাকে। সমগ্র বিশ্বেই আজ এই ভাবটির একান্ত প্রয়োজন, কারণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া

বিশ্বে ঐক্য আসতে পারে না। গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে, বিশেষত পঞ্চম এবং এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তাই এই চিন্তাগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

—'যিনি দেখেন সকল কার্য কেবল প্রকৃতির দ্বারাই সম্পাদিত হয় এবং আত্মা অকর্তা, তিনিই যথার্থদর্শী।'

যিনি সত্যদ্রষ্টা, তিনি চারপাশের বিভিন্ন প্রকাশ বা অভিব্যক্তিগুলোকে কীভাবে দেখেন? তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'তিনি দেখেন যে *প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি*, 'এই জগতের সব কাজ প্রকৃতিই করে', আত্মা নয়। *সর্বশঃ* 'সবরকমভাবে'; সর্বক্ষেত্রে প্রকৃতিই সব কাজ, বা যাকে আমরা দর্শনের ভাষায় 'প্রক্রিয়াদি' বলে থাকি, তা নিষ্পন্ন করে। প্রক্রিয়াদি যত কিছু তা প্রকৃতির *ভিতরেই* এবং প্রকৃতির *দ্বারাই* সংঘটিত হচ্ছে। প্রকৃতির পিছনে যে *পুরুষ* বা আত্মা আছেন, তিনি নিষ্ক্রিয়—আদৌ কিছু করেন না। আমাদের জীবনের যতকিছু পরিবর্তন, তা আসে সর্বত্র প্রকৃতিঘটিত-পরিবর্তন থেকেই। এইটি সাংখ্য মত। *তথা আত্মানম্ অকর্তারং যঃ পশ্যতি*, 'এবং যিনি দেখেন আত্মা আদৌ কিছু করেন না', *সঃ পশ্যতি*, 'তিনিই ঠিক দেখেন'। এক আত্মা কেবল চৈতন্য-জ্যোতিরূপে আছেন। পরিবর্তন যা কিছু, সব প্রকৃতির মধ্যে। এই পরিবর্তন যাঁরা নিজেদের ওপর আরোপ করেন, তাঁরা বদ্ধজীব। যাঁরা তা করেন না, তাঁরা মুক্ত। অতএব এটিই সত্য যে, কার্য যা কিছু তা প্রকৃতির, আত্মা কিছুই করেন না। কিন্তু প্রকৃতির ঐ কার্যের ফলে এবং ঐ কার্যের প্রতি আসক্তির ফলে পুরুষের মধ্যে [যেন] একটা পরিবর্তন আসে। তাই অনাসক্ত হয়ে এই বিপর্যয় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা চাই।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

—'যখন কেউ পৃথক পৃথক ভূতসমূহকে এক [আত্মাতে] অবস্থিত দেখেন এবং সেই পরম (এক) ব্রহ্ম থেকেই তাদের বিকাশ উপলব্ধি করেন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান।'

এই শ্লোকটি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক যে-কোনও গ্রন্থে স্থান পেতে পারে।

শ্লোকের বক্তব্য এই যে, যে মুহূর্তে আপনি উপলব্ধি করবেন জগতের যাবতীয় বৈচিত্র্য ও বহুত্ব একেই কেন্দ্রীভূত এবং সেই এক থেকেই উদ্ভূত, তখনই বুঝতে হবে আপনি ব্রহ্ম উপলব্ধি করেছেন, কারণ সেই 'এক' হলেন ব্রহ্ম। তাঁর থেকেই সবকিছু এসেছে। *একস্থম্ অনুপশ্যতি,* 'তিনি দেখেন বহু একেই', অর্থাৎ পরম শুদ্ধচৈতন্য বা ব্রহ্মে, 'অবস্থিত'। সেই একে কারা বিধৃত হয়ে আছে? তার উত্তরে বলা হচ্ছে, *ভূতপৃথগ্‌ভাবম্,* জগতের 'ভূতসমূহের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব'—সবকিছুই সেই এককে কেন্দ্র করে আছে; *তত এব চ বিস্তারম্,* 'এবং সেই "এক" থেকেই' এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের 'উৎপত্তি'। সেই 'এক' বস্তুই বিকশিত হয়ে এই বহুত্বব্যঞ্জক, বিভেদাত্মক জগৎরূপে প্রকাশিত। কোটি কোটি বস্তু এ জগতে রয়েছে। কিন্তু তারা এলো কোত্থেকে ? তারা কি নিজের থেকেই এসেছে? না, তাদের মূল সেই শাশ্বত 'এক'-এ। এখানে বলা হয়েছে *একস্থম্,* অর্থাৎ "একে" অবস্থিত। আপাতবিচ্ছিন্ন মনে হলেও তারা সব সেই 'একেই' কেন্দ্রিত। মহাজাগতিক বিবর্তনের সূচনায় সেই 'একই' ছিলেন।

যখন কেউ জাগতিক বস্তুসমূহ ও জীবের বহুত্বকে *একস্থম্,* অর্থাৎ "একে" কেন্দ্রীভূত দেখেন এবং *তত এব চ বিস্তারম্,* দেখেন যে 'তাঁর থেকেই [সবকিছুর] বিস্তার হয়েছে'; *ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা,* 'তখন তিনি ব্রহ্ম উপলব্ধি করেন।' সেই 'এক' হলেন ব্রহ্ম, যিনি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে *সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম,* এইভাবে ব্রহ্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত *সত্যম্,* অর্থাৎ 'সত্য'; কেবল সত্যই আছেন। *সৎ* মানে 'যা আছে'; ঐ *সৎ* থেকেই *সত্যম্* এসেছে। এর পরের কথাটি হলো *জ্ঞানম্,* যার অর্থ 'চৈতন্যস্বরূপ'; অচেতন পদার্থ নয়। চৈতন্য একটিই। তৃতীয় শব্দটি *অনন্তম্,* অর্থাৎ 'অনন্ত'। তাৎপর্য এই, ঐ 'এক' থেকেই এই বিশ্বের উৎপত্তি। এই সত্যটি উপলব্ধি করলেই আপনার ব্রহ্মোপলব্ধি হলো। সেই পরম 'এক'-এর মধ্যেই আমরা রয়েছি; তার ভিতরেই আমাদের বিস্তার এবং পরিশেষে সেই একেই আমরা ফিরে যাই। সেই 'এক' নিত্য বর্তমান। তাই বলা হয়, এই বিশ্ব হচ্ছে ব্রহ্ম; *ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতম্,* 'এই বিশ্ব অবিনাশী ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়' (মুণ্ডকোপনিষদ্, ২/২/১১)। এই হলো উপনিষদের ভাষা।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩১॥

—'হে কুন্তীপুত্র, এই পরমাত্মা আদিহীন ও অপরিবর্তনীয় বলে দেহে অবস্থিত থেকেও কিছুই করেন না বা [কর্মফলে] লিপ্ত হন না।'

পরমাত্মা অয়ম্, 'এই পরমাত্মা'; *অনাদিত্বাৎ*, 'আদিহীনতার দরুন', যার আদি আছে, তার অন্তও আছে। ব্রহ্ম কিন্তু অনাদি। জগতের আর সব কিছুরই আরম্ভ আছে, তাই তাদের শেষও আছে। একমাত্র ব্রহ্মই অনাদি, যাঁর কোনও আরম্ভ নেই। এটিই মূলতত্ত্ব। এমনকি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করছেন যে, বিশ্ব সৃষ্টির আদি মূল উপাদানটি অজ্ঞাত—অর্থাৎ, তার জন্ম বলে কিছু নেই। *নির্গুণত্বাৎ*, 'গুণাতীত বলে'; বহুত্ব মানেই *সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ* এই তিনটি গুণের প্রকাশ; কিন্তু ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ঐ তিন গুণের অতীত। তাছাড়া, এই পরমাত্মা *অব্যয়*, অর্থাৎ 'অক্ষয়'; *ব্যয়* মানে 'খরচ'; *অব্যয়* মানে যতখুশি খরচ করুন না কেন, বস্তুটি একই থাকবে, এতটুকু কমবে না। এই হলো *অব্যয়*, অর্থাৎ যে সত্য পরমাত্মায় নিহিত, তার 'কোনও ক্ষয় নেই'। তাই, এই পরমাত্মা বা ব্রহ্ম যা অনন্ত ও অশেষ, *শরীরস্থোঽপি*, 'শরীরে অবস্থিত থেকেও'; *ন করোতি ন লিপ্যতে*, 'কিছুই করেন না এবং কোনওকিছুতেই লিপ্ত হন না।' গীতা ও উপনিষদের এটিই মহত্তম শিক্ষা যে, আত্মা নির্লিপ্ত; কোনওকিছুর দ্বারাই তিনি রঞ্জিত হন না। মনে করুন, কেউ কোনও পাপ কর্ম করলো; সেই পাপ কিন্তু আত্মাকে স্পর্শ করবে না। সেই পাপ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনকে কলুষিত করবে ঠিকই, কিন্তু তার বাইরে গিয়ে আত্মাকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা নেই তার। যে আত্মসত্য অন্তরে নিহিত তা নিত্যশুদ্ধ। জঘন্য পাপীর আত্মাকেও পাপ কখনও স্পর্শ করতে পারে না। এটিই বেদান্তের মহান বাণী। বেদান্ত বলে, আত্মা নির্লিপ্ত, অক্রিয় এবং চিরমুক্ত। শঙ্করাচার্য তাই *ব্রহ্মসূত্র* ভাষ্যে লিখেছেন—*নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পরম্ আত্মন্।* পরমাত্মার স্বরূপ হলো তিনি *নিত্যশুদ্ধ* অর্থাৎ চিরপবিত্র; *নিত্যবুদ্ধ* অর্থাৎ চিরজাগ্রত; এবং *নিত্যমুক্ত* অর্থাৎ চির স্বাধীন। এই যে 'অবরুদ্ধ জ্যোতি' বা দিব্যদ্যুতি আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তাকে ব্যক্ত করতে হবে। এই জ্যোতিকে প্রকাশ করার জন্যই ধর্মজীবনের যাবতীয় প্রচেষ্টা। শুধু ধর্মজীবন কেন, সাংসারিক জীবনের লক্ষ্যও তাই। যখন আদিম মানুষ ছিলাম, তখন প্রকৃতি আমাকে নানাভাবে দাবিয়ে রাখত; আমি ছিলাম নিতান্ত অসহায়। তারপর ধীরে ধীরে একদিন আমি যখন সভ্য হলাম, তখন কী হলো? আমার ভিতরের দিব্য বিভা একটু প্রকাশিত হলো। সেই প্রকাশ আমাকে এতটাই শক্তিশালী করে তুললো যে, সভ্যমানব হিসাবে আমি ধর্মজীবনের প্রতি আকৃষ্ট

হলাম। এ এক অপূর্ব রূপান্তর। কিন্তু সেখানেও আমি থেমে থাকি না; আমার পরিপূর্ণ দিব্য স্বরূপটিকে ব্যক্ত করার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠি।

একটি উপমা দিয়ে পরের শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

—'সূক্ষ্মতাহেতু সর্বব্যাপী আকাশ যেমন লিপ্ত হয় না, তেমনি আত্মাও দেহের সর্বত্র অবস্থিত থেকেও লিপ্ত হন না।'

আকাশ সর্বব্যাপী। এমন কোনও স্থান নেই যেখানে আকাশ নেই। এমনকি একটুকরো পাথরের মধ্যেও আকাশ আছে। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন! পাথরের ভিতর যে আকাশ রয়েছে, তা আমরা খালি চোখে দেখতে না পেলেও পরমাণু পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে দুটি পরমাণুর মধ্যে আকাশ ঠিকই আছে। শুনলে আশ্চর্য হবেন, একটি পরমাণুর মধ্যেও প্রকাণ্ড আকাশ রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, পরমাণুর কেন্দ্রে যেখানে প্রোটনকণাগুলি থাকে, সেখান থেকে প্রান্তবর্তী ইলেকট্রনকণাগুলি পর্যন্ত যে দূরত্ব, তা তুলনামূলক বিচারে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের সমান। এই যে দূরত্ব তার সবটুকুই শূন্যতা দিয়ে ভরা—শুধুই আকাশ! এই বিশ্বটি কী? অন্তহীন শূন্যতা। জড়পদার্থের পরিমাণ খুবই অল্প, বাদবাকি আকাশ। আবার ঐ পদার্থের *ভিতরেও* আকাশ! ভৌতবিজ্ঞান বর্তমানে এই ভাষাতেই কথা বলছে।

যথা, 'যেমন' এই আকাশ *সর্বগতম্,* অর্থাৎ 'সর্বব্যাপী' এবং *সৌক্ষ্ম্যাৎ,*'অতি সূক্ষ্ম হওয়ার দরুন', *ন উপলিপ্যতে,* 'কখনও লিপ্ত হয় না'। আকাশকে আপনি কখনও কলুষিত করতে পারবেন না। মনে করুন, ঘরে একটা দুর্গন্ধ রয়েছে। কিন্তু তাতে কি ঘরের *আকাশ* কলুষিত হলো? কখনও না। ঘরের জানলা-দরজা খুলে দিন, বদ্ধ, দূষিত বাতাস বেরিয়ে যাক; দেখবেন, ঘর আবার আগের মতো সুন্দর। এই কারণেই আকাশের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এই অখণ্ড, অসীম, অপূর্ব সত্যকে আকাশ ছাড়া আর কোন্ দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যাবে! তাই আমাদের সব শাস্ত্রই পরমাত্মাকে বোঝাতে আকাশের তুলনাটি বেছে নিয়েছে। কি বস্তুর ভিতরে, কি বাইরে—সর্বত্রই আকাশ, যা কখনও মলিন হয় না। ব্রহ্মও তাই। তিনি সবকিছুর ভিতরে, আবার বাইরেও। এবং সর্বদাই শুদ্ধ।

আকাশের মতো, *সৌক্ষ্ম্যাৎ,* '[আত্মাও] অতি সূক্ষ্ম হওয়ায়'; *সর্বত্রাবস্থিতো*

দেহে, 'দেহের সর্বত্র অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও'; *তথা আত্মা ন উপলিপ্যতে,* 'আত্মা লিপ্ত হন না'। দেহের মধ্যে এবং সর্বত্র আত্মা উপস্থিত থাকলেও, তার দ্বারা তিনি কলুষিত হন না। আমাদের অধ্যাত্মজীবনের চরম লক্ষ্য বা কেন্দ্রবিন্দুও এই আত্মা। মানবজীবনের পবিত্রতম, শুদ্ধতম অনুভূতির বিষয় এই আত্মা, ধর্মীয় ভাষায় সচরাচর যাকে আমরা ঈশ্বর বলে থাকি। দুঃখের বিষয়, ঈশ্বর বলতে আমরা এমন এক অতিজাগতিক সত্তাকে বুঝি যিনি নাকি আকাশে বসে আছেন। কিন্তু ঐ অপব্যাখ্যা দূর করে দিলে 'ঈশ্বর' শব্দটির মধ্যে আপত্তিকর কিছুই নেই; বরং বলা যায় শব্দটি অতি সুন্দর। কিন্তু শব্দটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত যাতে মনে না হয় যে, 'ঈশ্বর' বহু জিনিসের মধ্যে একটি। বেদান্তের ঈশ্বর এরকম কোনও একটি বস্তু নয়। বেদান্তের ঈশ্বর সবকিছুর উৎস; সবকিছুই সেই এক দিব্যতার বহুবিধ প্রকাশ। ঈশ্বর থেকেই সবকিছু এসেছে, ঈশ্বরেই তাদের স্থিতি, আবার ঈশ্বরেই তারা লয় পাবে। ঈশ্বরের এই যে বর্ণনা তা একমাত্র আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্যের সঙ্গেই মেলে। নিত্যশুদ্ধ, নিত্যনির্মল, নির্লিপ্ত—এই হলো আত্মার স্বরূপ এবং সেই আত্মা আমাদের সকলের মধ্যেই আছেন। এইটিই মানবজাতির কাছে বেদান্তের মহত্তম প্রেরণাদায়ক বাণী। আপনি অতি মন্দ লোক হতে পারেন। আপনার মন ও ইন্দ্রিয়গুলি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার মধ্যে এমন একটি বস্তু আছে যাকে আপনার কোনও ত্রুটিবিচ্যুতিই স্পর্শ করতে পারে না। তিনি হলেন আত্মা, আপনার সত্তার গভীরতম সত্য, সারাৎসার। এই আত্মাকে আমরা কেউ মলিন করতে পারি না। আর এখানেই আমাদের উদ্ধারের নিশ্চিত আশ্বাস। সত্তার এই দিব্যতাকে ব্যক্ত করে আমরা নিজেরাই আমাদের উদ্ধারকর্তা হতে পারি; তার জন্য কারো আসার দরকার পড়ে না। এ কথা অবশ্য বলছি না যে, কারো কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায় না। অবশ্যই যায়, যেমন ঈশ্বরের অবতারাদি। তাঁদের কৃপাকটাক্ষে আমরা উদ্ধার হয়ে যাই, তাঁরা আমাদের অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারেন—এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। কিন্তু তাঁরা ছাড়াও অন্যান্যদের কাছ থেকেও আমরা কিছু না কিছু সহায়তা পেতে পারি। এমনকি এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষও আমাদের কিছুটা সাহায্য করতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে আমাদের সর্বাধিক সাহায্য করেন অবতার পুরুষেরা। তাঁরা আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে ব্যক্ত করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এর ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত আছে। কত মানুষকেই না তিনি স্পর্শ করে, তাদের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতে এবং দিব্য স্বরূপ প্রকট করতে সাহায্য

করেছেন। যিশুও সেই বিপথগামী নারীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'যাও, আর পাপ করো না' এবং সত্যি সত্যিই সে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। অবতারদের কথার জোরই আলাদা, কারণ ঈশ্বর স্বয়ং তাঁদের মুখ দিয়ে কথা বলছেন কিনা! সকলের কথায় ঐ শক্তি থাকে না। কেবল, যাঁরা অন্তর্নিহিত দেবত্বকে বিকশিত করেছেন তাঁদের কথায় ঐ শক্তি নিহিত থাকে; তাঁরাই বলতে পারেন—'যাও, আর পাপ করো না'। *নিউ টেস্টামেন্ট*-এ বর্ণিত এই ঘটনাটি খুব নাটকীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজে দুষ্ট ও পাপীর সংখ্যা কিছু কম নেই। কিন্তু একথাও সত্যি যে, পাপীরাই সর্বদা অন্যের ভিতর পাপ দেখে, মহাত্মারা তা দেখেন না। *নিউ টেস্টামেন্টে* আছে, মহিলাটি পাপকর্মে লিপ্ত হলে অনেক পুরোহিত যিশুর কাছে এসে তার বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। তাঁদের দাবি—দুশ্চরিত্রা ঐ মহিলাটিকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হোক। তখনকার দিনে অপরাধীদের হত্যা করার যেসব রীতি ছিল, তার মধ্যে একটি হলো পাথর ছোঁড়া। কিছু কিছু ইসলামিক দেশ এখন শাস্তিবিধানের জন্য ঐ পন্থাই গ্রহণ করেছে। বাইবেলেও ঐসব বিচিত্র হত্যারীতির বর্ণনা আছে। সে যাই হোক, পুরোহিতদের ইচ্ছার কথা শুনে যিশু বললেন, 'বেশ। তোমাদের মধ্যে যে কখনও কোন পাপ করেনি, সেই প্রথম পাথরটি ছোঁড়ো।' একথা শুনে পুরোহিতরা সবাই মুখচাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন, কারণ কেউই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারছেন না যে জীবনে তিনি কখনও কোনও পাপ করেন নি। ফলে ক্রুদ্ধ জনতা ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তখন যিশু মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাও, আর কখনও পাপ কোরো না। তোমার বিরুদ্ধে যাদের অভিযোগ ছিল, তারা গেল কোথায়?' মহিলাটি তার উত্তরে বললেন, 'প্রভু, তারা আর অভিযোগ না করেই বিদায় নিয়েছে।' যিশু বললেন, 'তোমার বিরুদ্ধে আমারও কোন অভিযোগ নেই। যাও, এখন থেকে শান্তিতে বসবাস কর।' যিশুর এই কথার মধ্যে এমন এক অপার্থিব শক্তি ছিল যা ঐ মহিলাকে অনুভব করিয়ে দিয়েছিল যে এক শুদ্ধ অসীম সত্তা তার ভিতরেও রয়েছে, যে সত্য কিছুক্ষণ আগেও তার কাছে অজ্ঞাত ছিল। বোধের এই উদ্বোধন ঘটাতে দিব্য পুরুষ বা অবতারই পারেন। সাধারণ আচার্যরা পারেন না। পাপকে ক্ষমা করা এবং কাউকে অন্তর্নিহিত দেবত্ব উপলব্ধি করিয়ে দেওয়া—সন্তরাও এতদূর পারেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই গভীর শিক্ষার পিছনে যে তত্ত্বটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা এই যে, দুষ্টই হই আর ধার্মিকই হই আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু আছে যা কখনও কলুষিত হয় না। বাদবাকি যা কিছু, সবই কলঙ্কিত হলেও হতে পারে।

অপরাধের উৎস ও তার প্রতিকারের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ সাতটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে পাপ স্পর্শ করতে পারে বটে, কিন্তু তাদের পিছনে যে-আত্মা আছেন, তিনি সর্বদা নির্দোষ ও অপাপবিদ্ধ। পাপ তাঁকে কোনওদিন স্পর্শ করতে পারে না। তাই আপনার প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করে, আপনার ব্যক্তিত্বের দিব্য দিকটিকে অবলম্বন করে, সবরকম ত্রুটিবিচ্যুতির ঊর্ধ্বে উঠে যান।

পরবর্তী শ্লোকে আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে ঃ

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥

—'হে অর্জুন, এক সূর্য যেমন সমগ্র জগৎকে আলোকিত করে, তেমনি ক্ষেত্রী [পরমাত্মা] সমগ্র ক্ষেত্রকে আলোকিত করেন।'

আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করেছিলাম *ক্ষেত্র* ও *ক্ষেত্রী* অর্থাৎ 'দেহ' এবং 'দেহের জ্ঞাতা', এই প্রসঙ্গ দিয়ে। যিনি দেহকে জানেন, তিনি হলেন *ক্ষেত্রজ্ঞ*। দেহ তো আর নিজে নিজেকে জানে না, অন্য কেউ জানেন। যিনি জানেন তিনি হলেন কর্তা, আত্মা, জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা। জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞাতার পার্থক্য নিরূপণের মধ্য দিয়ে এই অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছিল যে, একটি দেহের জ্ঞাতা অন্য দেহের জ্ঞাতা থেকে ভিন্ন নন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—সব ক্ষেত্রের একটিই জ্ঞাতা। এক অসীম পরমাত্মাই আমাদের সকলের মধ্যে বিরাজমান। দেহ বহু, কিন্তু পরমাত্মা এক। অবশ্য এই পরমাত্মা ছাড়াও আপনার ও আমার মধ্যে একটা মিথ্যা আমিত্ব-বোধ আছে, যে-আমিত্ব দেহ, মন ও বংশানুগতির দ্বারা প্রভাবিত। এই মিথ্যা আমিত্ব-বোধের দরুনই আমি আপনার থেকে পৃথক হয়ে গেছি। আমি আপনার শত্রু। আপনাকে শোষণ করি। আপনাকে হয়তো হত্যাও করতে পারি। দেহ-মন সংঘাতের কবলে পড়েই আমাদের এই অসহায় অবস্থা যা কোনও মতেই দূর হচ্ছে না। কিন্তু প্রকৃত আত্মা থেকে জগতের প্রতি কেবল ভালবাসা, পরহিতচিন্তা, সেবা ও নিবেদনের ভাবই বিচ্ছুরিত হয়।

বর্তমান শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *যথা রবিঃ প্রকাশয়তি*, 'সূর্য যেমন আলোকিত করে'; *একঃ*, 'একলাই'; এক সূর্যই সমগ্র সৌরজগৎকে আলোকিত করে। সৌরজগতে আলোর দ্বিতীয় কোনও উৎস নেই। সূর্যের আলো প্রায়

৮০০ কোটি মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবং সৌর-সীমান্তের ব্যাপ্তি ৪০০ কোটি মাইল বা তার কাছাকাছি। মহাকাশযান 'ভয়েজার' ধীরে ধীরে সৌরজগতের বাইরে চলে যাচ্ছে—মানুষের এ এক অভূতপূর্ব কৃতিত্ব। ভাবুন দেখি—কত কোটি কোটি মাইল মহাকাশ-পথ সে অতিক্রম করেছে। আর এর সবটুকুই একটি মাত্র সূর্যের দ্বারা আলোকিত! এই দৃষ্টান্ত দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, যেমন একটি সূর্য এই সমগ্র বিশ্বকে, অর্থাৎ সৌরজগৎকে বিভাসিত করে, সেইভাবে *ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি*, '*ক্ষেত্র* বা দেহের জ্ঞাতা সব *ক্ষেত্র* বা দেহগুলিকে আলোকিত করেন'; *ভারত*, 'হে অর্জুন!' ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের ঠিক আগের শ্লোক এটি। ভাবের গুরুত্বের দিক থেকে এটি অসামান্য।

গীতায় বারবার একত্বের ওপর, সমত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। *একম্ এব অদ্বিতীয়ম্*, পরমাত্মা 'এক ও অদ্বিতীয়'। দুই বলে কিছু নেই। এটি 'monism' নয় এটি অদ্বৈত বা অভিন্নতার তত্ত্ব। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ সর্বত্র, সব *ক্ষেত্র* বা দেহগুলিই এক *ক্ষেত্রী* বা পরমাত্মা দ্বারা আলোকিত। কী চমৎকার চিন্তা! বস্তু অনেক, জীবও অসংখ্য; কিন্তু *ক্ষেত্রী* বা *ক্ষেত্রজ্ঞ* একটিই—আপনার, আমার, সকল বস্তুর ভিতর সেই 'পরম এক'-ই বিদ্যমান। বহুর পিছনে 'পরম এক-কে দেখাই, ঠিক ঠিক দেখা; সেটিই সঠিক দর্শন। বহুত্ব এখন আমাদের বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু ভিতরের যে আত্মজ্যোতি, তাতে বহুত্ব নেই। দেহ-মন সংঘাতের বিভিন্নতার দরুণই আমরা মনে করি আত্মা বুঝিবা বহু। কিন্তু সত্য এই, এক অনন্ত ঈশ্বরই আছেন এবং তাঁর স্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য; চৈতন্যের জ্যোতিতেই জগতের সবকিছু আলোকিত। উপনিষদে বলা হয়েছে—*তস্য ভাসা সর্বমিদম্ বিভাতি*, 'তাঁর দীপ্তিতেই এই জগতের সব কিছু আলোকিত।' *জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ*, তিনি 'জ্যোতিরও জ্যোতি।' বর্তমান অধ্যায়ের ১৭ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলেছেন। তিনি 'পুরুষ' নন, 'স্ত্রী'-ও নন। তাই তাঁকে বোঝাতে আমরা তৎ শব্দটি ব্যবহার করি, যার অর্থ 'সেই' বা 'এই'। বলা হয় *ওঁ তৎ সৎ*, 'ওঁ, সেই পরম সত্য'। এই হলো ঈশ্বরের সংক্ষিপ্ততম বর্ণনা। পরের অধ্যায়গুলিতে এই প্রসঙ্গ আসবে।

অতএব ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে আমরা দেখলাম যে সমস্ত ক্ষেত্র বা দেহ অদ্বিতীয় পরমাত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য দ্বারা আলোকিত। কিন্তু সেই আলো যখন অজ্ঞতা বা ভ্রান্তিবশত দেহের মধ্যে আবদ্ধ বলে প্রতীত হয়, তখনই জীব

নিজেকে সকলের থেকে আলাদা বলে মনে করে। তার ফলে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন হয়েও আমরা একে অন্যকে হত্যা করার চেষ্টা করি, ধ্বংস করার নেশায় মেতে উঠি, লড়াই করি। এসব করার কারণ সত্য সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞানতা। গীতা সেই পরম সত্যটিই আমাদের স্মরণ করাতে চাইছে। কতভাবেই না মানুষ শোষিত হয়েছে। কিন্তু সব শোষণের মূলে রয়েছে অজ্ঞানতা; আমরা সকলে মিলে যে এক ও অবিভাজ্য সত্তা, সে কথা আমরা জানি না। আজ বিশ্ব জাগছে, সত্যের পথে চলা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এই ঐক্য-চেতনা ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে আলিঙ্গন করতে চাইছে। এই ঐক্যের পথই মানুষের যথার্থ প্রগতির পথ। *সাম্প্রতিক কালের এই যে প্রবণতা তার ব্যাখ্যা মেলে বেদান্ত দর্শনে*। পৃথিবীকে যদি ঐক্যবদ্ধ করতে হয়, তাহলে একটি দর্শন চাই-ই চাই এবং সেই দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাবে বেদান্তে এবং বিবেকানন্দের রচনাবলিতে। পাশ্চাত্যে দেওয়া তাঁর বক্তৃতাগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন বিশ্বের এই ঐক্যের ওপর। বর্তমান যুগে কিভাবে মানুষের মধ্যে ঐক্য আনা যায়, এটিই ছিল তাঁর বিশেষ চিন্তা। আধুনিক যুগের সেটিই হবে লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অভিমুখে আমরা এগিয়েও চলেছি। কিন্তু সঠিক পদক্ষেপে এগিয়ে চলার জন্য যে জীবন-দর্শনের একান্ত প্রয়োজন, তা আছে বেদান্তে। অন্য কোথাও তা আপনারা পাবেন না। বেদান্ত এমন একটি দর্শন যাকে আপনি চাইলে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রহণ করতে পারেন, কারণ ইহলৌকিক আর পারমার্থিকের মধ্যে আমরা কোনও পার্থক্য করি না। বস্তুত তারা একই শিক্ষার দুটি অঙ্গ বা প্রণালী বলেই আমরা মনে করি। কঠ উপনিষদে (২/১/১০) তাই বলা হয়েছে, ব্যক্ত জগতে একটি বস্তুর সঙ্গে আর একটি বস্তুর কোনও তফাৎ নেই—*নানাত্বম্‌* অথবা 'বিভিন্নতা' বলেই আদৌ কিছু নেই। এই ভাবটি মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে, সকলকে এই শিক্ষা দিতে হবে। এই অভিন্নতাবোধটি ধীরে ধীরে আসছে। এ যাবৎ আমরা মানুষে মানুষে কতই না পার্থক্য করে এসেছি! আমরা ভাবতাম এক গ্রামের মানুষ অন্য আর একটি গ্রামের মানুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা যেন দুটি পৃথক গোষ্ঠীর মানুষ। কিন্তু আজ কোটি কোটি মানুষ অনুভব করতে পারছেন তাঁরা এক মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে বিবর্তনের এই ধারাটি স্পষ্ট এবং এর থেকেই সংহতি, ঐক্য ও বিশ্বশান্তি আসবে। আজ জগৎ এই শান্তির জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী শ্লোকে এই অধ্যায়ের উপসংহার করছেন এই বলে ঃ

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪॥

—'যাঁরা জ্ঞানচক্ষু সহায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর প্রভেদ এবং ভূতসমূহের প্রকৃতির মিথ্যাত্ব বোঝেন, তাঁরা পরব্রহ্ম লাভ করেন।'

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ এবম্ অন্তরং, এই অধ্যায়ে '*ক্ষেত্র* বা দেহ এবং *ক্ষেত্রজ্ঞ* বা দেহের জ্ঞাতার মধ্যে যে প্রভেদ' তা উপস্থাপিত করা হয়েছে—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় কী করে? *জ্ঞানচক্ষুষা,* 'জ্ঞানরূপ চক্ষুর দ্বারা'। স্থূল চোখ দিয়ে দুই এর ঐক্য আপনি দেখতে পাবেন না। *ক্ষেত্র* ও *ক্ষেত্রজ্ঞ*-র প্রকৃতি এবং সকল ক্ষেত্রজ্ঞর একত্ব আপনি বাইরের চোখ দিয়ে দেখতে পাবেন না। তার জন্য আপনার জ্ঞানচক্ষুর প্রয়োজন। প্রথমে আপনাকে *ক্ষেত্র* ও *ক্ষেত্রজ্ঞ,* এই দুইএর প্রভেদ জানতে হবে; তারপর সকল *ক্ষেত্রজ্ঞ* যে অভিন্ন তা বুঝতে হবে; সর্বোচ্চস্তরে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-র ঐক্য উপলব্ধি করতে হবে। এইভাবে ধাপে ধাপে বেদান্ত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর মধ্যে যে অভিন্নতা, সেই বোধের দিকে আমাদের নিয়ে যায়। অদ্বয় পরম যে তত্ত্ব, তার থেকেই উভয়ের উৎপত্তি এবং একটি পর্যায়ে এসে তারা যেন দৃশ্য ও দ্রষ্টা বা বিষয় ও বিষয়ী—এই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে।

দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, চোখ দেখে। কী দেখে? কোনও বস্তু অর্থাৎ বিষয় দেখে। চোখ হলো দ্রষ্টা এবং যা দেখে, সেটি দৃশ্য বা বিষয়। এই যে পার্থক্য, তা এসেছে একই প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতির শক্তিই এক দিকে বিষয়, আবার অন্যদিকে বিষয়ী বা ইন্দ্রিয়ের রূপ নিয়েছে। জগতের বিবর্তন অব্যাহত রাখার জন্যই এই দ্বৈতভাব বা বৈচিত্র্য থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সত্য এই যে, উভয়ের পিছনেই রয়েছে এক উচ্চতর প্রকৃতি, অর্থাৎ সেই শুদ্ধচৈতন্য। এই হলো বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যখন কোনও বস্তু দেখি, তখন বস্তু একটি, আর আমি একটি। অর্থাৎ সেই বস্তুটি থেকে আমি পৃথক। কিন্তু উচ্চতর পর্যায়ে এই পার্থক্য আর থাকে না। তা না থাকলেও, সাধারণ স্তরে এই প্রভেদ থাকবেই; ধাপে ধাপে আমাদের এই পার্থক্যবোধকে অতিক্রম করে যেতে হবে। সেটিই প্রকৃত শিক্ষা—সকল প্রভেদ দূর করে 'পরম এক'-এর আলোয় সব কিছু দেখার অভ্যাস গড়ে তোলা। এক-এর আলোতেই বহুকে দেখতে হবে। এই অধ্যায়ের ৩০ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন ঃ

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা—

'এই সকল পৃথক পৃথক বহু জীব ও ভূতসমূহ একেই কেন্দ্রীভূত। সেই এক আত্মা থেকেই বিকশিত হয়ে তারা এখনকার অবস্থায় পৌঁছেছে'। এই জ্ঞান আমাদের লাভ করতে হবে। একেই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরম সত্তার জ্ঞান বলা হয়েছে। তাই পূর্ববর্তী শ্লোকে *ক্ষেত্র* এবং *ক্ষেত্রজ্ঞ*-র পার্থক্যটি আমাদের বুঝতে বলা হয়েছে। আমরা কেবল ক্ষেত্রটিকেই দেখি; ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে দেখতে পাই না। *ক্ষেত্র*, অর্থাৎ আমার দেহটি এবং অন্যান্যদের দেহ ও জাগতিক নানা বস্তু নিয়েই আমরা রাতদিন ব্যস্ত। কিন্তু *ক্ষেত্রজ্ঞ?* তাঁকে তো জানতে হবে। জানতে গেলে প্রথমেই ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রজ্ঞকে আলাদা করে ফেলা চাই এবং বোঝা চাই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞর আলোকেই আলোকিত। চোখের নিজস্ব কোনও আলো নেই। চৈতন্যর দীপ্তিতেই চোখ দেখতে পায়, কান শোনে। এক চৈতন্য বা ক্ষেত্রজ্ঞর জন্য এসব সম্ভব হয়।

তাই প্রথমেই আপনাকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর পার্থক্যটি ভালো করে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে যে, আমি শরীর নই, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ। দেহ কেবল একটা জড় বস্তু। তারপর *জ্ঞানচক্ষুষা*, 'জ্ঞানরূপ চোখ দিয়ে', আপনি সূক্ষ্ম সত্যের সন্ধান পাবেন। জ্ঞানচক্ষু সাধারণ চোখ থেকে আলাদা। স্থূল চোখ স্থূলবস্তুগুলিকেই দেখতে পায়, সর্বোচ্চ সত্য বা পরম সত্তা তার নাগালের বাইরে। তাই *জ্ঞানচক্ষু* চাই। জড় প্রকৃতির ভিতর অনুসন্ধান করতে গিয়ে একদিন বিজ্ঞানী এই *জ্ঞানচক্ষু* লাভ করেন। যে জিনিসকে যেমন মনে হয়, ইন্দ্রিয়গুলির কাছে তারা যেমনভাবে প্রতীত হয়, বাস্তবে কিন্তু তারা তেমন নয়। জ্ঞানের দৃষ্টি খুলে গেলে তবেই এই পার্থক্যটি আমরা ধরতে পারি। খালি চোখে দেখলে, যেদিকেই তাকাই না কেন, পৃথিবীটাকে সমতল বলেই মনে হয়। কিন্তু জ্ঞানচক্ষু বলে যে, না—পৃথিবীটা গোল। সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের ধারণাটি পাল্টে যায়। তাই বলছিলাম, ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান সীমিত; তা আমাদের কাছে যথার্থ সত্য উন্মোচিত করতে পারে না।

তাই, জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা আপনি প্রথমে দেহ ও আত্মার পার্থক্যটি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞর তফাৎটি বুঝতে পারবেন। তারপর আসবে 'প্রকৃতি ও তার বিষয়গুলি থেকে মুক্তি', যাকে বলা হচ্ছে ভূত *প্রকৃতি মোক্ষ।* কোটি কোটি বছর যে জড় প্রকৃতি আমাদের মোহিত করে রেখেছে, তার হাত থেকে মুক্তি আমাদের পেতেই

হবে। প্রকৃতি যেমন পশুদের মুগ্ধ করে রাখে, আমরাও তেমনি প্রকৃতির দাস হয়েই কাল কাটাচ্ছি। প্রকৃতির এই গোলামি থেকে নিজেদের মুক্ত করতেই হবে। সাংখ্যদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সকলেই প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। তারপর ধীরে ধীরে আমরা নিজেদের মুক্ত করি। অবশ্য প্রকৃতি একথাও বলে যে, সে *পুরুষ*-এর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করছে। এতদিন প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গে খেলছিল এবং পুরুষকে নিজের খেয়ালখুশি মতো নাচাচ্ছিল। এখন যেন সে পুরুষকে আপন মনে থাকতে দিয়ে নিজেকে তার থেকে আলাদা করে নিচ্ছে। তাই এক দিক থেকে দেখলে, একে প্রকৃতির মুক্তিও বলা যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই মুক্তি আত্মার, যে নিত্যমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতির জালে পড়ে এমন আচরণ করে আসছিল যেন সে বদ্ধ! এভাবেই অবিদ্যাজনিত বন্ধনদশার অবসান হয়। তখনই মানুষ উপলব্ধি করে যে, স্বরূপত সে মুক্ত, জ্ঞানের দীপ্তিতে সে চিরভাস্বর। এই হলো *ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং*-এর তাৎপর্য। 'যাঁরা এই সত্য জানেন', *যে বিদুঃ*, অর্থাৎ যাঁরা আত্মা ও অনাত্মার প্রভেদ বোঝেন, যাঁরা বোঝেন কিভাবে প্রকৃতির দ্বারা আত্মা প্রভাবিত হয়; *তে যান্তি পরম্*, 'তাঁরা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করেন', অর্থাৎ এই সত্য জেনে তাঁরা পরম মোক্ষ লাভ করে থাকেন। আমাদের যে কৃষ্টি, তার মূল লক্ষ্যই হলো ধাপে ধাপে আমাদের এই মোক্ষ-অভিমুখী করে তোলা। কখনও কখনও হয়তো সৃজনশীলতা হারিয়ে আমাদের প্রগতি রুদ্ধ হয় এবং আমরা প্রকৃতির কবলে পড়ি; ভাবি 'নিস্তারের বুঝি আর কোনও পথ নেই'। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলে, 'না, তোমার শৃঙ্খল তুমি ভেঙে ফেলতে পার।'

শ্রীরামকৃষ্ণ জেলের কথা বলেছেন। মাছ ধরার জন্য জেলে যখন জাল ফেলে তখন কয়েকটি মাছ জালে পড়ে না। তারা খুব বুদ্ধিমান; সর্বদাই জাল এড়িয়ে চলে। কিন্তু বেশিরভাগ মাছ অত চতুর নয়; ফলে তারা জালে ধরা পড়ে। এই যে প্রথম শ্রেণির বুদ্ধিমান মাছ, যারা কখনও ধরা পড়ে না, তারা *নিত্যমুক্তের* দৃষ্টান্ত। তারা সর্বদাই মুক্ত—কোনও জাল তাদের বাঁধতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণির অধিকাংশ মাছ *বদ্ধজীবের* উপমা। এই বদ্ধজীবের মধ্যে আবার কিছু মানুষ প্রাণপণ সংগ্রাম করে জাল থেকে পালিয়ে যায়। এদের *মুক্ত* বলে। কিন্তু মাছের মতো বেশ কিছু মানুষও জানেই না যে তারা জালে ধরা পড়েছে। তারা জালের মধ্যে, জাল কামড়ে চুপচাপ পড়ে থাকে। এরা বদ্ধজীব। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ চারধরনের মানুষের কথা বলেছেন—*বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত এবং নিত্যমুক্ত*। এদের মধ্যে যারা *বদ্ধ*, তাদের কোনও তাপ-উত্তাপ নেই; বদ্ধ

হয়েই যেন তারা তৃপ্ত! তারা জানেও না যে কিছুকাল পরেই জেলে জাল গুটিয়ে তাদের টেনে তুলবে এবং তাদের বিনাশ করবে। ঐটুকু বোঝার দূরদৃষ্টি তাদের নেই। কিন্তু ওদেরই মধ্যে আবার কিছু মানুষ প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মোটেই সুখী নয়, তারা সংগ্রাম করে মুক্ত হতে চায়। এদের *মুমুক্ষু* বলে। আর যাঁরা বন্ধন-জাল থেকে পালিয়ে যেতে পারে, তাদের *মুক্ত* বলা হয়। সবশেষে আছে *নিত্যমুক্ত*, কোনও বন্ধনই যাদের বাঁধতে পারে না। তারা মায়াজালে কখনও ধরা পড়ে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের দিকে তাকালেও আমরা দুটি চরিত্রের সন্ধান পাই। একজন হলেন নরেন্দ্র পরে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে *নিত্যমুক্ত, নিত্যসিদ্ধ* বলতেন। মায়া তাঁকে কখনও বাঁধতে পারেনি। অন্যজন হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ গৃহিভক্ত, ডাক্তার দুর্গাচরণ নাগ। এই দুজন সম্পর্কে প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ একদিন মন্তব্য করেছিলেন ঃ মহামায়া তাঁর জালে সকলকে আবদ্ধ করতে পেরেছিলেন; পারেননি কেবল দুজনকে—নরেন্দ্র এবং নাগ মহাশয়কে। কী করে তাঁরা মায়ার কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন? তার উত্তরে গিরিশবাবু বলেছেন, জ্ঞানের মাধ্যমে নরেন্দ্র এত বিরাট হয়ে গিয়েছিলেন যে মায়ার জালে তিনি আঁটেননি। আর নাগমহাশয় ভক্তিভাবে নিজেকে এত ছোট করে ফেলেছিলেন যে জালের ফুটো দিয়ে তিনি গলে গিয়েছিলেন। বাস্তবিক, এই হলো দুটি পথ—*জ্ঞান* আর *ভক্তি*। জ্ঞানী বলেন, 'আমি অনন্ত, অসীম'; তাই কোনও জাল তাঁকে বাঁধতে পারে না। আর ভক্ত বলেন, 'আমি কিছুই না, ঈশ্বরই সব'। দীনতার ভাবে অতি ক্ষুদ্র হয়ে জালের ফাঁক দিয়ে তিনি সহজেই বেরিয়ে যান। মায়া এঁদের বাঁধতে পারেন না।

বর্তমান শ্লোকে তাই বলা হয়েছে, যাঁরা পরম সত্যকে জানেন তাঁরা মুক্ত হয়ে যান—*যান্তি তে পরম্*—'তাঁরা সর্বোচ্চ স্থিতি লাভ করেন'। তাহলে সমগ্র অধ্যায় জুড়ে যে-কথাগুলি বলা হলো তা এই যে, আমরা চেষ্টা করলেই মুক্ত হতে পারি; আমরা সবকিছুর অন্তর্নিহিত সত্যটি উপলব্ধি করে, সমস্ত ভেদভাবনার অবসান ঘটিয়ে বহুর মধ্যে সেই পরম এককে দর্শন করতে পারি যাঁর থেকে সবকিছু এসেছে এবং যাঁতে আবার সবকিছুই একদিন মিলিয়ে যাবে। এই একত্বের জ্ঞানটি হলেই আমরা মুক্ত। যিশুও বলেছেন, 'তুমি সত্যকে জানো, সত্যই তোমাকে মুক্ত করবে'। এটিই এই অপূর্ব অধ্যায়ের গুরুত্ব। এখানে দর্শনের বহু কথা ও সূক্ষ্মভাব ছড়িয়ে আছে।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই সব ভাবই বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণের কথা আলোচনায় উত্তরোত্তর প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ সাংখ্যদর্শন ও বেদান্তের এইগুলিই অতি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা। ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে—কি নিজের জীবনে, কি অন্যের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে—এসব চিন্তা আমাদের খুবই সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গ আসবে পরবর্তী অর্থাৎ, চতুর্দশ অধ্যায়ে যেখানে অর্জুনের প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উপদেশ শুরু করেছেন।

ইতি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগনামক ত্রয়োদশ অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত।'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

চতুর্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়বিভাগযোগ

তিন গুণের পার্থক্য বিচার

আজ আমরা গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। এই অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের কথা বলা হয়েছে। সাংখ্য, বেদান্ত দর্শন, বস্তুত ভারতবর্ষের সব ধর্মেই বিষয়টি প্রভূত গুরুত্ব পেয়েছে। এই গুণগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বিচার করি, তাহলে দেখতে পাবো আমাদের দেশ আজ এক বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। শত শত বছর ভারতবর্ষ মূলত তমোগুণের দ্বারাই আচ্ছন্ন হয়েছিল। বর্তমানে তমোগুণের পরিবর্তে রজোগুণের প্রাধান্য চোখে পড়ছে। এটি নিঃসন্দেহে উন্নতির লক্ষণ।

গত সপ্তাহে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই আমাদের সাধারণ নির্বাচন সাঙ্গ হলো। পঞ্চাশ কোটি মানুষ ভোট দিলেন। যে-সব কেন্দ্রে গণ্ডগোল হয়েছিল সে-সব জায়গায় আবার নতুন করে ভোট নেওয়া হলো। এখন গোটা দেশ ফলাফলের প্রতীক্ষায় রয়েছে। গুণের আলোচনায় দেখতে পাবেন ব্যক্তি জীবনে ও সমষ্টি জীবনে এর প্রভাব কী সুদূরপ্রসারী! ভারতবর্ষে মানবিক বিকাশের পরবর্তী পর্যায় হবে শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে রজোগুণ থেকে সত্ত্বে উত্তরণ। রজোগুণকে নিয়ন্ত্রিত ও ঠিক পথে চালিত করার জন্য জাতীয় জীবনে আজ অন্তত কিছু পরিমাণ সত্ত্বগুণের প্রয়োজন। মানবিক প্রগতির সেটিই সঠিক দিশা যে-পথে পা বাড়ালে মানবাত্মার প্রকৃত স্বাধীনতা, সুখ ও কল্যাণ সুনিশ্চিত হবে। তাই আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন ও সমষ্টি জীবন পরিচালনার দিক থেকে এই অধ্যায়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই চতুর্দশ অধ্যায়টির নাম গুণ-ত্রয়-বিভাগ-যোগ। *গুণ-ত্রয়-বিভাগ,* অর্থাৎ 'তিনটি গুণের দ্বারা প্রকৃতির বিভাজন'। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। অর্থাৎ সমগ্র প্রকৃতি তিনটি গুণে গঠিত। এই অধ্যায়ের শ্লোকগুলি আলোচনার সময় আমরা দেখতে পাবো কিভাবে তিনটি গুণ মানুষের জীবনে এবং মহাবিশ্বে তাদের কাজ করে চলে।

এই অধ্যায়টি অর্জুনের কোন প্রশ্ন দিয়ে শুরু হচ্ছে না। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আলোচনার জের টেনে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই এখানে মুখ খুলেছেন। অধ্যায়ের একেবারে শেষ দিকে অর্জুন প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সে প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন। সেখানেই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি। এখন এই অধ্যায়ের গোড়ায় আসা যাক। এটির শুরু এই ভাবে ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান বলছেন—'সকল জ্ঞানের মধ্যে সর্বোচ্চ যে জ্ঞান, যা জেনে মুনিরা দেহত্যাগের পর পরম সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, আমি তোমাকে আবার সেই শ্রেষ্ঠজ্ঞানের কথা বলব।'

ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি, 'তোমাকে আবার বলব'; *জ্ঞানানাং উত্তমম্ পরম্ জ্ঞানম্,* 'জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান'। জ্ঞান তো অনেক রকমেরই আছে। এখানে ভগবান বলছেন, জ্ঞানের ভিতর যেটি শ্রেষ্ঠ, সেটিই তোমাকে এখন বলব; অর্থাৎ *উত্তমম্ পরম্ জ্ঞানম্*। *যৎ জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে,* 'যা জেনে সকল প্রাচীন মুনিরা'; *পরাং সিদ্ধিং ইতো গতাঃ,* 'পরম সিদ্ধি অথবা এই দ্বন্দ্বময় সসীম জগৎ অতিক্রম করে "পরম পূর্ণতা" লাভ করেছেন।' কেমন করে? তার উত্তরে বলা হচ্ছে—সকল জ্ঞানের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞান করায়ত্ত করে। এইভাবে এখানে চরম জ্ঞানের প্রশংসা করা হচ্ছে। আমরা বুদ্ধিমান, আমাদের ভালোমন্দ বোধ আছে; জগৎকে আমরা এমনভাবে কাজে লাগাতে পারি যার ফলে মুক্তি আমাদের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে। এখনও পর্যন্ত আমরা জগৎ-এর নিয়ন্ত্রণে। মনুষ্যেতর জীবের তো বটেই, মানুষের জীবনও বহুলাংশে প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমরা যেন প্রকৃতির হাতে খেলার পুতুল, প্রকৃতি আমাদের তার খেয়ালখুশি মতো নাচাচ্ছে। আমরা কিন্তু এই দাসত্ব ঘোচাতে পারি। প্রকৃতির কবল থেকে নিজেদের উদ্ধার করে আপন জীবন বিকশিত করার কাজ আমরা এখনই শুরু করতে পারি। কিন্তু তার জন্য চাই জ্ঞান। কীরকম জ্ঞান? তিন গুণের বাইরে গিয়ে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়—সেই জ্ঞান। এ সুযোগ কেবল মানুষেরই আছে; একমাত্র মানুষই এই জ্ঞান করায়ত্ত করতে পারে—অন্য জীবজন্তু পারে না। অতএব যে-জ্ঞানের ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হয়েছে, তা

শেষপর্যন্ত আমাদের এমন একটি অবস্থায় পৌঁছে দেবে যা সকল *গুণ*-এর অতীত। এখানে আমরা নতুন একটি চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। সেটি কী? *ত্রিগুণাতীত* অবস্থার ধারণা। *অতীত* শব্দের অর্থ 'ঊর্ধ্বে' বা পারে, *ত্রিগুণ*-এর অর্থাৎ 'তিনগুণের' ঊর্ধ্বে। বহু ঋষি এই ত্রিগুণাতীত অবস্থায় পৌঁছে মুক্তিলাভ করেছেন। আমরাও একদিন এই অবস্থা লাভ করে মুক্ত হয়ে যাব। এই কারণেই এই তিনটি গুণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া আমাদের এত প্রয়োজন। আমাদের জীবনে এই জ্ঞানের মূল্য অপরিসীম।

ইতো গতাঃ, 'এই মনুষ্য জীবনেই তাঁরা' পরম সিদ্ধি বা উৎকর্ষের চরম শিখরে 'পৌঁছেছেন'; *ইতো* মানে, 'এই মানব জীবনেই', অর্থাৎ এই আপেক্ষিক জগতে থেকেই। এই তিনগুণের প্রকৃতি উপলব্ধি করে এবং তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে প্রাচীন ঋষিরা এই দ্বন্দ্বময় জগতের ঊর্ধ্বে উঠে ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেছিলেন। তিনটি গুণকে তাঁরা তাঁদের জীবনের প্রভু হয়ে উঠতে দেননি, তাদের দাসে পরিণত করেছিলেন।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২॥

—'যাঁরা এই জ্ঞান আশ্রয় করে আমার স্বরূপ পেয়েছেন, সৃষ্টির সময়েও তাঁরা আর জন্মান না; প্রলয়কালেও ব্যথিত হন না।'

ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য, 'এই জ্ঞান আশ্রয় করে'; *উপাশ্রিত্য* মানে 'নির্ভর করে'; *ইদং জ্ঞানম্,* 'এই জ্ঞান'; *মম সাধর্ম্যম্ আগতাঃ,* 'তাঁরা আমার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান'; এবং এই ধরনের মানুষ, *সর্গেঽপি ন উপজায়ন্তে,* 'সৃষ্টিকালেও আর জন্মগ্রহণ করেন না।' করেন না, তার কারণ তাঁরা মুক্ত; এবং *প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ,* 'সমগ্র জগৎ যখন লয় পায়, তখনও তাঁরা দুঃখবোধ করেন না'। এই হলো সেই মুক্তির প্রকৃতি। মনের এই অসাধারণ অবস্থাটি একবার কল্পনা করুন। বিবর্তনের সূত্র ধরে আপনাকে বারবার ঘুরে ফিরে এই পৃথিবীতে আসতে হচ্ছে; কিন্তু এই ধরনের মানুষ, তা তিনি পুরুষই হন আর নারীই হন, এই নিয়মের মধ্যে পড়েন না কারণ তিনি মুক্ত; তিনি তিন *গুণ*-এর পারে চলে গিয়েছেন, তিনি ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেছেন। অনুরূপভাবে, জগৎ যখন লুপ্ত হবে, তখনও তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই; তিনি অনুদ্বিগ্ন। তাৎপর্য এই, আমরা যখন উপলব্ধি করব আমাদের প্রকৃত স্বরূপ

ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন, আমরা ব্রহ্মের থেকে আলাদা কিছু নই, তখন প্রকৃতির খেলা আর আমাদের বিব্রত করতে পারবে না। তখন আমরা দ্রষ্টা হয়ে খেলাটি কেবল দেখে যাব। এই কারণেই আগে এই ভাবটির ওপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, আমাদের ভিতর একজন আছেন যিনি 'দ্রষ্টা' হয়ে সবকিছু দেখে যাচ্ছেন—তিনি সাক্ষী। আর একজন প্রকৃতির খেলায় মেতে গেছে। প্রথমটিই আমাদের সত্যিকারের স্বরূপ। স্বরূপত আমরা প্রকৃতির দাস নই। প্রকৃতির পারে যাওয়ার সব শক্তি আমাদের আছে। আমাদের একটি দিব্য অন্তঃপ্রকৃতি আছে, কিন্তু সে কথা আমরা জানি না। আর জানি না বলেই আমরা বহিঃপ্রকৃতির হাতের পুতুল হয়ে গেছি। যেমন খুশি সে আমাদের নাচাচ্ছে! কিন্তু যাঁরা প্রকৃতি, অর্থাৎ তিন *গুণ*-এর পারে চলে গেছেন, তাঁরা আর জগৎ-এর প্রলয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন না কারণ তাঁরা মুক্ত—সৃষ্টিকালে তাঁদের আর ফিরে আসতে হয় না। এই কথাই এখানে বলা হচ্ছে।

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ।। ৩।।

—'হে ভারত, মহৎ প্রকৃতি আমার যোনি; তার ভিতর আমি [সৃষ্টির] বীজ নিক্ষেপ করি; তা থেকে সকল ভূতের জন্ম হয়।'

আপাতদৃষ্টিতে একদিকে রয়েছে প্রকৃতি, অন্যদিকে পরমেশ্বর। শেষপর্যন্ত কিন্তু আমরা দেখতে পাব যে সমগ্র প্রকৃতি ঈশ্বরেরই অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সাংখ্যদর্শনে কিন্তু *প্রকৃতি* এবং *পুরুষ* দুয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। *পুরুষ* মানে ভিতরের মানুষটি, অর্থাৎ আত্মা। সাংখ্য মতে *পুরুষ* বহু, কিন্তু *প্রকৃতি* একটিই। প্রকৃতি তার তিন *গুণ*-এর জালে মানুষ বা *পুরুষকে* আবদ্ধ করে। অবশেষে এমন একদিন আসে যখন মানুষ তার বন্দীদশার সত্যটা টের পায়; তখন সে ঐ জাল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুক্তিলাভ করে। সাংখ্য-দর্শন এইভাবেই বিষয়টিকে উপস্থাপিত করেছে। সাংখ্য মতাবলম্বীরা যেমন সমগ্র *প্রকৃতি*-কে একীভূত করেছে, এক সূত্রে বেঁধেছে, বেদান্তও তেমনি বহু *পুরুষ*-কে একটি পুরুষে রূপান্তরিত করেছে। শুধু তাই নয়, *প্রকৃতি* ও *পুরুষ* উভয়কেই এক অসীম ব্রহ্মে সমন্বিত করেছে। উপনিষদের অদ্বৈত দর্শনে উভয়ের এই ঐক্য এমন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে যে, সেখানে বলা হচ্ছে—দুই নয়, এক। একটিই সত্তা আছে, যা থেকে সবকিছুর আবির্ভাব এবং পরিণামে সবকিছু

তাতেই ফিরে যাবে। সেখানে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তাকে মেনে নিলেও মূলে যেহেতু *পুরুষের* কাছ থেকেই *প্রকৃতি* এসেছে, সেই কারণে আর দ্বৈতভাব রইলো না। কিন্তু যেই *প্রকৃতি* ক্রিয়াশীল হলো, অমনি দ্বৈতভাব এসে পড়ল—মোহ ও ভ্রান্তির উৎপাত শুরু হলো। এবং আমরা তার শিকার হয়ে সবকিছু গুলিয়ে ফেললাম। শাস্ত্র স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আহ্বান করে আমাদের বলছেন—এই মিথ্যা ছলনার বেড়ি ভেঙে মুক্ত হয়ে যাও। ধর্ম বা আধ্যাত্মিক জীবনের এটিই লক্ষ্য। সব অধ্যাত্মদর্শনেরই এই এক রা—মুক্ত হও, মুক্ত হও। কিন্তু মুক্ত হব কীভাবে? কীভাবে মুক্ত হওয়া যায়? বাস্তবিক, অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি কোন কিছু যেন আমাদের বেঁধে রেখেছে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দিচ্ছে না। তখন যেন আমাদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে; স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য তখন আমাদের প্রাণ যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কোথায় মুক্তি, কীভাবে মুক্তিলাভ করব? তখন এই একটি চিন্তাই আমাদের উন্মত্ত করে তোলে।

গতকাল বার্লিন থেকে এক ভক্ত (বার্লিন গেলে যাঁর বাড়িতে আমি থাকি) একটি জার্মান ও একটি ইংরেজি সংবাদপত্র আমার কাছে পাঠিয়েছেন। কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানীর মানুষ কাতারে কাতারে কেমন করে পশ্চিম জার্মানীতে চলে যাচ্ছেন, সেই খবরটি আমাকে জানানোই তাঁর উদ্দেশ্য। দু-দেশের মধ্যে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর ছিল তা ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং পশ্চিম জার্মানীতে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের অদম্য আনন্দ ও উৎসাহ দেখে কে! যে আনন্দের স্বাদ তাঁরা আগে পাননি, এখন সেই আনন্দের স্পর্শে তাঁরা আত্মহারা! এই দৃষ্টান্ত থেকেই আপনারা বুঝতে পারছেন স্বাধীনতার মূল্য কতটা! 'হিন্দু' পত্রিকার ক্রোড়পত্রেও আজ একটি ছবি ছাপা হয়েছে। তাতেও দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার নরনারী ও শিশু পূর্ব জার্মানীর সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিম জার্মানীতে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু কেন তাঁরা এভাবে ছুটে চলেছেন? 'আমি মুক্ত, আমি মুক্ত', 'বাইরের কোন নিয়ন্ত্রণ, কোন চাপ আর আমাকে সহ্য করতে হবে না'—এই অনুভূতির আনন্দ উপভোগের জন্যই তাঁরা এরকম করছেন। মানুষের অন্তরাত্মা এটিই চায়। শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু সকলেই স্বাধীনতা চায়। ঠিক সেইরকম, *প্রকৃতি*-র দাসত্ব থেকেও আমাদের মুক্ত হতে হবে। আমাদের সকলের ভিতরেই একটি উচ্চতর বা দিব্য প্রকৃতি আছে। বাইরের প্রকৃতি একরকম। ভিতরের প্রকৃতিটি আবার এক ধরনের। দুটিই প্রকৃতি। দুটিকে নিয়েই সত্যের সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ মূর্তি। সপ্তম অধ্যায়ে (শ্লোক ৪-৬) এই প্রকৃতি দুটিকে যথাক্রমে *অপরা প্রকৃতি* এবং

পরা প্রকৃতি বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বলেছেন, 'এই মহাবিশ্ব, এই বহিঃপ্রকৃতি আমার নিকৃষ্টা *প্রকৃতি*। আর মানুষের মধ্যে যে ঐশী স্ফুলিঙ্গ বিরাজমান, সেটি আমার উচ্চতর বা প্রকৃষ্টা *প্রকৃতি*। এই দুই প্রকৃতির প্রকৃত কারণ আমিই যা বিশ্বচরাচর ধারণ করে আছে'। এই শ্লোকগুলির উপর শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে বলেছেন—*প্রকৃতি দ্বয় দ্বারেণ অহং সর্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ জগতঃ কারণম্,* 'এই দ্বিবিধ প্রকৃতির মাধ্যমে আমি, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, সমগ্র জগতের কারণস্বরূপ।' অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে এই হলো মূল ঐক্য, যেখানে প্রকৃতি ও আত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বা শুদ্ধ চৈতন্যে মিশে যায়।

মম যোনিঃ মহদ্‌ব্রহ্ম, 'আমার গর্ভ হলো এই *প্রকৃতি* যাকে *মহৎ ব্রহ্ম* অথবা বিরাট ব্রহ্মা বলা হয়'। এখন বিশ্ব প্রসবের জন্য এই ব্রহ্মাকে তো সক্রিয় করতে হবে। *তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্,* তাই 'আমি তাতে গর্ভসঞ্চার করি', যাতে সপ্রাণ বিশ্ব উদ্ভূত হতে পারে। আমিই প্রকৃতির বিশ্ব-প্রসবের একমাত্র কারণ। আজকের প্রজননতত্ত্বও (জেনেটিকস্) বলে যে, দুটি উপাদানের সংযোগের ফলেই নতুন জীবের জন্ম হয়। সেইরকম, দ্বিবিধ *প্রকৃতি* থেকেই গোটা বিশ্বের জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, 'আমি' সেই অদ্বিতীয় তত্ত্ব যা প্রজনন প্রক্রিয়া আরম্ভ করার জন্য *প্রকৃতি*-কে সক্রিয় করে তোলে। এইভাবেই নতুন নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন তা হয়, তখন *প্রকৃতি* আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশ্বপ্রসবিনী মায়ের ভূমিকায় অধিষ্ঠিতা হন। এই প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করেই আমরা বলি জগজ্জননী। এটি এক অপূর্ব চিন্তা। আমরা যে বলে থাকি *শক্তি, পরাশক্তি, আদিশক্তি*—তা সবই এই মাতৃতত্ত্বকে উদ্দেশ্য করে। বহু কবি ও লেখকের চিন্তায় এই ধারণাটি ব্যক্ত হয়েছে। বিখ্যাত জার্মান কবি ও নাট্যকার গ্যেটে তাঁর 'দ্য ফাউস্ট' (*The Faust*) নামক মহাগ্রন্থের পরিসমাপ্তি করেছেন এই বলে ঃ 'সেই চিরন্তন নারীসত্তা আমাদের নিরন্তর এগিয়ে নিয়ে চলেছেন'। অসামান্য উক্তি। বাস্তবিক, এমন একটি নারীসত্তা আছে যা চিরকালীন, যা শাশ্বতী। তাকেই আমাদের ভাষায় *প্রকৃতি, মহাপ্রকৃতি* বা জগদম্বা বলি। আবার এখানে, এই শ্লোকে পাচ্ছি পরম পিতাকে। এও দেখছি, এই পিতা-মাতার ধারণাটি সাধারণ স্তন্যপায়ী জীবের জীবন থেকে শুরু করে সৃষ্টির উচ্চতম স্তর পর্যন্ত ভারতের অধ্যাত্মচিন্তায় কিভাবে গৃহীত হয়েছে। *সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত,* 'হে অর্জুন, এই সংযোগের ফলেই সকল জীবের সৃষ্টি হয়'। এখানে আমরা দুটি তত্ত্ব পাচ্ছি ঃ ব্রহ্ম এবং *প্রকৃতি, শিব* এবং *শক্তি*। দুটিরই প্রয়োজন এবং এই দুয়ের সংযুক্তি থেকেই সমগ্র বিশ্বের আবির্ভাব। একটি কথা

শুধু এখানে মনে রাখতে হবে। সেটি এই, স্বরূপত ব্রহ্ম এবং *প্রকৃতি* অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন যে ব্রহ্ম আর শক্তি আলাদা নয়। বিশ্বসৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁরা যেন একটু পৃথক হয়েছেন। কিন্তু স্বরূপত তাঁরা এক। একজন আর একজনের শক্তি। '*শক্তি*' মানে 'ক্ষমতা'। ব্রহ্মের প্রকৃত ক্ষমতা *শক্তির* মধ্যেই প্রকাশিত এবং যৌথভাবে তাঁরা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

—'হে কুন্তীপুত্র, সকল যোনিতে যেসব দেহ উৎপন্ন হয়, মহৎ *প্রকৃতি* তাদের গর্ভ এবং আমি বীজপ্রদানকারী পিতা।'

কৌন্তেয়, 'হে অর্জুন'; *সর্বযোনিষু মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ,* 'বিভিন্ন কারণে এই বিশ্বে যতরকমের মূর্তি বা দেহ উৎপন্ন হয়'; *তাসাং,* 'তাদের সবার'; *ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিঃ,* 'গর্ভ হলেন মহৎ ব্রহ্মা বা প্রকৃতি, যিনি মাতৃতত্ত্ব'; *অহম্ বীজপ্রদঃ পিতা,* এবং 'আমি পুরুষতত্ত্ব, বীজপ্রদানকারী পিতা'। এই দুয়ের সংযোগেই গোটা বিশ্বের উদ্ভব। এ যেন মানুষের জীবনের রং-তুলি দিয়েই বিশ্ব-বিবর্তন ও বিকাশের ছবিটি আঁকা হলো। পরের শ্লোকে *গুণের* প্রসঙ্গ আসছে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

—'হে বাহুবলশালী [অর্জুন], প্রকৃতিজাত *সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ* গুণ অবিকারী দেহীকে [আত্মাকে] দেহে আবদ্ধ করে।'

প্রকৃতিসম্ভবাঃ, 'প্রকৃতি থেকে জাত', তিনটি গুণ আছে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ তিনটি গুণ দিয়ে তৈরি। সেগুলি কী? সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। সমগ্র প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। সমগ্র বিশ্বেই এই তিনগুণের খেলা চলছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই তিন গুণ, *নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনম্ অব্যয়ম্,* কোন না কোনভাবে তাকে 'কবলিত ও বদ্ধ করে'। অর্থাৎ প্রকৃতির এই তিন শক্তি নরনারীকে বশীভূত ও গোলাম করে রাখে। *নিবধ্নন্তি* কথাটির অর্থ 'যা আবদ্ধ করে'; *দেহে,* অর্থাৎ 'শরীরে'; দেহিনম্, 'দেহস্থ আত্মাকে', যিনি স্বরূপত *অব্যয়ম্,* অর্থাৎ 'অবিনাশী'। মানুষের দেহের মধ্যে যিনি *দেহি,* অর্থাৎ আত্মা, তিনি অক্ষয়। তাঁর বিনাশ নেই। কিন্তু পঞ্চভূতের

ফাঁদে পড়ে মানুষ সীমিত ও ক্ষুদ্র হয়ে যায়, ভুলে যায় তার সত্যিকারের পরিচয়, তার স্বরূপ। কেন এটা হয়? হয়, তার কারণ এই যে তিনটি গুণের কথা বলা হলো, সেই গুণগুলি তখন তার ওপর কাজ করতে শুরু করেছে। কিভাবে তারা কাজ করে, সে কথা পরে বর্ণনা করা হবে। আপাতত এইটুকু বলা হচ্ছে যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, প্রকৃতির এই তিনটি গুণ বা উপাদানের প্রভাবে মানুষ তার যথার্থস্বরূপ ভুলে যায়।

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

—'হে নিষ্পাপ [অর্জুন], এই তিন গুণের মধ্যে নির্মলতার দরুন সত্ত্ব প্রকাশক ও নিরুপদ্রব; [তা সত্ত্বেও] সুখে আসক্তি ও জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা [আত্মাকে যেন] আবদ্ধ করে।'

এখন দেখা যাক সত্ত্বগুণ কিভাবে মানুষের ওপর কাজ করে। *নির্মলত্বাৎ*, 'নির্মলতাহেতু'; সত্ত্বগুণ নির্মল ও স্বচ্ছ; *প্রকাশকম্*, 'দীপ্তিমান; *অনাময়ম্*, 'নিষ্কলুষ'। এইটিই সত্ত্বগুণের প্রকৃতি—শুদ্ধ, স্বচ্ছ, নিষ্কলুষ ও দীপ্তিমান। *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি*, 'সুখের প্রতি আসক্তি দ্বারা এই গুণ মানুষকে বেঁধে ফেলে'। যেখানে প্রসন্নতা বিরাজ করছে, বুঝবেন সেখানে সত্ত্বগুণ রয়েছে। যখন মানুষ সুখী ও আনন্দে পরিপূর্ণ, জানবেন তার কারণ সত্ত্বগুণ। কিন্তু সেই সুখ আবার বন্ধনেরও কারণ হয়, কারণ সুখ পেতে পেতে সুখের প্রতি একটা আসক্তি গড়ে ওঠে। তারপর, *জ্ঞানসঙ্গেন চ অনঘ*, হে নিষ্পাপ [অর্জুন], এই সত্ত্বগুণ আবার *জ্ঞানসঙ্গ* বা 'জ্ঞানের প্রতি আসক্তি দিয়েও মানুষকে বাঁধে'। সত্ত্বগুণ এইভাবে সুখের প্রতি আসক্তি ও জ্ঞানের প্রতি আসক্তি দিয়ে মানুষকে বদ্ধ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সত্ত্বগুণও বন্ধনের কারণ। কিন্তু সত্ত্বের বন্ধন রজঃ এবং তমঃ-এর মতো অতটা খারাপ নয়। মনে রাখতে হবে, গুণ মাত্রেই জীবের বন্ধনের কারণ; সকল গুণের পারে তার স্বরূপের নিত্য অবস্থিতি। গুণাতীত অবস্থাই তার প্রকৃত স্বরূপ। এই অধ্যায়ের শেষে আমরা সেই *গুণাতীত* অবস্থা, অর্থাৎ 'যিনি তিন গুণের পারে চলে গিয়েছেন', সেই কথা পাব। এমন যে গুণাতীত মানুষ, তিনি কীরকম আচরণ করেন, কীভাবে জীবনযাপন করেন? এই প্রশ্ন অর্জুন পরে করবেন।

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

—'হে কুন্তীপুত্র, জেনো যে রজোগুণের প্রকৃতি হচ্ছে কামনা, যা তৃষ্ণা ও আসক্তি জাগায়; তা [এই রজোগুণ] কর্মে আসক্তি দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে।'

বিদ্ধি কৌন্তেয়, 'হে অর্জুন জেনো', রজোগুণ হলো *রাগাত্মকং,* অর্থাৎ 'কামনাই তার স্বভাব'। যেখানেই *রাগ* অর্থাৎ 'কামনা', সেখানেই *তৃষ্ণা* অর্থাৎ 'লিপ্সা' এবং *সঙ্গ* বা 'আসক্তি' থাকবেই থাকবে। *সমুদ্ভবম্,* 'রজোগুণ জন্ম দেয়'; কার? *তৃষ্ণা* এবং *সঙ্গ*-এর, অর্থাৎ 'অভিলাষ ও আসক্তির'। *তৃষ্ণা* কথাটির অর্থ পিপাসা, বাসনা, লিপ্সা। বুদ্ধের উপদেশে এই *তৃষ্ণা* কথাটি বারবার এসেছে। তিনি বলেছেন, সংসার, দ্বন্দ্ব ও সকল বন্ধনের মূলেই এই তৃষ্ণা। তাই তৃষ্ণার ঊর্ধ্বে আমাদের যাওয়া চাই। সেই অবস্থায় গেলে তবেই নিস্তার, তখনই আমরা মুক্ত হব। তখন আর বাইরের প্রকৃতি কোনমতেই আমাদের নাচাতে পারবে না। এখানে তাই ভগবান বলছেন, এই রজোগুণ *নিবধ্নাতি দেহিনাম্,* 'জীবকে বদ্ধ করে'; *কৌন্তেয়,* 'হে কুন্তীপুত্র'; *কর্মসঙ্গেন,* 'কর্মে আসক্তির দ্বারা'। যেখানেই তৃষ্ণা বা বাসনা, সেখানে বাসনাটি ব্যক্ত করার প্রচেষ্টা বা প্রবণতা থাকবেই থাকবে। তাকেই কর্ম বলে। আর এইভাবে তৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে আমরা একের পর এক কর্ম করে চলি। এই কর্মের ধরন দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন রজোগুণ একজন মানুষের ওপর কিভাবে কর্তৃত্ব করে চলেছে। যিনি *দেহী,* দেহের ভিতর যিনি বাস করছেন, *কর্মসঙ্গেন,* 'কর্মে আসক্তির ফলে', তিনি যেন বদ্ধ হয়ে যান।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্ ।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮॥

—'এবং হে ভারত [অর্জুন], জেনো, তমোগুণ অজ্ঞানসম্ভূত, সকল দেহধারীর [পক্ষে] মোহজনক; তা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা আবদ্ধ করে।'

তমোগুণের জন্ম *অজ্ঞান* বা অজ্ঞতা থেকে; *মোহনং সর্বদেহিনাম্,* এবং 'সব দেহধারী জীবের পক্ষে তা মোহজনক'। যেখানেই ভ্রান্তি, অর্থাৎ ভুলচুক দেখবেন, সেখানেই লক্ষ্য করে দেখবেন তমোগুণ রাজত্ব করছে। ভুল পথে চালিত হওয়া মনুষ্যজীবনের এক বিরাট অভিশাপ। মানুষ কীভাবে মোহগ্রস্ত হয়? *প্রমাদ আলস্য নিদ্রাভিঃ,* 'প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রা দ্বারা'। *প্রমাদ* কী? প্রমাদ হলো "মনোনিবেশ ও সতর্কতার অভাব"। *আলস্য* হলো সর্বদাই একটা "ক্লান্তির ভাব" এবং *নিদ্রা* হলো "ঘুম"। তৎ *নিবধ্নাতি,* 'তা বদ্ধ করে'; *ভারত,* 'হে

অর্জুন'। আপনি যখন তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তখন আপনি মনোযোগ অথবা একাগ্রতা হারাবেন। মানুষের জীবনে মনোযোগী হওয়ার মূল্য অপরিসীম। কিন্তু যতক্ষণ তমোগুণের আধিক্য থাকবে ততক্ষণ আপনার ভিতর একাগ্রতা আসবে না। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক হচ্ছে আলস্য, কুঁড়েমি বা সর্বদা একটা ক্লান্তির ভাব। কেউ ক্লান্ত হলে, সেই সময় তার মধ্যে তমোগুণের উপস্থিতি চোখে পড়ে। সবশেষে আসছে *নিদ্রা* বা 'ঘুম'। কাউকে কাউকে দেখবেন, দিনরাত পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে; কাজকর্মে তার এতটুকু আগ্রহ নেই। ঐ হলো তমোগুণের চরিত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, তমোগুণের দরুণই অসতর্কতা, অবসাদ ও ঘুম পেয়ে বসে। প্রত্যেক দেহধারী জীবই তমোগুণের এই মোহগ্রস্তকারী শক্তির শিকার। এইভাবেই এই শক্তি মানুষকে বন্ধনে বাঁধে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণই বন্ধনের কারণ, যদিও তাদের স্তরের পার্থক্য আছে। গুণের মধ্যে তমোগুণের স্থান সকলের নিচে, এটি সকলের নিকৃষ্ট। সর্বোৎকৃষ্ট হলো সত্ত্ব।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

—'হে ভারত, *সত্ত্ব* সুখে আসক্ত করে, *রজঃ* কর্মে; কিন্তু তমঃ বিবেক আচ্ছন্ন করে অনবধানতা [বা ভ্রান্ত ধারণায়] লিপ্ত করে।'

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি, 'সুখের মধ্যে সত্ত্বগুণ আত্মপ্রকাশ করে'। আপনি যখন সুখ অনুভব করেন, আনন্দে থাকেন, তখন বুঝতে হবে আপনার ভিতর সত্ত্বগুণের আধিক্য রয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, যেখানেই সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, সেখানেই আনন্দ। আপনার মনের আনন্দ দেখেই আপনি তা বুঝতে পারবেন। *রজঃ কর্মণি ভারত,* এবং 'রজোগুণ কর্মে আসক্ত করে'। রজোগুণ যখন আপনার ওপর আধিপত্য করে, তখন আপনার মনে হয় 'এটা করি, ওটা করি।' ফলে মন চঞ্চল হয়। মানুষের ভিতর *রজঃ* এভাবেই কাজ করে। *জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত,* 'তমোগুণ এমনভাবে জ্ঞানকে আবৃত করে, ঢেকে দেয় যে দৃষ্টির স্বচ্ছতা আর থাকে না; যা থাকে তা কেবল ভ্রান্তি বা অনবধানতা।' এই অজ্ঞতা থেকে একধরনের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। কারো মধ্যে যদি এ ধরনের ভাব দেখা যায় তো বুঝতে হবে তার ভিতর *তমঃ* কাজ করে চলেছে। কতবারই না আমরা ভুলচুক করে বসি! যা আমাদের

করা অনুচিত এমন কত অন্যায় করে ফেলি! এসব হয় তমোগুণের প্রভাবে। তাই যখনই আমাদের বিপথচালিত হওয়ার কোন, সম্ভাবনা দেখা দেবে, তখনই নিজেদের উদ্দেশ্যে বলা উচিত ঃ 'আমার মধ্যে তমোগুণের উৎপাত শুরু হয়েছে; আমাকে সতর্ক হতে হবে।' এই জ্ঞান নিজেকে যেমন বাঁচায়, তেমনি অন্যদেরও সাহায্য করে। যে জিনিসকে যেমনভাবে দেখা উচিত, তা আমরা প্রায়শই দেখি না। এর কারণ আমাদের মনটি বিভ্রান্ত। আমরা যখন বলি, 'আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি; কী করব বুঝে উঠতে পারছি না', তখন বুঝতে হবে তমোগুণের প্রাবল্য হয়েছে।

সত্ত্ব, রজঃ ও *তমঃ*, এই যে তিনটি গুণের কথা বলা হলো, এদের কোন না কোনটি একেক সময় ব্যক্তি জীবনে প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ আলাদাভাবে থাকে না। প্রকৃতির মধ্যেও যেমন তারা মিলেমিশে থাকে, আমাদের ভিতরেও তাই। তা সত্ত্বেও কোন সময় সত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটে, কোন সময় রজোগুণের, আবার কোন সময় তমোগুণের। তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হলেও, বিশেষ কোন একটি গুণের প্রাধান্য বা আধিক্যের প্রকাশ ঘটতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

—'হে ভারত [অর্জুন] রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে' সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হয়; ঠিক একইভাবে সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করে রজোগুণ আত্মপ্রকাশ করে; তেমনি তমোগুণ মাথাচাড়া দেয় সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণকে অভিভূত করে।'

হে অর্জুন, *রজঃ* ও *তমঃ*-কে অভিভূত করে *সত্ত্ব* গুণ প্রকাশিত হয়। যখন তা হয়, সে অবস্থাটিকে *সত্ত্ব*-প্রধান বলা হয়ে থাকে। সে অবস্থায় *রজঃ* ও *তমঃ* থাকে বটে, তবে খুব একটা মাথা তুলতে পারে না। ঠিক সেইভাবে *রজঃ* আত্মপ্রকাশ করে *সত্ত্ব* ও *তমঃ*-কে দাবিয়ে। আবার *তমঃ*-র আত্মপ্রকাশ *রজঃ* এবং *সত্ত্ব*-এর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এইভাবে কোন একটি গুণ অন্য দুটি গুণের ওপর আধিপত্য করে। আমরা প্রতিদিনই এইসব অবস্থার সম্মুখীন হই। এই অবস্থা সম্পর্কে যদি আমাদের সামান্য একটু সচেতনতা থাকে, তাহলে আর কথায় কথায় মনোবিজ্ঞানী অথবা মনোরোগ

বিশেষজ্ঞের দরজায় সাহায্যের জন্য হত্যে দিতে হয় না; আমরা নিজেরাই নিজেদের উন্নত করতে পারি, দোষত্রুটিগুলো শুধরে নিতে পারি। তার জন্য প্রয়োজন, কী পরিস্থিতিতে আমরা রয়েছি তা জানা। তা জানা থাকলে আমরা নিজেদের উদ্দেশ্যে বলতে পারি, 'হ্যাঁ, আমার ঐ শত্রুটি হানা দিয়েছে; এবার আমাকে সতর্ক হতে হবে।' মানুষের মধ্যে যখন এই *সতর্কতা* আসবে, তখন সে নিজেই নিজের প্রভু হয়ে তার চরিত্রকে বিকশিত করবে।

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১॥

—'এই দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে যখন জ্ঞানের দীপ্তি প্রকাশ পায়, তখন এটি জেনো সত্ত্বগুণ প্রবল হয়েছে।'

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *যদা,* 'যখন'; *অস্মিন্ দেহে,* 'এই মানব শরীরে', *সর্বদ্বারেষু,* 'সব ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে'; *প্রকাশ উপজায়তে,* 'জ্ঞানের দীপ্তি উৎপন্ন হয়', অর্থাৎ প্রকাশিত হয়। [এ কথার অর্থ, ইন্দ্রিয়গুলি সব শান্ত অবস্থায় রয়েছে।] এবং এই দীপ্তি কোথা থেকে আসে? একমাত্র *জ্ঞানং,* অর্থাৎ 'জ্ঞান' থেকে। *তদা,* 'তখন'; *বিদ্যাৎ,* 'জেনো'; *বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত,* 'সত্ত্বগুণ অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছে', অর্থাৎ প্রবল হয়েছে। জ্ঞানের উপস্থিতিতে যখন অন্তরে এইরকম শান্তভাব আসে, তখন আপনি নিশ্চিত জানবেন যে সত্ত্বগুণ প্রাধান্যলাভ করেছে। পরের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা ।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২॥

—'হে ভরতশ্রেষ্ঠ, রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি, কর্মের উদ্যম, অস্থিরতা, বাসনা—এগুলি সব জাগ্রত হয়।'

লোভঃ, 'লোভ'; প্রবৃত্তিঃ, 'কর্মের প্রতি আসক্তি'; *কর্মনাম্ আরম্ভঃ,* 'নিত্যনতুন কর্মের পরিকল্পনা'; *অশমঃ,* 'অস্থিরতা'; *স্পৃহা,* অর্থাৎ 'বাসনা'। এসব লক্ষণ দেখলেই বুঝবেন, এগুলি যে ঘটছে, তার কারণ ঐ সময়ে রজোগুণের প্রাধান্য হয়েছে, আর কিছু নয়। *রজসি এতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ,* 'হে ভরতশ্রেষ্ঠ, রজোগুণ প্রবল হলে তখনই এইসব কর্ম ও ইচ্ছা মানুষকে পেয়ে বসে।' *লোভঃ* হচ্ছে 'লোলুপতা'—আমি এটা চাই, আমি ওটা

চাই; তাতেও আমার হবে না, আমার আরো চাই—এসবই রজোগুণের লক্ষণ। *অশমঃ* মানে 'বল্গাহীন', অসংযত অস্থিরতা। ফলে কর্ম থেকে আপনার নিষ্কৃতি নেই। যেন ভিতরের একটা শক্তি আপনাকে নিরন্তর তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এবং আপনি কর্মের পর কর্ম করে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। আপনি স্বেচ্ছায় করছেন না, কোন অদৃষ্ট শক্তি যেন আপনার ঘাড় ধরে করাচ্ছে। *স্পৃহা* হলো 'বাসনা'। *রজসি এতানি জায়ন্তে,* 'রজোগুণের প্রাবল্য হলে মানুষের মধ্যে এই সব ভাবের উদয় হয়।'

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩॥

—'হে কুরুপুত্র, তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করলে বুদ্ধির মলিনতা, উদ্যমহীনতা, মতিভ্রম এবং মূঢ়তা, এইসব উৎপন্ন হয়।'

যখনই কোন ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির মালিন্য, উদ্যমহীনতা, মতিভ্রম এবং মূঢ়তা চোখে পড়বে, নিশ্চিত জানবেন তার ভিতর *তমঃ* বা তমোগুণের আধিক্য ঘটেছে। *অপ্রকাশঃ* হলো 'আলোর অভাব'; অর্থাৎ সেই মানুষটির মধ্যে আলোর নামগন্ধ নেই। কেন? তার কারণ তার মনটি যেন সম্পূর্ণভাবে মেঘে ঢাকা। *অপ্রবৃত্তিঃ চ,* 'কাজ করার কোন ইচ্ছা নেই'। তার সর্বদাই মনে হয়—বিছানায় একটু গড়িয়ে নিই। এই ধরনের মনোভাবকে বলে *অপ্রবৃত্তিঃ,* 'কর্মে অনীহা'। *প্রমাদো* হলো 'মতিভ্রম' বা ভুলবোঝার প্রবণতা এবং মোহ হলো 'মূঢ়তা'। বলা হচ্ছে, *তমসি এতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে,* 'তমোগুণ বেড়ে গেলে এইসব বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে ফুটে ওঠে'। একটু লক্ষ্য করলেই আপনি বুঝতে পারবেন তমোগুণ প্রবল হয়েছে কিনা। আর টের পাওয়া মাত্রই আপনি নিজের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'বুঝেছি, আমার মধ্যে এখন *তমঃ*-র উৎপাত শুরু হয়েছে!' আমি যে একটা অন্যায় কিছু করছি, এই সচেতনতাও মন্দের ভালো; কারণ এই সচেতনতাই অন্যায় কর্মের হাত থেকে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে। তাহলেই দেখুন জ্ঞানের মূল্য কতখানি! বাস্তবিক, জ্ঞান আমাদের উন্নত করে। চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৮ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : *ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে,* 'জীবনে জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছুই নেই'। *জ্ঞান* হলো পরম শোধক। জল দেহ শুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু মন শুদ্ধ করতে পারে একমাত্র জ্ঞান। তাই জ্ঞানের এত কদর। এই জ্ঞান হলে আমরা যেমন নিজেদের

জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারব, তেমনি যাদের দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তেছে, তাদের জীবনও ঐ জ্ঞানের প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এই জ্ঞানের আলোকে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যেও কোন্ গুণের প্রাধান্য হচ্ছে বা না হচ্ছে, কি অবস্থায় তারা আছে এগুলি বুঝে তাদের আমরা পথ দেখাতে পারি।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ।। ১৪।।

—'যখন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, তখন যদি দেহধারী মানুষের মৃত্যু হয়, তাহলে সে মহদাদি উপাসকদের নির্মল লোকগুলি প্রাপ্ত হয়। [নিষ্কলুষ লোকে গতি হয়]।'

যদি, *দেহভৃৎ,* অর্থাৎ 'দেহধারী মানুষ'; *প্রলয়ং যাতি,* 'মারা যায়'; *যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে,* 'যখন সত্ত্বগুণ সবচেয়ে প্রবল'; *তদা,* 'তখন'; *অমলান্ উত্তমবিদাং লোকান্ প্রতিপদ্যতে,* 'তিনি সেই ধরনের উচ্চ পবিত্র লোকগুলিতে স্থানলাভ করেন যেখানে হিরণগর্ভাদি উপাসকেরা গিয়ে থাকেন'। *অমলান্* কথাটির অর্থ, 'নিষ্কলুষ বা পবিত্র'; *উত্তমবিদাং লোকান্* মানে, 'সেই সব লোক বা স্থান যেখানে মহৎ ও জ্ঞানীরা ইতঃপূর্বেই গিয়েছেন'। কেবল *সত্ত্বগুণের* কল্যাণেই আপনি এই জাতীয় ঊর্ধ্বলোকে যেতে পারেন। *প্রতিপদ্যতে,* অর্থাৎ সত্ত্বগুণের অবস্থা 'আপনার ভবিষ্যৎ অস্তিত্বকে অতি ঊর্ধ্বস্তরে নিয়ে যায়।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে ।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ।। ১৫।।

—'রজোগুণবৃদ্ধিকালে মৃত্যু প্রাপ্ত হলে [মানুষ] তাঁদের মধ্যে জন্মায় যাঁরা কর্মে আসক্ত; ঠিক সেইভাবে, তমোগুণবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হলে [সে] মূঢ় যোনিতে জন্মায়।'

রজোগুণের আধিক্যসম্পন্ন, অর্থাৎ প্রবল রজোগুণী কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে তিনি আবার এমন পরিবেশে জন্মাবেন যেখানে চারপাশের মানুষ তীব্রভাবে 'কর্মের প্রতি আসক্ত', অর্থাৎ *কর্মসঙ্গিষু*। ফলে তিনিও কর্মের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত হবেন। আবার মৃত্যুর সময় যদি কেউ প্রবল তমোগুণসম্পন্ন হয়ে থাকেন, তিনি *মূঢ়যোনিষু,* অর্থাৎ 'নির্বোধদের' মধ্যেই জন্মাবেন। এইভাবে *তমঃ* বা তমোগুণের আধিক্য হলে সচরাচর আমরা পশু ইত্যাদি হয়ে জন্মগ্রহণ করি।

এইখানেই বিপদ। এরকম হলে জীবনের উৎকর্যতার বিচারে ও বিবর্তনের মানদণ্ডে আমাদের নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পাশ্চাত্যে এই প্রসঙ্গ উঠলেই সেখানকার মানুষ প্রতিবাদ করেন এবং বলেন—'মানুষ পশু হয়ে জন্মাবে, এটা কী করে সম্ভব?' তাঁদের এই বিরোধিতার কারণ আমরা বুঝি। ঐসব দেশের চিন্তায় মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীবজন্তুর মধ্যে যে বিস্তর ব্যবধান আছে, সেটি স্বীকৃত। আমাদের দেশে ওরকম কোন তত্ত্ব আমরা প্রচার করি না। বস্তুত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে খ্রিস্টানরা মনে করেন জীবজন্তুদের আত্মা বলে কিছু নেই। এটি ওঁদের মত। আমরা ও মতে বিশ্বাসী নই। আমরা বলি, তাদের আত্মা আছে বৈকি। মানুষের সঙ্গে তাদের তফাৎ শুধু এই যে, তাদের অপরিণত দেহ আত্মার মহিমা ও সৌন্দর্যটি প্রকাশ করতে পারে না, যা মানুষ ভালোভাবে পারে। যেহেতু আমরা মানুষ ও ইতর জীবজন্তুর মধ্যে কোনও অলঙ্ঘনীয় দেওয়াল খাড়া করিনি, সেইহেতু আমরা বলি, হ্যাঁ, কর্ম অনুসারে জীবের উর্ধ্বগতিও হতে পারে, আবার নিম্নগতিও হতে পারে। যদি কোনও মানুষের কর্ম এমন হয় যে তার সুপ্ত বাসনাগুলির প্রকাশ ও পরিতৃপ্তির জন্য পশু বা তার চেয়েও হীন কোন শরীরের দরকার, তাহলে তার মনুষ্যেতর প্রাণী হয়ে জন্মানো কেউই ঠেকাতে পারবে না। এই হলো আমাদের ধর্মের শিক্ষা, যা মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে মূলগত ব্যবধান স্বীকার করে না; বরং বলে যে, এক সত্তা সবকিছুর মধ্যেই সমভাবে প্রবহমান। এই শিক্ষা বিবর্তন সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধারার অনেকটা কাছাকাছি, যে চিন্তাধারা বলে মানুষ ক্রমশ নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উঠে এসেছে। তাই যদি কেউ এখানে, এ-জন্মে ভালো আচরণ না করেন, যদি কারো প্রবণতা এমনই হয় যে পশু-শরীর ছাড়া তাঁর বাসনা-কামনা তৃপ্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তাহলে তাঁকে পশু শরীর ধারণ করতেই হবে। তাঁর পশুজন্ম অবধারিত, তা তিনি পছন্দ করুন আর নাই করুন। নিয়ম তো আর কারো পছন্দ-অপছন্দের ধার ধারে না। বেদান্ত এ প্রসঙ্গে বলে, তিনি ঐ ধরনের জন্ম নিতে বাধ্য। 'বাধ্য' কথাটার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

যখন আমি পাশ্চাত্যে বক্তৃতা দিয়েছি, তখন অনেকে প্রশ্ন করেছেন : 'মনে করুন আমি মারা গেলাম; আমি কি এরপর শ্বেতাঙ্গদের দেশে জন্মাব? নাকি কৃষ্ণাঙ্গ অথবা বাদামী রঙের মানুষদের দেশে?' ওঁদের ঐ একটা ভয়! তার উত্তরে মজা করে আমি বলতাম, 'আপনি খুব ভালো কর্ম করেছেন, তাই আপনি অ-শ্বেতকায়দের মধ্যেই জন্মাবেন।' একথা খুবই সত্যি যে আপনার পরবর্তী জন্ম নির্ভর করছে 'কি ধরনের চিন্তা এবং কি ধরনের কাজ আপনি করেছেন',

একমাত্র তারই ওপর—*যথা কর্ম যথা শ্রুতম্*। এই জন্মে আপনার জীবনের প্রকৃতিই আপনার ভবিষ্যৎ জন্মটি নির্ধারণ করে দেবে। এদেশের মানুষ বলেন, 'পশুর মতো প্রবণতা ও বাসনা যদি আপনার থেকে থাকে, তাহলে পশুদেহ ধারণ করে সেই বাসনা মিটিয়ে নিতে বাধা কোথায়?' কারণ পশুর মতো বাসনা একমাত্র পশুদেহেই তৃপ্ত হতে পারে। অতএব দেখতেই পাচ্ছেন, জীবনের যে নিয়ম তা আপনার-আমার পছন্দ-অপছন্দের দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে না। *কর্ম* একটা নিয়ম। বাইবেলেও এই কর্মতত্ত্ব আছে। সেখানে বলা হয়েছে—তুমি যেমন বীজ পুঁতবে, তেমনি ফসল হবে। সাধারণ মানের বীজ পুঁতলে আপনি তার থেকে সরেস চাল বা গম পেতে পারেন না। আপনি যদি সৎ কাজ করে থাকেন, সৎ চিন্তা করে থাকেন, মানুষকে সাহায্য ও সেবা করে থাকেন, খুব ভালো কথা। আপনার পরবর্তী জীবন অবশ্যই এখনকার জীবনের থেকে অনেক ভালো, অনেক সুন্দর হবে। কিন্তু আপনি যদি লোককে সর্বদা কষ্ট দেন, মন্দ কাজে লিপ্ত থাকেন, তাহলে স্বাভাবিক কারণেই আপনার নিকৃষ্ট ধরনের জন্ম হবে। এ ব্যাপারে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা না গেলেও একথা সত্যি, প্রকৃতি জানে কিভাবে এসব ঘটাতে হয়। প্রকৃতিই এই কাজ করে, সচেতন মন করে না, এই যা তফাৎ। অতএব আপনি সাদা বাংলায় বলতে পারেন ঃ যে জীবন আপনি পেয়েছেন, তা আপনার প্রাপ্য ছিল বলেই পেয়েছেন। আপনার অতীত কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনা অনুসারে প্রকৃতির এটিই বিধান। অতএব এ অবস্থায় প্রতিবাদ করে এ কথা বলা বৃথা যে, পশু হয়ে জন্মানো আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্মানজনক। এর একমাত্র প্রতিকার, *আরো* ভালোভাবে জীবনযাপন করা। যতক্ষণ আমরা সৎ জীবনযাপন করছি, প্রাত্যহিক জীবন যতদিন আমাদের ক্রমশ উন্নত হতে থাকবে, ততদিন আমাদের কোন ভয় নেই। তাহলে মূল ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, *সত্ত্ব, রজঃ* ও *তমঃ* এই তিনটি গুণের যেটি আমাদের ওপর আধিপত্য করবে, সেই অনুসারেই আমাদের পরবর্তী জীবনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হবে।

মূঢ়যোনি মানে পশুর জন্ম, যা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই জাতীয় মনুষ্যেতর প্রজাতির সম্বল কেবল সহজাত প্রবৃত্তিগুলি; তাদের কোন জ্ঞান নেই। জ্ঞানে কেবল মানুষেরই অধিকার।

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্ ।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬॥

—'[তাঁরা, অর্থাৎ জ্ঞানীরা] বলেন ভালো কর্মের ফল *সাত্ত্বিক* এবং নির্মল; *রাজসিক* কর্মের ফল [নিশ্চিতভাবে] দুঃখ এবং *তামসিক* কর্মের ফল অজ্ঞানতা।'

সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে যে কর্ম, তার ফল *নির্মলম্‌* বা শুদ্ধ। *নির্মলং ফলম্‌, সাত্ত্বিক কর্ম* বা পুণ্য কর্ম থেকে 'বিশুদ্ধ ফল' পাওয়া যায়। *রজসস্তু ফলং দুঃখম্‌*, 'রজোগুণ থেকে যে কর্ম, তার ফল দুঃখ এবং যন্ত্রণা'। বহির্মুখী এবং কর্মচঞ্চল মন *রজঃ* বা রজোগুণে পরিপূর্ণ থাকে বলে পরিণামে খুব কষ্ট পায়। আর *তমঃ* বা তমোগুণের ফল? *অজ্ঞানম্‌*, 'অজ্ঞানতা'। *অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌*, 'তামসিক কর্মের ফল চরম অজ্ঞানতা'।

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

—'*সত্ত্ব* থেকে জ্ঞান জন্মায়, *রজঃ* থেকে লোভ এবং *তমঃ* থেকে নির্বুদ্ধিতা, ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা।'

সত্ত্বগুণের মাধ্যমে জ্ঞান আসে এবং রজোগুণ মানুষের মধ্যে আসক্তির সৃষ্টি করে। লোভ অথবা লালসা রজোগুণের দান। *প্রমাদমোহৌ তমসো*। তমোগুণ মানুষকে কী দেয়? 'নির্বুদ্ধিতা এবং মূঢ়তা'—*প্রমাদ* এবং *মোহ*। দুটিই অশুভ, মনের দুর্গতির চরম অবস্থা। বুদ্ধির অস্বচ্ছতা, ভ্রান্তি এবং চরম অজ্ঞানতা—এ সব কিছুই তমোগুণ থেকে আসে।

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

—'*সত্ত্বগুণে* স্থিত ব্যক্তিরা ঊর্ধ্বলোকে যান; *রাজসিক* বৃত্তির মানুষেরা মধ্যলোকে থাকেন; এবং *তামসিক* ব্যক্তিরা, নিকৃষ্টগুণবৃত্তির মানুষেরা, নিম্নলোকে যান।'

যাঁরা সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা ঊর্ধ্বলোকে যান। এর মানে এই নয় যে তাঁরা দৈহিকভাবে ওপর দিকে উঠে যান। কথাটির তাৎপর্য হলো, বিবর্তনের যেসব ক্রম বা ধারা আছে, সেখানে তাঁদের স্থান উঁচুতে। আধুনিক জীববিদ্যায় এসব শব্দ এখন মাঝে মধ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, যদিও বিজ্ঞানীরা সাধারণত এই জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করেন না। কিন্তু মানুষ প্রসঙ্গে যখন তাঁরা কথা বলেন,

তখন এসব পরিভাষার শরণ নিতে তাঁরা বাধ্য হন। এখানে যে *ঊর্ধ্বং* অর্থাৎ ঊর্ধ্বে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা কেবল মূল্যবোধ বা গুণগতমানের দৃষ্টিকোণ থেকে; জড়বিজ্ঞানের চোখে একথা অর্থহীন, কারণ সেখানে ওপরে যাওয়া বা নিচে নামার কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু মনুষ্যজীবনের বিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি এমন এক বাস্তব সত্য যাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা যায় না।

তাই বলা হচ্ছে, *ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা,* 'যাঁরা সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা ঊর্ধ্বলোকে যান'। এর অর্থ, বিবর্তন পরম্পরায় তাঁরা ঊর্ধ্বস্তরে উঠে যান। আজকের জীববিদ্যাও এই কথার প্রতিধ্বনি করে বলছে যে, হ্যাঁ, মানুষের উন্নততর বিবর্তন সম্ভব। মনো-সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে এখনকার এই মানুষই ক্রমশ উন্নত হয়ে *পরিপূর্ণতা* লাভ করতে পারে। বাস্তবিক, বিবর্তনের লক্ষ্যও এই পরিপূর্ণতা লাভ। প্রকৃতি যখন আপনাকে প্রশ্ন করবে, 'তুমি কি আপ্তকাম? তুমি কি পরিপূর্ণতা লাভ করেছ?' তখন যেন আপনি বলতে পারেন, 'হ্যাঁ, করেছি বৈকি।' এই অবস্থায় পৌঁছানোই বিবর্তনের লক্ষ্য। *মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ,* 'রজোগুণ যাঁদের ওপর প্রভুত্ব করে, তাঁরা মধ্যলোকে থাকেন', অর্থাৎ একটা মাঝামাঝি অবস্থায় থাকেন। তাঁরা মানুষ হয়ে মনুষ্যলোকেই থাকেন; তাঁদের বিবর্তন হয় না, কারণ রজোগুণ তাঁদের বশ করে রেখেছে। এরপর আসছে *তামসাঃ,* অর্থাৎ 'যাঁরা তামসিক'; *অধো গচ্ছন্তি,* 'নিচে নেমে যান', অর্থাৎ তাঁদের হীন জন্ম হয়। কেন? তার কারণ *জঘন্যগুণবৃত্তস্থা,* 'তাঁদের কাজকর্ম অতি জঘন্য প্রকৃতির'। তমোগুণ প্রবল হলে তাঁদের ঐরকম হীনগতি হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, *সাত্ত্বিক* মানুষদের ঊর্ধ্বগতি হয়; যাঁরা *রাজসিক,* তাঁরা মাঝামাঝি স্তরে থাকেন এবং যাঁরা *তামসিক* প্রকৃতির, বিবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁদের নিম্নগতি হয়ে থাকে। এই সুদুরপ্রসারী বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনটি *গুণ* মানুষের জীবনে কিভাবে কাজ করে চলেছে।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

—'দর্শক যখন তিনটি *গুণ* ব্যতীত অন্য কোন কর্তাকে না দেখেন এবং তিন গুণের অতীত তাঁকে [আত্মাকে] জানেন, [তখন] তিনি আমার স্বরূপ লাভ করেন।'

এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক। *যদা দ্রষ্টা অনুপশ্যতি,* 'দ্রষ্টা যখন দেখেন'।

দ্রষ্টা কি দেখেন? তিনি দেখেন, ভিতরে ও বাইরে যা কিছু ঘটে চলেছে, তার একমাত্র কারণ এই তিনটি *গুণ*। *নান্যং গুণেভ্য কর্তারম্‌*, 'গুণগুলিই কর্তা', আত্মা নন। এই সত্যটি উপলব্ধি করতে হবে যে আত্মা নিত্যমুক্ত, নিত্যশুদ্ধ। এই সত্য আমরা জানি না। আমরা গুণগুলির মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছি, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি। কিন্তু এখন জানলাম যে গুণগুলিই কর্তা, তারাই সবকিছু ঘটাচ্ছে। দ্রষ্টা এই সত্য উপলব্ধি করেন যে সব কর্ম গুণগুলির দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে; অর্থাৎ আত্মা নন, গুণগুলিই গুণের ওপর বা *প্রকৃতি*-র ওপর ক্রিয়া করছে। *গুণেভ্যঃ চ পরং বেত্তি*, 'যিনি গুণের অতীত তাঁকেও তিনি জানেন'; *পরং* মানে 'ঊর্ধ্বে' অথবা গুণের 'অতীত'; *মদ্ভাবং সঃ অধিগচ্ছতি*, 'তিনি আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান', একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলছেন। বাস্তবিক, এমন মানুষ আর মানুষ থাকেন না, তিনি ঈশ্বর বা পরম তত্ত্বের স্বরূপ লাভ করেন। এই অবস্থাটিকেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তি বা মোক্ষ বলা হয়, যা লাভ করা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেরই লক্ষ্য। তার জন্য সর্বপ্রথম দরকার *গুণ* গুলিকে জানা; তারপর ধাপে ধাপে ঐ তিনগুণের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে হয়—তমোগুণ থেকে রজোগুণে, তারপর রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে, পরিশেষে সত্ত্বগুণেরও ঊর্ধ্বে। এই তিনটি গুণই বন্ধনের কারণ, কারণ এই তিনগুণ নিয়েই *প্রকৃতি*। যিনি *পুরুষ*, তিনি এসবের ঊর্ধ্বে—তিনি চিরকালই মুক্ত, চিরকালই শুদ্ধ। এই জ্ঞান আমাদের লাভ করা চাই। এই অধ্যায়ের মূলভাব এইটিই। বেদান্তের দৃষ্টিতে সাংখ্যদর্শন থেকে আমরা এই প্রজ্ঞা লাভ করে থাকি।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ।। ২০।।

—'দেহ উৎপত্তির কারণ এই তিন *গুণ* অতিক্রম করে, জীব জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে অমৃতত্ব লাভ করে।'

দেহী, 'দেহধারী ব্যক্তি'; *গুণান্ এতান্ অতীত্য ত্রীন্*, 'এই তিনগুণের পারে গিয়ে'; *দেহসমুদ্ভবান্*, যে তিনগুণ 'দেহ উৎপত্তির কারণ'। তাৎপর্য এই, গুণের দ্বারা নির্মিত এই দেহ এখন আমরা ধারণ করে আছি বটে, কিন্তু তিন গুণের পারে চলে গেলে দেহ আর আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবে না। কারণ আমাদের প্রকৃত সত্তা যে আত্মা তা গুণের পরিণাম বা ফল নয়; আত্মা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। কিন্তু বর্তমানে দেহের সংস্পর্শে আসার ফলে, তা দেহের দ্বারা

এবং স্বভাবতই তিনটি গুণের দ্বারা যেন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অতএব, *এতান্ গুণান্,* 'এই গুণগুলি'; *অতীত্য,* 'অতিক্রম করে'; *জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখৈঃ বিমুক্তো,* 'জন্ম, মৃত্যু, জরা, অর্থাৎ বার্ধক্য এবং দুঃখ থেকে মুক্ত' [জীব]; *অমৃতম্ অশ্নুতে,* 'অমৃতত্ব লাভ করে'। এই অমৃতত্বই মানুষের স্বরূপ, প্রকৃত সত্তা। বাহ্য প্রকৃতির সব কিছুই মরণশীল; সবকিছুই বদলে যাচ্ছে। কেবল একটি বস্তুই আছে যার মরণ নেই, সেটি আপনার আত্মা। তাই, যে তিনগুণ থেকে এই দেহের উৎপত্তি, জীব যখন সেই তিনগুণের বাইরে চলে যায়, তখন দেহের কোন পরিবর্তন তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না। তখন সে অমর হয়ে যায়। আমাদের এই দেহ গুণের সম্পত্তি; প্রকৃত যে 'আমি' তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। 'আমি' গুণাতীত সত্তা। এখন আমি তিন গুণের নাগালের বাইরে গিয়ে *ত্রিগুণাতীত* হয়েছি। *বিমুক্তো অমৃতম্ অশ্নুতে,* যাঁর এই উপলব্ধি হয়েছে, 'তিনি মুক্ত [হয়ে] অমৃতত্ব উপভোগ করেন', যে অমৃতত্ব আমাদের সত্যিকারের স্বরূপ। সাংখ্য এবং বেদান্ত দর্শনের এইসব শিক্ষা আমাদের নিত্য স্বরূপের দিকে নিয়ে যায়।

সাংখ্য মতে, *পুরুষ* চিরকাল মুক্তই আছেন। কিন্তু সে সত্য ভুলে গিয়ে আমরা *প্রকৃতি*-র জালে পড়ি। তারপর আবার সেই জাল থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি বটে, কিন্তু সফল হই না। এই সাময়িক ব্যর্থতা সত্ত্বেও যদি আমরা মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাই, একদিন না একদিন আমরা সফল হবই হব, কারণ মুক্তি প্রত্যেকের প্রকৃত স্বরূপ। আমাদের ঘটি ময়লা হলে আমরা কী করি? তেঁতুল, ছাই বা অন্য কিছু দিয়ে সেটিকে পরিষ্কার করি। মাজা হয়ে গেলেই সেটি আবার ঝকঝক করে ওঠে। মনকেও সেইরকম পরিষ্কার করতে হয়। বেদান্ত এবং সাংখ্য দর্শন দেহধারী মানুষকে এই মুক্ত হওয়ার শিক্ষাই দিয়েছে। মনে রাখতে হবে মূল কথাটি হলো *মুক্তি* বা *স্বাধীনতা, পরিত্রাণ* নয়। মুক্তির অবস্থাকে সাংখ্যে *কৈবল্য অবস্থা* বলা হয়েছে, অর্থাৎ 'একাকীত্ব'; 'আমি একা', প্রকৃতি এবং তার গুণের দ্বারা আমি আবদ্ধ নই। এই হচ্ছে *কেবল অবস্থা*। জৈন দর্শন, যা বহুলাংশে সাংখ্য মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত, একটি শব্দ ব্যবহার করে। তা হলো *কেবলিন।* এর অর্থ অনন্য, অসঙ্গ অবস্থা—'কেবল আমিই আছি, একলা'। জৈন তীর্থঙ্করেরা এইরকম *কেবলিন* ছিলেন। এটি এক অদ্ভুত অবস্থা, যে অবস্থায় কোনকিছুর দ্বারা আমি আবদ্ধ নই। এটি গেল এক অবস্থা। অন্যটি হলো *মোক্ষ* বা মুক্তি। এটি বেদান্তের ভাষা। একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাব বেদান্ত সাংখ্যের ভাষা ব্যবহার করছে, আবার সাংখ্যও বেদান্তের

ভাষায় কথা বলছে। উভয়ের বক্তব্যের মূল সুরটি হলো মানুষের মুক্তি। বেদান্ত বলে, আমরা এখন মুক্ত নই। কেন? তার কারণ, আমরা প্রকৃতির জালে ধরা পড়েছি। শুধু তমোগুণ বা রজোগুণ নয়, সত্ত্বগুণও আমাদের বেঁধে রেখেছে। অতএব সত্ত্বগুণেরও বাইরে যেতে হবে। এই যে অসাধারণ সত্য, তাকে শ্রীরামকৃষ্ণ আরো সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন—কেন আমরা সত্ত্বগুণের বাইরে যাব? যাব এই জন্য যে, সত্ত্বগুণও প্রকৃতির একটি উপাদান। তাই প্রকৃতির পারে যেতে হলে সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করতে হবে।

একটি সুন্দর গল্প বলে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়টি বুঝিয়েছেন। গল্পটি এই ঃ একজন বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় তিনটি ডাকাত এসে তাকে আক্রমণ করল। মারধোর ও লুটপাট করার পর, প্রথম ডাকাতটি তার সাঙাতদের বলল, 'ওকে আর বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী? মেরে ফেল।' হত্যা করার মুহূর্তে দ্বিতীয় ডাকাতটি বলল, 'একে মেরে ফেলার কী দরকার? এর কাছে যা ছিল, সব তো আমরা হাতিয়ে নিয়েছি। সেগুলো নিয়ে, একে বেশ ভালো করে গাছের সঙ্গে বেঁধে আমরা সরে পড়ি চল।' তৃতীয় ডাকাতটি সব কিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় ডাকাত দুজন পালিয়ে গেলে সেও তাদের সঙ্গে গেল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা লোকটির কাছে ফিরে এসে বলল, 'তোমার এই দুরবস্থা দেখে আমার খারাপ লাগছে।' তারপর তার বাঁধন খুলে দিয়ে বললে, 'তুমি আমার পিছন পিছন এস। আমি তোমায় বাড়ি ফেরার পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে তৃতীয় ডাকাতটি লোকটিকে বনের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ঐ দেখ তোমার গাঁ, আর ঐ তোমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। তুমি এবার যাও।' তখন কৃতজ্ঞচিত্তে লোকটি ডাকাতটির উদ্দেশ্যে বলল, 'ভাই, তুমি আমার এত উপকার করলে; চল, আমার বাড়ি চল। আমি তোমার একটু সেবা করব। সে কথা শুনে ডাকাতটি বলে উঠল, 'না ভাই, না। আমি যেতে পারব না, কারণ আমিও ডাকাত। আমায় দেখলেই পুলিশ পাকড়াও করবে। আমি তোমার জন্য এইটুকুই করতে পারি।' এ কথা বলেই সে অদৃশ্য হলো।

গল্পের প্রথম ডাকাতটি তমঃ বা তমোগুণের প্রতীক। দ্বিতীয় জন রজঃ বা রজোগুণের প্রতীক। তৃতীয় জন সত্ত্ব বা সত্ত্বগুণের প্রতীক। তিনজনই ডাকাত। কিন্তু ওরই মধ্যে তৃতীয়জন একটু ভদ্র; দয়ামায়া ও সৌজন্যবোধ আছে তার! দৈনন্দিন জীবনেও এমনটি দেখা যায়। ডাকাত বা দুষ্কৃতীর খপ্পরে পড়লেও দেখবেন অনেক সময় তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকে যাদের একটু-আধটু

মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু অপরাধী বলে তারা পুলিশের নজরে থাকে, যেখানে সেখানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না। এখানে তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, *সত্ত্ব*-ও ডাকাত। তাই সত্ত্বগুণকেও ছাড়িয়ে যেতে হবে। এই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৫ নম্বর শ্লোকে তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব অর্জুন,* 'হে অর্জুন! সমস্ত বেদ ত্রিগুণাত্মক [অর্থাৎ, কামনামূলক]; তুমি এই তিনগুণের পারে চলে যাও।' বর্তমান অধ্যায়ে সেই কথাটিই একটু বিশেষভাবে, জোর দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ 'তিনগুণ অতিক্রম করে যাও'; *ত্রিগুণাতীত* হও। এই ত্রিগুণাতীত অবস্থাটি মুক্তির অবস্থা, অনির্বচনীয় আনন্দের অবস্থা! মহান ঋষিরা এই অবস্থা লাভ করেছিলেন; আমরাও পারি। তবে সাফল্য নির্ভর করে, কে কতটা মেহনত করছেন তার ওপর। এ জন্মে কোন কারণে যদি নাও হয়, পরের জন্মে অবশ্যই হবে। এই কারণেই হিন্দুরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। এ জন্মে যেহেতু আমার লক্ষ্য পুরোপুরি সিদ্ধ হলো না, সেহেতু পরজন্মেও আমি চেষ্টা চালিয়ে যাব। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে, যেখানে *ধ্যানযোগ*-এর আলোচনা আছে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন।

যাই হোক, কেউ যখন *সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ,* এই তিনটি গুণ অতিক্রম করে যান, তখন তাঁর কী লাভ হয়? তার উত্তর এই—তিনি *জন্ম, জরা, মৃত্যু এবং দুঃখ*-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পান। তিনি মুক্ত হয়ে যান। এখানে বলা হচ্ছে *বিমুক্ত*। শুধু তাই নয়, *অমৃতম্ অশ্নুতে,* তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। এটিই সর্বোচ্চ অবস্থা। এখন আমরা মরণশীল, কারণ দেহের সঙ্গে আমরা অভিন্ন হয়ে আছি। দেহের বিনাশ আছে, মৃত্যু আছে; কিন্তু দেহের মধ্যে যিনি আছেন, তিনি অবিনাশী। তিনি আত্মা। তাঁর মরণ নেই। কিন্তু অবিনাশী হলেও দেহের সংস্পর্শে এসে, দেহেতে আবদ্ধ হয়ে, যেন তিনি নশ্বর রূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু যখন আপনি সর্বোচ্চ সত্যটি উপলব্ধি করেন, তখন আর মৃত্যু আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না; তখন আপনি অমর, অমৃতত্ব লাভ করেছেন। বোধিলাভ করার পর কাশীতে গিয়ে বুদ্ধ পাঁচ শিষ্যকে বলেছিলেন, 'আমি অমরত্ব লাভ করেছি। তোমরাও চেষ্টা করলে এ অবস্থা লাভ করতে পার।' যাঁরা এ অবস্থা লাভ করেছেন, এসব তাঁদেরই মুখের কথা। অতএব এমন একটি পরম অবস্থা যে আছে, এসব কথা তারই অভ্রান্ত প্রমাণ। *বোধি* বা জ্ঞানলাভ, এটি একটি বিশেষ অবস্থা। বুদ্ধও বলেছিলেন যে, বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নন—বুদ্ধত্ব একটি অবস্থা। যে কেউ এই অবস্থা লাভ করতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের এইসব কথায় অর্জুন একটি প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ '*ত্রিগুণাতীত* অবস্থাটি প্রকৃতপক্ষে কী?' দ্বিতীয় অধ্যায়ে (৫২, ৫৩ সংখ্যক শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে বললেন, 'অবিবেকরূপ কলুষতা অতিক্রম করে তোমার বুদ্ধি আত্মায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক'—যাকে *স্থিতপ্রজ্ঞ*-এর অবস্থা বলা হয়—তখনও অর্জুন (৫৪ সংখ্যক শ্লোকে) প্রশ্ন করেছিলেন—'*স্থিতপ্রজ্ঞ* অবস্থার প্রকৃতিটি কী?' স্থিতপ্রজ্ঞের কী লক্ষণ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কয়েকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ প্রাণস্পর্শী ভাষায় বললেন, *স্থিতপ্রজ্ঞ* ব্যক্তি কেমনভাবে করুণা আর প্রেমের প্রতিমূর্তি হয়ে নির্বিকারভাবে জগতে বিচরণ করেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে *ত্রিগুণাতীত* অবস্থাটি বর্ণনা করবেন।

প্রসঙ্গত বলি, সব সভ্য সমাজেই বেশির ভাগ মানুষ *সাত্ত্বিক*, অর্থাৎ সত্ত্বগুণসম্পন্ন। তাই একজন অপরাধীর প্রতিও আমাদের শিষ্টতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত, বিশেষ করে যখন তার দোষ প্রমাণিত হয়নি। একবার এক পুলিশ প্রশিক্ষণ স্কুলে গিয়েছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তাঁদের বলেছিলাম, 'একজন অপরাধী বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরে যখন তাকে পুলিশ ভ্যানে উঠতে বলেন, তখন এইভাবে বলতে পারেন—"অনুগ্রহ করে গাড়িতে উঠুন।" ' কিন্তু তা না বলে, অত্যন্ত রূঢ়ভাবে, হয়তো বা পদাঘাত করেই তাকে আমরা গাড়িতে ঢোকাই। কেন? এরকম দুর্ব্যবহারের কি কোন প্রয়োজন আছে? তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তা যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে পরে সে তো শাস্তি পাবেই। কিন্তু এখনই তাকে শাস্তি দেওয়া কেন? সেও তো আপনার দেশেরই নাগরিক। তাকে সেটুকু সম্মান দেবেন না কেন? বাস্তবিক, এইসব ব্যাপারে আমাদের আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন আনা উচিত। তা না হলে আমরা যে সভ্য হয়েছি, সে দাবি করতে পারব না। অন্য মানুষদের সঙ্গে প্রায়শই আমরা অতি রূঢ় ব্যবহার করি। তাই আমাদের জীবনে অন্তত একটুখানি সত্ত্বগুণ আসা খুবই দরকার। এই প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সচেতন হলে তবেই তমোগুণ থেকে প্রথমে রজোগুণ, তারপর রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে ওঠার তাগিদ আসে আমাদের। এখানেই এই ত্রিগুণ-তত্ত্বের গুরুত্ব। এই তিনগুণ যেমন মানুষের মধ্যে রয়েছে, তেমনি জীবজন্তু এবং মহাবিশ্বের সর্বত্র সবকিছুর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত, কারণ প্রকৃতি যে তিনগুণে গড়া।

ত্রিবিধ গুণের এই আলোচনার সূত্র ধরে আমরা এবার দেখতে পাব, অর্জুন

প্রশ্ন করছেন—যে মানুষ তিনগুণের পারে চলে গেছেন, তাঁর প্রকৃতি কীরকম? বহু ধরনের গুণসম্পন্ন মানুষ আমাদের চারপাশে আমরা দেখেই থাকি। অর্জুন বলবেন, কিন্তু এমন শ্রেণির মানুষ যদি থেকে থাকেন যাঁরা ত্রিগুণাতীত, আমি জানতে চাই তাঁরা কীরকম আচরণ করেন এবং তাঁদের জানা বা চেনার উপায়টাই বা কী? দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যে এই ধরনের প্রশ্ন উঠেছিল, সে কথা আগেই বলেছি। অর্জুন তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—*স্থিতপ্রজ্ঞ*-এর লক্ষণ কি? প্রশ্নটি খুবই যুক্তিযুক্ত, কারণ *স্থিতপ্রজ্ঞ* তো আর মাঠেঘাটে দেখা যায় না। তাছাড়া আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি আমাদের মন কতটা চঞ্চল! প্রতিটি অভিজ্ঞতাই তাকে নাড়া দিয়ে যায়, সর্বদাই সে দোদুল্যমান! কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ এমন এক মানুষ যাঁকে কোনকিছুই বিচলিত করতে পারে না; তিনি সর্বদাই স্থির, সম্পূর্ণ অচঞ্চল। ঐ অধ্যায়ের আলোচনাকালে আমরা দেখেছি *স্থিত* মানে 'স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত' এবং *প্রজ্ঞা* কথাটির অর্থ 'মন' বা 'জ্ঞান'—অর্থাৎ স্থির বা দৃঢ়ভাবে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের পর—ত্রিগুণ বা তিনটি গুণের কথা আমরা ইতস্ততভাবে এখানে-সেখানে পেয়েছি। কিন্তু বর্তমান অধ্যায়টিতে আগাগোড়াই ত্রিগুণের আলোচনা এবং শেষ কয়েকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীতের প্রকৃতি বর্ণনা করবেন।

কথামৃতেও দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ এই গুণের উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা কোন গুণের বশ নয়। তখন তারা সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত ও মুক্ত জীবনযাপন করে। ভারতবর্ষে তাই *পরমহংস*-দের, অর্থাৎ মন-বুদ্ধির পারে গেছেন যাঁরা, সেই উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের পাঁচবছরের শিশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়। ঐ বয়সের শিশুরা একেবারে শুদ্ধ ও নির্মল—তাদের মধ্যে তখন কোনরকম ছলচাতুরী থাকে না, লুকোছাপা নেই। এতটাই সরল। এই প্রসঙ্গে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময়কার ঘটনা। শরণার্থীরা সব করাচি থেকে ভারতে চলে আসছেন। একটি শিশুও তার বাবার সঙ্গে জাহাজে করে ভারতে আসবে। আমিই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। সে যাইহোক, শিশুটি কিন্তু ঠিক টের পেয়েছে যে তার বাবা একটু ভয় পেয়েছে। ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কয়েকজন পাকিস্তানী স্বেচ্ছাসেবক কাছে আসতেই ভদ্রলোক একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবছেন—যদি এরা আমাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেয়, তাহলে কী করব? ভদ্রলোক সরকারি কাজ করতেন। তাঁকে আমি বলেছিলাম, 'আমি না বলা পর্যন্ত আপনি ভারতে যাবেন না। অবস্থা যখন খুব খারাপ হবে. আমিই আপনাকে জানাব।' তা, এখন এই

ভারতে যাওয়ার সময় জাহাজে উঠে তিনি একটু উদ্বিগ্ন হলেন। শিশুটি বাবার মনোভাব ঠিক ধরে ফেলেছে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'বাবা, তুমি পালাচ্ছ। কিন্তু কেন?' শিশুটি সরাসরি জানতে চাইল—তুমি কি ভয় পেয়েছ? ভদ্রলোক নিজেই পরে আমার কাছে এ গল্প করেছেন। শিশুদের রকমসকম এমনই। তারা একেবারেই সরল—কোনরকম ধূর্তামি নেই তাদের মধ্যে। যেন *পরমহংস*। পরমহংসেরা তাই ছোট ছোট শিশুদের কাছে রাখতে ভালবাসেন। পরমহংসদের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে তাই শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে বালকের উপমা দিয়েছেন।

এবার অর্জুন সেই প্রশ্ন করছেন ঃ

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো ।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১॥

—অর্জুন বললেন, 'হে ভগবান্, কী কী লক্ষণের দ্বারা ত্রিগুণাতীত [মানুষ] জ্ঞাত হন? তাঁর আচরণ কীরকম? কীভাবে তিনি এই তিনগুণকে অতিক্রম করেন?'

কৈর্লিঙ্গৈঃ, 'কী কী লক্ষণের দ্বারা'; *ত্রীন্ গুণান্ এতান্ অতীতো ভবতি প্রভো,* 'হে প্রভু, আমরা কী করে বুঝতে পারি যে, কোন ব্যক্তি তিন *গুণের* পারে গেছেন?' *কিমাচারঃ,* যাঁরা তিন গুণের পারে গেছেন, 'তাঁরা কীভাবে আচরণ করেন?' কীরকম ব্যবহার করেন? বাইরে থেকে তাঁদের আচার আচরণ আমরা বুঝবো কীভাবে? *কথং চৈতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ততে,* 'কী উপায়ে তিনি তিনগুণকে অতিক্রম করে যান? এইটুকুই প্রশ্ন। তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২॥

—শ্রীভগবান্ বললেন 'হে পাণ্ডুপুত্র, যিনি প্রকাশ (সত্ত্বগুণের ধর্ম), প্রবৃত্তি (রজোগুণের ধর্ম) এবং মোহ (তমোগুণের ধর্ম) আবির্ভূত হলে (মনে মনে) দ্বেষ করেন না, আবার নিবৃত্ত হলে আকাঙ্ক্ষাও করেন না।'

আগের শ্লোকগুলিতে আমরা দেখেছি প্রত্যেক *গুণ*-এর এক একটা বিশেষ

নিজস্ব ধর্ম আছে। প্রথমটিকে বলা হয়েছে *প্রকাশম্,* অর্থাৎ 'প্রকাশধর্মী', ভিতরের আলো। সত্ত্বগুণ হৃদয়ে আলো জ্বালিয়ে দেয়। তাই *প্রকাশম্* হলো সত্ত্বগুণের ফল। দ্বিতীয়টি হলো *প্রবৃত্তি,* যার অর্থ 'প্রবল কর্মমত্ততা'; এটি রজোগুণের ধর্ম বা ফল। তৃতীয়টি হলো *মোহ,* অর্থাৎ 'ভ্রান্তি', যা তমোগুণের পরিণাম। কিন্তু এই যে *ত্রিগুণাতীত* মানুষের কথা বলা হচ্ছে, তিনি *ন দ্বেষ্টি,* 'অসুখী হন না', যখন তাঁর মধ্যে *প্রকাশ, প্রবৃত্তি* এবং *মোহ সম্প্রবৃত্তানি,* 'আবির্ভূত হয়'। *ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি,* আবার 'তারা আবির্ভূত না হলেও তিনি উদ্বিগ্ন হন না'। এইরকম যে মানুষ তিনিই তিনগুণের পারে গিয়েছেন। তাৎপর্য হলো, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি—ওগুলি আসে যায়, কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। যদি শীতের গরম কাপড়চোপড় ভালো মতো পরা থাকে, তাহলে যতই ঠাণ্ডা পড়ুক না কেন, আপনাকে কাবু করতে পারবে না। ঠাণ্ডাকে আপনি ভয় পাবেন না। কিন্তু হালকা পোশাক পরা থাকলে আপনি বিপদে পড়বেন। ঠিক সেইরকম, আপনি যখন অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করে, শক্তিমান হয়ে সব গুণের পারে গিয়েছেন, তখন *গুণ*গুলি এলেই বা কী, আর গেলেই বা কী? আপনার তাতে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু এই অকুতোভয় অবস্থাটি আসবে *প্রকৃতি-র* পারে গেলে, যে-প্রকৃতি সাধারণ জীবের দেহ-মনকে বশীভূত করে রাখে। আত্মা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে। যেহেতু আপনি আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, অর্থাৎ উপলব্ধি করেছেন যে আপনি স্বরূপত আত্মা, সেহেতু এই গুণ তিনটি আপনাকে আর বিব্রত করতে পারবে না। তাদের আসা যাওয়া, উপস্থিতি অনুপস্থিতি, দুটিই আপনার কাছে তখন সমান। এটিই ত্রিগুণাতীত ব্যক্তির প্রথম বৈশিষ্ট্য। *ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি,* 'তারা যখন আপনার ভিতর কাজ করে, তখন আপনি ক্রুদ্ধ হন না বা মুষড়ে পড়েন না' এবং *ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি,* 'তারা যখন আর আপনার মধ্যে কাজ করে না, তখন তাদের জন্য আপনার কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না'। আপনি ওসবের পারে চলে গেছেন বলেই আপনি উদাসীন। আপনার অবস্থা তখন স্বামী বিবেকানন্দের বলা গল্পের ষাঁড়টির মতো। শিশুর গায়ে মশা বসলে তার কষ্ট হয়। তাই তাকে তাড়িয়ে দিতে হয়। কিন্তু ষাঁড়ের কী ক্ষতি করবে সে? স্বামীজী বলছেন, "একটা মশা অনেকক্ষণ ধরে একটা ষাঁড়ের শিঙে বসেছিল—অনেকক্ষণ বসবার পর তার বিবেকবুদ্ধি জেগে উঠল; হয়তো ষাঁড়ের শিঙে বসে থাকার দরুন তার বড় কষ্ট হচ্ছে—এই মনে করে সে ষাঁড়কে সম্বোধন করে বলতে লাগলো, 'ভাই ষাঁড়, আমি অনেকক্ষণ তোমার শিঙের উপর বসে আছি, বোধ হয় তোমার অসুবিধে হচ্ছে, আমায় মাপ কর, এই আমি উড়ে যাচ্ছি।' ষাঁড় বললে, 'না, না, তুমি

সপরিবারে এসে আমার শিঙে বাস কর না—তাতে আমার কি এসে যায়?' "[১] এই *হলো* শক্তিমানের কথা। আপনার যখন আত্মজ্ঞান হবে, তখন আর এই সব *গুণ*-এর আসা যাওয়ায় আপনি মোটেই মাথা ঘামাবেন না। কথাটি একবার ভেবে দেখুন। এই উচ্চ অবস্থার কিঞ্চিৎ অনুভবও যদি আপনার হয়, জীবনটা কত সুন্দরই না হবে! এই শ্লোকটি আপনার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মধ্যে সুপ্ত যে শক্তি, তা জাগিয়ে তোলার প্রেরণা দিচ্ছে।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩॥

—'গুণগুলি [তাদের নিজের নিজের কাজে] প্রবৃত্ত জেনে যিনি উদাসীনের মতো গুণত্রয় দ্বারা বিচলিত হন না, [তিনি] আত্মায় প্রতিষ্ঠিত এবং চঞ্চল হন না।'

তিনি চরম *উদাসীনঃ*, অর্থাৎ 'নির্লিপ্ত'। কাদের প্রতি? এই যে তিনটি গুণের আসা যাওয়া এবং তাদের কাজকর্ম, সে সবের প্রতি। প্রতিটি মানুষই এইরকম উদাসীন থাকতে পারে; সে সম্ভাবনা সকলের ভিতরেই আছে। শুধু প্রয়োজন একটু প্রশিক্ষণের এবং এ ব্যাপারে একটু সজাগ থাকা। একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের যখন অল্প বয়স, তখন কেউ যদি আমাদের গালমন্দ করে, আমরা দারুণ মুষড়ে পড়ি; আমাদের মনে তার ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু সেই আমরাই বৃদ্ধ বয়সে অনুরূপ ঘটনাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনি না, কারণ তখন আমরা জীবন থেকে অনেক কিছু শিখেছি, অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের। তখন আমরা বলি, 'ও কিছু নয়। বলছে বলুক। যেতে দাও।' কিন্তু প্রখর যৌবনে কখনও কখনও এমন আচরণের বিরুদ্ধে ফেটে পড়ি আমরা। এসব ঘটনা আপনারা নিত্যই দেখতে পাবেন। এক সময় যা ভয়ঙ্কর আপত্তিকর মনে হয়, অন্য আর এক সময় তাকে তেমন গুরুত্ব দিই না আমরা। কেন? তার ব্যাখ্যা এই, ততদিনে আমাদের একটা নতুন মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে আমরা মনের এই ওঠাপড়া, এই ঢেউগুলিকে অতিক্রম করে যেতে পারি। *উদাসীনবৎ আসীনঃ*, 'উদাসীনের মতো থেকে', অর্থাৎ নির্লিপ্ত থেকে। লোকে তাঁর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে, সমালোচনা করছে, কিন্তু কোনওদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর মনোভাব হলো, 'বলে যাও, আমি মজা পাচ্ছি'! শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, কেউ যদি তোমাকে কুবাক্য বলে, এক কানে শুনে অন্য

১ বাণী ও রচনা, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৫

কান দিয়ে তা বার করে দাও, কারণ কতকগুলো শব্দ বই তো নয়, একটা ধ্বনি ছাড়া তো আর কিছু নয়! এই ধরনের পরিস্থিতিতে মনকে নির্লিপ্ত রাখা, অক্ষুব্ধ রাখা, আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচায়ক এবং চেষ্টা করলে এই ক্ষমতা আমরা সকলেই অর্জন করতে পারি। আর তা না করে যদি আমরা আরো স্পর্শকাতর হতে থাকি, তাহলে কেউ ভর্ৎসনা করা মাত্রই আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে! যারা তা করে, তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি নেই।

বিগত বিশ দশকের (১৯২০) কথা। তখন আমি মহীশূরে। সেখানকার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। প্রত্যেকবার পরীক্ষার ফল বেরোবার পর কোন না কোন ছাত্র বা ছাত্রী শহরের প্রকাণ্ড 'কুকনহল্লী' জলাধারে গিয়ে আত্মহত্যা করতো। আত্মহত্যার কারণ, তাঁর নাম সফল ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় নেই। বাড়ি না ফিরে তারা সোজাই চলে যেত ঐ দীঘিতে আর জলে ঝাঁপ দিত। এর থেকে কী প্রমাণিত হয়? মানসিক দিক থেকে তারা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। জীবনের একটা বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার মতো মানসিক শক্তি তাদের ছিল না। তাই ওখানে পরীক্ষার সময় এবং ফল বেরোনোর আগে নিয়ম করে পাহারার বন্দোবস্ত করা হতো। যে কথাটা বলতে চাই, তা এই যে, আমাদের আরো একটু শক্তিশালী হতে হবে। বেদান্তের একটিই বাণী—শক্তিমান হও, নির্ভীক হও। অনেক কিছুই হয়তো তোমাকে ভয় দেখাবে, কিন্তু তোমার ভিতর এমন একটি প্রকাণ্ড শক্তির উৎস আছে যার সামান্য একটু প্রকাশ ঘটাতে পারলেই তুমি নির্ভয় হতে পার। জীবনের আপাততুচ্ছ বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে পার। বেদান্ত জগতের মানুষকে এইরকম শক্তিমান ও নিঃশঙ্ক করে তুলতে চায়। জগতে যে নানারকম ভয়ের কারণ আছে, সে কথা সত্যি; কিন্তু এও সত্যি যে আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে সে সব ভয় জয় করতে পারি। এখানে তাই বলা হচ্ছে *গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে,* 'তিনি তিনগুণের কার্যকলাপ দেখে কখনো বিচলিত হন না'। জগৎটা তিন গুণের খেলা। গুণের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলেই জগৎটা চলছে। তাতে আমি বিড়ম্বিত হতে যাব কেন? *যোঽবতিষ্ঠতি,* 'যাঁরা এই প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত'; *নেঙ্গতে,* তাঁরা 'চঞ্চল হন না'। তাঁরা আদৌ আলোড়িত হন না। এটি এমন এক সাফল্য যা মানবজীবনে অপরিহার্য। একেই চারিত্রশক্তি বলে। আপনারা নিশ্চয় লজ্জাবতী লতা দেখেছেন। আপনি যদি তার গায়ে একটু ফুঁ দেন, দেখবেন সে মৃতপ্রায় হয়ে নেতিয়ে পড়েছে। বেশ কিছুক্ষণ পর সে আবার সজীব হয়ে ওঠে। আমরা তো লজ্জাবতী লতা নই; আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই শক্তি আছে। সেই শক্তিকে বিকশিত করতে হবে—লজ্জাবতী লতা হলে আমাদের চলবে না।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪॥

—'[যিনি] সুখ ও দুঃখকে এক মনে করেন, আত্মস্বরূপে স্থিত, [যিনি] এক তাল মাটি, পাথর এবং সোনাকে সমজ্ঞান করেন, [যিনি] প্রিয় ও অপ্রিয় ঘটনাকে এক দৃষ্টিতে দেখেন, [যিনি] নিন্দা ও স্তুতিকে সমান জ্ঞান করেন, [তিনিই] গুণাতীত।'

সম দুঃখ সুখঃ মানে 'দুঃখ ও সুখে মন সমভাবাপন্ন'। এই *সমত্ব*-র শিক্ষাই গীতা বারবার দিয়ে আসছে। *সমত্ব* মানে মনের অচঞ্চল একতানতা। মনের একটু-আধটু ওঠাপড়া হতেই পারে। কিন্তু এই সমত্বের গুণে চট্ করে সে আবার স্থির হয়ে যায়—বেশিক্ষণ মুহ্যমান হয়ে থাকে না। *সম দুঃখ সুখঃ*, এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। *সমত্ব* দিয়েই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করতে হবে। *যোগ*-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাই গীতায় বলা হয়েছে *সমত্বম্ যোগ উচ্যতে—সমত্বই যোগ।* মনকে এমন স্থির রাখতে হবে যাতে সুখ বা দুঃখ কোনটাই তাকে দোলাতে পারবে না। এটি অসাধারণ গুণ। আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের পরিভাষা ব্যবহার করে আমি প্রায়শই বলে থাকি যে, প্রকৃতি মানুষের শরীরে একটা *সমত্ব* দিয়ে রেখেছে। আপনার দেহের তাপমাত্রাই বলুন, আর রক্তের উপাদানই বলুন, সবকিছুর মধ্যেই একটা নির্দিষ্টতা বা স্থিরতা আছে। আপনি যখন কাজকর্ম করেন, তখন এসবের হেরফের হয় বটে, কিন্তু যথাসময়ে ওগুলি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। ওঁরা এই ব্যবস্থাটিকে homeostatic mechanism বা আভ্যন্তরীণ সাম্য রক্ষার পদ্ধতি বলে থাকেন। দেহের এই ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই শক্তি কে দিল? প্রকৃতি। প্রকৃতিই আপনার শরীরে এই বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। এতো গেল দেহের সাম্যভাব। এখন আপনাকে নিজের চেষ্টায় উচ্চতর আর এক ধরনের হোমিওস্ট্যাসিস (Homeostasis) বা সাম্যভাব অর্জন করতে হবে। সেটি মনের সাম্যভাব। মনটিকে স্থির রাখতে হবে। মনের অচঞ্চল প্রশান্তির জন্য এটি করা একান্ত দরকার এবং এটি আপনাকেই করতে হবে। সংস্কৃতে *শম* এবং *দম* বলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ আছে। প্রথম শব্দটির অর্থ 'মনের সংযম' এবং দ্বিতীয়টির অর্থ 'ইন্দ্রিয় সংযম'। এই দু-ধরনের সংযম যদি আপনার থাকে, তাহলে আপনার ভিতর *সমত্ব* গুণটিও আসবে। বাস্তবিক, সমত্ব ছাড়া উন্নত জীবন অসম্ভব।

আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের অভিমতও তাই। গ্রে ওয়ালটার (Gray Walter)

তাঁর *দ্য লিভিং ব্রেইন* (*The Living Brain*) নামক গ্রন্থে তাঁর শিক্ষক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার জোসেফ বারক্রফট্ (Sir Joseph Barcroft)-এর এক মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, মুক্ত জীবনের জন্য অন্তরের এক নিরুদ্বেগ সাম্যভাব একান্ত প্রয়োজন। সেটি ছাড়া মুক্ত জীবন বা উন্নতজীবন আকাশকুসুম কল্পনা। সত্যিই তাই। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে আপনি যদি জাহাজ নিয়ে যান তো সেই জলে থিরথিরে রেশমি ঢেউ উঠবে না। তার জন্য চাই শান্ত সরোবর। সব বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে এই মৃদু স্পন্দনের এক মহৎ ভূমিকা আছে। অনুচ্ছ্বসিত সরোবরে নৌকা চললে তবেই জলের বুকে এই মৃদু স্পন্দন চোখে পড়ে। তাই মন যখন শান্ত থাকে, তখনই মহৎ চিন্তার উদয় হয়, মহৎ বিকাশের সম্ভাবনা সূচিত হয়। অতএব এটি স্নায়ুবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। এরও ওপরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, *স্বস্থঃ,* যার অর্থ 'আত্মায় অধিষ্ঠিত', 'স্থির'—আপনার অবস্থান আত্মার বাইরে নয়। *স্ব স্থঃ,* 'আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত'। তারপর *সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ,* '*লোষ্ট* অথবা একটুকরো মাটি, *অশ্ম* অর্থাৎ পাথর এবং *কাঞ্চন* অর্থাৎ সোনা—সব কিছুর প্রতি মনের সমান প্রতিক্রিয়া।' যে-মন এসব বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখে না, এমন মনের অধিকারী ব্যক্তিই সমদৃষ্টিসম্পন্ন। সত্যি কথা। একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝবেন এক তাল মাটিও যা, একটা পাথরও তাই, আবার সোনা—সেও সেই একই বস্তু। তাদের মধ্যে মূলগত কোন তফাৎ নেই। এই জ্ঞান একদিন আসে। আর তা যখন আসে, তখন মানুষ সবরকম লোভের ঊর্ধ্বে গিয়ে মুক্ত হয়ে যায়। তারপর শ্রীকৃষ্ণ ত্রিগুণাতীতের আরো লক্ষণ বলছেন। *তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো,* 'প্রিয় অথবা অপ্রিয় ঘটনার প্রতি মন সমভাবাপন্ন'; *ধীরঃ,* অর্থাৎ 'বিচক্ষণ'; এবং *তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ,* 'নিন্দা ও প্রশংসায় মন সমভাবাপন্ন'। বস্তুত মহাভারত এবং অন্যান্য গ্রন্থে যে-রাজনৈতিক দর্শনের কথা বলা হয়েছে, তা যদি আমরা অনুধাবন করি তাহলে দেখতে পাব সব প্রশাসকদেরই এই সব গুণ অন্তত কিছু পরিমাণে অবশ্যই থাকা উচিত। আমরা সাধারণত দেখি শাসককুলের কাউকে প্রশংসা করা হলে তিনি একেবারে গলে যান; আবার কেউ যদি তাঁর নিন্দা করে, তাহলেও তাঁর মাথা বিগড়ে যায়। এই ধরনের মানুষ কখনোই ভালো প্রশাসক হতে পারে না। অবশ্য কেবল প্রশাসকদেরই যে এই সব গুণ থাকতে হবে তা নয়, সাধারণ মানুষকেও কিছুটা সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, প্রয়াস করতে হবে মনের *সমত্ব* লাভের।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ।। ২৫।।

—'তাঁকেই গুণাতীত বলা হয়, যিনি মান ও অপমানে নির্বিকার, বন্ধু ও শত্রুর প্রতি সমভাবাপন্ন এবং সকল কর্ম ত্যাগ করেছেন।'

মানাপমানয়োঃ, 'সম্মান ও অপমানে'; *তুল্যঃ,* 'যাঁর মন নির্বিকার'; এবং *তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ,* যিনি 'বন্ধু ও শত্রুর সঙ্গে সমান আচরণ করেন'; এমন মানুষই আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত। তাঁর মনের সমতা সর্বদাই অক্ষুন্ন থাকে। তারপর, *সর্বারম্ভপরিত্যাগী,* 'নিত্যনতুন কর্মের পরিকল্পনা তিনি পরিত্যাগ করেছেন'। কর্মে উন্মত্ত মন অষ্টপ্রহর নতুন নতুন পরিকল্পনা করে। কিন্তু এই যে গুণাতীত ব্যক্তি, তিনি এই ধরনের উন্মাদনা পরিহার করেছেন। ফলে তাঁর মনটি স্থির। যা করতে হয়, তা তিনি করে যান; এবং সেই কাজ তিনি নৈপুণ্যের সাথেই করেন। *অষ্টাবক্র সংহিতা*-য় (১৮/৪৯) আছে, *যদা যৎ কর্তুমায়তি তদা তৎ কুরুতে,* 'যে-কাজ সামনে এসে পড়ে, আপ্তকাম ব্যক্তি কেবল সেটুকুই করে যান।' নানান কর্ম করার জন্য তিনি ব্যস্ত হন না, তাঁর মধ্যে কর্মের ছটফটানি থাকে না। যে-কাজ তাঁর সামনে এসে পড়ল, তিনি সেটুকুই করেন; কারণ শরীররক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তার অতিরিক্ত চাহিদা তাঁর কিছুই নেই। *গুণাতীতঃ স উচ্যতে,* 'এমন মানুষই *গুণাতীতঃ* বলে কথিত হন।' বাইরের জগতের চাপ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। অপরিবর্তনীয় সত্তায় তাঁরা নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাঁরা মুক্ত এবং এই মুক্তিই মানবজীবনের লক্ষ্য। যে মানুষ আজ প্রকৃতি ও তার গুণের দাপটে প্রতিনিয়ত হাবুডুবু খাচ্ছে, সেই মানুষই আবার ধীরে ধীরে এই শক্তিকে প্রতিহত করার মনোবল অর্জন করে এবং পরিশেষে মানসিক সমত্ব লাভ করে তিনগুণের পারে চলে যায়। এটিই *গুণাতীতঃ* অবস্থা। সকলেই গুণাতীত হতে পারেন, সকলের মধ্যেই এই সম্ভাবনা আছে। অবশ্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম করলে তবেই এই অবস্থা লাভ করা যায়। তাই কাজটি এখনই আরম্ভ করে দেওয়া ভালো। পাঁচ বা দশ শতাংশ সামর্থ্যও যদি শুরুতে অর্জন করা যায়, তাই বা মন্দ কি!

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।। ২৬।।

—'এবং যিনি ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা আমাকে সেবা করেন, এইসব গুণ অতিক্রম করে তিনি ব্রহ্মত্বলাভে সমর্থ হন।'

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *অন্তর্যামি*-রূপে যে আমি সকল জীবের মধ্যে রয়েছি, তাঁর দিকে দৃষ্টি দাও। *যো চ মাং অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে*, 'যিনি ভক্তিযোগ দ্বারা—ঐকান্তিক, অচঞ্চল, সরল ভক্তি দ্বারা—আমাকে সেবা করেন'; *স গুণান্ সমতীত্য এতান্*, 'তিনি এইসব গুণ সম্যকভাবে অতিক্রম করে'; *ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*, 'ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার সামর্থ্য অর্জন করেন।' ব্রহ্মই চরম সত্য। শ্রীকৃষ্ণ এখানে ভক্তির প্রসঙ্গ এনেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, *ভক্তি* ছাড়াও আপনারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে পারেন, তিনটি গুণকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়াসী হতে পারেন, কিন্তু এটি করা কঠিন। কিন্তু ভগবানকে ভালবাসতে পারলে কাজটি অনেক সহজ হয়ে যায়। ভালবাসার দ্বারা অনেক কিছুই সম্ভব হয়, বিশেষ করে যদি সে ভালবাসা ঈশ্বরের দিকে চালিত হয়। তাই, যিনি *ভক্ত* নন, তাঁর চাইতে যিনি *ভক্ত* তাঁর পক্ষে মনকে বশে এনে ত্রিগুণাতীত হওয়ার সুবিধা অপেক্ষাকৃত ভাবে বেশি। সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন ঃ *যো মাং সেবতে*, 'যিনি আমাকে সেবা করেন'; *অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন*, 'একনিষ্ঠ ঐকান্তিক ভক্তির মাধ্যমে'; *স এতান্ গুণান্ সমতীত্য*, 'তিনি এইসব গুণ অতিক্রম করে যান'; এবং *ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*, 'ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নত্ব লাভ করতে সক্ষম হন।'

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭॥

—'কারণ, আমি অবিকারী, অবিনাশী, সুখস্বরূপ ব্রহ্মের এবং শাশ্বত ধর্মের আশ্রয়।'

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্, 'যেহেতু আমি এমনকি ব্রহ্মেরও আশ্রয়'; *অমৃতস্য অব্যয়স্য চ*, [যিনি] 'অবিনাশী এবং অবিকারী, তাঁর'। পরবর্তী অধ্যায়টির নাম *পুরুষোত্তমযোগ*। সেখানে আমরা *পুরুষোত্তম*-এর কথা পাব। শ্রীকৃষ্ণকে *উত্তম পুরুষ* বলা হয়। *উত্তম পুরুষ*, অর্থাৎ 'পরম দিব্য পুরুষ'। আমাদের ভক্তির লক্ষ্য এই দিব্য পুরুষ। ঈশ্বরের অবতার এই শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সকলের অন্তরাত্মা, *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্*, তিনি 'ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়', যে-ব্রহ্ম *অমৃত*, অর্থাৎ অমর বা অবিনাশী এবং *অব্যয়*, অর্থাৎ অবিকারী বা অপরিবর্তনীয়। তিনি আবার *শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য*, 'শাশ্বত ধর্মেরও ভিত্তি', যা এই বিশ্বকে রক্ষা করে; এবং *সুখস্য ঐকান্তিকস্য*, 'অন্তহীন ঐকান্তিক সুখেরও'। এক কথায়, তিনিই সবকিছুর আশ্রয়, স্থিতি বা প্রতিষ্ঠা।

ব্রহ্মের দুটি দিক—*নির্গুণ* এবং *সগুণ,* 'গুণযুক্ত এবং গুণাতীত'। অথবা বলা যায় *নিরাকার* এবং *সাকার,* 'অমূর্ত এবং মূর্ত'। ব্রহ্ম আর *শক্তি। শক্তি* মানে ব্রহ্মের শক্তি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনুপম উপমা দিয়ে বিষয়টিকে এইভাবে বুঝিয়েছেন ঃ কুণ্ডলী পাকানো সাপটি যেন *নির্গুণ ব্রহ্ম;* সেই সাপটিই আবার যখন নড়ছে চড়ছে, ফণা তুলছে, তখন তাকে বলি *সগুণ ব্রহ্ম।* এই বিশ্ব যখন নাম ও রূপের সঙ্গে সংযুক্ত, তখন তা *সগুণ;* যখন তা নাম ও রূপের বাইরে, তখন তা *নির্গুণ।* এই অনন্য ব্রহ্মই *শক্তি*-র মাধ্যমে ঈশ্বরাবতার হয়ে আবির্ভূত হন। অতএব, তিনি বলতেই পারেন, 'আমি পরম তত্ত্বের সঙ্গে অভিন্ন'। একথা বলার অধিকার তাঁর আছে, কারণ, বস্তুত তিনি তো তাই। তিনি দৈহিক বন্ধন থেকে মুক্ত—তিনি নিজেকে দেহ মনে করেন না। অথচ আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তিনি তো আমাদের মতোই আচার আচরণ করছেন! গীতার চতুর্থ অধ্যায় আলোচনার সময় আমরা দেখেছি অবতারের স্বরূপ কি এবং তাঁর জীবনের অসীম দিকটি ধরা কত শক্ত! আমরা এখন সীমিত, সসীম জীব; তাই অবতারের সসীম দিকটিই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। পরম ব্রহ্মই যে অবতারের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন, সেই সত্যটি আমাদের চোখের আড়ালেই থেকে যায়। তাই এই চতুর্দশ অধ্যায়টি একটি সত্য ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে। সেটি কি? *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্,* অর্থাৎ *উত্তম পুরুষ* বা পরম পুরুষ হিসাবে 'আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা'; *শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য,* এবং 'শাশ্বত ধর্মের' যা এই বিশ্বকে পুষ্ট করছে এবং ধারণ করে আছে।

ভারতবর্ষে আমরা ধর্মকে *সনাতন ধর্ম* বলি, কারণ তার কোন নির্দিষ্ট নাম নেই, স্থান ইত্যাদির দ্বারা তা সীমাবদ্ধ নয়। এই ধর্মের প্রাণ একগুচ্ছ সত্য যা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মেও অনুস্যূত হয়ে আছে। সব ধর্মের প্রাণভোমরাই এই *সনাতনধর্ম;* ওইটিই আসল বস্তু। বাদবাকি আর যা কিছু নিয়মকানুন এবং মতবাদ—সেগুলিকে *যুগধর্ম* বলা হয়। এই *যুগধর্ম* একটি বিশেষ কালের, বিশেষ কিছু মানুষের প্রয়োজনে গড়ে ওঠে, যা বলে দেয় আপনারা কী খাবেন, কী পরবেন, বিয়ে-থা কেমন করে অনুষ্ঠিত হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি সবই *যুগধর্ম* বা *স্মৃতির* অন্তর্ভুক্ত। একটি বিশেষ সময়ে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে তার জন্ম। অন্যদিকে আছে সনাতন ধর্ম, যা কতকগুলি শাশ্বত সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—এমন সব সত্য যা বাজিয়ে নেওয়া যায়, পরীক্ষা করে নেওয়া চলে। সেটি *শ্রুতি*। শ্রুতি হলো নির্ভেজাল সত্য। তাই *স্মৃতি* এবং *শ্রুতি,* দুটি ভিন্ন বস্তু। প্রথমটিতে—মতম্ বা মতের কচকচি। দ্বিতীয়টিতে *তত্ত্বম্* বা

তত্ত্ব। খাদ্য, পোশাক ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যক্তিগত যে অভিরুচি, সেটি হলো *মতম্*। এসব বিষয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ থাকতেই পারে; তাতে আপত্তি নেই। প্রয়োজনবোধে, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এসব ঝোঁক বদলাতে পারে। তাই একে *মতম্* বলা হচ্ছে। কিন্তু *তত্ত্বম্* হলো সনাতন সত্য, অপরিবর্তনীয় সত্য। সে সত্যকে অনুসরণ করতেই হবে। আমাদের প্রত্যেককেই সেই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। এই কারণেই তাকে *তত্ত্বম্* বলা হচ্ছে। ভারতবর্ষে আমরা এই *মতম্* এবং *তত্ত্বম্*-কে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকি। দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা আমাদের কাছে স্পষ্ট। *মতম্* বহু; কিন্তু *তত্ত্বম্* একটি। ব্যবহারিক বা দৈনন্দিন জীবনে আমরা বলি দুই আর দুই-এ চার। অথবা, আগুন তপ্ত। এর অন্যথা হয় না, একে বদলানো যায় না। ঠিক সেইরকম, আত্মা নিত্যমুক্ত; ঐ মুক্তিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। মানুষ বলুন, বিশ্বে অন্য আর যা কিছুর অস্তিত্ব আছে বলুন, সবকিছুর মূলেই ঐ সত্য বা *তত্ত্ব*। যাঁরা ঐ তত্ত্বকে উপলব্ধি করেন, তাঁদের বলা হয় *তত্ত্বদর্শী*।

স্বামী বিবেকানন্দ তখন আমেরিকায়। তাঁর বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তরপর্ব চলছে। সে সময় একজন প্রশ্ন করলেন : স্বামীজী, আপনি কি এক ধরনের সম্মোহনবিদ্যা প্রচার করছেন না? স্বামীজীর উত্তরও তৈরি। বললেন : না। তোমরাই সম্মোহিত হয়ে আছ; আমি কেবল তোমাদের সেই মোহনিদ্রার আবেশ কাটিয়ে দিচ্ছি। 'আমি সাদা, আমি কালো, আমি গরিব, আমি ধনী'—তোমরা নিজেদের সম্পর্কে এইসব ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বসে আছ। কিন্তু এগুলির কোনটাই তোমাদের স্বরূপ নয়! তোমরা আত্মা। ঐটিই তোমাদের প্রকৃত স্বরূপ। আমি তোমাদের সম্মোহিত করছি না, সম্মোহনের ঘোর কাটিয়ে দিচ্ছি। এইটিই আমার কাজ।

স্বামীজী যা বললেন, সেইটিই যথার্থ ধর্ম। আমাদের প্রত্যেককেই কে যেন জাদু করে রেখেছে! আর এই কারণেই আমরা ঝগড়া করি, লড়াই করি। সম্মোহিত হয়ে থাকার দরুনই আমাদের এই প্রবণতা। কিন্তু এই ঝোঁক কাটাতে গেলে একটু সত্যের বা তত্ত্বের অন্বেষণ করতেই হবে, চাই এক উদার বিজ্ঞানমনস্কতা। বিজ্ঞান আর কী? সত্যের অনুসন্ধান—এই তো? সবকিছুর নেপথ্যে কোন্ সত্য লুকিয়ে আছে সেটি দেখা। আমাদের নানাধরনের বিশ্বাস থাকতেই পারে। কিন্তু প্রশ্ন করতে হবে, খতিয়ে দেখতে হবে—আচ্ছা, এই বিশ্বাসটি কি সত্য? এই হলো অন্তর্জগতের বিজ্ঞান বা বেদান্ত। বেদান্তে আমরা তত্ত্বের অন্বেষণ করি। তাই একে *তত্ত্বশাস্ত্র* বলা হয়।

আগেই বলেছি, আমরা *মত* আর *তত্ত্ব*-এর মধ্যে পার্থক্য করি; এবং করি বলেই আমাদের *স্মৃতি* বা *যুগধর্মের* মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। *স্মৃতি* ক্রমাগতই বদলেছে, কিন্তু *শ্রুতি* শাশ্বত বা সনাতন। এই *শ্রুতি* থেকেই *সনাতন ধর্ম* এসেছে। আত্মার স্বরূপ, মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি, চরম সত্যের প্রকৃতি—এগুলিই শ্রুতির আলোচ্য বিষয়। এগুলি তত্ত্ব। এগুলিকে গ্রহণ করে আপনাকেই যাচাই করে দেখতে হবে তা সত্য কিনা। কিন্তু *স্মৃতি*-র অনুশাসন পরীক্ষা করে দেখার জো নেই। আপনাকে মুখ বুঁজে তা বিশ্বাস করতে হবে, মেনে চলতে হবে। এভাবে আপনি জামা পরবেন, এভাবে আপনি শিখা বা টিকি রাখবেন—এসব স্মৃতির ব্যাপার। অতীতে এই জাতীয় স্মৃতিমূলক বিধিনিষেধ আমাদের অনেক ছিল। কিন্তু এখন আমরা ঐ সমস্ত নিয়মকানুনের অনেককিছুই বর্জন করেছি। কিন্তু যুগধর্মের কিছু অদলবদল করেছি বলে *সনাতনধর্মটি* মিথ্যা হয়ে যায়নি, কারণ এই ধর্মের ভিত্তি অপরিবর্তনীয় পারমার্থিক সত্য বা তত্ত্ব। একটা ঘটনার কথা বলি। তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। ষাট বছর আগে একজনের পিতামহ অনশন শুরু করলেন। কারণ কী? কারণ, তাঁর নাতি তার *শিখা* কেটে ফেলেছে! আমরা তাঁকে বোঝালাম যে, দেখুন এখন সময় বদলাচ্ছে; কেউ হয়তো *শিখা* রাখা পছন্দ করে, অন্যরা হয়তো করে না। তা, আমাদের দর্শন এসব পরিবর্তন মেনে নেয়। শিখা রাখা—এ হচ্ছে *স্মৃতি*-র অনুশাসন। *শ্রুতি*-র সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এইভাবে বলাতে ভদ্রলোক অনশন ভঙ্গ করলেন। *শ্রুতি* ও *স্মৃতি*-র এই তফাৎটা বুঝি বলেই আমরা এখনও টিকে আছি। আমাদের দেশে স্মৃতিশাস্ত্রের কি কিছু কমতি ছিল? কিন্তু এখন সেসব দিন চলে গেছে। এখন আমাদের দেশে 'হিন্দু কোড বিল' এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান চালু হয়েছে। এগুলিই আধুনিক স্মৃতিশাস্ত্র। এগুলি আমরা লঙ্ঘন করতে পারি না। কিন্তু *শ্রুতি* চিরন্তন। *শ্রুতি* বলতে উপনিষদ্‌কেই বোঝায় এবং সেই উপনিষদের কেবল একটি গুচ্ছই আছে—সব মিলিয়ে একটি। উপনিষদের দ্বিতীয় কোন সেট নেই। একটি মাত্র গুচ্ছ থাকার কারণ এই যে, তার উপজীব্য অদ্বিতীয় এক সত্যের আলোচনা। সেই যে অদ্বিতীয়, চিরন্তন সত্য—তাকেই সনাতন ধর্ম বলে। জীবনের এদিক সেদিক বাহ্য পরিবর্তন যতই ঘটুক না কেন, মূল সত্যটি অবিকৃত থেকেই যায়। শেলী তাঁর অতি সুন্দর একটি কবিতায় লিখেছেন যার অর্থ 'এক থাকে, বহু চলে যায়' ('The One remains and the many change and pass')। যখন আপনারা *বহু* নিয়ে চর্চা করেন, তখন জানবেন আপনারা *স্মৃতি* নিয়ে আলোচনা

করছেন। ঠিক তেমনি, আপনাদের দৃষ্টি যখন পরম *এক*-এর ওপর নিবদ্ধ, তখন আপনারা *শ্রুতি*-কে ধরেছেন।

তিনটি *গুণ*-এর পারে কিভাবে যাওয়া যায়, সেই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই এই চতুর্দশ অধ্যায়টি শেষ হয়েছে। গীতা এখানে আমাদের যে উপদেশ দিয়েছেন তা হাতে কলমে একটু করে দেখার চেষ্টা করাও মঙ্গল। তাহলে জীবনভোর যে তমোগুণ বা তামসিকতার অন্ধকারে ডুবে রয়েছি, তার থেকে অন্তত আমরা রজোগুণে উঠতে পারব। এটাও কম লাভ নয়। কুঁড়েমি, অন্যকে বিরক্ত করা ছাড়া আর কোন বিষয়েই আগ্রহ নেই—এসব ভাব তমোগুণ থেকে আসে। তমোগুণ পেরিয়ে যখন আমরা রজোগুণে উত্তীর্ণ হই, তখন আমাদের মধ্যে সুন্দর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেই রজোগুণ ছাড়িয়ে যখন আমরা সত্ত্বগুণে পৌঁছাই, তখনই আমাদের সার্থক বিকাশ ঘটে; তখনই মানুষে-মানুষে সুখ ও শান্তির সম্পর্ক গড়ে ওঠে—তখন আর পারস্পরিক লড়াই নেই, কলহ নেই, বিবাদ নেই।

এই মুহূর্তে আমাদের রাজনীতিতে একটু সত্ত্বগুণের আভাস দেখা যাচ্ছে। এই কিছুদিন আগেও সব রজোগুণ আর তমোগুণে ডুবে ছিল। তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন, ব্যক্তিজীবনের মতো জাতির রাজনৈতিক জীবনও *তামসিক, রাজসিক,* দুয়ের মিশ্রণ, আবার কিছুটা *সাত্ত্বিকও* হতে পারে। সাত্ত্বিক ভাব এলে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আর উত্তাপ, মানসিক অস্থিরতা এবং দুঃখকষ্টের সৃষ্টি হবে না। যা থাকবে তা হলো নিবিড় কর্মময়তা। এই সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে দেশের মানুষকে অবহিত হতে হবে। কারণ এটি জানা থাকলে আমাদের কর্ম প্রচেষ্টাগুলি রজোগুণ অতিক্রম করে অন্তত একটুখানি সত্ত্ব-অভিমুখী হবে। আর কিছু না হোক, সে ব্যাপারে আমরা একটু প্রয়াসী তো হতে পারব। এধরনের প্রবণতা এলে তবেই রাজনীতি ঠিক ঠিক গণতান্ত্রিক হবে, এধরনের পরিবেশেই গণতন্ত্র পুষ্ট হতে পারে। আর তা না হলে শুধু ওঠা আর পড়া। আজ ভালো তো কাল মন্দ। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই দুর্দশা আমরা কেউই কামনা করি না। গুণত্রয়ের এই আলোচনা শেষ করে এবার আমরা পঞ্চদশ অধ্যায়ে প্রবেশ করব।

ইতি গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

'এখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি।'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তম যোগ

গীতার চতুর্দশ অধ্যায় শেষ করে এবার আমরা পঞ্চদশ অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যা শুরু হচ্ছে একটি চিত্রকল্প দিয়ে, একটি গাছের রূপকল্পনা দিয়ে। আমাদের উদ্দেশ্য করে প্রথম শ্লোকটিতেই বলা হয়েছে—এই বিরাট বিশ্বকে এক মহাশক্তিধর বনস্পতিরূপে চিন্তা কর। ভারতীয় সংস্কৃতিতে গাছের অপার মহিমা। তাই শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে তাঁর উপদেশ শুরু করেছেন একটি গাছের উপমা দিয়ে।

শ্রীভগবান্ উবাচ

উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান বললেন—'তাঁরা এক শাশ্বত অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলে থাকেন যার মূল উর্ধ্বে এবং শাখাপ্রশাখা নিচের দিকে, বেদসমূহ যার পাতা; যিনি তা জানেন, তিনি বেদজ্ঞ।'

এখানে বলা হচ্ছে, এই বিশ্বসংসার যেন একটি গাছের মতো। তবে এক অনুপম গাছ—*উর্ধ্বমূলম্ অধঃশাখম্*, 'যার মূল ওপরে এবং ডালপালাগুলি নিচে'। সাধারণ গাছের সঙ্গে বিশ্বরূপ মহীরূহের এখানেই যা পার্থক্য। *অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্*, 'একেই শাশ্বত *অশ্বত্থ* বলা হয়।' *অশ্বত্থ* গাছের ল্যাটিন নাম 'ফিকাস রিলিজিওসা'। এদেশে আমরা পিপুল বা *পিপ্পল*-ও বলে থাকি। বট গাছের মতো ('ফিকাস বেঙ্গলেনসিস্') অশ্বত্থকেও ভারতবর্ষে খুব পবিত্র মনে করা হয়। এই মহাবিশ্বও যেন একটি অশ্বত্থ গাছ। কীরকম সে গাছ? তার উত্তরে বলা হচ্ছে—তার মূলগুলি ওপরের দিকে, আর ডালপালা সব নিচে। কী অনবদ্য ছবি! কত গভীর চিন্তাই না রয়েছে এর পিছনে! আর কাব্যিক সুষমাই বা কত! তারপর বলা হচ্ছে, এই যে *অশ্বত্থ* গাছ, এটি *অব্যয়*, অর্থাৎ, 'শাশ্বত': *প্রাহুরব্যয়ম্*, 'অনাদি বলা হয়'। *ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি*, 'এই গাছের পাতাগুলি,

যস্য পর্ণানি, বৈদিক উক্তিগুলি, *ছন্দাংসি'*। যেহেতু পাতাগুলোই গাছকে রক্ষা করে, সেই কারণে তাদের বলা হচ্ছে *ছন্দাংসি,* অর্থাৎ 'বেদের উক্তিগুলি'। *বেদ মানে জ্ঞান। যস্তং বেদ স বেদবিৎ,* 'যিনি এই সত্য জানেন, তিনি বেদের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।' তাছাড়া এই গীতায় আমরা আগেও দেখেছি (১০/২৬) শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে গাছের মধ্যে *অশ্বত্থ* গাছ বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, বেদ থেকে আরম্ভ করে গীতা পর্যন্ত সর্বত্রই গাছ যেন অস্তিত্বের প্রতীক। আমরা বলি জীবনবৃক্ষ। সামান্য একটু রদবদল করে বলা হলেও সর্বত্রই এই প্রতীকটি চোখে পড়ে। বস্তুত মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে বনস্পতির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রকৃতির কোলে লালিত আদিম মানুষের চোখে গাছ ছিল মহা পবিত্র। তাদের দেবদেবী সব ওখানেই পূজিত হতো। আমাদের বৈদিক সভ্যতায় কী ছিল? তখন তো আমরা গাছপালা পরিবৃত অরণ্যের শ্যামল স্নিগ্ধ ছায়াতেই বাস করতাম; সেখানেই তো আমাদের যত কিছু শিক্ষাদীক্ষা সম্পন্ন হতো। তাই অরণ্যের সঙ্গে ভারতীয় কৃষ্টির যেন এক নাড়ীর যোগ; ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে তার স্থান অতি উচ্চে। আরণ্যক জীবনে প্রাচীন ভারতীয়রা তাই কয়েকটি গাছকে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছিল, যার মধ্যে আছে *অশ্বত্থ* বা *পিপ্পল* এবং *বট।* ভারতীয় পরম্পরায় এই গাছগুলিকে অতি পবিত্র মনে করা হয়। আমরা শুধু গাছের ছায়া উপভোগ করেই ক্ষান্ত হইনি, তাকে দর্শনেও ঠাঁই দিয়েছি। ভারতীয়দের এই সূক্ষ্ম অনুভূতি ও মনোভাব বেদান্তের আলোয় নিষ্ণাত হয়ে জন্ম দিয়েছে এক অভূতপূর্ব দর্শনের। এইভাবেই এই গাছ আমাদের কাছে পবিত্র ও মহিমময় হয়ে উঠেছে। পরবর্তী কালে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, বুদ্ধ এই গাছের তলায় বোধিলাভ করলে, এই গাছের ভাবমূর্তির মহিমা আরো বেড়ে যায়। ঐ সময় থেকেই এই গাছকে *বোধিবৃক্ষ* বলা শুরু হলো।

কিন্তু এতো গেল ভারতের কথা। অন্যান্য দেশে গাছকে কী দৃষ্টিতে দেখা হয়? আগেই বলেছি, আদিম জনগোষ্ঠীর চোখে গাছ সর্বদাই অতি পবিত্র। একমাত্র সেমিটিক ধর্ম সম্প্রদায়গুলির দৃষ্টিভঙ্গি একটু অন্যরকম। তাঁরা গাছের মহিমা অত কীর্তন করেন না। তাঁরা এক মহাজাগতিক দেবতাকেই পরম পবিত্র মনে করেন, তাঁর অভিব্যক্তিগুলিকে নয়।

অন্যদিকে ইউরোপে, বিশেষ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে (অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে) গাছকে বিশেষ সম্মান করা হয়।

ওসব দেশে ইগড্রাসিল (Yggdrasill) বা অ্যাশ ট্রি বলে একধরনের গাছ আছে যাকে অতি পবিত্র বলে মনে করা হয়ে থাকে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান পুরাণে ঐ গাছের কথা আছে। ইংরেজ মনীষী কার্লাইল (Carlyle) তাঁর *Heroes and Hero Worship* নামক গ্রন্থে (পৃঃ ২৭) এই ইগড্রাসিল গাছের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি চমৎকার অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। কিন্তু ভারতীয় রূপকল্প ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রূপকল্পের মধ্যে প্রভেদ এই, ইগড্রাসিল গাছে মূল আর পাঁচটা গাছের মতো নিচের দিকেই প্রসারিত; কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা অশ্বত্থের মূলকে ঊর্ধ্বে রেখেছে। এটি সম্ভব হয়েছে, কারণ এদেশে পবিত্রতার ভাবনাটি দর্শনের দ্বারা জারিত। 'কার্য' দৃশ্যমান, অর্থাৎ তাকে দেখা যায়, কিন্তু 'কারণ' তো তা নয়; তা অদৃশ্য। তাই, দেশ-কালের ঊর্ধ্বে যে অদৃশ্য 'কারণ', তার মধ্যেই এই অশ্বত্থের মূল প্রোথিত। সেই মূল থেকেই দেশ-কালের জমিতে এই বিশাল ব্যক্ত বিশ্ব বা *সংসার বৃক্ষের* উদ্ভব। মূলের কথা যখন আমরা চিন্তা করি, তখন এই সংসাররূপ বনস্পতিকে বলি *ব্রহ্ম বৃক্ষ*। *সংসার বৃক্ষ* এবং *ব্রহ্ম বৃক্ষ*—দুটি নামই ঠিক। এখানে আমরা সংসার বৃক্ষের কথা আলোচনা করছি। সেই মূল পরম *এক* থেকেই বহু এসেছে, বৈচিত্র্য এসেছে। এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বেই আমরা বাস করছি। কিন্তু যখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই বৈচিত্র্যের উৎস কি, তখনই আমাদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান ভারতীয় ঋষিরা এই প্রশ্নটি নিয়ে বহু চিন্তাভাবনা করেছিলেন, যার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা পেয়েছি এক অসাধারণ দর্শন ও পুরাণ। পুরাণ আর কিছুই নয়, তা ঐ সমৃদ্ধ দর্শনেরই সহজবোধ্য ব্যাখ্যা। এই কারণে কোন কোন পুরাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাতে কত না ভাব, কত না অপূর্ব কল্পনার সন্ধান পাই আমরা!

মুণ্ডক উপনিষদ্-এ একটি চিত্রকল্প আছে, যা *কঠ উপনিষদ্*-এ আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। মুণ্ডক উপনিষদের চিত্রকল্পে একটি গাছের কথা বলা হয়েছে যার ওপর দুটি পাখি বসে আছে। পাখি দুটির একটি *জীব* অথবা জীবাত্মা; অন্যটি আত্মা, পরমাত্মা অথবা ব্রহ্ম। উপমাটি এক কথায় অপূর্ব। এই সব চিত্রকল্পের সাহায্যে পরম সত্যটি অপেক্ষাকৃত সহজ করে বোঝানো হয়েছে। তা না হলে আমরা সূক্ষ্মতত্ত্ব ধরতে পারি না। দুটি পাখির উপমা এবং এই জাতীয় অন্যান্য দৃষ্টান্তগুলি এই কারণেই দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য শ্লোকে আমরা পাচ্ছি গাছের উপমা। সমস্ত বিশ্বকে একটি বনস্পতিরূপে চিত্রিত করা হচ্ছে। কীরকম গাছ? অশ্বত্থ। বলা হচ্ছে : *ঊর্ধ্বমূলম্ অধঃশাখম্ অশ্বত্থম্*, 'এই *অশ্বত্থ ঊর্ধ্বমূলম্*,

যার মূল উর্ধ্বে এবং *অধঃশাখম্*, শাখাপ্রশাখা নিচে'; *অব্যয়ম্*, 'অবিনাশী', অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়। এই সংসারবৃক্ষ নিত্য। মানুষ আসছে, যাচ্ছে; কিন্তু সংসার নিত্য প্রবহমান। পাখিরা সব আসছে, যাচ্ছে; কিন্তু গাছ ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে।

এই শ্লোকটিতে কঠ উপনিষদের একটি শ্লোকের ছায়া পড়েছে। সেখানে (২/৩/১) প্রায় একই ভাষায় বলা হয়েছে—

ঊর্ধ্বমূলো অবাক্ শাখঃ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ;
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেব অমৃতম্ উচ্যতে;
তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন;
এতদ্ বৈ তৎ ॥—

'ঐ বৃক্ষ *ঊর্ধ্বমূলো অবাক্ শাখঃ,* "মূল ওপরে এবং শাখাগুলি নিচে প্রসারিত"; *এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ,* "এটি এক সনাতন বা অনাদি *অশ্বত্থঃ* গাছ"; *তদেব শুক্রম্ তদ্ ব্রহ্ম,* "সেই মূলই কেবল শুদ্ধ, সেইটিই ব্রহ্ম"; *তদেব অমৃতম্ উচ্যতে,* "বলা হয়, ঐটিই একমাত্র অবিনশ্বর"; *তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে,* "সব লোক তাঁতে আশ্রিত"; *তদু নাত্যেতি কশ্চন,* "তাঁকে কেউ অতিক্রম করে না"।'

এ কথা কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে। এই উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য সরল ঔপনিষদিক চিত্রকল্পটিকে এমনভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন যে, সত্তারূপ চিরন্তন বনস্পতির প্রাণস্পন্দনটি যেন আমরা অনুভব করতে পারি। তাই ভাষ্যের প্রাসঙ্গিক অংশটি আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। আচার্য বলেছেন ঃ

'এই *অশ্বত্থ* বৃক্ষ নিরন্তর জন্ম, মৃত্যু ও বহুবিধ দুঃখবিজড়িত; যার প্রকৃতি ইন্দ্রজালের (দ্বারা সৃষ্ট বস্তুর মতো), মরীচিকায় দেখা জলের মতো, (অথবা) আকাশে মেঘের তৈরি নগরের মতো প্রতি মুহূর্তে পাল্টে যাচ্ছে; এগুলির মতো প্রকৃতি সম্পন্ন হওয়ায়, দেখা দিয়েই তারা আবার মিলিয়ে যায় এবং শেষে পার্থিব গাছের মতো অবলুপ্ত হয়; কলা গাছের কাণ্ডের মতোই অসার; যা শত শত সংশয়ীর বুদ্ধিপ্রসূত সংশয়গ্রস্ত সিদ্ধান্তের বিষয়; বৈজ্ঞানিক সত্য অনুসন্ধানকারীদের কাছে যা রহস্যময়, অনিশ্চিত *বাস্তব সত্য*; যার সারবত্তা (সত্যতা) আসে, বেদান্তের নির্ণয় অনুযায়ী, পরম ব্রহ্ম থেকে; *অবিদ্যা* (অজ্ঞানতা), *কাম* (বাসনা) এবং *কর্ম* (ক্রিয়া) দ্বারা গঠিত *অব্যক্ত* (নির্বিশেষ প্রকৃতি) বীজ থেকে উদ্‌গত হয়ে; অঙ্কুর রূপে জ্ঞান-কর্ম সমন্বিত ব্যক্ত ব্রহ্ম,

হিরণ্যগর্ভকে লাভ করে; সকল প্রাণীর বিভিন্ন সূক্ষ্মশরীররূপ কাণ্ড পেয়ে; ইন্দ্রিয়জ ভোগতৃষ্ণারূপ জলসিঞ্চনে বর্ধিত হয়ে; বুদ্ধি এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত বিষয়রূপ কোমল মুকুলে শোভিত হয়ে; *শ্রুতি* (বেদ), *স্মৃতি* (ধর্মীয় এবং সামাজিক রীতিনীতি এবং কর্তব্যবিষয়ক শাস্ত্র), *ন্যায়* (তর্কবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি), *বিদ্যা* (সামগ্রিক বিজ্ঞান) এবং *উপদেশ* (আধ্যাত্মিক নির্দেশ) -রূপ পলাশ বা পত্রে সজ্জিত হয়ে; যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি শাস্ত্রীয় কর্মরূপ সুন্দর ফুলে মণ্ডিত হয়ে; সুখদুঃখ ইত্যাদি নানা অনুভবের রসে সম্পৃক্ত হয়ে; প্রাণীদের উপজীব্য অসংখ্য ফল লাভ করে; জীবের বিভিন্ন বাসনার জলসিঞ্চনে পুষ্ট ও পরস্পর দৃঢ়বদ্ধ (সংস্কাররূপ) প্রশাখা সমন্বিত হয়ে; ব্রহ্মা (সমষ্টি মন) থেকে আরম্ভ করে অধঃস্তন সকল জীবের দ্বারা নির্মিত *সত্য* ইত্যাদি সপ্তলোকরূপ পাখির নীড়ে বাস করে; নাচ, গান, বাজনা, হাস্য-পরিহাসজনিত সুখদুঃখ তথা আনন্দ-বেদনার বহুবিধ কলরোল এবং "বাঁচাও", "বাঁচাও" আর্তচিৎকারে মুখরিত হয়ে; এই (আপেক্ষিক) সংসারবৃক্ষ, যার প্রকৃতি অশ্বত্থ গাছের (পাতার মতো) বাসনা ও কর্মের ঝড়ে সদা মর্মরিত হওয়া, তাকে বেদান্তশাস্ত্রে উপদিষ্ট ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বের জ্ঞান থেকে উৎপন্ন অনাসক্তিরূপ অস্ত্রের দ্বারা উচ্ছেদ করতে হবে।'

সকলে না হলেও, বিরল কেউ কেউ এই সংসারবৃক্ষের উৎপত্তির কথা জানতে চান। তাঁরা প্রশ্ন করেন; এই সংসার কোথা থেকে এল? যাঁদের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগে, তাঁরা হয় দার্শনিক হন, না হয় বৈজ্ঞানিক। তাঁরা মূল সত্যটি জানার জন্য ব্যগ্র। উপনিষদের মহান ঋষিদের মনেও এই প্রশ্ন জেগেছিল এবং তাঁরা যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তা এই যে, অনন্ত, অবিনাশী ব্রহ্মই এই সংসারবৃক্ষের মূল। সেই মূল থেকেই যেহেতু এই বিশ্ব প্রকাশিত হয়েছে, সেইহেতু এই বিশ্বও অতি পবিত্র। তাই এই বিশ্বকে আমরা *সংসারবৃক্ষ বলি*, আবার *ব্রহ্মবৃক্ষ*-ও বলি। দুটি পরিভাষাই ব্যবহৃত হয়। এই সংসারবৃক্ষের মূলটিকে বুঝি বলেই আমরা বিশ্বের মহিমা উপলব্ধি করি। বীজের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড গাছের সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত থাকে। যদিও বীজটি দেখলে তক্ষুনি তা বোঝা যায় না। কারণ সম্ভাবনাগুলি তখন অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। কিন্তু যেই বীজটি গাছে পরিণত হলো, তখন তার বহুবিধ প্রকাশ আমাদের চোখে পড়ে— ডালপালা, পাতা, কোরক, ফুল, ফল ইত্যাদি। এই বিশ্বও তাই। বিবর্তনের সূত্র ধরে ব্রহ্ম থেকে এই বিশ্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই বৈচিত্র্য দেখে ভয় পাবার কিছু নেই, কারণ বহুত্বের পিছনে একটি মূলগত ঐক্য আছে।

সেই পরম *এক* থেকেই *বহু* এসেছে এবং বহু সেই পরম একেই আবার ফিরে যাবে। এইভাবেই একদা ভারতবর্ষে এক মহত্তম দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল এবং তত্ত্বটি আমাদের সহজবোধ্য করে তোলার জন্য ঋষিরা এই অশ্বত্থগাছের উপমা দিয়েছেন।

সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, আরো স্থূল—এই হলো বিবর্তনের ধারা। সবচেয়ে স্থূল এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। বিবর্তনের প্রথম পর্যায়টি সূক্ষ্মতম। সেটি কী? বেদান্ত বলছে, সেটি হলো *মহৎ*, অর্থাৎ সমষ্টি মন। তারপর এসেছে [চব্বিশটি] তত্ত্ব। তার থেকে একে একে এসেছে গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি এবং বিভিন্ন প্রাণী। আদি প্রকৃতি থেকে এই যে বিবর্তনের ধারাটি চলে আসছে, তার মধ্যে কিন্তু একটি শৃঙ্খলা আছে। তাই বিশ্বকে এই শ্লোকে যে একটি গাছের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হলো, তা বড় চমৎকার এবং দর্শনের দিক থেকে অতি তাৎপর্যপূর্ণ। বেদান্ত তাই ব্যক্ত জগৎকে সম্মান করে, বিশেষ মূল্য দেয়। কিন্তু ততক্ষণই আমরা এই জগতের গুণ গাই যতক্ষণ তাকে মূল উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত দেখি। মূলটিকে সরিয়ে দিলে এই জগৎ বিড়ম্বনা মাত্র, যার থেকে আমরা পরিত্রাণ চাই। এই জন্য গীতায় এই *সংসারবৃক্ষকে* অতিক্রম করে যেতে বলা হয়েছে, কারণ আমরা সংসারকে অন্যচোখে দেখি, ব্রহ্মের থেকে আলাদা করে দেখি। আলাদা করে দেখলে এই সংসারের কানাকড়ি দাম নেই। তাই পরবর্তী একটি শ্লোকে (১৫/৩) গীতা বলবেন যে, এই সংসাররূপ বৃক্ষটিকে কেটে ফেল। কিন্তু কেটে যে ফেলব, কী দিয়ে? স্থূল কোন অস্ত্র দিয়ে নয়, অনাসক্তিরূপ অস্ত্র দিয়ে। চরম অনাসক্তির অস্ত্র দিয়ে এই গাছকে উচ্ছেদ করে তবে আমরা মুক্ত হব।

ব্রহ্মরূপে জগৎকে দেখলে এই *সংসারবৃক্ষকে* উচ্ছেদ করা যায় না, কারণ তা সত্য এবং সত্য বলেই পবিত্র। এরকম দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে এই গাছকে কেটে ফেলার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে সংসারকে আমরা কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি করে ভাবি এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, এটি সহজাত বা স্বয়ম্ভূ, সংসাররূপ সেই বৃক্ষটিকে বাঁচিয়ে রাখার কোন দরকার নেই। অনাসক্তির বিকাশ ঘটিয়ে তাকে সমূলে বিনাশ করাই শ্রেয়। কিন্তু যদি একবার ভালো করে চোখ খুলে দেখি এবং এই সত্যটি বুঝতে পারি যে সংসার বৃক্ষটির মূল হলো ব্রহ্ম, যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম থেকে এসেছে, তাহলে আর এই গাছটিকে কেটে ফেলার দরকার পড়ে না, কারণ যা ব্রহ্ম মূল থেকে এসেছে তা তো ব্রহ্মই। বেদান্ত আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছে। বলছে—*ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতম্ ইদম্* অথবা 'এই ব্যক্ত বিশ্ব';

অমৃতম্ ব্রহ্ম এব, 'অবিনাশী ব্রহ্মই'। শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায় শুরু করতে গিয়ে পাতায় ছাওয়া অশ্বত্থ গাছের একটি অসাধারণ চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলেছেন। পাতাগুলি গাছটিকে পুষ্ট করে। পাতাগুলিকে বলা হয়েছে বেদ, যা আমাদের বলে দেয় কোন্‌টি ঠিক এবং কোন্‌টি ভুল, কোনটি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা এবং কেমন করে মিথ্যাকে অতিক্রম করে সত্য উপলব্ধি করতে হয়।

অধশ্চোর্ধ্বং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

—'তিনগুণের দ্বারা পুষ্ট এবং বিষয়রূপ পল্লববিশিষ্ট তার [সংসাররূপ অশ্বত্থের] শাখাগুলি অধোদেশে এবং উর্ধ্বদেশে প্রসারিত; এবং নিম্নে, মনুষ্যলোকে, কর্মফলজনক মূলগুলি অনুপ্রবিষ্ট।'

সংসাররূপ এই অশ্বত্থ গাছের ডালপালাগুলো উপরে এবং নিচে দুদিকেই ছড়ানো। নিচের দিকে প্রসারিত শাখাগুলো এই পার্থিব জগতের প্রতীক এবং উর্ধ্বমুখী শাখাগুলো দিব্যলোকের দ্যোতক। উর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী দুধরনের শাখাগুলোই একটি মূল থেকে এসেছে, যার নাম ব্রহ্ম, যার স্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য। *প্রসৃতাঃ* মানে 'প্রসারিত'; *অধশ্চোর্ধ্বং*, 'নিচে ও উপরে'; *তস্য শাখা,* 'তার শাখাগুলি'; *গুণপ্রবৃদ্ধাঃ* 'তিন গুণের দ্বারা' অর্থাৎ *সত্ত্ব, রজঃ* এবং *তমঃ* দ্বারা 'পুষ্ট'। আগের অধ্যায়েই বলা হয়েছে, এই ব্যক্ত বিশ্ব ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় তিনগুণের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। *বিষয়প্রবালাঃ,* 'ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি পল্লবের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ'। *অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি,* এবং 'নিচেও' অবান্তর বা গৌণ মূলগুলি 'প্রসারিত হয়েছে'। পরম মূলটি বা আসল মূলটি উপরে; কিন্তু এখানে মানুষের সংস্কার বা প্রবণতা, কর্ম এবং কর্মফলরূপ ঝুরিগুলি নেমে এসেছে। এগুলি অবান্তর মূল। *কর্মানুবন্ধীনি,* 'আমাদের কর্মজাত', *মনুষ্যলোকে,* 'মানবলোকে'। এই হলো প্র[illegible] শক্তিশালী অশ্বত্থ বৃক্ষরূপ বিশ্বের চিত্র।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥

—'ইহলোকে এর [এই অশ্বত্থের] স্বরূপ, না অন্ত, না আদি, [এমনকি] স্থিতিও, এভাবে উপলব্ধ হয় না। এই দৃঢ়মূল অশ্বত্থকে অনাসক্তিরূপ শক্তিশালী কুঠারের দ্বারা ছেদন করে....'

এই গাছের প্রকৃত রূপটি কি, তা আমরা সহজে বুঝতে পারি না। এটি এত বিশাল যে একবার দৃষ্টি মেলেই ধারণা করা যায় না। *রূপম্*, 'রূপ'; *ইহ* 'এই লোকে'; *ন উপলভ্যতে,* 'উপলব্ধ হয় না', অর্থাৎ উপলব্ধি করা অসম্ভব। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যেও যদি আমরা এই বিশ্বের সম্পূর্ণ বর্ণনা দিতে চেষ্টা করি, তা পারব না। তা অসম্ভব। এই বিশ্ব এত বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ! *নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা,* 'এর শেষ নেই, এর শুরুও নেই, এর স্থিতি সম্পর্কেও আমরা জানি না'; অর্থাৎ এটি কেমনভাবে ও কিসের ওপর ভিত্তি করে আছে, তাও আমরা জানি না। এ আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, এত রহস্যাবৃত এই বিশ্ব। আজকের তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকদের কাছেও এটি এক প্রহেলিকা। স্যার জেমস্ জিনস্ (Sir James Jeans)-এর কাছেও এটি রহস্যাবৃত বিস্ময়কর বিশ্ব—*The Mysterious Universe*। *অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্,* 'এই বদ্ধমূল অশ্বত্থকে'; *দৃঢ়েন ছিত্ত্বা,* 'দৃঢ়ভাবে কেটে'। কেমন করে? অবশ্যই এক শাণিত অস্ত্র দিয়ে। কিন্তু সেই শাণিত অস্ত্রটি কী? তার উত্তরে বলা হচ্ছে, *অসঙ্গশস্ত্রেণ,* 'অনাসক্তিরূপ অস্ত্র দ্বারা'। অর্থাৎ মনের এমন একটা গতি হবে যখন আমরা বলতে পারব ঃ 'পূর্ণাঙ্গ গাছটির পিছনে যে পরম সত্য আছে, আমি তা জানতে চাই'। সেই সত্যটি কী? ব্রহ্ম। এখানে এই মর্ত্যলোকে, সবকিছুই নিরন্তর বদলে যাচ্ছে, মারা যাচ্ছে এবং আবার জন্মাচ্ছে। এই জগতের প্রকৃতিই তাই। আমি তাই দেখতে চাই এই বৃক্ষের পিছনে কোন্ সত্য লুকিয়ে আছে, কোন্ সত্য এই বিশ্বচরাচর ধারণ করে আছে। মনে যদি এই ভাব আসে, তাহলে এই সংসার মহীরুহের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিন। এই অনাসক্তিকেই এখানে তীক্ষ্ণ অস্ত্র বলা হচ্ছে। আমরা মূলটিকে চাই, তার এইসব ক্ষণস্থায়ী অভিব্যক্তিগুলিকে নয়। পাতা গজায়, আবার ঝরে পড়ে; শাখা গজাচ্ছে আবার ভেঙে যাচ্ছে; গাছ হচ্ছে, যাচ্ছে। কিন্তু এইসব নিত্য পরিবর্তনের মধ্যে সেই পরম *এক* অবিচল ও স্থির। ইংরেজ কবি শেলী তাঁর কবিতায় এই কথাই বলেছেন— 'এক থাকে, বহু চলে যায়।' আমরা সেই অদ্বিতীয় সত্যকেই জানতে চাই।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

—'তারপর সেই ব্রহ্মপদ অন্বেষণ করা উচিত, যেখানে গিয়ে তাঁরা (জ্ঞানীরা) আর ফিরে আসেন না। আমি সেই আদি *পুরুষ*-কেই আশ্রয় করি যাঁর থেকে অনাদি কর্ম ও বিশ্ব প্রবাহিত।'

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং, 'তারপর আমাদের সেই পরম ব্রহ্মপদ অন্বেষণ করতে হবে যিনি এই জগতের অন্তরালে রয়েছেন'। তৎ মানে ব্রহ্ম। বহুর পিছনে যে *এক* রয়েছেন, সেই সত্য আমাদের উপলব্ধি করতেই হবে। *যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ,* 'যে সত্য লাভ করলে পুনর্জন্ম হয় না।'। তখন আমরা চিরকালের জন্য মুক্ত, কারণ আমরা আমাদের শাশ্বত স্বরূপ উপলব্ধি করে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছি। *তমেব চাদ্যং পুরুষম্ প্রপদ্যে,* 'একমাত্র সেই আদি পুরুষকেই আমি আশ্রয় করব'। *তম্* এব মানে 'কেবল তাঁকেই'—কেবল তাঁকেই আমি আশ্রয় করব; *যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী,* 'যা থেকে অতীতে এই বিশ্ব নিঃসৃত হয়েছে'।

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার তাঁর এক শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোর কোন দর্শন-টর্শন হয়? ধ্যানের সময় কোন আলো দেখিস?' তার উত্তরে শিষ্য বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি একটা আলো দেখতে পাই।' সে কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'খুব ভালো'। কিন্তু শিষ্যটি বললেন, 'আমার ওসব পছন্দ নয়।' 'তাহলে তুই কী চাস?' শ্রীরামকৃষ্ণ আবার প্রশ্ন করলেন। তখন শিষ্যটি বললেন, 'আমি ঐ জ্যোতির উৎসটিকে চাই।' তা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু তার জন্য তোকে অপেক্ষা করতে হবে।' শিষ্য বললেন, 'আমি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত।'

তম্ এব চাদ্যং পুরুষম্, 'কেবল সেই অনাদি পুরুষকেই'; *প্রপদ্যে,* 'আশ্রয় রূপে গ্রহণ করি'; *যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী,* 'যাঁর থেকে এই সমগ্র বিশ্ব প্রবাহিত', যেমন 'গোমুখ' থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমন করে; *পুরাণী,* 'অনাদি কাল থেকে'। বেদান্ত বলে, এই জগৎ *অনাদি,* অর্থাৎ এর কোনও আরম্ভ নেই, এ নিত্য। এ এক অপূর্ব ভাব। যতদূর আপনার দৃষ্টি যায়, অতীতের দিকে একবার ফিরে তাকান না কেন—দেখবেন তখনও জগৎ রয়েছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে কোটি কোটি বছর আগে এই বিশ্ব প্রকাশিত হয়েছিল, আবার বহু কোটি বছর পর এটি বীজের অবস্থায় ফিরে যাবে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। ঐ আদি বীজ থেকে এই বিশ্ব আবার প্রকাশিত হবে। এই ভাবে

সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার বা প্রলয়ের ছন্দে জগতের ধারা নিত্য প্রবাহিত হবে। জগতের সব কিছুই এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ছন্দে ছন্দিত—সব কিছুরই এই তিনটি দিক বা পর্যায় আছে। তারা এল, কিছুকাল থাকল, তারপর চলে গেল। এখানে নিত্য বস্তু কিছু নেই, জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এ যেন সমুদ্রের বুকে ঢেউ। ব্রহ্ম হচ্ছেন সমুদ্র এবং বিশ্ব যেন একটা ঢেউ যার উৎপত্তি ব্রহ্মরূপ সমুদ্র থেকে। ঢেউ সমুদ্রে মিলিয়ে যায়, তারপর আবার নতুন ঢেউ ওঠে। বেদান্ত জগৎকে এভাবেই ব্যাখ্যা করে। গীতাও আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে বলছেন। এই শ্লোকে বলা হচ্ছে, *তম্ এব চাদ্যং পুরুষম্ প্রপদ্যে,* 'যে দিব্য সত্তা থেকে এই জগৎ যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হচ্ছে, আমি তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাব।' *আদ্যং পুরুষম্* মানে 'আদি পুরুষ', যাঁর ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। *কঠ উপনিষদে* (১/৩/১১) বলা হয়েছে, 'ঐটিই পরম লক্ষ্য, পরম অবস্থা'—*সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।* আমাদের মনে ও হৃদয়ে তাই এরকম একটা আকুতি, একটা তীব্র ব্যাকুলতা জাগা চাই যে, 'হ্যাঁ আমি সেই পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবই'। পরবর্তী শ্লোকে তাই বলা হয়েছে ঃ

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

—'অহঙ্কার ও মোহমুক্ত হয়ে, আসক্তি-দোষ জয় করে, আত্মনিষ্ঠ হয়ে, ইন্দ্রিয়জ বাসনামুক্ত হয়ে, সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব-মুক্ত হয়ে, বিগতমোহ ব্যক্তিরা সেই শাশ্বত ব্রহ্মপদ লাভ করেন।'

নির্মানমোহা, 'মান এবং *মোহ-মুক্ত*'; *নির্,* শব্দটির অর্থ শূন্য বা রহিত; মান মানে 'অহংকার বা ঔদ্ধত্য' এবং *মোহ* হলো 'অবিবেক'। *জিতসঙ্গদোষা,* 'আসক্তি-দোষ জয়ী'; *জিত* মানে 'জয়ী', *সঙ্গদোষা* মানে 'আসক্তিরূপ দোষ'। *অধ্যাত্মনিত্যা,* 'আত্মজ্ঞান নিষ্ঠ'; অর্থাৎ আমি আত্মা, নিত্য শুদ্ধ, দিব্য সত্তার একটি স্ফুলিঙ্গ—এই জাতীয় মনোভাব; *বিনিবৃত্তকামাঃ* 'বহির্মুখী বাসনাগুলিকে যিনি জয় করেছেন'; *দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ,* 'দ্বন্দ্ব থেকে যিনি মুক্ত'। সুখ এবং দুঃখ, আনন্দ এবং কষ্ট—এগুলিকে দ্বন্দ্ব বলে। কারণ একটা আর একটার ঠিক বিপরীত। তিনি এগুলিকে জয় করছেন। *সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ* 'যাকে সুখ এবং দুঃখ বলে'। *অমূঢ়াঃ,* 'যাঁরা *মৌঢ্যা* বা মোহ থেকে মুক্ত'; *গচ্ছন্তি,* 'তাঁরা লাভ করেন'; *পদম্ অব্যয়ম্* তৎ, ব্রহ্মের 'সেই অক্ষয় স্থিতি'।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলতে চাইছেন, কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের পরিণতি যে মানুষ, *তার একটি বিশেষ শক্তি আছে, যে শক্তি বলে বিবর্তনের প্রক্রিয়াটিকে সে নিজের হাতে নিয়ে, তাকে ক্রমশ ঊর্ধ্বায়িত করে, তার আদি পরমাত্মস্বরূপে ফিরে যেতে পারে।* সে সামর্থ্য কেবল মানুষেরই আছে। সূর্য বা অন্য কোন জীবের সে ক্ষমতা নেই। একমাত্র মানুষই এই প্রশ্ন করতে পারে ঃ 'আমি কোথা থেকে এসেছি? কেমন করেই বা আমি সেখানে ফিরে যেতে পারি?' ঋষিরা সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়েই পরম সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন এবং বেদরূপ অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারটি সমগ্র মানবজাতির হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। বেদের মধ্যে যে-সত্যটি তাঁরা উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তা সর্বজনীন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দৈহিক বিচারে মানুষ এই মহাবিশ্বের একটি ধূলিকণার চেয়েও নগণ্য! যতদূর মনে পড়ছে, ফরাসী বৈজ্ঞানিক ব্লেইজ প্যাসকাল (Blaise Pascal) বলেছিলেন, 'মহাশূন্যে বিশ্ব আমাদের গ্রাস করে এবং একটা বিন্দুতে পরিণত করে, সেকথা ঠিক; কিন্তু চিন্তার মাধ্যমে আমরা সেই মহাবিশ্বকেই আবার আলিঙ্গন করি'। তাই, যে কথা বলছিলাম, মানুষের ভিতর এমন একটা কিছু আছে যা অনন্ত।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মের কী সংজ্ঞা দিয়েছেন? *সত্যম্-জ্ঞানম্-অনন্তম্ ব্রহ্ম,* 'ব্রহ্ম হচ্ছেন সত্যম্, অর্থাৎ সত্য; *জ্ঞানম্* বা শুদ্ধ চৈতন্য; এবং *অনন্তম্,* অর্থাৎ অনন্ত'। বেদান্তমতে এই হলো ব্রহ্মের স্বরূপ যা থেকে এই বিশ্বপ্রবাহ উন্মেষিত হয়েছে। অতএব মানুষ হিসেবে আমরা বুঝতে পারি বিশ্বকে জানা এবং তাকে আবিষ্কার করার স্বাভাবিক ক্ষমতা আমাদের আছে; 'গাছ' অর্থাৎ সংসারবৃক্ষ এবং তার *মূল* দুটিকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। গাছটির চর্চা কম বেশি এখন আমরা সকলেই করি, কিন্তু হায়, মূলটির সন্ধান এবং তাকে বোঝার চেষ্টা করে কজন! কিন্তু এটা তো ভুললে চলবে না যে, মূলটিই গাছকে সঞ্জীবিত করে, তাকে পুষ্ট করে। তাই আমাদের মূলে যাওয়া দরকার। *প্রাচীন ভারতীয়রা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে অন্তর্লোকে ডুব দিয়েছিল এবং এই সত্য আবিষ্কার করেছিল যে, বহুর পিছনে এক নিত্য সত্তা আছে।* তাঁদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়েছিল—'আমিও ঐ শাশ্বত সত্তার একটি অংশ'। সপ্তম শ্লোকে এই অনুভূতিই প্রতিধ্বনিত হবে এবং বলা হবে, যে অনন্ত ও শাশ্বত ব্রহ্ম থেকে বিশ্ব উৎসারিত, আমরাও তার এক একটি স্ফুলিঙ্গ। মোহের কবল থেকে মুক্ত হলেই আমরা সেই পরম অবিনাশী অবস্থাটি লাভ করব।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬॥

—'সূর্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, চন্দ্রও না, অগ্নিও না; যেখানে গিয়ে [জীব] আর ফেরে না সেটিই আমার শ্রেষ্ঠধাম।'

এখানে একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। *তৎ মম পরমং ধাম,* শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'ঐ পরম অবস্থাটিই আমার স্বরূপ'। অবতাররূপ 'ঐটিই আমার প্রকৃত অবস্থা', ওখানেই আমার নিত্য স্থিতি। ওইটি স্বয়ংপ্রভ অবস্থা। অন্যত্র বলা হয়েছে, এই অবস্থাটি কিরকম জানো? *সকৃৎ বিভাতম্,* 'সর্বদা উজ্জ্বল'। সেই উজ্জ্বলতা থেকেই সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, এক কথায় সবকিছুই দীপ্তিমান হয়। এখানে তাই বলা হচ্ছে, *ন তৎ ভাসয়তে সূর্যো,* 'সূর্য সেই পরম সত্যকে প্রকাশ করতে পারে না'; *ন শশাঙ্কো,* 'চাঁদও না।' *শশ, অঙ্ক* এ দুয়ে মিলে *শশাঙ্ক*। এর এক অর্থ 'শশকের বা খরগোশের চিহ্ন'; অর্থাৎ, চাঁদকে দেখলে মনে হয় যেন ওর মধ্যে একটা খরগোশ আছে। সে যাইহোক, এখন বলা হচ্ছে, *ন পাবকঃ,* সেই পরম সত্যকে প্রকাশ করতে 'আগুনও পারে না'; *যৎ গত্বা ন নিবর্তন্তে,* 'যেখানে গেলে আমাদের আর জন্ম-মৃত্যুর জগতে ফিরে আসতে হবে না'; *তৎ ধাম পরমং মম,* 'সেটিই আমার পরম ধাম।' *ধাম* শব্দের অর্থ 'গৃহ' অথবা নিবাস।

বিভিন্ন উপনিষদেই এই ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ব্রহ্মই সব আলোর উৎস। তাই তাঁকে কেউই আলোকিত করতে পারে না। তাঁর তুলনায় সব আলোই নিষ্প্রভ। আত্মার দীপ্তির কাছে সূর্যের আলোও যেন জোনাকির মতো টিমটিম করে। তাই আত্মাকে *জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ* অর্থাৎ 'জ্যোতির ও জ্যোতি' বলা হয়েছে। কঠ উপনিষদ্ একটি সুন্দর শ্লোকে এই ভাবটিকে প্রকাশ করেছে। সেখানে (২/২/১৫) বলা হচ্ছে ঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

ন তত্র সূর্যো ভাতি, 'সেখানে সূর্য [ব্রহ্মকে] প্রকাশ করে না'; *ন চন্দ্র তারকম্,* 'চন্দ্র এবং তারারাও না'; *নেমা বিদ্যুতো ভান্তি,* 'এই সব বিদ্যুৎসমূহও

সেই সত্যকে প্রকাশ করে না'; *কুতোঽয়মগ্নিঃ,* 'এই জাগতিক আগুন আর তাঁকে কীভাবে প্রকাশ করবে!' *তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্,* 'তিনি প্রকাশমান বলেই সব কিছু প্রকাশ পায়; *তস্য ভাসা সর্বম্ ইদম্ বিভাতি,* 'তাঁর আলোতেই এই ব্যক্ত বিশ্ব আলোকিত।' শুদ্ধচৈতন্যের সেই আলোই আপনার, আমার, সব জীবের মধ্যেই জাজ্বল্যমান।

সেই আলো, সেই গভীরতম সত্যকে ভুলে গিয়ে আমরা এমন অদ্ভুত আচরণ করি যে বলার নয়। কিন্তু একবার আত্মার সেই জ্যোতির কথা জানতে পারলে আমাদের জীবন সম্পূর্ণ বদলে যায়। মরমিয়া সাহিত্যের সর্বত্রই আলো বলতে আত্মা বা ঈশ্বরকেই বোঝানো হয়েছে। ফারসি ভাষায় *নূর* বলে একটি শব্দ আছে, যার অর্থ আলো। এ আলো কীসের আলো? সত্যের আলো, ঈশ্বরের আলো। অন্ধকার কারোরই পছন্দ নয়; সকলেই আমরা আলোর পিয়াসী, আলোর দিকে যেতে চাই। দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাট এই সব আলোর মূল্য আছে ঠিকই, কিন্তু মনটিকেও তো আলোকিত করা চাই। তার জন্যও ব্যবস্থা আছে, তার জন্যও আলো আছে। কী সেই আলো? সত্য। সেই সত্যের উপলব্ধির দ্বারাই কেবল আমাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'সেইটিই আমার শ্রেষ্ঠ ধাম বা নিবাস'। অতএব সকল জ্যোতির জ্যোতিকে উপলব্ধি করলেই আপনি সেখানে পৌঁছে যাবেন।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭॥

—'আমারই এক চিরন্তন অংশ, সংসারে জীব হয়ে, প্রকৃতি থেকে মন সমেত ছটি ইন্দ্রিয়কে (নিজের দিকে) আকর্ষণ করে।'

বেদান্ত ও গীতার এই শ্লোকটি ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যে মানুষের মর্যাদাকে চরম সত্যের আলোকে এমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করা হয়নি। *মমৈবাংশো,* অর্থাৎ *মম এব অংশো,* 'আমারই এক অংশ'; এখানে *এব* মানে 'নিশ্চিতরূপে'; অর্থাৎ সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এবং আমার স্বরূপ, যা *সনাতনঃ,* 'শাশ্বত'; *জীবলোকে জীবভূতঃ,* 'সংসারে জীব হয়ে দেহধারণ করেছে'। এইটিই দেহধারী জীবের স্বরূপ; সে শাশ্বত, তাই সে কখনও মরতে পারে না। যা দেহকে আলোকিত ও সক্রিয় করে তাকেই *জীব* বলা হয়। জীব এবং ইংরেজি শব্দ 'genetic', দুটিই এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। শ্রীকৃষ্ণ

বলছেন, 'দিব্য স্ফুলিঙ্গরূপে আমিই সকল জীবের মধ্যে প্রবেশ করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অখণ্ড। অখণ্ডকে খণ্ড বলে মনে হচ্ছে বা দেখাচ্ছে'—এই যা। গীতা পরে বলবেন, এটা কীরকম জানো? 'ঠিক অখণ্ড আকাশের মতো'। মনে করুন, আপনি একটা হল তৈরি করলেন। এটা যেন অখণ্ড, অবিভাজ্য আকাশকে টুকরো করা হলো। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আপনি ভাবছেন আকাশকে আপনি ভাগ করেছেন। কিন্তু আকাশ এসব খণ্ডবিখণ্ড করার কথা কিছুই জানে না, কারণ আকাশকে কাটছাঁট করা যায় না।

মনঃ ষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি, 'ভিতরের সেই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও মনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে'। *ইন্দ্রিয়াণি* হলো 'ইন্দ্রিয়সমূহ'; *ষষ্ঠানি* মানে 'ছটি'; অর্থাৎ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই নিয়ে ছটি। আমার সনাতন অংশটি এই ছটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে দেহধারণ করে। মানুষের মধ্যে বিরাজমান এই *সূক্ষ্মশরীর*। এই সূক্ষ্মশরীরটি স্থূল শরীরের মধ্যেই বাস করে। এই সূক্ষ্মশরীরের মধ্যেই আবার চৈতন্য তত্ত্ব বা *জীব*-এর বসবাস।

কেবল উপনিষদেই এই চরম সত্যটি এইভাবে, এইরকম জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে। সুফি, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মের মরমিয়া সাধকেরাও একথা বলেছেন। কিন্তু এই সত্য এবং তার ব্যাখ্যা উপনিষদ্ই সর্বপ্রথম দিয়েছিল যা অন্যান্য অধ্যাত্মপথের পথিকদের প্রভাবিত করেছে। বাস্তবিক, আত্মার আবিষ্কার এক অতুলনীয় সত্যের উন্মোচন। কী সেই আবিষ্কার? আবিষ্কার এই যে, ক্ষুদ্র এই শরীরের মধ্যে এক প্রকাণ্ড তত্ত্ব বা সত্য নিহিত আছে। এই কারণেই মানুষকে উদ্দেশ্য করে উপনিষদ্ বলেছেন *অমৃতস্য পুত্রাঃ,* 'অমৃতের সন্তান'। দেহ নশ্বর, কারণ সে জড় মৃত্যুর সন্তান, কিন্তু মানুষ তা নয়, মানুষ অমৃতের সন্তান। মানুষকে এমন উচ্চ আসন আর কোথাও দেওয়া হয়নি এবং এমন দৃঢ়তার সঙ্গে সত্যের উদ্‌ঘোষণা আর কোথাও শোনা যায় নি। উপনিষদের একটিই কথা—তুমি স্বরূপত ঈশ্বর। তোমার এই দিব্য উত্তরাধিকারের কথা কখনও ভুলো না। সমগ্র বেদান্তের নির্যাসটি স্বামী বিবেকানন্দ দু-একটি কথায় দিয়েছেন। তিনি প্রথমে বললেন : 'প্রত্যেকেই স্বরূপত ঈশ্বর।' এ কথা বলে তিনি আরো কয়েকটি শব্দ জুড়ে দিলেন। বললেন, 'জীবনের লক্ষ্য এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন।' দিব্যতা আপনার ভিতর এখনও আছে। কিন্তু তা অপ্রকাশিত। যতক্ষণ আপনি তাকে বিকশিত না করছেন, ততক্ষণ সে আপনার কোন কাজেই আসবে না। ছাইচাপা আগুনে

তো আর আপনি ভাত রাঁধতে পারবেন না। তার জন্য ছাই সরিয়ে নিবু নিবু আগুনে আপনাকে কিছু শুকনো কাঠ ফেলতে হবে। তাহলেই দপ্‌ করে আগুন পূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে এবং তখন তাতে আপনি রাঁধতে পারবেন। এক্ষেত্রেও তাই। স্বরূপ হিসাবে আত্মা আমার ভিতরে থাকলেই হবে না, সেটাই যথেষ্ট নয়। আমি যে আত্মা, নিত্যমুক্ত, নিত্যশুদ্ধ—এই সত্যটি আমাকে উপলব্ধি করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ তাই আমাদের এই সত্যটি জানিয়ে দিচ্ছেন। সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের মূল কথা একটিই—প্রত্যেকেই স্বরূপত ব্রহ্ম এবং সেই দিব্যতাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি, সে ক্ষমতা আমাদের আছে। কিন্তু সেই শক্তিকে কাজে না লাগানোর দরুন আমরা সামান্য জীবের মতো ঘোরাফেরা করি। অথচ আমাদের বদ্ধ জীবের মতো বাঁচার কথা নয়। আমাদের মুক্ত হওয়ার কথা। মুক্তিতে আমাদের জন্মগত অধিকার। *মানুষের মুক্তির কথা বেদান্তের মতো আর কোন শাস্ত্র এমন শতমুখে বলে না।* বেদান্তের মূল প্রশ্ন—আপনি কি মুক্ত? আপনি কি স্বাধীন? বদ্ধ হয়ে থাকবেন না, বাহ্য শক্তি বা বিষয়গুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবেন না, *জীব* হয়ে থাকবেন না, মানুষ ছাড়া অন্য সব প্রাণীদের ভবিতব্য ঐ জীব হয়ে থাকা। অধিকাংশ নরনারীও হয়তো এখন তাই। কিন্তু এভাবে, এই হীন অবস্থায় পড়ে থাকতে সে বাধ্য নয়। সে ইচ্ছে করলে জীবনের মোড় ফেরাতে পারে। নিজের হাতে নিজের জীবনের ভার গ্রহণ করে তাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি। সে স্বাধীনতা আমাদের আছে। নিজের এই স্বাধীনতা অনুভব করুন এবং তাকে কাজে লাগিয়ে মুক্ত হয়ে যান। *সমস্ত মানবজাতির কাছে এটিই বেদান্তের মর্মবাণী।* বেদান্তের মধ্যে ধর্মমত ও সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণের গোঁড়ামি কিছু নেই। বেদান্ত শুধু বলে—জীবনে মহান সত্যটি বাজিয়ে দেখ, পরীক্ষা করে দেখ, তারপর তা জীবনচর্যায় ফুটিয়ে তুলে বল 'আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন।' ভগবান বুদ্ধও এই সত্য উপলব্ধি করে আনন্দে বলে উঠেছিলেন; 'আমি বোধিলাভ করেছি, আমি মুক্ত, আমি মুক্ত।'

বর্তমান শ্লোকে বলা হচ্ছে, ভিতরের সেই ক্ষুদ্র দিব্য স্ফুলিঙ্গ *প্রকৃতিস্থানি,* অর্থাৎ 'প্রকৃতিতে স্থিত' মন এবং পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে; মন ও পাঁচটি ইন্দ্রিয় 'সবই প্রকৃতি জাত', কারণ সবগুলিই তিন *গুণে* গঠিত। *কর্ষতি* মানে *আকর্ষতি,* নিজের কাছে 'আকর্ষণ করে'; সামান্য সীমিত মানুষ হয়ে যায়। অর্থাৎ মনো-দৈহিক প্রক্রিয়ার কবলে পড়ে ঐ দিব্য স্ফুলিঙ্গ [যেন] সীমিত মানুষে পর্যবসিত হয় এবং নিজের গগনচুম্বী স্বরূপকে ভুলে যায়।

আমাদের স্থূলশরীরের অন্তরালে একটি *সূক্ষ্মশরীর* এবং একটি *কারণ শরীর* আছে। *সূক্ষ্মশরীর* সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু তার চাইতেও সূক্ষ্ম *কারণ শরীর।* এই সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর একই সঙ্গে থাকে। মৃত্যুর সময় কী হয়? ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন, মৃত্যুর সময় স্থূল দেহটিই পরিত্যক্ত হয়। খসে যায়। সূক্ষ্ম শরীরের কিন্তু কিছু হয় না, সে অটুট থাকে। স্থূল শরীরের মৃত্যুতে সূক্ষ্ম শরীরের মৃত্যু হয় না। নতুন দেহ গ্রহণ করে পূর্ণতালাভের জন্য তার যাত্রা ক্রমাগত চলতেই থাকে। আমাদের প্রাচীন ঋষিদের প্রজ্ঞায় এই সত্যটি ধরা পড়েছিল। এই সূক্ষ্ম শরীরের আবিষ্কার থেকেই পুনর্জন্মবাদের মহান তত্ত্বটি প্রচারিত হয়েছে যা সব ভারতীয়রাই জন্ম থেকে বিশ্বাস করে আসছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনাকালে এস.এল.ক্রানস্টন (S.L.Cranston) সঙ্কলিত এবং নিউইয়র্কের জুলিয়ান প্রেস থেকে প্রকাশিত *Reincarnation : An East-West Anthology* নামক একখানি আধুনিক গ্রন্থের উল্লেখ করে দেখিয়েছিলাম যে পুনর্জন্মবাদ তত্ত্বটি আজ সারা বিশ্বেই আদৃত। এ জন্মে তো আর আমার সব বাসনা মিটল না, তাই আমি আবার সুযোগ পাব; নতুন দেহ গ্রহণ করে অপূর্ণ বাসনাগুলিকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করব। এভাবে চলতেই থাকে। *অনেক জন্ম সংসিদ্ধঃ,* এই ভাবে 'অনেকবার জন্মগ্রহণ করে করে', অবশেষে একদিন পরম সত্যটি উপলব্ধি করি। মানব বিবর্তনের এই চরম লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাই একেবারে শেষ জন্মে এবং তা এই পৃথিবীতেই—স্বর্গ বা দূরের কোন লোকে নয়। এই কথা মনে রেখে মানুষকে তার জীবন ও কর্ম পরিচালনা করে যেতে হবে।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮॥

—'ঈশ্বর যখন মানবদেহ ধারণ করেন এবং যখন তিনি শরীর ত্যাগ করেন, তিনি এই [সূক্ষ্ম] ইন্দ্রিয়গুলিকে এবং মনকে [সঙ্গে] নিয়ে যান, বাতাস যেমন আধার [ফুল] থেকে গন্ধগ্রহণ করে, তেমনি।'

এখানে *জীব* অথবা আত্মাকে *ঈশ্বর* বলে সম্বোধন করা হচ্ছে। কেন? যেহেতু *জীব ঈশ্বর* থেকেই এসেছে। সেই কারণে সেও *ঈশ্বর* । কিন্তু স্থূল জীবনের চৌহদ্দির মধ্যে এসে, সীমিত হয়ে, সে তার ঈশ্বরত্ব খুইয়ে বসেছে। এ যেন সম্মোহনের মতো। সম্মোহিত হয়ে আমরা সকলেই ভুগছি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন, সত্যিকারের ধর্ম কোন সম্মোহনের ব্যাপার নয়; সম্মোহনের

ঘোর কাটানোই তার উদ্দেশ্য। সম্মোহিত হয়ে আমরা ভাবছি আমরা বুঝি এই দেহটা। এ ঘোর মোহগ্রস্ততা। আমরা দেহ নই; আমরা দেহের *মধ্যে*। এই সত্যটি আমাদের উপলব্ধি করতেই হবে। তা যদি করতে পারি, তাহলে শরীর থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে, আত্মাই যে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে পারি।

শরীরং যদবাপ্নোতি, '*জীব* যখন মানবদেহ গ্রহণ করে', অর্থাৎ জন্মের সময়, অথবা *যচ্চাপ্যুৎক্রামতি*, 'যখন দেহত্যাগ করে', অর্থাৎ মৃত্যুর সময়। *উৎক্রামতি* শব্দের অর্থ 'বেরিয়ে যাওয়া' বা উৎক্রমণ করা। *ঈশ্বরঃ*, 'এই *ঈশ্বর* বা ভিতরকার *জীব*', যা ঈশ্বরের অংশ; *গৃহীত্বৈতানি সংযাতি*, দেহ ছেড়ে যাবার সময় মন ও ইন্দ্রিয়গুলির মতো 'সূক্ষ্ম উপাদানগুলিকে বয়ে নিয়ে যায়।' সূক্ষ্ম শরীর তখন নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে বেরিয়ে যায়। কেমন করে? দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হচ্ছে *বায়ুর্গন্ধান্ ইব আশয়াৎ; আশয়* মানে 'উৎস'। অর্থাৎ ফুল থেকে যেমন সৌরভ নির্গত হয় এবং বাতাস তা বয়ে নিয়ে যায়। বাতাস সুগন্ধ বয়ে নিয়ে যায় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে বাতাসের কোন সম্পর্ক নেই। সে সুগন্ধের বাহক মাত্র। সেইরকম, সূক্ষ্মশরীর ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি সঙ্গে নিয়ে যায় যাতে নতুন জীবনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সে উপভোগ করতে পারে। একেই পুনর্জ্জন্ম বলে।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯॥

—'কান, চোখ, ত্বক, জিভ, নাক এবং মনকেও আশ্রয় করে জীবাত্মা [রূপরসাদি] বিষয়গুলিকে উপভোগ করে।'

শরীরলাভ করে পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং মনের সাহায্যে আমরা এই জগৎ উপভোগ করি। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় কী? *শ্রোত্রং*, 'কান'; *চক্ষুঃ*, 'চোখ'; *স্পর্শনং*, 'ত্বক', *রসনং*, 'জিভ'; *ঘ্রাণমেব চ*, 'এবং নাক'—এই হলো পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যাদের সাহায্যে আমরা জগৎকে অনুভব করি; এবং *অধিষ্ঠায় মনশ্চ*, 'মনকে আশ্রয় করে'। মনই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই নিয়েই সূক্ষ্মশরীর প্রকৃতপক্ষে, স্থূল দেহ নয়, এই সূক্ষ্মশরীরই সবকিছু উপভোগ করে। আমরা পেটে খাবার চালান করি বটে, কিন্তু পেট তা উপভোগ করে না। উপভোগ করে আপনার সূক্ষ্ম শরীর, আপনার মন, আপনার ইন্দ্রিয়গুলি।

বিষয়ান্ উপসেবতে, ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা আপনার সূক্ষ্ম শরীর 'বিষয়গুলি ভোগ করে'। আগের দেহে উপভোগ করে আমরা সে দেহ ছেড়ে দিয়েছি এবং বর্তমান দেহে আগের সেইসব অভিজ্ঞতাকে বয়ে নিয়ে এসেছি। এইভাবে জন্ম জন্ম ধরে আমরা জগৎকে ভোগ করছি। যতক্ষণ না আমরা এই ভোগে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অনন্ত আত্মার দিকে মন দিচ্ছি, ততক্ষণ এভাবেই আমাদের জীবন চলবে। কিন্তু যেদিন আমরা আত্মার দিকে দৃষ্টি ফেরাব, সেদিন আর সূক্ষ্মদেহের এসব ছাইভস্ম অভিজ্ঞতার কোন প্রয়োজন হবে না। কারণ তখন তার বোধ হবে যে, চিরকাল সে পূর্ণই আছে। পেটভরা থাকলে কে আর খাদ্যের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে মরে? আমাদের পেট ফাঁকা বলেই খাদ্যের সন্ধান করছি। আমাদের মন ফাঁকা বলেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির পিছনে ছুটছি। মন পূর্ণ থাকলে এসব জিনিস আর আমরা খুঁজি না। এই যে একটা অবস্থা, একেই পূর্ণতা বা perfection বলে। এই পূর্ণতাই *মুক্তি* বা *মোক্ষ*। এই মুক্তিতে সকল মানুষেরই অধিকার। এই মুক্তিলাভই মানবীয় বিবর্তনের চরম লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বহু মানুষ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না। তারা জীব থেকেই খুশি, বাইরের জগতের শক্তিগুলোর হাতে খেলার পুতুল হয়েই খুশি, জন্মগত সংস্কার বা বাসনার দাসত্ব করেই তৃপ্ত।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০॥

—'(এক দেহ ছেড়ে আর এক দেহে) যাওয়ার সময়, অথবা (একই) দেহে অবস্থান করে বিষয়ভোগে রত, অথবা ত্রিগুণের সঙ্গে যুক্ত জীবাত্মাকে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা দেখতে পায় না; কিন্তু যাঁদের জ্ঞানচক্ষু আছে, তাঁরা দেখতে পান।'

এটি ভারি সুন্দর শ্লোক। আমার *Message of the Upanishads* (Appendix II, পৃঃ ৫৬৯) ('উপনিষদের সন্দেশ') নামক বইটি পড়ে স্যার জুলিয়ান হাক্সলে (Sir Julian Huxley) আমাকে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি জানান, 'আমরা পুনর্জন্ম স্বীকার করি না'। কঠোপনিষদে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। তাঁর চিঠির উত্তরে আমি এই বর্তমান শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলাম। হাক্সলে তাঁর চিঠিতে যে মত প্রকাশ করেছিলেন তা এই যে, 'আমাদের বিজ্ঞান পুনর্জন্ম স্বীকার করে না'। আমরা এইটুকু মানতে পারি যে দেহের মৃত্যুর পর কিছু একটা থেকে যায়, কিন্তু তা যে আবার অন্য আর একটা শরীর গ্রহণ করে, এ-মত আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তাতে

genetic continuity বা বংশগতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। বিজ্ঞানীরা কেবল বংশানুগতির নিয়ম (genetic system)-এ আস্থাবান। পিতা থেকে পুত্র—এইভাবেই প্রজনন শক্তির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। তাই কিছু যে একটা টিকে থাকে, তা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু পুনর্জন্মকে বিজ্ঞান মানে না। এই অভিমতের উত্তরে বর্তমানে আলোচ্য শ্লোকটি উদ্ধৃত করে আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম যে, জীব বা জীবাত্মা যখন দেহে থেকে তিন গুণের পরিণাম বিষয়গুলিকে ভোগ করেন, তখন তা দেখা যায়। কিন্তু তা দেখতে হলে আপনার *জ্ঞানচক্ষু* চাই। এই স্থূল চোখে সেই সত্য আপনি দেখতে পাবেন না। কিন্তু আমাদের *জ্ঞানচক্ষু* খুলে গেলে, প্রকৃতির পারে যে সত্যটি লুকিয়ে আছে, তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। এই চেয়ার বা টেবিলটি যে প্রোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদি উপাদানে গঠিত, সে সত্য চর্মচক্ষু দিয়ে আমরা ধরতে পারি না। তার জন্য দরকার *জ্ঞানচক্ষু*, একধরনের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, যা বিজ্ঞানেও অপরিহার্য।

এই প্রক্রিয়া, এই অনুশীলন, এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে বিকশিত করে আরো এগিয়ে যান। তখন দেখবেন, আবিষ্কার করবেন, হ্যাঁ, সত্যিই তো। দেহের মধ্যে আত্মা বলে একটি বস্তু আছেন যিনি সব কিছু উপভোগ করছেন। *জ্ঞানচক্ষু* উন্মীলিত হলে তখনই এই সত্য আপনার কাছে উদ্ভাসিত হবে। *বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি*, 'মূঢ় ব্যক্তিরা এই সত্য দেখতে পায় না'। কেন? তার কারণ, তারা শুধু বাইরেটাই দেখে, তাদের অন্তর্দৃষ্টি নেই। *পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ*, 'যাঁদের *জ্ঞানচক্ষু* আছে, তাঁরা এই সত্য দেখতে পান।' সমস্যা এইটিই। বিষয়টি নিয়ে সারা পৃথিবীতেই আজ অনুসন্ধান চলছে। খোদ আমেরিকাতেই বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান পুনর্জন্ম নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন, তথ্যও সংগ্রহ করছেন, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। তাঁদের ব্যর্থতার কারণ, এসব তত্ত্ব বাহ্যদৃষ্টি দিয়ে বোঝা যায় না। মন খুব শুদ্ধ হলে, কেবল তখনই দেহের আবরণ ভেদ করে, অর্থাৎ দেহভাব অতিক্রম করে, সূক্ষ্ম শরীরের ভিতর কি ঘটছে না ঘটছে তা দেখার ক্ষমতা অর্জন করা যায়। তখন পরিষ্কার দেখা যায় *জীব* কীভাবে জগতে আসছে, কিছুদিন সব ভোগটোগ করে আবার এ জগৎ থেকে চলে যাচ্ছে। যাঁদের *জ্ঞানচক্ষু* খুলে গেছে, তাঁরাই কেবল এই সত্যটি দেখতে পান, *মূঢ়াঃ* বা মোহগ্রস্তব্যক্তিরা পারে না।

আমাদের রক্ত-মাংসের শরীরটাকে বেদান্তে *স্থূলশরীর* বলা হয়। সেই স্থূলশরীরের ভিতর আবার একটি *সূক্ষ্মশরীর* আছে যা চিন্তা, অনুভব এবং

স্মৃতি দিয়ে গড়া, সংস্কৃতে যাকে *সংস্কার* বা *বাসনা*ও বলা হয়। ইংরেজিতে এই সূক্ষ্মশরীরকে আত্মা (soul) এবং সংস্কৃতে *জীব* বলে। সূক্ষ্ম শরীরের সন্ধান পেয়েই প্রাচীন ভারতীয় ঋষিরা পুনর্জন্মের ব্যাপারটি বুঝতে পারেন এবং বর্তমানে বহু সংস্কৃতিবান মানুষও যে এই সত্যে বিশ্বাসী তার প্রমাণ *Reincarnation : An East-West Anthology* নামক গ্রন্থটি। গ্রন্থের প্রচ্ছদে বলা হয়েছে ঃ

'পুনর্জন্ম তত্ত্বটিকে প্রায়শই প্রাচ্য ধারণা হিসাবেই দেখা হয় এবং মনে করা হয়ে থাকে যে, এই ধারণা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এবং ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খায় না। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সকল যুগের বিশিষ্ট দার্শনিক, ধর্মশাস্ত্রবেত্তা, কবি, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্যদের উদ্ধৃতিসমূহের বিপুল তথ্যপূর্ণ এই সংকলন, যার মধ্যে রয়েছে পুনর্জন্ম ভাবধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যসমৃদ্ধ সমীক্ষা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের পুনর্জন্মবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা, যা চিরাচরিত চিন্তাধারার এই ত্রুটি সংশোধনে সহায়তা করবে।'

'এই সংকলনের আলোচ্য-বিষয় মানুষের অমরত্ব, যাকে বহু দার্শনিক এ কালের মুখ্য বিচার্য বিষয় বলেছেন।'

ঘোষণাটি শেষ হয়েছে জেম্‌স ফ্রীমান ক্লার্ক (James Freeman Clarke) -এর নিম্নলিখিত মন্তব্য দিয়ে। তিনি বলেছেন ঃ

'এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় হবে, যদি দেখা যায় যে বিজ্ঞান এবং দর্শন, মৃত্যুর পরে আত্মার দেহান্তরে গমনের পুরনো তত্ত্বটি আবার গ্রহণ করছে এবং আমাদের বর্তমান ধর্মীয় মনোভাব এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে ঢেলে সাজিয়ে মানুষের বিশ্বাসের প্রশস্ত সমুদ্রে ভাসানোর উদ্যোগ করছে। অবশ্য মানুষের মতামতের ইতিহাসে এরকম বহু অদ্ভুত ঘটনাই ঘটেছে।'

গ্রন্থের মুখবন্ধে সংকলকরা বলেছেন, 'যদিও ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই বহু বিশিষ্ট চিন্তাবিদ পৃথিবীতে বারবার দেহধারণের এই ধারণাকে হয় সমর্থন করেছেন, নয়তো কখনও কখনও বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেছেন—এই গ্রন্থই যার প্রমাণ—তবুও এসব মন্তব্য পুনর্জন্মবাদকে একটি প্রামাণিক সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও বলব, যে চিন্তা বহু বিশিষ্ট মানুষকে দীর্ঘকাল ভাবিয়েছে, তাকে হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; বরং তা প্রশ্ন, পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানের যোগ্য।'

মৃত্যুর সময় একটা কিছু অবশ্যই চলে যায়, কিন্তু তা কোন স্থূল বস্তু নয়—তা অতি সূক্ষ্ম। আমরা যখন বেঁচে থাকি, তখন কিন্তু সেই সত্তা আমাদের সকলের মধ্যেই থাকে। আমরা যে নানারকম আনন্দ উপভোগ করি, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি, তার সবই তিনগুণ দিয়ে তৈরি এবং তার ভিতরেও ঐ সত্তা বিরাজমান। যাঁর *জ্ঞানচক্ষু* আছে, সূক্ষ্ম ধারণাশক্তি আছে, কেবল তিনিই তা টের পান। পাশ্চাত্যের আধুনিক স্নায়ুতত্ত্ববিদদের কারো কারো মন যেমন খুব সূক্ষ্ম—তাঁরা নিউরোন (neuron) এবং নিউরোন-এর কার্যকলাপ ছাড়াও মানুষের মধ্যে বাড়তি কিছু দেখতে পান। এই শ্লোকে তাই বলা হয়েছে, *বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি*, 'স্থূলবুদ্ধির মানুষ এই সত্য দেখতে পায় না'। কিন্তু আপনার মন যখন খুব সূক্ষ্ম হবে, তখন আপনি এই সত্য আবিষ্কার করতে পারবেন। আমি নিশ্চিত, বেদান্তের এই অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। জড় বিজ্ঞান যে এই সত্যকে শুধু প্রমাণ করেই ছাড়বে তা নয়, সে দেখিয়ে দেবে যে দেহান্তর গ্রহণের এই পূর্বধারণা বা অনুমানটিকে স্বীকার না করে নিলে আমাদের কোন অভিজ্ঞতারই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। জড়বিজ্ঞান হয়তো সরাসরি মন বা আত্মাকে প্রমাণ করে দিতে পারবে না, কিন্তু সে একথা বলতে পারে যে, স্থূল মস্তিষ্কের অতীত *কোন এক সত্তাকে* স্বীকার না করলে স্নায়ুগুলির কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করা যায় না। কোন কোন বিজ্ঞানীর ভিতর এই প্রত্যয় এসেছে, ভবিষ্যতে আরো অনেকের ভিতরেই আসবে, কারণ এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে। এখানেই দশম শ্লোকটির গুরুত্ব।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১॥

—'(পূর্ণতালাভের জন্য) সচেষ্ট যোগীরা এঁকে [আত্মাকে] নিজের ভিতরে দেখেন; কিন্তু অশুদ্ধচিত্ত এবং অবিবেকী ব্যক্তিরা চেষ্টা করেও এঁকে দেখতে পায় না।'

যতন্তো, 'যাঁরা সংগ্রাম করেন', অর্থাৎ যাঁরা আত্মসত্য উপলব্ধি করার জন্য প্রচণ্ড প্রয়াস করেন; *যোগিনঃ*, এমন 'যোগীরা'; পশ্যন্তি, 'দেখেন'; *আত্মনি অবস্থিতম্*, আত্মাকে 'নিজের ভিতর অবস্থিত দেখেন'। *যোগিনঃ চ এনম্*, 'যাঁরা অধ্যাত্ম সত্য সন্ধান করছেন, এমন যোগীরা'। যিনি অধ্যাত্ম সত্য অন্বেষণ

করছেন, তিনিই *যোগী।* এক দিক থেকে, যে বিজ্ঞানী জড় প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সত্যের সন্ধান করেন তাঁকেও যোগী বলা যায়, কারণ জড় বিজ্ঞানের লক্ষ্যও তো সত্যের অনুসন্ধান, তা ভিতর থেকেই হোক আর বাইরে থেকেই হোক। সত্যকেই তো তিনি চাইছেন। কিন্তু তাহলেও *যোগী* বলতে আমরা এমন মানুষকেই বুঝি যাঁর দৃষ্টি মানুষের ব্যক্তিত্বের অধ্যাত্ম দিকটির ওপরই নিবদ্ধ। *এনম্* মানে 'এই সত্য' অর্থাৎ আত্মাকে। *পশ্যন্তি আত্মানম্ অবস্থিতম্* মানে 'নিজের মধ্যে অবস্থিত দেখেন'; অর্থাৎ দেহ-মন সংঘাতের মধ্যে এই আত্মাকে প্রতিফলিত দেখেন। সেই যোগীর কাছে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়, যিনি তা উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করছেন, সংগ্রাম করছেন। *অকৃতাত্মানো,* কিন্তু 'যাদের মন *যোগ*যুক্ত নয়', তারা কেবল স্থূল বিষয়ের চিন্তাই করতে পারে, সূক্ষ্ম চিন্তা তাদের মাথায় ঢোকে না; এমন মানুষ, *যতন্তোঽপি,* 'চেষ্টা করলেও'; *ন এনম্ পশ্যন্তি,* এই দেহের পিছনে যে আত্মা আছেন, 'সেই আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে না'; *অচেতসঃ,* 'কারণ তাদের মন' এই সত্যর সঙ্গে 'সম্পূর্ণভাবে যুক্ত নয়।' তাই শুধু বাইরের জিনিস দেখাই তাদের কপালে আছে।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২॥

—'সূর্যস্থিত যে আলো সমগ্র জগৎকে আলোকিত করে, চন্দ্রেও যা এবং অগ্নিতেও যা [যে আলো], সে আমার আলো জেনো।'

সেই অদ্বয়, সর্বব্যাপী, শুদ্ধচৈতন্য এবং অবতাররূপে নিজের পরিচয় দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে বলছেন ঃ *যৎ আদিত্যগতং তেজো জগৎ ভাসয়তে অখিলম্,* 'সূর্যের যে আলো সমগ্র সৌরজগৎকে উদ্ভাসিত করে।' বাস্তবিক, সৌরশক্তির এমন প্রতাপ যে তা দুর্গম গিরিগুহার ভিতরেও প্রবেশ করতে পারে। সেইরকম, *যৎ চন্দ্রমসি যৎ চ অগ্নৌ,* 'চন্দ্র এবং অগ্নিতে যা আছে'; সেগুলিও তো দীপ্তিমান বস্তু; তৎ *তেজো বিদ্ধি মামকম্,* 'জেনো, তারা সেই সব জ্যোতি আমার কাছ থেকেই পেয়েছে', সেই আমি, যে শুদ্ধচৈতন্য। শুদ্ধচৈতন্য স্বপ্রকাশ, জ্যোতিস্বরূপ—তিনি সবচেয়ে দীপ্তিমান, যে দীপ্তির কোন তুলনা নেই। সূর্যের আলো তার ভিতরের কতকগুলো জৈবিক প্রক্রিয়ার ফল—ও আলো তার নিজস্ব নয়; তাই একদিন না একদিন সূর্যের মৃত্যু হবে—আমরা বলি তাপ-মৃত্যু বা 'heat death'। যেদিন সূর্যের ভিতরকার সব হাইড্রোজেন শক্তিতে

রূপান্তরিত হয়ে নিঃশেষে জগতের বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে, সেদিন আর সূর্য সূর্য থাকবে না। এখন যে সূর্যের আলো আমরা পাচ্ছি, তা *সাময়িক* কিছুকালের জন্য, চিরদিন পাব না। কিন্তু যিনি পরমাত্মা বা ব্রহ্ম, তিনি সব আলোর আলো। তাই উপনিষদে ব্রহ্মকে *জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ* অর্থাৎ 'সকল জ্যোতির জ্যোতি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'আমিই সেই আলো' বলতে শ্রীকৃষ্ণ সেই তত্ত্বটিই বোঝাতে চেয়েছেন। সেন্ট জন-এর চতুর্থ গসপেলেও (Gospel) বলা হয়েছে: 'তিনিই আলো যা বিশ্বে আগত সবার হৃদয় আলোকিত করে রেখেছে।' এটি অনুপম বৈদান্তিক সত্য। যে আলো সকলের হৃদয় উজ্জ্বল করে রেখেছে, সেটি ঈশ্বরের দিব্য জ্যোতি। অনন্ত চৈতন্যরূপ যে আমি, তার দীপ্তিতেই সব কিছু দীপ্যমান।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩॥

—'আমার ঐশ্বরিক শক্তি দিয়ে পৃথিবীতে প্রবেশ করে আমি ভূতসমূহ ধারণ করি এবং রসাত্মক চন্দ্র হয়ে সকল ওষধি পুষ্ট করি।'

সেই এক সত্তা, অর্থাৎ অনন্ত চৈতন্য, পৃথিবীতে প্রবেশ করে *ভূতানি ধারয়ামি অহম্*, বলছেন, 'আমি সর্বভূতকে ধারণ করি'; *ওজসা*, 'আমার শক্তি দিয়ে'; *পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ*, 'সব গাছ-গাছড়া এবং ওষধিকে পুষ্ট করি।' পৃথিবীতে প্রবেশ করে সেই ওজঃ শক্তি দ্বারা আমি সব প্রাণী তথা জীবনকে পরিপুষ্ট করি। পৃথিবীই আপাতদৃষ্টিতে সব কিছু দেয় আমাদের, কিন্তু শেষপর্যন্ত তার শক্তিও আসছে সেই অনন্ত উৎস থেকে। সেই উৎসের নাম ঈশ্বর। তাই আমরা তাঁকে *পরাশক্তি, আদ্যাশক্তি* অর্থাৎ 'সর্বোচ্চ শক্তি, আদি শক্তি' এই সব বলে থাকি। বেদান্ত সাহিত্যে এইসব নামের ছড়াছড়ি। এই শক্তিই আবার ওষধি অর্থাৎ গাছ-গাছড়া এবং রসাত্মক চন্দ্রকে পুষ্ট করে। প্রাচীন কালে মনে করা হতো, দেখতে নিরেট মনে হলেও চাঁদের প্রকৃতি আসলে নমনীয় বা জলীয় যা গাছপালাকে সমৃদ্ধ করে। এটি প্রাচীন ভারতীয় বিশ্বাস। তাই এখানে বলা হচ্ছে *পুষ্ণামি*, 'আমি পুষ্ট করি'। *এখানে যে-কথাটি বোঝাবার তা এই, এই অপূর্ব সত্তা কেবল সর্বাতীত নন, তিনি সর্বগতও বটে।* এই অসীম সত্তা যেমন একদিকে প্রকৃতির মধ্যে বিরাজ করছেন, তেমনি মানুষের ভিতরেও বিদ্যমান। এই সত্যটি বোঝানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ পরের শ্লোকে এমন একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন

যার সঙ্গে আমরা পরিচিত এবং যা আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে। তিনি বলছেন—আমরা অনেককিছু খাই এবং তা হজম করি। খাদ্যবস্তুর সারটা নিয়ে শরীর গঠন করি এবং যা অবাঞ্ছিত ও বর্জনীয় তা পরিত্যাগ করি। কিন্তু কীভাবে খাদ্য হজম হয়? আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বলা হচ্ছে—*জঠরাগ্নি* দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সমস্ত প্রাণীর এই যে জঠরাগ্নি যা চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় (অর্থাৎ যা চিবিয়ে খাওয়া হয়, চুষে খাওয়া হয়, চাটা হয় এবং পান করা হয়) ইত্যাদি চাররকমের ভোজ্য বস্তুকে পরিপাক করে, সে আগুন আমিই। তাঁর শক্তিতেই এই কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এই বাস্তব দৃষ্টান্তটি বুঝিয়ে দিচ্ছে আমরা তাঁর মধ্যে এবং তাঁর দ্বারাই প্রতি মুহূর্তে বেঁচে আছি। পরম সত্তা সম্পর্কে এটিই বেদান্তের অভিমত। তিনি বিশ্বের বাইরে আছেন এবং ভয়ের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে আমরা তাকিয়ে থাকব—না, তা নয়। কখনও যেন আমরা ওরকম না ভাবি। এই বিশ্বে তিনি *ওতপ্রোত* হয়ে আছেন। *ওতঃপ্রোতম্* এটি সুন্দর সংস্কৃত শব্দ। এর মানে 'টানা-পোড়েন'। একটা কাপড় হাতে নিয়ে দেখুন। কাপড়টা কি? আগাগোড়া টানা আর পোড়েন। সেইরকম ব্রহ্মকেও এই বিশ্বের টানা আর পোড়েন, অর্থাৎ এক অবিভাজ্য সত্তা বলা হয়েছে। তাই কেউ যখন খেয়েদেয়ে বলে—'আমি হজম করছি', বুঝতে হবে যে, ঈশ্বরই ঐ হজমশক্তিরূপে নিজেকে প্রকাশ করছেন। পরের শ্লোকে এই ভাবটিকে আরো বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করা হবে।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪॥

—'আমিই বৈশ্বানররূপে প্রাণিদের দেহ আশ্রয় করে, প্রাণ ও অপানযুক্ত হয়ে, চাররকম খাদ্য পরিপাক করি।'

আমিই বৈশ্বানর বা অগ্নি হয়ে *প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ,* 'মানুষের দেহে প্রবেশ করে'; *প্রাণাপান সমাযুক্তঃ,* '*প্রাণ* ও *অপান* (বায়ু) সংযুক্ত হয়ে'; *পচামি অন্নম্,* 'অন্ন হজম করি'; পচ্ মানে 'হজম করা', 'পোড়ান' অথবা 'রান্না করা'; *চতুর্বিধম্,* 'চার রকমের' খাদ্য। চাররকম খাদ্য কী কী? চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয়। অতএব, খাওয়া দাওয়াও একটা পবিত্র কাজ। বাস্তবিক, বেদান্তের একটি মূল বক্তব্য হলো, আধ্যাত্মিক নয় এমন কিছুই নেই। জাগতিক বলে কিছুই নেই, সবই আধ্যাত্মিক, সবই পবিত্র, সবই দিব্য। এখনকার ভাব ঠিক এর বিপরীত, যা বলে পবিত্র বা শুদ্ধ বলে কিছু নেই—সবই জাগতিক এবং

একঘেয়ে। এটি অতি আধুনিক হুজুগ। কিন্তু গীতার ভাবই শেষপর্যন্ত মানুষকে টানবে কারণ একথা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, সৌরশক্তিই খাদ্যরূপে এবং হজমশক্তিরূপে আমাদের কাছে হাজির হয় এবং তা আবার আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ঈশ্বরীয় শক্তিই নানাভাবে, নানারূপে পরিবর্তিত হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছে। খাদ্যের উপমা দিয়ে এটি বোঝানো হলেও আপনাদের বুঝতে হবে যে, এই সত্য জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ শক্তির একটিই উৎস—তা হলো ঈশ্বর। তাঁর কাছ থেকেই সব কিছু আসছে এবং গাছপালা, ফুল, ফল, ঋতু, যাবতীয় সবকিছুর বিকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর মহিমাই প্রকাশ পাচ্ছে। বিশেষ গাছের বিশেষ ফুল বা ফল বিশেষ ঋতুতেই আত্মপ্রকাশ করে। তাই, যা বলছিলাম, বেদান্তে জাগতিক বলে কিছুই নেই, আমরা বুঝি আর নাই বুঝি সবই পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক রসে সম্পৃক্ত। এটি ভারতীয় চিন্তাধারা যা জেনে রাখা ভালো। 'সেক্যুলারইজম্' বলে আমাদের আলাদা কিছু নেই। উপনিষদের মহান শিক্ষা হলো *ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতম্*—'সেই অবিনাশী ব্রহ্মই এই ব্যক্ত বিশ্ব।' গোটা বিশ্বটাই যে ব্রহ্ম, তা একবার বুঝতে পারলে সবকিছুই পবিত্র, সবই দিব্য মনে হয়। জীবনকে কেমন করে পবিত্র ও দিব্য করে তোলা যায়, এই ভাবনাই যেন আমাদের ব্যাকুল করে তোলে। কারণ আজ আধুনিকতার দোহাই দিয়ে যা কিছু অর্থবহ, সুন্দর, পবিত্র ও দিব্য, তাদের ধ্বংস করার পথে আমরা অনেকদূর এগিয়ে গেছি। জীবনে যে কিছু পবিত্র, দিব্য বস্তু আছে, সে সম্পর্কে একটুখানি সচেতনতা আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। পাশ্চাত্যের বহু মানুষ আজ এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছেন; তাঁরা জীবনকে দিব্যায়িত করার জন্য উৎসুক। সমকালীন জীবনে তাই এই শ্লোকটি খুবই প্রাসঙ্গিক।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

—'আমিই সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট; স্মৃতি, জ্ঞান ও (তাদের) বিলুপ্তি আমার থেকেই আসে। সমস্ত বেদ দ্বারা আমিই জ্ঞাতব্য; আমিই বেদান্তপ্রবর্তক এবং আমিই বেদের জ্ঞাতা।'

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমিই সকলের আত্মা।' *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো,* 'আমিই সকলের হৃদয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি'; কেবল মানুষের হৃদয়ে নয়, মানুষ নয় এমন প্রাণীর হৃদয়েও। *মত্তঃ স্মৃতিঃ জ্ঞানম্ অপোহনং চ,* '*স্মৃতি* বল, *জ্ঞান* বল এবং *অপোহন* অর্থাৎ তাদের বিলোপই বল, বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা তোমরা আমার কাছ থেকেই পেয়ে থাক'। অর্থাৎ শুধু ভালোটাই নয়, মন্দটাও আসে সেই এক ঐশী উৎস থেকে। যেহেতু এক ঈশ্বরই আছেন, খারাপটির হেতুও তিনি। তাই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি—সবকিছুর আদি মূল তিনি—যা কিছু আসে, সব সেই এক উৎস থেকে। আমাদের হিন্দু বা বেদান্ত দর্শনে দুটি উৎস নেই। ভালোর জন্য একজন এবং মন্দর জন্য আরেকজন, অর্থাৎ শয়তান, না—এরকম মত আমাদের নয়। এই সত্যটি আমরা সৌরজগতের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। সৌরজগতের সব কিছুই আসে সৌরবিকিরণ থেকে। মনে করুন, টেবিলে চমৎকার সব ফুল রয়েছে; পাশাপাশি সুস্বাদু খাবারও রয়েছে। এগুলি সবই সৌরবিকিরণের ফল। তা নয় মানা গেল, কিন্তু ঘরের এক কোণে যে ধুলো-ময়লা পড়ে আছে, সেগুলো কোত্থেকে এল? তার উত্তর—ঐ সৌরবিকিরণ থেকেই। ওগুলোও একরূপে সৌরবিকিরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই, এই বিশ্বের ভালো, মন্দ অথবা তার মাঝামাঝি অন্য সব কিছুই সেই সৌরশক্তি। একটু বিজ্ঞানমনস্ক হলেই আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, ভালো এবং মন্দের দুটি পৃথক উৎস নেই। পথের ঐ যে অবাঞ্ছিত ধুলো, সেও এক বিশেষ অবস্থায় সৌরবিকিরণের ফল। জঞ্জালেরও কিছু গুণ আছে। তার থেকেও সার হয়, যা গাছপালাকে পুষ্ট করে। তাহলে জঞ্জালকে সর্বাংশে মন্দ বলি কী করে? তা চাষবাসের কাজে লাগে, গাছের ফলন বাড়িয়ে দেয়। তাকে আমরা বড় জোর আপেক্ষিকভাবে খারাপ বলতে পারি। কিন্তু ময়লা আমরা না খেলেও সেই সারে পুষ্ট যেসব শস্য বা ফলমূল হয়, সেগুলি তো আমরা খাই। তাহলে তাকে আমরা পুরোপুরি খারাপ বলি কী করে? তারও তো গভীর মূল্য আছে। সেই সত্যটি আমরা প্রায়শই ভুলে যাই। অতএব, এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে যেটি খারাপ, অন্য আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটিই ভালো। এটি আমাদের বুঝতে হবে।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সাপের বিষ ভয়ানক বস্তু। আমরা তাকে ভয় পাই। কিন্তু তারও অনেক গুণ। চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট কদর, কারণ ঠিক সময়ে, ঠিক মতো প্রয়োগ করলে তা রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পারে। এইভাবে দেখলে দেখবেন কোন কিছুই পুরোপুরি ভালো নয় এবং কোনকিছুই পুরোপুরি

খারাপ নয়। বেদান্ত এই কথাই বলে, যদিও দ্বৈতবাদী ধর্মমতগুলি এই সত্যের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানীদের কথা আলাদা; এই বিশ্বের পিছনে যে এক ঐক্য আছে, তা তাঁরা বিশ্বাস করেন।

বেদৈশ্চ সর্বৈঃ অহমেব বেদ্যো, 'সমগ্র বেদে একমাত্র আমিই জ্ঞাতব্য'। অর্থাৎ বেদের জ্ঞাতব্য হলো এই শাশ্বত দিব্য সত্য। *বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্‌,* 'আমিই বেদের স্রষ্টা; আমিই বেদসমূহের জ্ঞাতা।' এই সত্যটি আমাদের জানতে হবে। সমস্ত বেদে যে কথাটি ঘোষণা করা হয়েছে তা এই ঃ *সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি।* এই শ্লোকাংশটি আমরা কঠ উপনিষদে (১/২/১৫) পাই। এর অর্থ—'বেদসমূহ যে গম্যবস্তুর কথা, যে সত্যের কথা একবাক্যে ঘোষণা করে।' এই হলো সেই সত্য, সেই অনন্ত *এক* বস্তু এবং 'আমিই তাই', সেই পরমপদ।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬॥

—'এই জগতে *ক্ষর* এবং *অক্ষর,* বিনাশশীল ও অবিনশ্বর, এই দুই পুরুষ আছেন। সকল ভূত বিনাশী এবং *কূটস্থ* অবিনাশী বলে অভিহিত।'

অবশেষে আমরা গীতার একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশে এসে পড়েছি। পরের শ্লোকটিতে আমরা দেখতে পাব শ্রীকৃষ্ণ *উত্তম পুরুষ* বা পরম পুরুষের কথা বলছেন। দু-একটি প্রাচীন পুরাণ ছাড়া আর কোথাও ভগবানকে *পুরুষোত্তম* রূপে দেখান হয়েছে বলে আমরা জানি না। তাই এ অধ্যায়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই অধ্যায়ের নামটিও *পুরুষোত্তমযোগ।*

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চ অক্ষর এব চ,* 'এ জগতে দুটি পুরুষ আছেন যাঁদের একটি *ক্ষর,* অর্থাৎ নশ্বর এবং অন্যটি *অক্ষর* বা অবিনশ্বর'। আদি প্রকৃতিই হলেন *অক্ষর পুরুষ,* যাঁর বিনাশ নেই। যিনি অবিনাশী, তিনি নিত্য আছেন এবং তিনিই নানা বিকারশীল রূপ ধারণ করেন। এই সমস্ত রূপ বা বস্তুসমূহই *ক্ষর পুরুষ।* দুটি পুরুষের বৈশিষ্ট্যটি একটু তলিয়ে দেখুন। *ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি,* 'ভূত বা সব সৃষ্ট বস্তুই বিনাশশীল' এবং *কূটস্থ অক্ষর উচ্যতে,* 'যিনি *কূটস্থ,* মায়ারূপে আছেন, অর্থাৎ আদি প্রকৃতি, তিনি *অক্ষর পুরুষ,* অর্থাৎ অবিনাশী'। এখান থেকে যে ভাবটি পাচ্ছি, সেটিই পরের শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হবে।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭॥

—'[*ক্ষর ও অক্ষর থেকে*] আলাদা এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ [আছেন] যিনি পরমাত্মা, অক্ষর ব্রহ্ম, ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত থেকে যিনি তাদের পালন করেন।'

আগের শ্লোকে যে *ক্ষর* এবং *অক্ষর পুরুষ*-এর কথা বলা হয়েছে, তাঁরা তো আছেনই। তাছাড়াও *উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ*, 'আরেকজন পরম উৎকৃষ্ট পুরুষ আছেন'। তিনি কে? বলা হচ্ছে, *পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ*, 'তিনি পরমাত্মা বলে অভিহিত'। তিনিই *উত্তম পুরুষ*, 'শ্রেষ্ঠ পুরুষ'। *পুরুষ* হিসাবে *উত্তম পুরুষ*-এর ধারণাটি কী অসাধারণ বলুন তো! এরপর বলা হচ্ছে, *যো লোকত্রয়ম্ আবিশ্য*, 'যিনি সমস্ত বিশ্ব আবৃত করে রয়েছেন'; আবিশ্য মানে আবৃত করা, ঢেকে রাখা; বিভর্তি, সমগ্র বিশ্বকে 'রক্ষা করেন'; তিনি *অব্যয়*, 'অবিনাশী'; এবং *ঈশ্বরঃ*, 'পরম নিয়ন্তা'। এটি চরম সত্য। একদিকে তিনি পরমাত্মা, অন্যদিকে তিনি আবার আপনার এবং আমার মধ্যে রয়েছেন! শ্রীকৃষ্ণ আগেই নিজমুখে বলেছেন, 'আমার এক দিব্য অংশ বা স্ফুলিঙ্গ তোমাদের সকলের ভিতর প্রবেশ করেছে।' তাহলেই দেখা যাচ্ছে, পরমাত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য অনন্ত, অখণ্ড এবং অদ্বিতীয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকেই, বহুর মধ্যে যে এক সত্তা, আমরা সে আলোচনা করে চলেছি। বস্তুত সেই অদ্বিতীয় সত্তাই আছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছিল, 'সব *ক্ষেত্রে* আমাকেই একমাত্র *ক্ষেত্রজ্ঞ* বলে জেনো।' তাৎপর্য এই, জ্ঞাতা একজনই আছেন, জ্ঞাতব্য বহু। রূপের বৈচিত্র্য ও বহুত্বের জন্য মনে হয় জ্ঞাতা বুঝি বা অনেক। কিন্তু না, তা নয়। সব *ক্ষেত্রের* একজনই *ক্ষেত্রজ্ঞ*, যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিবিম্বিত হন। কিন্তু বিচার করে দেখলে বোঝা যায় সব ক্ষেত্রের একজনই *ক্ষেত্রজ্ঞ*। শাশ্বত দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা একজনই আছেন এবং তিনি ব্রহ্ম। এই হলো উপনিষদের চরম সিদ্ধান্ত। এখানে গীতায় তাঁকে *অব্যয়, ঈশ্বর* ইত্যাদি বলা হচ্ছে। জগতের সব কিছুরই *ব্যয়* বা বিনাশ আছে। জগৎটাই *ব্যয়*। আমরা সবাই শক্তি আহরণ করছি আবার তা খরচও করে ফেলছি। শেষে এমন দিন আসবে যখন আমাদের আর শক্তি বলে কিছু থাকবে না। বেদান্ত বলে, ব্যক্ত ব্যক্তি বা বস্তু-সত্তার সর্বত্রই এই প্রকৃতি। কিন্তু শক্তির উৎসটি সর্বদা পরিপূর্ণ, অনন্ত, *অব্যয়।*

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

—'যেহেতু আমি [বিনাশশীল] ক্ষরের অতীত এবং [অবিনাশী] অক্ষরেরও ঊর্ধ্বে, সেইহেতু ইহলোকে এবং বেদেও [আমি] *পুরুষোত্তম* বলে প্রসিদ্ধ।'

এটি বিখ্যাত শ্লোক। *যস্মাৎ,* 'যেহেতু'; *ক্ষরম্ অতীতোঽহম্,* 'আমি *ক্ষর* অথবা বিনাশশীল বস্তুসমূহের অতীত'; *অতীতঃ* মানে 'ঊর্ধ্বে' অথবা 'শীর্ষে' অথবা 'পারে'; *অক্ষরাৎ অপি চ উত্তমঃ,* 'এবং *অক্ষর* অথবা অবিনাশী শক্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ'। *উত্তমঃ* শব্দের ব্যঞ্জনাটি ভারী গভীর। শ্রেষ্ঠকেই *উত্তমঃ* বলে। ক্রমানুসারে প্রথম পাচ্ছি *ক্ষর পুরুষ,* যা নশ্বর। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন *অক্ষর পুরুষ* বা অবিনশ্বর সত্তা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি এই *অক্ষর পুরুষের* চেয়েও শ্রেষ্ঠ। *অতঃ,* 'অতএব'; *অস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ,* 'আমি বেদে এবং ইহলোকে প্রসিদ্ধ'; কী নামে? *পুরুষোত্তমঃ,* 'পুরুষোত্তম বা *উত্তম পুরুষ'* বলে। ভক্তের ভগবান এবং জ্ঞানীর ঈশ্বর হচ্ছেন *পুরুষোত্তম।* এক ব্রহ্মই *সগুণ* এবং *নির্গুণ* হয়েছেন। একই সত্তা এক দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎরূপে ব্যক্ত হচ্ছেন, আবার আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে জগতের অতীত স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। একই সত্তার দুটি অবস্থা বোঝাতে সংস্কৃতে *নিত্য* এবং *লীলা,* এই দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। *নিত্য-স্বরূপে* ব্রহ্ম যা তাই এবং *লীলা-স্বরূপে* তিনি এই জগৎ। এই জগৎ তাঁর খেলা। দশম অধ্যায়, অর্থাৎ *বিভূতিযোগ*-এ আমরা দেখেছি এই বিশ্ব বিপুল বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এই বৈচিত্র্য ঈশ্বরেরই দিব্য *বিভূতি* বা প্রকাশ। তাই আমরা জগৎকে ঈশ্বরের থেকে আলাদা করে দেখি না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলেছেন—*নিত্য* আর *লীলা* এক। যা *নিত্য* তাই *লীলা,* আবার যা *লীলা* তাই *নিত্য।* অদ্বৈত দর্শনে একটিকে আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোন উপায় নেই। রূপের বিচারে সব আলাদা মনে হলেও সত্য এই যে, সবকিছুর পিছনে সেই এক সত্তা বিরাজ করছেন। আজকের জড়বিজ্ঞানও সেই মূলগত ঐক্য অন্বেষণের দিকেই ঝুঁকেছে। বিজ্ঞানীরা আজ এমন এক শক্তির সন্ধান করছেন যা সব শক্তির আকর বা উৎস। একে তাঁরা unified field energy বা সমন্বিত শক্তিক্ষেত্র তত্ত্ব বলছেন, যার দ্বারা অন্য সব শক্তির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। স্থূল জগতে এই সংগ্রাম চলছে। আমরা কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্মকে মিলিয়ে দিয়ে শুদ্ধ চৈতন্যরূপ অসীম ব্রহ্মের মধ্যে সেই ঐক্যকে আবিষ্কার করেছি। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্* বলছেন, *সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম।* অর্থাৎ ব্রহ্ম হলেন পরম সত্য

বা *সত্যম্*—এমন একটা কিছু যা আছে; এটা কল্পনা নয়। সেইরকম, এই ব্রহ্ম *জ্ঞানম্*, যাঁর স্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্য; তিনি জড় পাথর নন। তারপর বলা হয়েছে, *অনন্তম্*, অর্থাৎ অসীম। কিন্তু কোথায় তিনি? তার উত্তরে বলা হচ্ছে, *যো বেদ নিহিতম্ গুহায়াম্*—যিনি আপন হৃদয়ে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন, তিনি এই দেহেই ব্রহ্মত্বলাভ করেন, কারণ ব্রহ্ম তো হৃদয়েই নিহিত আছেন। কী অসাধারণ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে! উপনিষদ্ বলতে চাইছেন, ইচ্ছে করলে সেই অনন্ত সত্তাকে বা সত্যকে আমরা আমাদের আত্মা বলে উপলব্ধি করতে পারি।

সমস্ত উপনিষদ্ জুড়েই এই বিস্ময়কর সত্যের আলোচনা ও ব্যাখ্যা, যার মূল বক্তব্য হলো সেই অনন্ত চৈতন্যকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা মানুষের আছে, কারণ তার দেহ-মন সংঘাতেই সেই চৈতন্য প্রতিফলিত। জীবজন্তুর কিন্তু এই সর্বোচ্চ জ্ঞানলাভের সামর্থ্য নেই; তাদের দৌড় প্রবৃত্তিগত জ্ঞান পর্যন্ত। এর বেশি তারা বোঝে না। একমাত্র মানুষেরই বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎকে বোঝার ক্ষমতা আছে। নিজের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে, দেহ-মনের উর্ধ্বে তার যে অসীম সত্তা, তাকে সে অনুভব করতে পারে। অদ্বৈত গ্রন্থ *অষ্টাবক্র গীতা*-য় একটি শ্লোক আছে (৭/২) যেখানে ঋষি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলছেন ঃ 'আমি সেই অসীম সত্য-সমুদ্র যেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঢেউ-এর মতো উঠছে, কিছুক্ষণ থাকছে, তারপর আবার মিলিয়ে যাচ্ছে'—*ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ জগদ্বীচিঃ স্বভাবতঃ। বীচি* মানে 'তরঙ্গ'। *জগদ্বীচিঃ* মানে 'জগৎরূপ তরঙ্গগুলি'। অতীত ও বর্তমানের বিশ্বসমূহ অনন্ত সমুদ্রের তরঙ্গমাত্র এবং আমিই সেই অনন্ত সাগর। আমি এই তুচ্ছ, ক্ষুদ্র শরীর নই। এ কথা বলা কি সহজ? কী দুর্জয় সাহস লাগে এ কথা বলতে! কিন্তু মানুষই তা পারে, কারণ তার স্বরূপ বাস্তবিকই অনন্ত। অসীম যেন সীমার জালে ধরা পড়ে তার বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে! মানুষের জীবনে যে সংগ্রাম, তার প্রকৃত অর্থই তো এই। নিজেদের প্রশ্ন করুন ঃ 'কেন আমরা মুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করি?' দেখবেন মন বলে উঠবে, সংগ্রাম করি, তার কারণ আমরা অনুভব করি যে আমরা বদ্ধ, আর কেই বা বদ্ধ হয়ে থাকতে চায়? আমরা মুক্তি চাই, কারণ মুক্তিই জীবনের লক্ষ্য, মুক্তিই আমাদের যথার্থ স্বরূপ। কেমন করে এই মুক্তিলাভ করতে হয় তা যদি আমাদের জানা থাকে তবে এই জন্মে, এই দেহেই আমরা মুক্ত হয়ে যেতে পারি। বেদান্ত সেই পথটি আমাদের বলে দেয়, কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে তা আমাদের জানিয়ে দেয়। মানুষ শৃঙ্খলমুক্ত *হলো তো ঈশ্বর হয়ে গেল।* আর ঈশ্বর যখন পায়ে বেড়ি পরেন, তখন তিনি মানুষ।

'কথামৃতে' শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক এই কথাই বলেছেন—'পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।' স্বরূপত আমরা তো সেই অনন্ত ঈশ্বরেরই অংশ। আমরা যদি এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারি, এমনকি সেই উপলব্ধির দিকে একটুখানি অগ্রসর হতে পারি তাহলে কী ভালোই না হবে বলুন তো। ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার; তাঁর ব্যক্তিসত্তা আছে, আবার তিনি নৈর্ব্যক্তিকও বটে। এই শ্লোকে আমরা যে *পুরুষোত্তমের* ধারণা পাচ্ছি তার সাহায্যে সগুণ ও নির্গুণের ঐক্যটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে বলছেন, 'আমি *ক্ষর পুরুষ* এবং *অক্ষর পুরুষ,* দুইএরই অতীত; তাই ইহলোকে এবং বেদে আমি *পুরুষোত্তম* বলে প্রসিদ্ধ।'

পুরুষোত্তম সম্পর্কে আমাদের অনেকরকম ধারণা আছে। কিন্তু আমরা যেন কখনও না ভুলি যে *পুরুষোত্তম* একজনই, তা সে আমরা তাঁকে *শিব* বলেই ডাকি অথবা *বিষ্ণু* বলেই ডাকি। সেটা আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার। তা বলে তাঁরা আলাদা কিছু নন। *রুচিনাং বৈচিত্র্যাৎ,* 'রুচির ভিন্নতা অনুযায়ী' এক পুরুষোত্তমকেই আমরা নানাভাবে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা নামে ডেকে থাকি। একই খাদ্যবস্তুকে রুচি অনুসারে আমরা বিভিন্নভাবে রাঁধতে পারি, কিন্তু তা বলে খাদ্যবস্তু তো আর বদলে যায় না, তা একই থাকে। এই হলো ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, বেদান্তের মনোভাব। *পুরুষোত্তম* এমন একজন যাঁকে আমরা ভালবাসতে পারি, যাঁর শরণাপন্ন হতে পারি। তিনি কোন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ম্যাজিস্ট্রেট নন যিনি আমাদের প্রতিটি ভুলচুক খাতায় লিখে রাখতে ব্যস্ত। তিনি অনন্ত প্রেম—প্রেমস্বরূপ। এটি মরমিয়া সাধনার চরম ভাব, যা গীতা এই *পুরুষোত্তমযোগে* সবিস্তারে বলছেন। আমরা এই *পুরুষোত্তম*-এর সঙ্গে নিবিড় প্রেমের সম্পর্ক পাতাতে পারি, কারণ তিনি প্রেমে পরিপূর্ণ। তাঁকে ভালবাসলে তিনি সাড়াও দেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে সকলের সাথেই আমরা মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। এই *পুরুষোত্তমই* আবার পরব্রহ্ম—নিরাকার, নির্গুণ, নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম। একমাত্র গভীর *সমাধি* অবস্থাতেই আমরা তাঁর সংস্পর্শে আসতে পারি। কিন্তু চোখ খুলে যখন বর্ণময়, বৈচিত্র্যময় জগতের রূপ প্রত্যক্ষ করি, তখন ঈশ্বরকে একমাত্র *পুরুষোত্তম* রূপেই ডাকতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন এই পুরুষোত্তমই হলো মানুষ ও মানবেতর সকল জীবের একীভূত আত্মা। কিন্তু *জ্ঞান*-এর সাথে *ভক্তি*-ভাব নিয়েও আমরা *পুরুষোত্তম*-এর দিকে অগ্রসর হতে পারি। আবার জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে *কর্মকেও* মিশিয়ে নিয়ে, ব্যবহারিক জীবন যাপন করেও, মুক্ত হয়ে যেতে পারি। এইটিই গীতার বিশেষ শিক্ষা যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে শুরু হয়েছিল। এই শিক্ষা বলে যে,

কর্মের মাধ্যমে, মানবীয় সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে গিয়েও পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করা সম্ভব। এটি গীতায় বর্ণিত যোগের একটি বিশেষ দিক যাকে *পুরুষোত্তম যোগ* বলা হয়েছে।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯॥

—'হে ভারত, যিনি মোহমুক্ত, [এবং] পুরুষোত্তম আমাকে এভাবে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ; সর্বভাবে আমাকে ভজনা করেন।'

যো মাম্ এবম্ জানাতি, 'যিনি এভাবে আমাকে জানেন'; *পুরুষোত্তমম্,* 'এই *পুরুষোত্তম'; অসংমূঢ়ো,* 'সব মোহ থেকে মুক্ত', অর্থাৎ 'সুস্পষ্টভাবে' আমি তাঁকে *পুরুষোত্তম* বলে জানি। আমরা সবাই পুরুষ, কিন্তু তিনি পরমপুরুষ। যিনি এটি জানেন, *স সর্ববিদ্,* 'তিনি সর্বজ্ঞ হয়ে যান'। পুরুষোত্তমকে জানলে সবই জানা হয়ে যায়, কারণ তিনিই তো সব হয়েছেন। *ভজতি মাং সর্বভাবেন,* 'তিনি সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন'। তাঁর প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি চিন্তাই তখন পূজা হয়ে যায়, এমনকি খাওয়া দাওয়াও। তখন তাঁর দৃষ্টিতে কোনকিছুই ঈশ্বর-বিযুক্ত নয়।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ ।
এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০॥

—'হে নিষ্পাপ অর্জুন, এইভাবে আমার দ্বারা এই গুহ্যতম বিজ্ঞান বলা হলো; এটি জেনে [মানুষ] চরম বুদ্ধিমান হয়, কৃতার্থ হয়।'

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি তোমাকে এতক্ষণ সবচেয়ে নিগূঢ় বিজ্ঞানের কথা বললাম।' যে কোন *শাস্ত্র* যখন অন্তর্জীবন নিয়ে আলোচনা করে তখন তা অতি রহস্যময় মনে হয়। অন্তর্জীবন মানেই রহস্যে ভরা। তাই বিজ্ঞানীদের কাছেও প্রকৃতি একটা রহস্য। তাঁরা প্রকৃতির কাজ ও প্রভাব নিয়েই কেবল অনুসন্ধান করেন, প্রকৃতির স্বরূপ নিয়ে অত মাথা ঘামান না। কিন্তু তাতেই তাঁদের বিস্ময়ের অবধি নেই। শুধু বহিঃপ্রকৃতিই যদি এত বিস্ময়ের বস্তু হয়, তাহলে যে বিজ্ঞান মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি নিয়ে অনুসন্ধান চালায়, তা না জানি আরো কত গুণ বিস্ময়ের! গীতা তাই এই বিজ্ঞানকে *গুহ্যতমম্* আখ্যা দিচ্ছেন। *তমম্* শব্দটি কোনকিছুর চরম অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। *তর* আপেক্ষিকভাবে

বেশি, কিন্তু *তম* হলো সর্বোচ্চ বা সব থেকে বেশি। এই যে আন্তর সত্য উপলব্ধির বিজ্ঞান, গীতা তাকে চরম গুহ্য বা রহস্যময় বিজ্ঞান বলছেন। তাহলে এটি কি *গুপ্ত* কিছু বা গোপনীয়? না, তা নয়। অতি গভীরতম, তাই বলা হচ্ছে গুহ্যতম। মনে করুন, একজন একটি বিশাল গুহায় আছেন। আপনি গুহার আশপাশ ঘুরলেন। কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে গুহার মধ্যে তিনি নেই। তিনি আছেন, গুহার অনেক ভিতরে তিনি বসে আছেন। *অনঘ,* 'হে নিষ্পাপ [অর্জুন], *ইদম্ উক্তম্ ময়া,* 'আমি এখন এই বিজ্ঞান বললাম'; *এতৎ বুদ্ধা,* 'এটি জেনে', অর্থাৎ এই সত্য জেনে; *বুদ্ধিমান্ স্যাৎ,* মানুষ 'জ্ঞানী হয়'। এই সত্য জানলে বা উপলব্ধি করলে আপনি প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিমান হবেন। অর্থাৎ আপনার বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ প্রকাশ হবে সেই জ্ঞান। যে-বুদ্ধি দিয়ে আপনি এদিক-সেদিক থেকে একটু আধটু জ্ঞান আহরণ করে থাকেন, তা সাধারণ মানের বুদ্ধি। যে বুদ্ধির দ্বারা ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়, সেটিই প্রকৃষ্ট বুদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তোমাকে এতক্ষণ যা বললাম, তা উপলব্ধি করতে পারলে তুমি যথার্থ বুদ্ধিতে ভূষিত হবে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, ভগবান বুদ্ধ সেই অনন্ত ও শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধি করে বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন, জ্ঞানের দীপ্তিতে ঝলমল করে উঠেছিলেন। সেই যে বুদ্ধি, তা আত্মজ্যোতিতে দীপ্তিমান।

আপনারও সেই *বুদ্ধি* হবে যখন আপনি এই সত্য উপলব্ধি করবেন। আবার বুদ্ধিই একমাত্র করণ বা মাধ্যম যার সাহায্যে আপনি এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেন। *বুদ্ধি*-র ঠিক পিছনেই আত্মা রয়েছেন। *বুদ্ধি* একটু পিছন ফিরে তাকালেই আত্মার মুখোমুখি হবে। কিন্তু এখন আমাদের যে-বুদ্ধি, তা কী করে পিছনের দিকে তাকাতে হয়, তা জানে না। বুদ্ধি এখন বাইরের বিষয় বৈচিত্র্য দেখতেই ব্যস্ত। কিন্তু এই বুদ্ধি যেদিন টের পাবে যে তার ঠিক পিছনেই এক অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার মজুত রয়েছে, স্বয়ং *পুরুষোত্তম* রয়েছেন, তখন তার সেই বুদ্ধিই যথার্থ *বুদ্ধি,* আত্যন্তিক *বুদ্ধি*। ভাবুন তো, বুদ্ধি সম্পর্কে কী একটি অনবদ্য চিন্তা! বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, নিজেই প্রশ্ন করছেন—এই যে বলা হয়, মন অথবা বুদ্ধি দিয়ে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না, তার মানে কী? মানে এই যে, এখনকার এই মন, এখনকার এই *বুদ্ধি* দিয়ে আপনার ব্রহ্ম উপলব্ধি হবে না। কেন? তার কারণ এই, আমাদের এখনকার মন এবং *বুদ্ধি* ইন্দ্রিয়গুলির দাসত্ব করছে। তারা তাদের নিজের বশে নেই; তারা মলিন হয়ে আছে। কিন্তু এই *মন* ও *বুদ্ধিকেই* যদি আপনি

সম্পূর্ণ শুদ্ধ করতে পারেন, তাহলে আপনার সত্য উপলব্ধি হবে। তাই গীতায় *বুদ্ধিগ্রাহ্যম্,* অর্থাৎ 'বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করতে হবে' বলা হয়েছে। অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধি দিয়ে আপনি আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলেছেন, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি এবং শুদ্ধ আত্মা এক। কাজের ভিত্তিতে আমরা একই বস্তুর নানা নাম দিই। কিন্তু সকলের পিছনে একটি শক্তিই কাজ করছে। কাজেই মন খুব শুদ্ধ হলে, সেটিই আত্মা। *এতৎ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ,* 'এটি জেনে মানুষ প্রকৃত *বুদ্ধিমান* হয়'। কেউ কেউ ভাবেন, ছলে-বলে কৌশলে তাঁরা বহু মানুষকে ঠকাতে পারেন, অতএব তাঁরা *বুদ্ধিমান*। কিন্তু এ কোন্ ধরনের বুদ্ধি! এ তো নির্বোধের দুর্বুদ্ধি! এতো শেয়ালী ধূর্তামি। যে বুদ্ধি সর্বোচ্চ বা পরম সত্যের ধারণা করতে সক্ষম, সেই বুদ্ধিই বুদ্ধি, সেখানেই বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভারী সুন্দর একটি শ্লোক আছে। সেখানে বলা হয়েছে, *এতদ্ বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ,* 'এটি হলো বুদ্ধিমানের *বুদ্ধি'; মনীষা চ মনীষীনাম্,* 'এ হলো মনীষীদের প্রজ্ঞা'; *যৎ সত্যম্ অনৃতেন ইহ মর্ত্যেন আপ্নোতি মা অমৃতম্,* 'যা এই নশ্বর দেহে অবিনশ্বর সত্তাকে উপলব্ধি করে'। এখানে *ভাগবত* বলতে চাইছেন, সেই বুদ্ধি বিকশিত করার চেষ্টা কর যা শ্রেষ্ঠ, যে-বুদ্ধির দ্বারা মরণশীল দেহেই ভগবানলাভ করা যায়, আত্মসাক্ষাৎকার করে অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

কৃতকৃত্যশ্চ ভারত, 'হে অর্জুন, [ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে], ''যা লাভ করার, তা লাভ করে'' জ্ঞানী *কৃতকৃত্য* হয়'। সমস্ত জীবনটার দিকে তাকিয়ে বলুন তো, কখনও আপনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন—হ্যাঁ আমি কৃতকৃত্য হয়েছি? কেবল তখনই এ কথা আপনি বলতে পারবেন যখন আপনি এই সত্য উপলব্ধি করবেন। তার আগে নয়। যা করা উচিত, তা যখন আপনি করেন, তখনই আপনি *কৃতকৃত্য* বা *কৃতার্থ*। *কৃতকৃত্য* আর *কৃতার্থ*—দুটি একই কথা। বোধিলাভ করে ভগবান বুদ্ধ যখন ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হয়েছিলেন তখন তিনি এই তাৎপর্যপূর্ণ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন; বলেছিলেন—আমি কৃতকৃত্য হয়েছি। এখানে গীতাও সে কথাই বলছেন।

ইতি পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

'এখানেই পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের সমাপ্তি।'

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ

দৈবী ও আসুরী সম্পদ-এর শ্রেণিবিন্যাস

এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই অধ্যায়ের কিছু কিছু ভাব আগের আগের অধ্যায়গুলিতেও ব্যক্ত হয়েছে। এখানে মানুষকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে—নৈতিক এবং অনৈতিক। সংস্কৃত ভাষায় এদেরই যথাক্রমে *দৈবী* ও *আসুরী* বলা হয়। যারা বিশ্বাস করে জীবন মানেই ইন্দ্রিয় সম্ভোগ করা, সেই আসুরী প্রকৃতির মানুষেরা ইন্দ্রিয়সুখলাভের জন্য সর্বদা সচেষ্ট। স্বভাবতই তারা পরস্পর লড়াই করবে, সংঘর্ষের মুখোমুখি হবে। কেবল হিংসা ও লোভই নয়, একটার পর একটা পাপ এসে জুটবে তাদের জীবনে। আবার দৈবীভাবাপন্ন আর এক শ্রেণির মানুষ আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, দেহের উর্ধ্বে যে *আত্মা* আছেন, যে দিব্য স্ফুলিঙ্গটি দীপ্যমান, সেটিই তাঁদের সত্যিকারের সত্তা বা স্বরূপ। এখন হয়তো তাঁরা ইন্দ্রিয়গুলির সীমার মধ্যেই আছেন, ইন্দ্রিয়সুখে আনন্দ পান, কিন্তু তাঁরা জানেন এগুলিই সব নয়, এসবের ওপরেও এমন একটা কিছু আছে যেটি লাভ করার জন্য তাঁদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। যাঁরা এই ধরনের মানুষ, যাঁরা উন্নত মূল্যবোধগুলি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন, তাঁরা *দৈবী সম্পদ*-এর অধিকারী। অন্যদিকে, যারা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই জীবনের সর্বস্ব মনে করে, তারা আসুরী সম্পদে পরিপূর্ণ। সর্ব ধর্মেই এই দুই শ্রেণিবিভাগ চলে আসছে। একমাত্র চরম বস্তুবাদী মানুষেরাই ভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে আর কিছু নেই। এদের মধ্যে কিছু মানুষ একেবারে নিরেট আহাম্মক ও অমার্জিত; আবার কিছু মানুষ হয়তো ভালো। জড় বস্তুবাদকে সাময়িকভাবে ভালো মনে হলেও, ভবিষ্যতের মানদণ্ডে তা নিতান্তই অশুভ, কারণ যতকিছু অশুভ ও অকল্যাণকর পরিস্থিতির উদ্ভব এই সীমিত জীবনদর্শন থেকেই।

ভারতবর্ষে আজ আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা এই ধরনের উগ্র বস্তুতান্ত্রিকতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ফলেই সমাজে যতকিছু উৎপাত। তাই গীতার এই শ্রেণিবিভাগ, যা মহাভারতের মতো অন্যান্য শাস্ত্রেও

দেখা যায়, সমগ্র মানবজাতির হৃদয় আলোকিত করে, তাকে দৈবী সম্পদ বা গুণগুলি আয়ত্ত করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারে। আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে। একটি পথ মানবিক বিকাশের উচ্চতর স্তরে আমাদের নিয়ে যায়; অন্যটি আমাদের নিম্নগামী করে দৈহিক অথবা জৈবিক স্তরের বদ্ধজলার দিকে ঠেলে দেয়। সম্পদ মানে ঐশ্বর্য। হয় আমাদের দৈবী সম্পদ বা আধ্যাত্মিক বিকাশের ঐশ্বর্য, নয় তো আসুরী সম্পদ বা জাগতিক ভোগসুখের ঐশ্বর্য লাভের পথ—এ দুটির একটিকে বেছে নিতে হবে। *আসুরী* ও *দৈবী* দুটিই সম্পদ। প্রথমটি রাক্ষুসে প্রকৃতির, দ্বিতীয়টি নৈতিক ও মানবিক প্রকৃতির। *আচার্য শঙ্কর বলছেন, এই আসুরী ও দৈবী বলতে এখানে কেবল মানুষকেই বোঝাচ্ছে, পৌরাণিক দেবতা বা অসুরদের নয়।* এমনকি যে 'নরক' শব্দটি এখানে আমরা পাব, তার অর্থ হীনজীবন। নরক একটা কোন আলাদা স্থান নয়। অতএব এ জন্মে আমরা দেবতা হতে পারি, আবার অসুরও হতে পারি। সংস্কৃতে *দেব* শব্দের অর্থ 'দীপ্তিমান বা দ্যুতিমান'। যাঁরা দৈবী সম্পদের অধিকারী তাঁদের মধ্যে একধরনের দ্যুতি থাকে, যা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে ও অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে দু-একটি শ্লোকে দৈবী সম্পদের অধিকারী মানুষের প্রকৃতি বর্ণনা করবেন। তারপর বেশ কয়েকটি শ্লোকে তাদের কথা বলবেন যাদের প্রকৃতি *আসুরী*, অর্থাৎ রাক্ষসের মতো। এই শ্রেণিবিভাগ সব সমাজের মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখানেই এই অধ্যায়ের গুরুত্ব। শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথা দিয়েই এই অধ্যায় শুরু হচ্ছে।

শ্রীভগবান্ উবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১॥

শ্রীভগবান বললেন—'নির্ভীকতা, চিত্তের শুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা, সরলতা।'

যে মানুষের মধ্যে এইসব অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তাঁকে সমাদর না করে আমরা পারি না। বেদান্তমতে প্রথম যে চারিত্রিক গুণটি আমাদের থাকা দরকার, তা হলো *অভয়ম্*, অর্থাৎ 'নির্ভীকতা'। ভয় সম্বল করে কখনও কোন চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। তাই, আপনি যদি আপনার শিশুকে নৈতিক গুণসম্পন্ন দেখতে চান, তাহলে তাকে ভয় দেখাবেন না, তাকে ভীতিগ্রস্ত

করে তুলবেন না। তা যদি করেন, সে *গোপনে নীতিভ্রষ্ট* হয়ে যাবে, কারণ ভয় নৈতিক জীবনের পরিপন্থী। বেদান্ত এবং উপনিষদের সুরে সুর মিলিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে প্রথম যে গুণটির কথা বললেন, তা হলো ভয়শূন্যতা। *ভয়* মানে আতঙ্ক। ভয়ের আগে *অ* উপসর্গটি জুড়ে দিলে তা হয়ে যায় *অভয়,* অর্থাৎ নির্ভীকতা। আমরা ভয় দেখিয়ে মানুষকে ভালো করতে যাই, কিন্তু তার ফল স্থায়ী হয় না। পরিস্থিতি বদলে গেলেই, ভিতরের অশুভভাব আবার আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু মানুষের ভিতর যখন নৈতিকতা দানা বাঁধে, তখন তার চরিত্রে স্থায়ী পরিবর্তন আসে। তখনই সে *অভয়* হতে পারে। নৈতিক জীবনের ভিত্তিই এই ভয়শূন্যতা!

শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ভয় জিনিসটা যে কত খারাপ, তা আজ সর্বত্র সকলেই বুঝতে পারছেন। অজ্ঞেয়বাদী ইংরেজ চিন্তাবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল এই প্রসঙ্গে একটি মজার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলছেন, একজনের একটা বাচ্চা বেড়াল ছিল। ভদ্রলোক চাইতেন বেড়ালটা ছোটবেলা থেকেই ইঁদুর ধরা শিখুক। কিন্তু বেড়ালের স্বভাবই তো ইঁদুর ধরা—ভদ্রলোক বোধ হয় এই সহজ সত্যটি বুঝতে চাননি। তাই তিনি বেড়ালটার জবরদস্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। একটা ইঁদুর এনে, দড়িতে বেঁধে, বেড়ালটাকে তার সামনে রাখলেন। তারপর একটা ছড়ি দিয়ে বেড়াল বাচ্চাটাকে পিটিয়ে বললেন, 'যা, গিয়ে ওটাকে ধর'। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর ইঁদুরটাকে দেখামাত্রই বেড়ালটা ভয়ে কাঁপতে থাকে। ভয় দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়ার এমন হালই হয়। একমাত্র ভয়শূন্য হলে তবেই ভিতরকার স্বাভাবিক গুণগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হতে পারে। ভয়ে সবগুণ চাপা পড়ে যায়। অতএব *দৈবী সম্পদের* যোগ্য হতে গেলে সর্বপ্রথম যে গুণটি সকলের আয়ত্ত করা চাই, তা হলো *অভয়ম্* বা নির্ভীকতা।

তারপর *সত্ত্ব সংশুদ্ধিঃ, 'বুদ্ধি* বা মনের শুদ্ধতা'; *জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতিঃ, 'জ্ঞান* অন্বেষণ ও *যোগ*-এ নিষ্ঠা'। *জ্ঞান* হলো 'তত্ত্বজ্ঞান' এবং *যোগ* হলো তার 'বাস্তব প্রয়োগ বা উপলব্ধি'। মনকে সর্বদা একটি চিন্তায় নিযুক্ত রাখতে হবে—'কী করে তত্ত্বজ্ঞানলাভ করা যায়', 'কী করে সেই জ্ঞান অবলম্বন করে *জীবনযাপন* করা যায়'। তা করতে পারলেই আপনার *জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতিঃ.* অর্থাৎ জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা হলো।

তারপর দানম্। *দানম্* মানে 'নিজের সম্পদ আর পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ক্ষমতা'। আমাদের সব শাস্ত্রেই দানের ভূয়সী প্রশংসা করা

হয়েছে। সবচেয়ে প্রাচীন যে ঋগ্বেদ, সেখানেও '*দানস্তুতি*' বলে একটি স্তোত্র আছে। আপনার যা আছে, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে তা ভোগ করুন। ভারতীয়দের রক্তে এই শিক্ষাটি এমনভাবে ঢুকে গেছে যে তাদের মতো অতিথিবৎসলতা আর কোন দেশের মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। পাশ্চাত্যের বহু মানুষ তাই ভারতীয়দের অতিথিপরায়ণতার শতমুখে প্রশংসা করেন। এটি সম্ভব হয়েছে ভারতীয় শিক্ষার গুণে।

আমেরিকার এক কলেজে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। বক্তৃতা শেষ হলে কাছাকাছি একটি হোটেলে দুপুরে খাওয়ার সময় ঐ কলেজেরই এক অধ্যাপক বললেন ঃ 'ফুলব্রাইট (Fullbright) স্কলার হয়ে আমি তিন মাস মীরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। আমার স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু ঐ তিন মাসে একটা দিনও আমরা বাড়ির খাওয়া খেতে পারিনি! প্রতিদিনই কেউ না কেউ তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে আমাদের খাওয়াতেন। মানুষের হৃদয়ের এই স্পর্শ আমরা এত উপভোগ করতাম, কী বলব! আমাদের মনেই হতো না আমরা বিদেশে আছি। এ অভিজ্ঞতা আর কোথাও হয়নি।' সে কথার উত্তরে বলেছিলাম ঃ 'এটা আপনি ঠিক বলেছেন। এটি ভারতীয়দের জাতীয় বৈশিষ্ট্য।' তাই, যে কথা বলছিলাম, এই *দানম্*-এর ভাবটি বড় মধুর। আমার কিছু আছে, আর আপনারও হয়তো সে জিনিসটার অভাব। তাই আপনাকে সেটি দিয়ে দিলাম। দেওয়া এবং নেওয়া দুটিই খুব স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক হয়ে সম্পন্ন হলো। এটি গেল *দৈবী সম্পদ্*-এর এক দিক।

এরপর বলা হয়েছে *দমঃ চ*, 'এবং ইন্দ্রিয় সংযম'। *দমঃ* মানে ইন্দ্রিয়ের সংযম। এই সংযম ছাড়া নৈতিক জীবন একেবারেই অসম্ভব। ইন্দ্রিয়গুলি যদি লাগাম ছাড়া হয়, তাহলে নৈতিক জীবনের ভরাডুবি। তাই *শম*, অর্থাৎ মনের নিয়ন্ত্রণ-এর সঙ্গে, *দম* বা 'ইন্দ্রিয় সংযম'-কেও অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। সভ্য জীবনযাপন করতে গেলে ইন্দ্রিয় সংযম একান্তই অপরিহার্য। যে সমাজে মানুষ মানুষের মাংস খায়, আর যাই হোক সেই সমাজ বা সেই মানুষকে সভ্য বলা চলে না। সভ্য সমাজের লক্ষণই হলো সেখানকার মানুষ সংযত। *শম* এবং *দম*-এর ভাবনাটি তাই খুবই শোভন, যার মূল কথা হলো—ইন্দ্রিয়গুলিকে আপনার মনের নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ইন্দ্রিয়গুলিকে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ঘোড়াগুলোকে বশে রাখতে না পারলে আপনি কী করে ভ্রমণ উপভোগ করবেন? সেক্ষেত্রে ঘোড়াগুলোই মজা লুটবে আর আপনি তাদের উপভোগের

শিকার হবেন! অতএব ইন্দ্রিয়দমন ও তাদের নিয়ন্ত্রণ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম বড়সড় পদক্ষেপ। যে-কোনও সভ্য সমাজের মানুষকে অন্তত কিছুটা সংযত হতেই হবে। সংস্কৃতে *দম* শব্দটি খুবই মজার। ইংরেজি প্রতিশব্দে ঐ মজার ছিটেফোঁটাও পাবেন না। কেন? তার কারণ : আপনি যদি *দম* শব্দটিকে উল্টে দেন, তাহলে ওটি হয়ে যাবে *মদ। মদ* মানে 'মত্ততা', অহংকার, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি। মানুষ বেশি মদ খেলে যেমন নেশাগ্রস্ত হয়, তেমনি হাতে প্রচুর ক্ষমতা এলেও তার ঐ একই দশা হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই কথা সর্বাংশে সত্য। সংস্কৃতে তাই আমরা বলি—ম-দকে দ-ময় পরিণত কর।

গান্ধীজীর মতো মানুষ হলে নাম-যশ তাঁকে উদ্ধত করে না। তিনি ওসব হজম করে নেন। গান্ধীজী নিজেই একদিন বলেছিলেন, '*মহাত্মারাই মহাত্মাদের* দুঃখটা বুঝতে পারেন।' *মহাত্মা* উপাধি আমাকে বড়ই বিড়ম্বিত করেছে। তাই বলছিলাম, মান হজম করতে হলে আধ্যাত্মিক শক্তি চাই। সে শক্তি থাকলে উন্মত্ততা আসবে না। অন্যের প্রতি অবিচার, দুর্ব্যবহার সম্ভব হবে না। তাই সংস্কৃতে এই দুটি শব্দ—*মদ* এবং *দম*—খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই নানাধরনের *মদ* বা মত্ততার দ্বারা আচ্ছন্ন। মনকে বিশেষভাবে তালিম দিয়ে এই নেশা কাটাতে হবে এবং তা কাটাতে গেলে দরকার বিবেক বা বিচারের। ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতাগুলির ঘোর কাটাতে গেলে মনের সামনে এইটিই সবচেয়ে বড় কাজ।

তারপর বলা হচ্ছে *যজ্ঞশ্চ,* 'এবং যজ্ঞ'। সাধারণভাবে বিশেষ কিছু উপাসনা ও ক্রিয়াকে আমরা যজ্ঞ বলে থাকি। তারপর আসছে *স্বাধ্যায়ঃ* অথবা 'আত্মচর্চা' অর্থাৎ অধ্যয়ন এবং জ্ঞান আহরণ। তারপর *তপঃ* অথবা 'আত্মনিগ্রহ' এবং সত্য উপলব্ধির জন্য মন ও ইন্দ্রিয়গুলির শক্তিকে একাগ্র করা। সংস্কৃত সাহিত্যে এইটিই তপস্যার শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা। তপস্যা বা *তপস্‌*-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি* একটি বাক্যে এই কথাই বলেছেন। *তপস্‌* বলতে সাধারণত আমরা একজাতীয় কৃচ্ছ্রসাধনই বুঝি, যেমন কুড়িদিন একটানা উপবাস করা, টা টা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকা—এক কথায় শরীরের পক্ষে কষ্টকর এমন কিছু করা। *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি* বলছেন, *তপস্‌* মানে ওসব কিছু নয়। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌*-এর ওপর ভাষ্য দিতে গিয়ে শঙ্করাচার্য ঐ স্মৃতিশাস্ত্রের সুন্দর সংজ্ঞাটি উদ্ধৃত করেছেন সেইখানে, যেখানে উপনিষদ্‌ বলছেন—'*তপস্‌*-এর দ্বারা ব্রহ্ম উপলব্ধির চেষ্টা কর। *তপস্‌*-ই ব্রহ্ম।' কারণ এবং কার্য দুটিই এক বস্তু। উপায় ও উদ্দেশ্য আলাদা নয়। তাই বলা হয়েছে, তপস্যাই ব্রহ্ম। বারো ঘণ্টা রোদ্দুরে পুড়ে আপনি কেমন

করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবেন? ঐ ধরনের তপস্যায় হবে না। তাই শঙ্করাচার্য *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি* থেকে নিচের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

মনসশ্চ ইন্দ্রিয়াণাঞ্চৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্ব ধর্মেভ্যঃ স ধর্মঃ পর উচ্যতে ॥

অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়গুলির এবং মনের শক্তির একাগ্রতাই তপস্যা বলে কথিত। সকল ধর্মের মধ্যে ঐটিই শ্রেষ্ঠ; অন্যান্য যা কিছু মানুষের কাছে মূল্যবান, সেসব কিছুর থেকেও তা শ্রেষ্ঠ।'

বাস্তবিক, এই যে ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি এবং মনের শক্তিকে একাগ্র করা, এটি এক অসাধারণ কৃতিত্ব। বিজ্ঞানীই হন, প্রশাসকই হন, আর অধ্যাত্মপথের অভিযাত্রীই হন, এ কাজটি সকলকেই করতে হবে। এইটিই *তপস্যা*। যেখানেই মহত্ত্ব দেখবেন, জানবেন তার পেছনে এই *তপস্যা* রয়েছে। বিত্তবান হতে গেলে যেমন *তপস্যা* চাই, নাম-যশের অধিকারী হতে গেলেও যেমন *তপস্যা* চাই, তেমনি বিজ্ঞানী হতে গেলেও এই *তপস্যার* একান্ত প্রয়োজন। তপস্যা ছাড়া কিছুই হবার নয়। তাই তপস্যার এই সংজ্ঞাটি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। *ঐকাগ্র্যম্* মানে 'মনের একাগ্রতা'; *তপ উচ্যতে,* তাকেই 'তপস্যা বলা হয়।' এই শ্লোকেও সেই অপূর্ব ভাবের ছায়াপাত ঘটেছে। আপনি উচ্চতর, মহত্তর কিছু খুঁজছেন। এই যে অন্বেষণ, তাকেই *তপস্যা* বলে এবং তার জন্যই আপনাকে আপনার মানসিক শক্তি এবং ইন্দ্রিয়গুলির শক্তিকে সংহত করতে বলা হচ্ছে। তা যদি করতে পারেন, তবেই আপনি মহৎ কিছু লাভ করবেন।

সবশেষে আসছে *আর্জবম্,* অর্থাৎ 'সরলতা'। সরলতা হচ্ছে 'খলতা'র ঠিক বিপরীত। শিশুরা সরল। তাদের মধ্যে এই *আর্জবম্* আছে; তারা বড়দের মতো ছলচাতুরী জানে না। *আর্জবম্* তাই অধ্যাত্মজীবনের একটি মস্ত গুণ।

পরের শ্লোকে আরো কয়েকটি গুণের কথা বলা হচ্ছে। সেগুলি কী? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২॥

—'অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, প্রশান্তি, অদোষদর্শিতা, দয়া, নির্লোভতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচপলতা।'

এগুলি সবই সদ্‌গুণ। যে কোন দেশের নীতিশাস্ত্রেই মানবচরিত্রের এই সব গুণগুলি কম-বেশি সমাদৃত। *অহিংসা* মানে 'অন্যকে পীড়া না দেওয়া'। অর্থাৎ এক কথায়, 'ভালবাসা'। ভালবাসা থেকেই অহিংসার জন্ম। কিন্তু কি জানি কেন, আজকের মানুষকে বোধহয় ভূতে পেয়েছে, কারণ তার মধ্যে চতুর্দিকে হিংসা ছড়ানোর এক দুরন্ত কুপ্রবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। তারপর আসছে *সত্যম্‌* অর্থাৎ 'সত্য' এবং *অক্রোধম্‌*, অর্থাৎ 'ক্রোধের অভাব'। *ক্রোধ* কথাটির মানে আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না, কারণ তার সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু *অক্রোধ* হলো ক্রোধের ঠিক বিপরীত অবস্থা। *ত্যাগ* হলো 'অনাসক্তি ও বর্জনের মনোভাব'। ত্যাগের মধ্য দিয়েই উন্নত মূল্যবোধগুলি আসে। তাই *ত্যাগ* ছাড়া নৈতিক জীবন আকাশকুসুম কল্পনা। নৈতিক জীবন তো দূরের কথা, *ত্যাগ* ছাড়া একজন সৎ নাগরিকই হওয়া যায় না। কারণ তা হতে গেলে তো দেশের জন্য, জাতির জন্য, অন্তত কিছুটা হলেও নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। যেকোন স্বাধীন দেশে ত্যাগই হলো নাগরিকত্বের ভিত্তি। *শান্তিঃ* মানে 'প্রশান্তভাব'; মন শান্ত, অনুত্তেজিত। উত্তেজিত মন যেমন নিজের ক্ষতি করে, তেমনি অন্যের বিপদও ডেকে আনে। *অপৈশুনম্‌* হলো 'অদোষদর্শিতা', বিদ্বেষপ্রসূত অন্যের ছিদ্র অন্বেষণ করার প্রবণতার অভাব। এটি উন্নত মনের লক্ষণ। *দয়া* মানে 'করুণা'। এটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ঃ *দয়া ভূতেষু*, 'সকল জীবের প্রতি করুণা'। *অলোলুপ্ত্বং* অর্থ 'নির্লোভতা'। কারোর কিছু আছে এবং তা দেখে আমার মনে হলো আমারও ওটা চাই—যেভাবেই হোক আমাকে ওটা পেতে হবে—এই হলো লোভ। এর ঠিক বিপরীত হচ্ছে নির্লোভতা। *মার্দবং* মানে 'মৃদুতা'। কথাটির উৎপত্তি মৃদু শব্দ থেকে। মৃদুতার কী সৌন্দর্য বলুন তো! মহাভারতে মৃদুতার প্রশস্তি আছে। কেউ ভাবতে পারেন, একজন নিরীহ ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার থেকে একটি হিংস্র জন্তু অনেক ভালো। কিন্তু না, এ ধারণা ভুল। যে মৃদু সে হিংস্র জীবকেও জয় করতে পারে। মহাভারতে (৩/২৪/৭০) আছে—

মৃদুনা মার্দবং হন্তি
মৃদুনা হন্তি দারুণম্‌।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিৎ
তস্মাৎ তীক্ষ্ণতরো মৃদুঃ ॥

অর্থাৎ 'মৃদু মৃদুকে জয় করে। মৃদু কঠোরকেও দ্রবীভূত করে। মৃদুতার পক্ষে

অসাধ্য কিছুই নেই। তাই মৃদুতা পরমগুণ। *মৃদু* বা মৃদুতা সবচেয়ে শক্তিশালী, সবকিছুকে ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে।'

মনে করুন ফোঁটা ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করে একটা পাথরের ওপর প্রতি মুহূর্তে পড়ছে। সেই যে মৃদু জলবিন্দু, তার সংস্পর্শেই কিন্তু নিরেট পাথরটি একটু একটু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে। জল *মৃদু*, নরম, কোমল; কিন্তু তার পেলব ছোঁয়ায় কঠিন পাথরের মধ্যে কী পরিবর্তন লক্ষ্য করুন!

অধ্যাত্মজগতে মৃদু স্বভাবের মানুষরাই জগৎ জয় করেছেন, যাঁরা দুর্ধর্ষ বা দুর্দান্ত প্রকৃতির, তাঁরা নয়। যুদ্ধ করে নেপোলিয়ন বিশ্বজয় করার চেষ্টা করেছিলেন। সর্বশক্তি নিয়োজিত করেও কিন্তু তিনি তা পারেননি। ইংরেজদের হাতে বন্দী হয়ে ছটি বছর তাঁকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে কাটাতে হয়েছিল। সে সময় তিনি তাঁর পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তা একদিন কথা প্রসঙ্গে বন্ধুদের কাছে বলেছিলেন। শোনা যায় তিনি বলেন ঃ

জগতে কেবল দুটি শক্তিই আছে—একটি হলো আত্মার শক্তি, অন্যটি তরোয়ালের। কিন্তু এই আত্মশক্তি চিরকাল তরবারির শক্তিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে, তাকে পরাস্ত করেছে। তোমরা দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখ। জুলিয়াস সীজার, শার্লামেন এবং আমি তরবারির সাহায্যে জগৎ জয় করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কী হলো? আমরা সকলেই ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু যিশু খ্রিস্টকে দেখ। তিনি আত্মার শক্তি দিয়ে, প্রেমের শক্তি দিয়ে জগৎ জয় করার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে আজও কোটি কোটি মানুষের পূজা তিনি পাচ্ছেন। তাহলে, ইতিহাস কার ললাটে বিজয়ীর তিলকরেখা এঁকে দিল?

দৃষ্টান্ত হিসাবে ভারতবর্ষকেই দেখুন না। স্বামী বিবেকানন্দ এ কথার উল্লেখ করে বলেছেন ঃ পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে আমরা কখনও পরের রাজ্য জয় করিনি, যদিও সে সামর্থ্য আমাদের ছিল। তার পরিবর্তে আমরা সব দেশের সব জাতিকে সম্মান করে এসেছি। 'নিজে বাঁচো এবং অন্যকেও তার মতো বাঁচতে দাও'—এই ছিল আমাদের রীতি। ভারতবর্ষের মানুষকে তাই 'নরম প্রকৃতির' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের লেখকরা লিখতেন—এ জগতে 'শান্তশিষ্ট হিন্দু'-র কোন আশা নেই। এই দর্পের কারণ পাশ্চাত্যের মানুষ ভাবতেন তাঁরা শক্তিমান, বিপুল সামরিক ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের অধিকারী। কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, যে 'নম্র' সেই জগৎ জয় করতে

পারে এবং তথাকথিত যারা 'শক্তিমান', তারা নিমেষে কর্পূরের মতো উবে যেতে পারে। ইতিহাস তো সে কথাই বলে। যে সব সাম্রাজ্য একদা শুধু বাহুবলের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল, এমনকি পারস্য সাম্রাজ্যও, তারা আজ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। যে বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য একদা গ্রীসকে পদানত করেছিল, সেই আবার ক্ষুদ্র এথেন্সের কাছে পরাস্ত হলো। কী দুর্ভাগ্য, একবার ভাবুন তো! অতএব, ইতিহাস এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, 'যারা নম্র তারাই জগতের উত্তরাধিকারী'। যিশু তো এই কথাই বলেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও সেই সত্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। দেখা গেছে যারা নম্র, বিনয়ী, শেষপর্যন্ত তাদেরই জয় হয়েছে—যারা আপাতশক্তিমান, দুর্বিনীত এবং উদ্ধত, জয়ের বরমাল্য তাদের কণ্ঠে দোলেনি। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানেও ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। দুর্দান্ত শক্তিধর প্রাণীদের অনেকেই আজ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে; কিন্তু নিরীহ পোকামাকড়গুলি মাটির তলায় আজও বংশবিস্তার করে চলেছে। অতএব ইতিহাসের রায় এই যে, যারা শান্ত ও শান্তিকামী তারা জগৎ শাসন করবে, যারা যুদ্ধবাজ, দাম্ভিক ও উদ্ধত, তারা নয়। একথা আমি আমার *The Eternal Values for a Changing Society* নামক গ্রন্থের (ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত) দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছি। যারা উন্মত্ত ও হিংসায় বিশ্বাসী, তারা কিছুকাল জগতে দাপিয়ে বেড়াতে পারে বটে, কিন্তু দীর্ঘকালের বিচারে ব্যর্থতাই তাদের ললাট-লিখন। এই হলো মানবসভ্যতার ইতিহাস।

হ্রীঃ বা 'বিনয়' বা লজ্জা একটি সংস্কৃত শব্দ যা অতি মধুর। পারস্যের এক রাজা, যিনি ২৫০০ বছর আগে রাজত্ব করতেন, তাঁর যুদ্ধজয়ের সব কীর্তিকলাপ বর্তমানে ইরাণের অন্তর্গত পার্সেপলিস্ (Persepolis)-এ পাথরের গায়ে খোদাই করে রাখতেন। কিন্তু কী ক্ষণভঙ্গুর এই আস্ফালন! দুশো বছর কাটতে না কাটতেই আলেকজাণ্ডার সে সব জায়গা দখল করে নিলেন এবং দর্পিত সেই সব স্মারক ধূলিলুণ্ঠিত হলো। এই বছর কয়েক আগে পারস্যের শাহ্ সেই ধূলিধূসরিত পারস্য সাম্রাজ্যের ২৫০০ তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করলেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতি, তিনিও এসেছিলেন সেই উৎসবে অংশ নিতে। তার কয়েক বছরের মধ্যেই আবার সেই শাহ্‌ও চলে গেলেন। কোথায় মিলিয়ে গেল সেই অহংকার আর ঔদ্ধত্য? শেক্সপীয়ার তাঁর *Measure for Measure* নাটকে বলেছেন, 'ক্ষমতার স্বল্পায়ু পোশাক পরে মানুষ বাঁদরের মতো আচরণ করে'।

তারপর *অচাপলম্*। এই শব্দেরও গভীর ব্যঞ্জনা। এর অর্থ 'অচপলতা'। মন যখন চপল, তখন সে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। *চপলম্* হলো নিত্য পরিবর্তনশীল ছটফটে মন। তার ঠিক বিপরীত মানসিক অবস্থাটি হচ্ছে *অচাপলম্।* সেখানে মনের কোন চঞ্চলতা নেই; মনটি স্থির।

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ।। ৩।।

—'হে ভারত [অর্জুন], তেজ, ক্ষমা, পবিত্রতা, ধৈর্য, অবিরোধ, অনভিমান—এগুলি দৈবী অবস্থালাভের যোগ্য মানুষের সম্পদ।'

ভারত, 'হে অর্জুন!' *ভবন্তি সম্পদং দৈবীম্ অভিজাতস্য,* 'এইসব সাত্ত্বিক সম্পদ উচ্চতর প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষের লাভ হয়'। আগে কিছু গুণের কথা বলা হয়েছে। এখানে আরো কতকগুলি সম্পদের কথা বলা হচ্ছে। সেগুলি কী? *তেজঃ,* অর্থাৎ 'শক্তি' বা দীপ্তি। যে-কোন দিকেই কৃতকর্মা হতে গেলে শক্তির একান্ত প্রয়োজন। তারপর *ক্ষমা,* যা অতি মহৎগুণ। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে বলা হয় *ক্ষমা বীরস্য ভূষণম্,* 'ক্ষমা বীরের ভূষণ'। খুব সত্যি কথা। সামান্য জীব কখনও ক্ষমা করতে পারে না। যথার্থ বীর যাঁরা, তাঁরাই তা পারেন। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ক্ষমা আর দুর্বলতা, এ দুটিকে যেন আমরা এক না করে ফেলি। দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। যিনি প্রকৃত শক্তিমান তিনিই কাউকে ক্ষমা করতে পারেন।

তারপর আসছে *ধৃতি* বা 'প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি'। হ্যাঁ, আমিও এ কাজটি করতে পারি, আমাদের দ্বারাও এ কাজটি সম্ভব—*ধৃতি* হলো এই ধরনের মনোভাব। অষ্টাদশ অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। এরপর *শৌচম্,* অর্থাৎ 'পবিত্রতা' বা 'শুচিতা'। *অদ্রোহো* কথাটির তাৎপর্য 'কারো ক্ষতি না করা'। কেন আমি অন্যের ক্ষতি করব? কিন্তু জগতে এরকম মানুষের অভাব নেই যারা অন্যের ক্ষতি করে *আনন্দ* পায়। এই মনোভাবকেই *দ্রোহ* বলে। আর *অদ্রোহ* হচ্ছে 'অন্যের ক্ষতি না করা'। *ন অতিমানিতা,* 'অনভিমানতা', অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত হামবড়া ভাব না থাকা। অনেকের এরকম ভাব থাকে—'জান না, আমি কে?' এই হলো *অতিমানিতা*। এর বিপরীত অবস্থা হলো *ন অতিমানিতা*। যাঁরা দৈবী সম্পদলাভের যোগ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে এইসব গুণ দেখা যায়। *ভবন্তি সম্পদম্,* 'এইগুলি সম্পদ';

কাদের? *দৈবীম্ অভিজাতস্য*, 'সাত্ত্বিক অবস্থালাভের যোগ্য ব্যক্তিদের'। এইটিই বলা চলে প্রথম সংকেত। গীতায় আগেও ঠারেঠোরে এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই কথাগুলিকেই এই অধ্যায়ের পরপর তিনটি শ্লোকে গুছিয়ে বলা হলো। সব শাস্ত্রেই এই সব গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নৈতিক আচরণবিধিগুলিতে, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনাচিন্তার মধ্যেও এইসব চারিত্রিক মূল্যবোধগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর তা হবে নাই বা কেন? এসব মূল্যবোধ দেশ-কালের ঊর্ধ্বে। এগুলি ছাড়া সুস্থ মানবসমাজ কল্পনাও করা যায় না। পশুদের সমাজে, যেখানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই একমাত্র কথা, সেখানে এজাতীয় মূল্যবোধ না থাকতেও পারে; যদিও একথা সত্যি যে, কোন কোন পশুর মধ্যেও দয়া, উদারতা এবং সহযোগিতার মতো মহৎগুণ বেশ ভালো পরিমাণেই আছে। কিন্তু তাহলেও বলা যায়, সেগুলি জৈবিক বংশগতি বা genetic codes-এর ফল, সচেতন নৈতিক বিকাশ নয়। এইখানেই মানুষের সঙ্গে পশুর তফাৎ। মানুষ চেষ্টা করে, পুরুষকারের দ্বারা সংগ্রাম চালিয়ে এইসব মহৎগুণ বা সম্পদ আয়ত্ত করে।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ সেইসব মানুষের প্রকৃতির কথা বলবেন যাদের মধ্যে *'আসুরী সম্পদ'* বা 'অসুরদের গুণগুলি' বর্তমান। এই সব আসুরিক বৃত্তিগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখবেন সবগুলিই হিটলার-এর মধ্যে ছিল। এই গুণগুলির সাথে হিটলার-এর ছবিটি পুরোপুরি মিলে যাবে। এই কারণেই গোটা বিশ্ব তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এই বিরাট বিশ্বে তাঁর কোন বন্ধু ছিল না। তাঁর এই *আসুরী* প্রকৃতির জন্য জার্মানীর বহু মানুষও তাঁর বিপক্ষে চলে গিয়েছিলেন।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪॥

—'হে পার্থ [অর্জুন], দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কর্কশতা এবং অজ্ঞতা *আসুরী* অবস্থালাভের যোগ্য ব্যক্তিরই হয়।'

প্রথমে *দম্ভো* বা 'ধর্মধ্বজিত্ব'; *দর্পো* অর্থাৎ 'গর্ব'; *অভিমানঃ* অর্থাৎ 'অহংকার'; তারপর, *ক্রোধ* বা 'রোষ'; *পারুষ্যম্ এব চ*, এবং 'কর্কশতা'; তারপর, *অজ্ঞানম্* বা 'অজ্ঞতা'; *চ অভিজাতস্য পার্থ সম্পদম্ আসুরীম্*, 'হে অর্জুন, এগুলি সব *আসুরী সম্পদ-সম্পন্ন* ব্যক্তির গুণ।'

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা ।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

—'বলা হয়, দৈবী সম্পদ মুক্তির কারণ, আসুরী [সম্পদ] বন্ধনের; [কিন্তু] হে পাণ্ডব (অর্জুন), শোক করো না—তুমি দৈবী সম্পদের যোগ্য হয়ে জন্মেছ।'

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন ঃ *দৈবীসম্পৎ বিমোক্ষায়,* 'এই সাত্ত্বিক সদ্‌গুণগুলি মানুষকে *মোক্ষ* বা মুক্তির দিকে নিয়ে যায়'; *নিবন্ধায় আসুরী মতা,* 'আসুরী সম্পদ মানুষকে ক্রমান্বয়ে আরো, আরো বেশি বন্ধনের দিকে টেনে নিয়ে যায়'। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই কথা বলছেন, অর্জুন নিশ্চয় তখন মনে মনে ভাবছেন, 'আমি তাহলে কোন্ শ্রেণিতে পড়লাম?' ভগবান তাই সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনকে আশ্বস্ত করছেন এই কথা বলে—*মা শুচঃ,* 'শোক করো না'; *পাণ্ডব,* 'হে অর্জুন'; *সম্পদং দৈবীম্ অভিজাতোঽসি,* কারণ, 'তুমি দৈবী সম্পদের যোগ্য হয়ে জন্মেছ'। তুমি *আসুরী সম্পদ* নিয়ে জন্মাওনি; তোমার গুণগুলি সব *দৈবী।* এ আশ্বাস শ্রীকৃষ্ণ কেবল অর্জুনকেই দিচ্ছেন না, যারা এই গীতা পাঠ করছি, তাদের প্রত্যেককেই দিচ্ছেন। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই তাই দৃঢ় প্রত্যয় জাগা উচিত যে, 'আমিও *দৈবী সম্পদের* উপযুক্ত, *আসুরী সম্পদের* নয়।' শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলের সামনে যেন একটি আয়না ধরেছেন এবং সে আয়নায় আমরা আমাদের প্রকৃতির ছবিটি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এখানে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণভাবেই কথাগুলি বললেন। কিন্তু পরের শ্লোকে তিনি বিষয়টির আরো গভীরে প্রবেশ করছেন।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬॥

—'হে অর্জুন, এই জগতে দেবস্বভাব এবং অসুরস্বভাব, এই দু-ধরনের জীব আছে। দেবস্বভাবের কথা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে; [এখন] অসুরস্বভাবের কথা আমার কাছে শোন।'

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্, 'এই জগতে দু-ধরনের মানুষ আছে'; *দৈব আসুর এব চ, দৈব* এবং *আসুর,* অর্থাৎ দেবস্বভাববিশিষ্ট এবং অসুরস্বভাববিশিষ্ট'। *দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ,* 'আমি *দৈবী সম্পদ* বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি'; *আসুরং পার্থ মে শৃণু,* 'হে অর্জুন, এখন আমার কাছ থেকে *আসুরী* বা অসুরস্বভাববিশিষ্ট মানুষের গুণগুলির কথা শোন।' আগের আগের

অধ্যায়গুলিতে *দৈবী সম্পদ* এবং *আসুরী সম্পদ*-এর সামান্য একটু আধটু প্রসঙ্গ এসেছে; কিন্তু এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এই গুণগুলির কথা সবিস্তারে বলেছেন। দৈবী সম্পদের কথা বলার পর এবার তিনি *আসুরী সম্পদ* অর্থাৎ অসুর প্রকৃতির মানুষের লক্ষণগুলি বলবেন। একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝবেন, যাদের কোন মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ নেই, ক্ষমতালাভ ও জাগতিক ভোগসুখই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, পৃথিবীর এমন সব মানুষের ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭॥

—'অসুরস্বভাব ব্যক্তিরা কি করা উচিত, তা জানে না; এও জানে না কীসের থেকে নিবৃত্ত হওয়া উচিত; তাদের না আছে শুচিতা, না সদাচার, না সত্য।'

মানুষের গুণের এই শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছিল তিন হাজার বছরেরও আগে। আজকের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এদের একটু-আধটু রদবদল করা হয়তো দরকার; কিন্তু অধিকাংশই আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে একটা জিনিস, যা একেবারেই স্পষ্ট, তা হলো এই যে, *আসুরী সম্পদ*-এর অধিকারী যারা, তারা কী করা উচিত এবং কী করা অনুচিত, কী কাজে *প্রবৃত্তি* থাকা উচিত এবং কীসে *নিবৃত্তি*, তা জানে না। *জনা ন বিদুঃ*, 'এই জাতীয় মানুষদের ঐ বিচার একেবারেই নেই'। আবার, *ন শৌচম্*, 'তাদের শুচিতা বা পবিত্রতার বালাই নেই'; *নাপি চাচারো*, 'সদাচারও না'; *ন সত্যং তেষু বিদ্যতে*, 'তাদের মধ্যে সত্যও নেই'। এগুলি সব প্রতিবন্ধক। মনে করুন একজন মানুষ অতি স্বার্থপর। তার একমাত্র লক্ষ্য নিজের স্বার্থসিদ্ধি। তার মধ্যে কোন উচ্চ আদর্শ নেই। এমন যে মানুষ, সে চরম অসৎ হতে পারে; কোন কিছুই তাকে অসৎ পথ থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। যত *আসুরী* প্রবৃত্তি সব তার মধ্যে বাসা বাঁধবে। গত চল্লিশ বছর ধরে আমরা অনেক ভারতবাসীই শিশুদের এই আসুরিক পথে যেতে উৎসাহিত করছি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক উইলিয়াম ম্যাকডুগাল (William McDougall) পঞ্চাশ বছরেরও বেশি আগে যে মন্তব্যটি করেছিলেন আমি তা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, কারণ তাঁর কথাগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন : 'যাদের সামনে চারিত্রিক কোন উচ্চ আদর্শ নেই, যারা কেবল ব্যক্তিগত উচ্চাশার দ্বারাই অনুপ্রাণিত, সেইসব

অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা অসৎ হতে বাধ্য, কারণ নৈতিকবোধ উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিবন্ধক। আর যদি বিবেক বাধা দেয়, আমি তা অগ্রাহ্য করব'। তিনি ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করেছেন এবং আজ মানুষের জীবনে এই ভাবটিই পরিপূর্ণরূপে ফুটে উঠছে। এইসব মানুষের মধ্যে *সত্যম্*, অর্থাৎ সত্য ও সত্যবাদিতার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাবেন না। তাদের মনোভাব এই, যে-সত্য, যে-আদর্শ অনুসরণ করলে আমি আখের গোছাতে পারব না, সে সত্যে, সে আদর্শে আমার কাজ কী? এটি আজ মানবজীবনের অতিপরিচিত ছবি।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮॥

—'তারা [অসুররা] বলে "জগৎ সত্যহীন, (নৈতিক) ভিত্তিহীন, ঈশ্বরবিহীন; কামবশত পারস্পরিক মিলনের ফলে উদ্ভূত; তা ছাড়া আর কী?"

অনেক মানুষই বস্তুবাদী। তাতে অতটা ক্ষতি করে না। কিন্তু সমূহ বিপদ তখনই ঘনিয়ে আসে, যখন এই বস্তুবাদ এমন এক চরম অবস্থায় পৌঁছায় যে সেখানে স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া আর কোনকিছুকেই বরণীয় মনে হয় না। এটি হলো কট্টর বস্তুবাদ যা আজ বিশ্বের বহু স্থানেই আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি অশুভ লক্ষণ। এর থেকেই বিপর্যয় নেমে আসে। এই জড় বস্তুবাদের পিছনে কীধরনের মনোভাব রয়েছে? যারা এই বস্তুবাদের পৃষ্ঠপোষক, তাদের জীবনদর্শনটাই বা কী? এখানে আমি সেই সব মানুষের কথা বলছি না যাঁরা যুক্তিশীল, বিচারশীল জড়বাদী। তাঁদের অনেকের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ আছে; অনেক সময় দেখা যায় তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসীদের চেয়েও তাঁদের চরিত্র উন্নত। তাঁরা বিশেষ এক থাকের মানুষ—অত্যন্ত নীতিবান ও মানবিক গুণসম্পন্ন। কেবল তাঁরা ভগবান-টগবান বা উচ্চতর কোন শক্তিকে বিশ্বাস করেন না। একদিক থেকে তাতে হয়তো কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু সমস্যা এই, অপার্থিব শক্তিকে অবিশ্বাস করার দরুন তাঁদেরও হয়তো একদিন ঐ গোঁড়া বস্তুবাদীদের ভিড়ে মিশে যেতে হতে পারে। সেইখানেই ভয়। এখানে, এই শ্লোকে যাদের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, জীবনচর্যায় তারা ঘোর বস্তুবাদী। *অসত্যম্ অপ্রতিষ্ঠং তে জগৎ আহুরনীশ্বরম্ ঃ অসত্যম্ তে আহুঃ*, এই কট্টর বস্তুবাদীরা বলে, 'এই জগৎ *অসত্যম্*, অর্থাৎ এর পিছনে কোনরকম সত্য নেই।' যা আমি চোখ দিয়ে *দেখছি*, শুধু *সেইটিই* আছে। যা দেখতে পাচ্ছি না—তা

নেই। জগতের প্রতি এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, এর কারণ গভীর দৃষ্টিশক্তির অভাব; এই আপেক্ষিক জগতের পিছনে যে অনন্ত আত্মা আছেন, তা দেখার সামর্থ্য তাদের নেই। সে শক্তিও নেই, তা দেখার রুচিও নেই। তাই তাদের সিদ্ধান্ত, *অপ্রতিষ্ঠম্‌*, অর্থাৎ 'এই জগৎ ভিত্তিহীন'। জগতের এই স্থূল রূপের নেপথ্যে কোন আধ্যাত্মিক সত্য লুকিয়ে নেই। শুধু তাই নয়, *অনীশ্বরম্‌*, এই বিশ্বের পিছনে 'কোন দিব্য শক্তি নেই'। অতি সূক্ষ্ম দিব্যশক্তি তারা মানে না। তাদের কথা হলো—যা আমি চোখ দিয়ে দেখব, শুধু সেটিকেই আমি বিশ্বাস করব। ঐখানেই তারা থেমে থাকে না। তারা বলে, এই বিশ্ব *অপরস্পরসম্ভূতম্‌*, 'স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের ফল'। কিন্তু এই মিলনের উদ্দেশ্য কী? তার উত্তরে তারা বলে—'উদ্দেশ্য আর কী?'—*কিম্‌ অন্যৎ; কামহৈতুকম্‌*, 'কামবশত'। তাদের কাছে কাম-ই জগতের একমাত্র চালিকাশক্তি! ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বেও এই ধরনের সোচ্চার দাবি করে বলা হয়েছে, কাম এবং হিংসা এই দুটিই নাকি মানব মনের মূল বা প্রধান প্রেরণা! মানুষের মনের তলদেশ পর্যবেক্ষণ করে পাশ্চাত্যের নবীন মনোবিজ্ঞান কী আহামরি সিদ্ধান্তেই না পৌঁছেছে! ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই অগভীর। এই শ্লোকে এইরকম নিরেট বস্তুবাদী বা অস্থিরস্বভাব ব্যক্তিদের মনোভাব উল্লেখ করে বলা হচ্ছে, তাঁরা বলে থাকে যে কামের দ্বারা তাড়িত হয়েই নারী-পুরুষের মিলন এবং সেই সংযোগ থেকেই জগৎ চলছে—এছাড়া আর অন্য কী কারণ থাকতে পারে? ভোগকামনা ছাড়া জগতের আর কিছুই আমি বিশ্বাস করি না'—এই হলো তাদের জীবনবেদ। ভারতের বস্তুতান্ত্রিক চার্বাক দর্শনেও এই জাতীয় মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, যদিও আমি শুনেছি চার্বাক নিজে খুবই সংযত মানুষ ছিলেন। চার্বাকপন্থীরা নিজেরা বইপত্র রচনা করে তাঁদের দর্শন প্রচার করেননি। অন্যরা, যাঁরা নিছক বস্তুতান্ত্রিকতার বিরোধী, তাঁরাই তাঁদের লেখার মাধ্যমে ঐ দর্শনের ওপর আলোকপাত করেছেন। বস্তুতপক্ষে, বস্তুতান্ত্রিকতায় প্রাচীন অথবা আধুনিক বলে কিছু নেই—সুর চিরকালই এক! তবে একটা কথা বলা দরকার। বস্তুতান্ত্রিকতার মধ্যেও উচ্চ নৈতিক ভাব থাকতে পারে, প্রচণ্ড মানবিক বোধ থাকতে পারে। টমাস হাক্সলে (Thomas Huxley)-র মতো অজ্ঞেয়বাদীও অত্যন্ত মানবদরদী ও মানবতাবাদী ছিলেন, যিনি বলেছিলেন বিজ্ঞানের লক্ষ্য মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করা। এঁরা যে বস্তুতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী, সে বস্তুতান্ত্রিকতার কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এখানে যে বস্তুবাদের প্রসঙ্গ হচ্ছে, তা অতি নিকৃষ্ট ধরনের। এ

বস্তুবাদ মানুষের সুখদুঃখ নিয়ে মাথা ঘামায় না। তার একটাই কথা : 'আমার সুখ চাই এবং যে-কোন উপায়ে আমি তা লাভ করব।'

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥

—'এই মত অবলম্বন করে, নষ্টচিত্ত, স্বল্পবুদ্ধি এবং ক্রূরকর্মা ব্যক্তিরা শত্রুরূপে আবির্ভূত হয়ে জগৎ ধ্বংস করে।'

এই জীবনদর্শন অবলম্বন করে তারা জগতে কীরকম আচরণ করে? *এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য,* 'এই দৃষ্টিভঙ্গি আশ্রয় করে'; *দৃষ্টি* মানে 'মত' বা দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শন। *নষ্টাত্মানো,* 'তারা নষ্টচিত্ত' বা মলিনচিত্ত; *অল্পবুদ্ধয়ঃ* 'তাদের বুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ নয়'। তারা তাদের চিন্তার অযৌক্তিকতার কথা বুঝতে পারে না এবং *পরম সত্যের* সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দিকগুলিও দেখতে পায় না। তারা *অল্পবুদ্ধয়ঃ,* 'হীনমতি'। এরকম মানুষ কী করে? *প্রভবন্তি,* সমাজে 'উদ্ভূত হয়'; *উগ্রকর্মাণঃ,* 'হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত'; *ক্ষয়ায় জগতো,* 'এই জগৎকে ধ্বংস করার জন্য'; *অহিতাঃ,* 'জগতের শত্রু হয়ে'। সমাজে এরকমের মানুষের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। জার্মানীতে ফ্যাসিস্ট নাজী আন্দোলনের উপদ্রব এর দৃষ্টান্ত। এর মূলে ছিল অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির প্রতি জার্মানীর ঈর্ষা। কিন্তু সেই ঈর্ষাকে ইন্ধন করে উদগ্র সর্বনাশা নাজী আন্দোলন গড়ে তোলা—এ একমাত্র হিটলারের ক্ষমতাতেই কুলিয়েছিল। ১৯২৩ সাল বা ঐরকম সময়ে, মাত্র পাঁচজন লোক এক শহরে একত্র হয়ে ঐ নাজী পার্টির জন্ম দেয়। ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় এসে তারা জার্মানীর ভোল পাল্টে দিয়েছিল। ঘৃণার বীজ বপন করে তারা মানুষের মন একেবারে বিষিয়ে দিয়েছিল। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে এবং তার ফলে শেষপর্যন্ত ঐ নাজী আন্দোলন নিশ্চিহ্ন হয়। যাঁরা নাজী আন্দোলনের বলি হয়েছিলেন, আজ নতুন জার্মানী তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছে এবং জার্মানীর মানুষ আজ আর ঐ আন্দোলনের নাম মুখে পর্যন্ত আনতে চান না। এই বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসেই আমরা এই ঘটনা ঘটতে দেখেছি।

অহিতাঃ মানে অনিষ্টকারী 'শত্রু'। *হিতাঃ* মানে 'যাঁরা বন্ধুভাবাপন্ন', অর্থাৎ কল্যাণকারী।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

—'অপূরণীয় ইন্দ্রিয়কামনায় পূর্ণ হয়ে, কপটতা, দম্ভ, অহংকার ও ঔদ্ধত্যে মত্ত হয়ে, মোহবশত অশুভ ভাব পোষণ করে, অশুদ্ধ সংকল্প নিয়ে তারা কর্ম করে।'

কামম্ আশ্রিত্য দুষ্পূরং, 'দুষ্পূরণীয় কাম আশ্রয় করে', অর্থাৎ যে কামনা কখনও পূর্ণ হবার নয়; *দম্ভ মান মদান্বিতাঃ,* 'দম্ভ, অভিমান এবং ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ হয়ে'। *মোহাৎ গৃহীত্বা অসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তে অশুচিব্রতাঃ,* 'মোহজনিত অশুভ ভাব গ্রহণ করে, অশুদ্ধ সংকল্প নিয়ে তারা কাজ করে'। মোহের আবর্তে পড়লে মানুষের মন পরিষ্কার চিন্তা করতে পারে না। সে মনের চিন্তাগুলি তখন অধিকাংশই ক্ষতিকারক—'আমাকে এটা করতেই হবে, আমাকে ওটা করতেই হবে'—এইরকম ভাবের ফুট সর্বদাই উঠতে থাকে। *মোহাৎ গৃহীত্বা,* 'মোহবশত গ্রহণ করে'; *অসদ্গ্রাহান্,* 'অশুভ ভাবগুলি'; *প্রবর্তন্তে,* 'এ জগতে তারা কাজ করে'; *অশুচিব্রতাঃ,* 'চিন্তায় ও কাজে তারা একেবারেই অশুদ্ধ'।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১॥

—'আমৃত্যু কাম উপভোগই পরম উদ্দেশ্য মনে করে, অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করে, [এটিই সব] এইরকম নিশ্চয় করে;'

চিন্তামপরিমেয়াং চ উপাশ্রিতাঃ, 'অপরিমেয় উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা মনে বহন করে'; *প্রলয়ান্তাম্, 'প্রলয়* বা মৃত্যু পর্যন্ত' তারা এগুলিকে সযত্নে লালন করে। তাদের মনে অন্তহীন বাসনা। 'আমি এই করব, সেই করব' ভাব তাদের মনে ক্রমাগতই বেড়ে চলে। জগতের অধিকাংশ উদ্ধত স্বেচ্ছাচারীদের মানসিক গঠনই এরকম। পরবর্তী একটি শ্লোকে এইসব উৎকট বাসনাগুলিকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হবে।

কামোপভোগপরমা, 'তাদের একমাত্র লক্ষ্য কেমন করে কামনা বাসনাগুলিকে চরিতার্থ করা যায়'; *এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ,* 'এইরকম সিদ্ধান্ত করে যে, এটিই একমাত্র সঠিক পথ, বাকি যা কিছু, সব মিথ্যা।' এই সিদ্ধান্তকেই তারা আঁকড়ে থাকে। তাদের জগৎ বড়ই সংকীর্ণ। জীবনের উচ্চতর কোন লক্ষ্য তাদের চোখে পড়ে না। এই হলো তাদের মানসিক বৈশিষ্ট্য।

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২॥

—'শত আশারূপ রজ্জুতে বদ্ধ হয়ে, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হয়ে, বিষয়ভোগের জন্য অসৎ উপায়ে। [তারা] অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে।'

আশাপাশ শতৈর্বদ্ধাঃ, 'তারা *পাশ* বা দড়ি দিয়ে বাঁধা, *শতৈঃ,* শতশত'। কীসের দড়ি? *আশা,* অর্থাৎ বাসনার দড়ি। *ঈহন্তে কাম ভোগার্থম্,* 'তারা ভোগের ইচ্ছাগুলোকে চরিতার্থ করার জন্য চেষ্টা করে'; *অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্,* 'অসৎ উপায়ে বিত্ত সঞ্চয়ের'। তা সে চুরি করেই হোক, ডাকাতি করেই হোক, অথবা অন্য যে কোন উপায়েই হোক। কামনা উপভোগ করতে গেলে তো টাকাপয়সা চাই। সে টাকা অন্যের আছে, আমার নেই। অতএব চুরি কর, ডাকাতি কর, লুটপাট কর। এই হলো তাদের যুক্তি। আর কতরকমের যে দুর্নীতি আছে, তার ইয়ত্তা নেই এবং সেই অনৈতিক উপায়েই মানুষ টাকার পাহাড় করে।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩॥

—'আজ আমার এটি লাভ হয়েছে; ভবিষ্যতে এই বস্তু পাব; এই ধন আমার, আবার ভবিষ্যতে এই ধনও আমার হবে।'

এই ধরনের মানুষ কিরকম চিন্তা করে, এখন শ্রীকৃষ্ণ তা বলছেন। *ইদমদ্য ময়া লব্ধম্,* 'এখন আমি' মানুষকে বঞ্চিত করে 'এটি লাভ করেছি'; *ইদম্ প্রাপ্স্যে মনোরথম্,* 'আমার মনের অভিলষিত বস্তুটি এরপর আমি পাব'; *ইদম্ অস্তি,* 'এটি আমার আছে'; *ইদম্ অপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্,* 'অন্যান্য উপায়ে আমি আরো বিপুল অর্থ সংগ্রহ করব।' এইভাবে আমার কাম *চরিতার্থ করার জন্য নতুন নতুন পথ* খুঁজে বার করব।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি ।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

—'এই শত্রু আমার দ্বারা হত হয়েছে এবং অন্যদেরও আমি বিনাশ করব। আমি প্রভু, আমি ভোগী, আমি সফল, শক্তিমান ও সুখী।'

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ, 'আমার এই শত্রুকে আমি বিনাশ করেছি'; এবার আমি অন্যান্য শত্রুদের আক্রমণ করব এবং তাদের ধ্বংস করব। *হনিষ্যে চাপরান্ অপি,* 'অন্য শত্রুদেরও আমি হত্যা করব'—এই হলো এধরনের মানুষের মনোগত ইচ্ছা। *ঈশ্বরোঽহম্,* 'আমি প্রভু'; *অহং ভোগী,* 'আমি ভোক্তা', অর্থাৎ আমিই এই সব সুখ উপভোগ করি। *সিদ্ধোঽহং,* 'আমি কৃতকৃত্য'; *বলবান্,* 'আমি শক্তিশালী'; *সুখী,* 'আমি সুখী ব্যক্তি'। এ জাতীয় মানুষ এরকমই ভাবে। যারা মনুষ্য সমাজের প্রভূত সর্বনাশ করেছে, তাদের জীবনী যদি পড়েন তো দেখবেন, তাদের চিন্তাধারা এরকমই ছিল। এখানে এই শ্লোকে তাদের মনোভাবগুলিকে একত্রিত করা হয়েছে।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

—' ''আমি ধনী এবং উচ্চবংশজাত। আমার সমকক্ষ কে আছে? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, আনন্দ করব।'' এইভাবে তারা অজ্ঞানের দ্বারা মোহিত হয়।'

অস্মি, 'আমি হই'; আঢ্যঃ, 'ধনী', শুধু ধনী নয়, মস্ত ধনী; এবং *অভিজনবান্,* 'উচ্চ বংশে জাত'; *কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া,* 'আমার সমতুল্য আর কে আছে' এই জগতে? *যক্ষ্যে,* 'আমি যজ্ঞ করব'; *দাস্যামি,* 'আমি দান করব'; করুণা করে দু-একটা পয়সা গরিব-দুঃখীর সামনে ছুঁড়ে দেব! *মোদিষ্যে,* 'আমি আনন্দ-ফূর্তি করব'; *ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ,* 'এইভাবে তারা অজ্ঞান দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে'।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

—'অনেক সংকল্প দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে বিজড়িত, কামনা উপভোগে আসক্ত, [তারা] জঘন্য নরকে পতিত হয়।'

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা, 'বহু সংকল্প দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত'; যাদের মন বিক্ষিপ্ত, তাদের মনে কত সংকল্পের ঢেউই না ওঠে! *মোহজালসমাবৃতাঃ,* 'মোহজালে জড়ানো'। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন, যাদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা, ক্ষমতার সুরায় যারা নেশাগ্রস্ত, তারা কারো কথা কানে নেয় না। নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তারা বাঁচে, সেটাই তাদের জগৎ। অন্যরা 'হাঁ জী, হাঁ

জী' করবে, এটাই তারা চায়। ঐটিই তাঁদের স্বভাব। ক্ষমতালোভী অত্যাচারী নেতাদের সকলেরই এই দুর্দশা। *প্রসক্তাঃ কামভোগেষু,* 'কামনা উপভোগে গভীরভাবে আসক্ত'; পতন্তি নরকেঽশুচৌ, 'এ ধরনের মানুষ জঘন্য নরকে গিয়ে পড়ে'। এর প্রকৃত অর্থ এই, তারা নরকসদৃশ অতি জঘন্য জীবনযাপন করে। নরক বলে আলাদা কোন একটা জায়গা নেই। মানুষের ভিতরেই নরক। যেখানে সবকিছু খারাপ ও দুর্দশাগ্রস্ত, যেখানে হিংসা, হানাহানি ও অশুভ শক্তির রমরমা, সেটিই *নরক।*

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭॥

—'আত্মাভিমানী, দুর্বিনীত, মান ও ঐশ্বর্যের অহংকারে মত্ত, তারা শাস্ত্রবিধি অমান্য করে দম্ভের সঙ্গে নামমাত্র যজ্ঞ করে।'

আত্মসম্ভাবিতাঃ, 'আত্ম-অভিমানী'; *স্তব্ধা,* 'মেজাজী'; *ধন মান মদান্বিতাঃ,* 'আত্মগরিমা ও ঐশ্বর্যের অহংকারে মত্ত'; *যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে,* 'নমো নমো করে তারা সামান্য যজ্ঞ ইত্যাদি করে থাকে'; *দম্ভেন,* 'ধর্মধ্বজিতার সঙ্গে'; *অবিধিপূর্বকম্,* 'শাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে'। তারা নিয়মকানুন না মেনে হয়তো কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে; কিন্তু তা লোকদেখানো ভড়ং এবং ঔদ্ধত্যের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

—'অহংকার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ আশ্রয় করে এইসব ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি নিজদেহে ও অন্যের দেহে আমাকে (অর্থাৎ, অন্তর্যামী আত্মাকে) দ্বেষ করে।'

সংশ্রিতাঃ, 'বশবর্তী হয়ে'; কার বশবর্তী?—অহঙ্কারম্, 'অভিমান'; *বলং,* 'ক্ষমতা'; *দর্পং,* 'দর্প'; *কামং,* 'কাম'; *ক্রোধং চ,* 'এবং ক্রোধ'—এগুলোর বশবর্তী হয়ে; *মাম্ আত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তো,* 'তাদের ও সকল জীবের মধ্যে অবস্থিত আমাকে অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করে'। *অভ্যসূয়কাঃ,* 'তারা ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি'; তাদের দুষ্ট আচরণের দ্বারা তারা আমাকে, যে-আমি তাদের মধ্যে এবং অন্য সকলের মধ্যে আছি, আঘাত করে। ভগবান বলছেন ঃ আমি সকল জীবের মধ্যে যেমন আছি, তেমনি প্রকৃতির অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও আছি। কিন্তু এই

অসুর প্রকৃতির লোকেরা সকলের সেই অন্তর্যামী আমাকে তাদের দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যথা দেয়। *মাম্ আত্মপরদেহেষু,* 'নিজ দেহে ও অন্য দেহে, আমাকে'; *প্রদ্বিষন্তো,* 'ঘৃণার সঙ্গে তারা প্রত্যাখ্যান করে'; *অভ্যসূয়কাঃ,* 'তারা দুষ্টপ্রকৃতির লোক' যারা অন্যদের ঘৃণা করে। অসুরপ্রকৃতির এইসব লোকের ব্যবহার এমনই এবং তাদের মধ্যে, যে-সব বদগুণের কথা বলা হলো, সেগুলো প্রকাশ পায়। ভগবান বলছেন, তারা যখন অন্যদের ঘৃণা করে, বঞ্চনা করে, অথবা অপমান করে, তখন সে দুর্ব্যবহার আমাকেই আঘাত করে, কারণ আমিই তাদের মধ্যে রয়েছি। এটি বেদান্তের শিক্ষা। কিন্তু অসুরদের এই আচরণের ফল কী হবে? পরের কয়েকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং এই অধ্যায় শেষ হবে তিনটি প্রধান পাপের বর্ণনা দিয়ে, যে-পাপ থেকেই অন্যান্য আর পাঁচটা পাপের জন্ম।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সমাজে এইরকম অসুরপ্রকৃতির লোকের অভাব নেই। দৈবাৎ কখনও সখনও তাদের স্বভাব বদলায় বটে, কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় তারা এতটাই অনমনীয়, তাদের কুপ্রবৃত্তির শিকড় এত গভীরে চলে গেছে যে তারা আর তার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। এখানে 'নরক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আগেই বলেছি, নরক মানে একটা 'জঘন্য অবস্থা'। স্বর্গ বা নরক বলে যেমন আলাদা দুটি স্থান নেই, তেমনি *অসুর* বা *দেবতা* বলেও পৃথক দুটি জাতি নেই। মানুষের মধ্যেই অসুর, মানুষের মধ্যে দেবতা—সব কিছুই মানুষের মধ্যে। আমরা কি হতে চাই তা আমাদেরই ঠিক করে নিতে হবে; সে স্বাধীনতা আমাদের আছে। যিনি অসুর হতে চান তিনি ক্রমাগতই নিচে নামবেন। নামতে নামতে একদিন তিনি এমন এক জঘন্য পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়বেন যেখানে কোন আলো নেই, কেবলই অন্ধকার। আত্মার আলো, দিব্য জ্যোতি সেখানে প্রবেশ করে না। ফলে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতেই তাঁকে জীবন কাটাতে হবে।

ঈশোপনিষদ্-এর তৃতীয় শ্লোকে আছে—*অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ....* 'তাঁরা অসুরদের নিবাস সেই সব লোকে যায় যা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আবৃত'। সে অন্ধকার কীসের? আত্মজ্ঞানের অভাবজনিত অন্ধকার, অর্থাৎ সেই অন্ধকারে আত্মাকে দেখা যায় না। অশুভ মালিন্যে পরিপূর্ণ সে জগৎ। *তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ,* 'যারা *আত্মহনঃ* বা আত্মঘাতী, তারাই ঐসব লোকে যায়'। এখানে আমরা একটি অসাধারণ শব্দ

পাচ্ছি ঃ *আত্মহনঃ* বা 'আত্মঘাতী'। *আত্মা* মানে পরমাত্মা এবং *হনঃ* মানে 'হত্যা করা'। এক কথায় *আত্মহনঃ* মানে আত্মহত্যা। আত্মহত্যা বা 'সুইসাইড' বলতে আমরা দৈহিক মৃত্যুই বুঝি; কিন্তু এখানে সে মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে না— এখানে আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার কথা বলা হচ্ছে। কারণ অসুর প্রকৃতির লোক আত্মাকে অস্বীকার করে সত্য থেকে বহুদূর সরে যায় এবং বিভ্রান্তিকর অন্ধকারে দিনযাপন করে। এদেরই *আত্মহনঃ* বলা হয়েছে। দৈহিকভাবে নিজেকে হত্যা করা খারাপ কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে কোটিগুণ খারাপ অন্তর্যামী আত্মাকে অস্বীকার করে আধ্যাত্মিক আত্মহনন। অবিনাশী, শাশ্বত, অসীম আত্মাকে প্রত্যাখ্যান করে অসুরের মতো আচরণ করা দৈহিক আত্মহত্যার চেয়েও গর্হিত কাজ। ঈশোপনিষদ্ আমাদের সেই সত্যই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। গীতাতেও আমরা সেই উপদেশ বিস্তৃতভাবে পাচ্ছি।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

—'এই বিদ্বেষী, ক্রূর, পাপাচারী নরাধমদের আমি বারবার আসুর যোনিতে নিক্ষেপ করি।'

তান্ দ্বিষতঃ ক্রূরান্, 'এই সব মানুষ যারা *ক্রূরঃ* অথবা অতি নিষ্ঠুর এবং *দ্বিষতঃ,* অর্থাৎ বিদ্বেষী'। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে একেবারেই অন্ধ এরা। এ বিষয়ে যাদের এতটুকু সচেতনতা আছে, তারা কখনও এমন হৃদয়হীন হতে পারে না। অন্তরে দিব্যতার যে আলো জ্বলজ্বল করছে তা থেকে তারা সম্পূর্ণ বিযুক্ত। যারা নিষ্ঠুর হয়, তারা এই গোত্রের মানুষ। চরম নিষ্ঠুরতার বহু দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি, যেমন ধরুন সন্ত্রাসবাদীরা বা অপরাধীরা—কী বর্বর আচরণই না তারা করে! তারা যে মানুষ, তাদের ভিতর যে একটি দিব্য সত্তা আছে, সে কথা তারা বেমালুম ভুলে গেছে; আর ভুলেছে বলেই আজ চতুর্দিকে এত পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা। *তান্,* 'এইরকম লোকেরা'; *দ্বিষতঃ,* 'বিদ্বেষী'; *ক্রূরান্,* 'হিংসাপরায়ণ'; *অশুভান্,* 'পাপাচারী'; *সংসারেষু নরাধমান্,* 'তারা সংসারে নরাধম', অর্থাৎ মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তারাও মানুষ, কিন্তু তাদের কুপ্রবৃত্তি ও চিন্তাধারা এতটাই আসুরিক যে তাদের নরাধম বলা হচ্ছে। তারা তাদের মানবিকতা এবং দেবত্ব একেবারে ভুলে গেছে। *অহম্,* 'আমি, প্রভু'; *ক্ষিপামি,* বারবার তাদের নরকে 'নিক্ষেপ করি'। কীভাবে নিক্ষেপ করেন?

তাদের আপন আপন কর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে। বাইরে থেকে দ্বিতীয় কেউ যে তাদের নরকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, তা নয়। সে প্রশ্ন ওঠে না। কারণ প্রকৃতির এমনই ধারা যে, সেখানে সমস্ত ফল বা কার্য আসে কারণ থেকে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হচ্ছে, *অহম্ ক্ষিপামি,* 'আমি তাদের নিক্ষেপ করি অথবা তাদের জন্ম নিতে বাধ্য করি'; *অজস্রম্,* 'বারবার'; *আসুরীষ্বেব যোনিষু,* 'আসুর যোনিতে'। তাদের নৈতিক সম্বল বা মূলধন এতই কম যে তারা আর ওপরে উঠতে পারে না। অসুর প্রকৃতির মানুষের এই হলো ভবিষ্যৎ। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে এটিই শেষ কথা নয়; তারা চাইলে পরে তাদের স্বভাব বদলাতে পারে। একথা শাস্ত্র বারবার জোরের সঙ্গে বলেছেন। মানুষ তার স্বভাব অবশ্যই পাল্টাতে পারে, তার মনের উৎকর্ষসাধন করতে পারে। আধ্যাত্মিক পথে পা দেওয়ার স্বাধীনতা তাদের অবশ্যই আছে। হঠাৎ কোন মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টিতে পড়ে গেলে তাদের স্বভাব বদলে যেতে পারে। এমন দৃষ্টান্ত প্রত্যেক সমাজেই চোখে পড়ে। কিন্তু সাধারণত এই ধরনের মানুষ বারংবার নারকীয় জীবনই যাপন করে; অবশ্য ততদিন, যতদিন না তার শুভচেতনা জাগ্রত হচ্ছে।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

—'হে কুন্তীপুত্র, জন্মে জন্মে আসুরী যোনি পেয়ে এবং বিভ্রান্ত হয়ে, আমাকে না পেয়ে, এই মূঢ়রা আরো অধোগতি পেতে থাকে।'

আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ, 'আসুরী জন্ম পেয়ে'; *মূঢ়াঃ,* 'এই নির্বোধেরা'; *জন্মনি জন্মনি,* 'জন্মে জন্মে'; *মাম অপ্রাপ্যৈব,* তাদের হৃদয়ে 'আমাকে উপলব্ধি না করে; কৌন্তেয়, 'হে কুন্তীপুত্র'; *ততো যান্তি অধমাং গতিম্,* 'তারা আরো নীচ অবস্থায় নেমে যায়'। মানুষের মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, সে যে উচ্চতম অবস্থা লাভ করতে পারে, এই নির্বোধেরা তা বুঝতে পারে না। *মাম্ অপ্রাপ্য,* 'আমাকে না পেয়ে', অর্থাৎ সকলের মধ্যে নিত্য বিরাজিত আমার পরমাত্মস্বরূপ না উপলব্ধি করে তারা মনুষ্যজীবনের নিকৃষ্টতম স্তরে নেমে যায়। এইটিই *আসুরী সম্পদ*-এর চরম রূপ। পরবর্তী সুন্দর একটি শ্লোকে *দৈবী সম্পদ* এবং *আসুরী সম্পদ* সম্পর্কে এতক্ষণ যে-সব কথা বলা হলো, তার সারসংক্ষেপ দেওয়া হবে।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১॥

—'কাম, ক্রোধ এবং লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বার যা জীবাত্মাকে ধ্বংস করে; অতএব এই তিনটিকে ত্যাগ করা উচিত।'

এখানে *নরক* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমি আবার বলছি, নরক বলতে কোন একটা বিশেষ স্থানকে বোঝায় না। এর দ্বারা বিশেষ এক মানসিক অবস্থা বোঝায়। আমরা দিব্য মানসিকতার অধিকারী হতে পারি, আবার নারকীয় মানসিকতার অধিকারীও হতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, নরকে যাবার তিনটি দ্বার বা দরজা আছে। *ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনম্ আত্মনঃ*, 'নরকে যাবার বা নারকীয় জীবনে প্রবেশ করার পথ তিনটি। *নাশনম্ আত্মনঃ*, 'আত্মার নাশক' তিনটি দরজা দিয়েই অথবা একটি বা দুটি দরজা দিয়েও আমরা নরকে প্রবেশ করতে পারি। এই তিনটি প্রবেশপথ কী কী? মনোমুগ্ধকর এই তিনটি পথ হলো *কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ*, 'কাম, ক্রোধ এবং লোভ'। কাম যদি লাগামছাড়া হয় তো মানুষের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে। প্রাচীন সভ্যতাগুলির দিকে তাকান, অথবা আধুনিক সভ্যতার দিকে তাকান—তাহলেই এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করবেন। ইতিহাসের যে সব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, তাদের প্রায় প্রত্যেকটির পিছনেই এই কামের কারসাজি। নির্দিষ্ট সীমার বাইরে গেলেই কাম অনর্থ বাধাবে, নানা সমস্যার সৃষ্টি করবে। যতরকম শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি—সবের উৎস এই কাম। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলেছেন, '*কাম* হলো *ভোগ*' ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি। এই ভোগের মাত্রা চড়ালে নিশ্চিতভাবে যা আসবে, তা হলো *রোগ* অথবা শারীরিক বা মানসিক 'ব্যাধি'। নরক জীবনে প্রবেশের প্রথম দ্বারটি হচ্ছে *কাম* বা লালসা। তারপর আসছে ক্রোধ বা রোষ। গীতায় এ কথা আমরা বহুবার আলোচনা করেছি। *ক্রোধ* মানুষকে একেবারে উন্মত্ত করে তুলতে পারে এবং সে উন্মত্ততায় কোন অন্যায় কাজ করতেই তার বাধে না। সবশেষে আসছে *লোভ। লোভ* হচ্ছে অন্তহীন বাসনা। অর্থ উপার্জন করা এবং নিজের ভরণ-পোষণের জন্য তা খরচ করা—সেটি *লোভ* নয়। সেটা খুবই স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু অদম্য 'আরো চাই, আরো চাই' ভাব, যা অসৎ পথে ও নানাবিধ সমস্যার দিকে মানুষকে টেনে নিয়ে যায়, সেটি খারাপ। দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা ওল্টালেই দেখা যাবে বিত্তবান মানুষ আরো চাইতে গিয়ে কিরকম সব বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছেন। এসব হয়তো রোজকার ঘটনা। কিন্তু

কিসে কী হয় তা একটু জেনে রাখা ভালো। সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনে একটু-আধটু *কাম* মানুষের থাকে, একটু *ক্রোধ*-ও থাকতে পারে। বস্তুত, মনস্তত্ত্ব বলে যে, জীবনে একটু ক্রোধেরও প্রয়োজন আছে, কারণ তা না হলে আমরা নির্ভেজাল গোবেচারা হয়ে অন্যের হাতে খেলার পুতুল বনে যাব। তাই জীবনে একটু-আধটু ক্রোধেরও একটা ভূমিকা আছে। তবে খেয়াল রাখতে হবে সেই ক্রোধ যেন ইতিবাচক ও গঠনমূলক হয়। মনস্তত্ত্বে তাকেই 'righteous indignation' বা 'ন্যায্য ক্রোধ' বলা হয়। একজন ধনী ব্যক্তি কোন গরিব মানুষকে পীড়ন করছে দেখলে আপনি চুপচাপ সরে পড়তে পারেন না। সেখানে আপনার প্রতিবাদ করা দরকার। এবং প্রতিবাদ করতে গেলেই রাগ এসে যাবে। তা আসুক, কারণ সে রাগ ন্যায্য এবং শুভ-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মানুষের জীবনে এ ধরনের ক্রোধের উপযোগিতা আছে। তা না হলে আমরা একেবারেই অকেজো ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যাব। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে যদি আমরা সোচ্চার না হই তাহলে এক নরকের মধ্যে আমাদের বাস করতে হবে এবং সে নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টির কিছুটা দায় আমাদের ওপর বর্তাবে। এটিই ক্রোধের ইতিবাচক ভূমিকা। তাই অন্যায় ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ খুবই দরকার। শরীরতত্ত্ব অনুসারে মানবজীবনে যেমন যন্ত্রণার একটি স্থান আছে, তেমনি আমাদের জীবনে ক্রোধেরও স্থান আছে। একথা ঠিক যে আমরা যন্ত্রণা চাই না। কিন্তু এই যন্ত্রণা না থাকলে অতর্কিতে মরণ এসে আমাদের গ্রাস করবে। যন্ত্রণা আমাদের আশু বিপদ সম্পর্কে আগে থেকে সতর্ক করে দেয়।

তাই বলছিলাম, বেঁচে থাকার জন্য যেমন যন্ত্রণার একটা মূল্য আছে, তেমনি ক্রোধেরও একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে। তবে সে ক্রোধ খুব সংযত হওয়া চাই, পরিশীলিত হওয়া চাই—তাতে বন্য উন্মত্ততা থাকলে চলবে না। উন্মত্ত হয়েছেন কি সব গেল! তাই এগুলি একটা স্তরে যেমন ইতিবাচক, অন্য আর একটি স্তরে তেমনি নেতিবাচক বা ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে। বিচার করে দুটির পার্থক্য আমাদের বুঝতে হবে। তা না হলে নৈতিক জীবন এবং মহৎ চরিত্র গড়ে উঠবে না। তাই *বিবেক*, অর্থাৎ বিচার চাই। এটা উচিত কি অনুচিত? কতদূর যাব? কোথায় আমার থামা উচিত? এইসব বোধ আমার থাকতে হবে। কিন্তু তা বলে কি শক্তির প্রয়োজন নেই? খুব আছে। এবং ক্রোধও একটা শক্তি। কিন্তু সেই শক্তিকে ন্যায়ের স্বার্থে, সামাজিক কল্যাণের কাজে খুব সংযত হয়ে ব্যবহার করতে হবে। তবে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত; সীমা ছাড়ালেই *কাম*, *ক্রোধ* এবং *লোভ* নরকের দ্বারে পর্যবসিত হবে। এখন ঐ তিন শক্তি

আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে যা খুবই অনভিপ্রেত। আবেগ ও অনুভূতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা চাই, তা না হলে তারা আমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে, কারণ তাদের প্রভূত শক্তি। মনে রাখবেন বুদ্ধির চাইতেও এই আবেগ ও অনুভূতির শক্তি অনেক বেশি। কিন্তু *বুদ্ধি* কি করে? সে তার জ্ঞানের শক্তি দিয়ে, বিচারের শক্তি দিয়ে ঐ দুরন্ত শক্তিগুলিকে সংযত করে। বিবেক হলো বৌদ্ধিক শক্তি বা তেজ যা ভালোমন্দ বিচার করতে পারে। তাই আবেগের রাশ টেনে রাখার মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে বুদ্ধি বা বিচারশক্তি। এই শক্তি আমাদের থাকা চাই। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি খেলে বেড়াচ্ছে তাকে ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে। ভ্রমণ উপভোগ করতে হলে ঘোড়াগুলিকে সংযত রাখতেই হবে। *কঠোপনিষদ্*-এর তৃতীয় অধ্যায়ে সেই কথাই বলা হয়েছে।

তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ, 'অতএব এই তিনটি ত্যাগ কর'। আমরা যেন এই তিনটি, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভের কবলে না পড়ি। তারা যেন আমাদের পরাস্ত না করতে পারে। তারা যেন আমাদের প্রভু না হয়; আমরাই তাদের প্রভু—এ কথাই এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাস্তবিক, এই কাম, ক্রোধ ও লোভকে সংযত করার মাধ্যমেই সমাজের নৈতিক বিকাশ সম্ভব হয়। যেখানে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, সে সমাজ অনৈতিক হতে বাধ্য কারণ তার ভিতরে কোন শক্তি নেই। সে সমাজ বা সে সভ্যতার অন্তিম লগ্ন আসন্ন।

গিবন (Gibbon)-এর লেখা *The Decline and Fall of the Roman Empire* গ্রন্থখানি পড়ুন। দেখবেন রোম সাম্রাজ্যের পতনের ঠিক আগে সেখানে ঐ তিনটি অশুভ শক্তির দাপট কিভাবে বেড়ে গিয়েছিল। আত্মনিয়ন্ত্রণের কোন বালাই ছিল না বললেই চলে। আজ একজন রাজা হলেন। দিন কয়েক পরে হয়তো তাঁকে খুন করা হলো এবং তাঁর জায়গায় আরেকজনকে সিংহাসনে বসানো হলো। সৈন্যবাহিনীই তখন সর্বেসর্বা। তাই নতুন রাজাকে প্রভূত অর্থের বিনিময়ে তাঁর গদিটি কিনতে হতো। আর সে টাকা না দিলে কিছুদিনের মধ্যেই সেনাবাহিনীর হাতে তিনি খতম হতেন। প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতার ওপর ভিত্তি করে যে মহান রোম সাম্রাজ্যের সৌধটি এককালে গড়ে উঠেছিল, যে সুশৃঙ্খল সাম্রাজ্যের মানুষ একদা চিন্তার জগৎকে অসাধারণ সমৃদ্ধ করেছিল, শেষদিকে আত্মসংযমের অভাবে, মাত্রাতিরিক্ত কাম, ক্রোধ ও অর্থলালসার কবলে পড়ে তার কী চরম দুর্গতি হলো! দু-তিনশো বছরের মধ্যেই তার অবক্ষয় এমন চরমে পৌঁছেছিল যে বহিঃশত্রুর এক আক্রমণের চোটেই ধূলিসাৎ হলো—পতন হলো রোমের। সে রোম আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না।

আমাদের সমাজকেও এসব নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই কোন না কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, যিনি আমাদের নতুন বাণী দিয়ে সঞ্জীবিত করেছেন। তাঁদের চারিত্রিক মহত্ত্ব ও পবিত্রতা জাতির মর্মমূলকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল, এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে এদেশ আবার উঠেছে। ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় ঠিক এমনটিই হয়েছিল। তিনি এমন এক আচার্য ছিলেন যিনি তৎকালীন জাতীয় জীবনের নৈতিক মানকে তুঙ্গে তুলে দিয়েছিলেন এবং করুণার ভাবে সমগ্র দেশকে পরিপ্লাবিত করেছিলেন। যেখানে করুণার প্রাধান্য সেখানে আর অশুভভাবগুলি ঠাঁই পাবে কী করে? যে-হৃদয় করুণায় দ্রবীভূত, সেখানে কাম-ক্রোধ-লোভ সক্রিয় হবে কী করে? সে কি কাউকে ঠকাতে পারে? পারে না। কারণ তার মন সকলের প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ। এইভাবে বুদ্ধের সময়ে ভারতীয়দের নৈতিক জীবনের মান খুবই উঁচুতে উঠে গিয়েছিল এবং এইভাব কয়েক শতাব্দী বজায় ছিল। তারপর আবার সেই ভাবে ভাঁটা পড়ে এবং ক্রমশ তা বিলুপ্ত হয়। ফলে অশুভ ও অকল্যাণকর যেসমস্ত ভাবগুলি এতদিন গা ঢাকা দিয়েছিল, তারা আত্মপ্রকাশ করল। তারপর শুরু হলো বিদেশীদের আক্রমণের পালা। বর্তমানে আমরা এমন এক সন্ধিক্ষণের মধ্যে দিনাতিপাত করছি যার পিছনে পড়ে রয়েছে অবক্ষয়ের যুগ এবং সামনে অভূতপূর্ব সম্ভাবনার হাতছানি। বিগত ও অনাগত, এই দুটি পর্বের মিশ্র মধ্য লগ্নে এখন আমরা দাঁড়িয়ে। বর্তমানে সবকিছু মিলেমিশে জট পাকিয়ে রয়েছে।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বক্তৃতা দেবার সময় সে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের বলতাম ঃ দেখ, তোমরা এদেশে বিশেষ বিশেষ ভাব নিয়ে নানারকম দিন উদ্যাপন করে থাক, যেমন 'ইভিল ডে' (Evil Day) ইত্যাদি। এ বেশ ভালো। কিন্তু, আমি তোমাদের কাছে লুকাবো না, ভারতবর্ষ এখন এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যে তাকে ভালো বা মন্দ কোন বিশেষণেই বিশেষিত করা যাবে না। একদিকে নানারকম দুর্নীতি ও দুরাচারের ছড়াছড়ি, অন্যদিকে সদিচ্ছা ও সদাচারেরও অভাব নেই। তোমরা তাকে ভালোও বলতে পার, মন্দও বলতে পার। যদি ভালো বল, সে কথাও সত্য; আবার যদি মন্দ বল, তাও সত্য—সে কথাও খেটে যাবে। এখানে সেখানে বহু ভালো জিনিস হচ্ছে। আবার ওপর ওপর দেখলে দেখতে পাবে দুষ্টামি ও পাপের কিছু কমতি নেই। আমরা এখন এইরকম একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছি। কিন্তু আমাদের কপাল ভালো, আমাদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতো

আচার্যদের পেয়েছি, রাজনীতির ক্ষেত্রে পেয়েছি মহাত্মা গান্ধীকে। ভারতীয় জীবন ও চিন্তাকে তাঁরা এমন প্রভাবিত করে গেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তার ফল ফলবেই, ব্যাপকভাবে সেই প্রভাব অনুভূত হবে। যখন তা হবে তখন নিজেদের সংযত করে আমরা আবার উঠতে শুরু করব; আমরা আরো নীতিবান ও মানবিক হয়ে উঠব। কী অদ্ভুত বিকাশই না ঘটবে তখন! শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব তো সেই জন্যই।

আরেকটা কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ শুধু ভারতের জন্যই আসেননি। তাঁদের অবদান সকলের জন্য, সারা পৃথিবীর জন্য। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়ে যাওয়ায় আজকের পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে গেছে। বুদ্ধের সময় এ সুযোগ ছিল না। আজ অতি সহজে পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষ আর এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই ধরুন না। মহাসমাধির মাত্র সাত বছর পরেই স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে তাঁর নাম আমেরিকায় পৌঁছে গেল। ব্যাপারটা ভাবুন একবার! আগের যুগ হলে এটা সম্ভব হতো না। তাই বলছিলাম, যে-সব পাপের পঙ্কিলতায় সমাজ নরকে পরিণত হয়, এইসব যুগাচার্যদের মহৎ শিক্ষার প্রভাবে সে সব একদিন কেটে যাবেই। স্বর্গ আর কোথায়? আমরা যদি পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারি, তাহলে এটাই স্বর্গ। আর তা না হলে এটাই নরক। সমাজে পারস্পরিক বিশ্বাস একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই যদি চিল শকুনের মতো দিনরাত শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়, অন্যকে শোষণের সুযোগ খোঁজে, তাহলে কে কাকে বিশ্বাস করবে? আজ যেন সকলেই ধূর্ত শেয়াল—কি করে অন্যের ক্ষতি করা যায়, সে চিন্তাতেই ব্যস্ত! এমনকি স্বামী-স্ত্রীও দুজন দুজনকে বিশ্বাস করতে পারছে না! যখন পাপ খুব বেড়ে যায়, তখনই এই দূরবস্থা আসে। অন্যদিকে, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ মানুষকে কতটা বিশ্বাস করে! পরস্পরের মধ্যে কত না বোঝাপড়া! এটা সম্ভব হয়, কারণ মানুষগুলি সেখানে লোভী নয়। হ্যাঁ, বেঁচে থাকতে গেলে কিছু টাকাপয়সার অবশ্যই দরকার; কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাকে লোলুপ হতে হবে। একটা সময়ে ভারতীয়দের মনোভাব এরকমই ছিল। কালে তার পরিবর্তন হয়েছে। এখন আবার সেই আগের দৃষ্টিভঙ্গি ফিরে আসছে। কোন কোন মানুষের মধ্যে এই পরিবর্তন, এই চারিত্রিক বিকাশ, তাড়াতাড়ি ঘটবে, কারো বা দেরিতে।

তাই, সারা পৃথিবী জুড়েই আপনারা দু-ধরনের মানুষ দেখতে পাবেন—

একদল নীতিবান, আরেক দল অসুর স্বভাবের। ন্যায়পরায়ণ মানুষের সংখ্যা যত কমে এবং অসুর প্রকৃতির মানুষের সংখ্যা যত বাড়ে, ততই সমাজের অবনতি হয়। তারপর একসময় আবার চাকা ঘোরে। নীতিনিষ্ঠ মানুষরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকেন এবং সকলেই তাঁদের তারিফ করেন। তখনই সুসময়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ যেদিন তুমি গুণের কদর করতে শিখবে, জানবে তুমি উন্নত হচ্ছ। কিন্তু তুমি যদি পাপকে বাহবা দাও, বুঝতে হবে তুমি নরকের পথে পা বাড়িয়েছ। সুখের বিষয়, পৃথিবীর সর্বত্র *এখনও* সততা ও পবিত্রতার সমাদর আছে। সেটিই আশার কথা। ভালো কিছু দেখলে আমরা মোটেই উদাসীন থাকতে পারি না; আমরা তার কদর করি। কেউ ভালো কাজ করলে আমরা তার প্রশংসা করি। একজন যুবক একটি ডুবন্ত শিশুর প্রাণ বাঁচালে সরকার তাকে পুরস্কৃত করেন। পদক দেন। বাস্তবিক, অন্যের জন্য যখন কেউ নিজের প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করার সাহস দেখান, তখন সে মহত্ত্বকে আমরা প্রশংসা না করে পারি না। কিন্তু মহত্ত্বের এই উচ্চ শিখরে উঠতে সময় লাগে। সবকিছুর জন্যই সময়ের দরকার। নামতেও সময় লাগে, উঠতেও। সবই ধীরে ধীরে ঘটে। কিন্তু একটা নতুন কিছু, একটা ভালো কিছু যে ঘটতে চলেছে তা আমরা বেশ বুঝতে পারি। দেখা যাচ্ছে সমাজে নতুন নতুন ভাবের প্রচার ও প্রসার হচ্ছে— এটি আশার কথা। তা থেকেই একদিন প্রগতির সুরম্য মুকুল উন্মীলিত হবে। তাই সমাজকে ভালো ভালো ভাব দিন। সমাজ যেন একটি কড়াই—নিত্য সেখানে রান্না হচ্ছে। তাতে কিছু মহৎ ভাবের মশলা ফেলে দিন না। দেখবেন, তাতে যে ব্যঞ্জন তৈরি হবে তা কত সুস্বাদু! অর্থাৎ, সমাজ থেকে তখন এমন সব মানুষ জন্ম নেবে যারা নৈতিক মূল্যবোধে পরিপূর্ণ, *দৈবী সম্পদে* ঋদ্ধ। ভারতবর্ষের মানুষ এই সত্যে বিশ্বাসী। আমাদের জাতীয় অভিজ্ঞতা থেকে সমাজের এই উত্থান পতন কাকে বলে, তা আমরা বিলক্ষণ জানি। আমরা বুঝি বেশ কিছুকাল আমরা পড়ে গিয়েছিলাম এবং এখন আবার ধীরে ধীরে উঠছি। আমাদের ভিতর দৈবীগুণের উদ্বোধন ঘটাতে নতুন শক্তির অভ্যুদয় হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে এই হলো আমাদের মূল্যায়ন।

তাহলে আমরা দেখলাম যে নরকে যাবার তিনটি দরজা কিভাবে আমাদের প্রলুব্ধ করে। বাইবেলে যিশুর একটি সুন্দর কথা আছে। সেখানে তিনি বলছেন, 'দিব্যজীবনে প্রবেশ করার যে পথ, সেটি সোজা, কিন্তু সংকীর্ণ; খুব কম লোকই সে পথের সন্ধান জানে।' এটি *নিউ টেস্টামেন্ট*-এ (ম্যাথু কথিত গসপেল; ৭ ঃ ১৩-১৪) আছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে—'যে দরজাটি বিশাল এবং পথটি

প্রকাণ্ড দেখবে, যেখানে দলে দলে মানুষ ছুটে চলেছে, জেনো, সেটি ধ্বংসের পথ।' কথাটি সত্য, কারণ দেখবেন বেশিরভাগ মানুষই *কাম, ক্রোধ ও লোভ*-এর পথটি চট্ করে বেছে নেয় এবং তাতেই তারা শেষমেশ ভোগে, কষ্ট পায়। আবার দৈবাৎ কখনও তাদের চৈতন্য হলে তারা ভুল শুধরে নিয়ে নৈতিকতার পথে ফিরে আসে। একথা বলে শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

—'হে কুন্তীপুত্র, এই তিনটি অন্ধকার [নরকের] দ্বার থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ নিজের কল্যাণ আচরণ করে এবং সেই হেতু পরম মোক্ষলাভ করে।'

বিমুক্তঃ, 'যে পারে গেছে' অথবা যে মুক্ত হয়েছে; *এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ*, 'এই তিনটি তমসাচ্ছন্ন দ্বার থেকে'। *তমোদ্বার* মানে অন্ধকারাচ্ছন্ন দরজা, যা দিয়ে মানুষ অন্ধকার থেকে আরো অন্ধকারে প্রবেশ করে। অন্ধকার কেউই পছন্দ করে না; সকলেই আলো চায়। তাই যে *কাম, ক্রোধ এবং লোভ*, এই তিনটি জিনিস থেকে মুক্ত, এইরকম যে *নরঃ*, অর্থাৎ 'মানুষ'; *আচরতি আত্মনঃ শ্রেয়ঃ*, 'নিজের কল্যাণ ও বিকাশের জন্য সচেষ্ট হয়'; এবং *ততো যাতি পরাং গতিম্*, 'সেই প্রচেষ্টার ফলে সে জীবনের শ্রেষ্ঠ স্তরে উঠে যায়।' কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটে হলো নরকে যাওয়ার রাস্তা। কিন্তু কেউ যদি ভালোমন্দ বিচার করে, কল্যাণ অকল্যাণের কথা চিন্তা করে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়, তাহলে সে আলোকোজ্জ্বল পথ বেয়ে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করবে। এমন মানুষ মহত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই মূল্যবান সত্যটি বুঝতে শিখেছি যে, চরম অধঃপতিত মানুষও চাইলে ভালো হতে পারে, উন্নত হতে পারে। এ ঘটনা আমরা বহুবার ঘটতে দেখেছি। কেউ নিচে নেমে গেছে বলে সে যে আর কোনদিন উঠতে পারবে না, তা নয়। কিছুকালের জন্য হয়তো কারো পতন হয়েছে, কিন্তু সুযোগ পেলে সেও আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এমন অনেক মানুষ আছে, হয়তো কারো বক্তৃতা শুনে, তার মনের গতি বদলে গেল, সে ভালো পথে চলা শুরু করল। কলকাতার জেলের এক কয়েদির কথা বলি। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি দেখে তার ভাবান্তর হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত একখানি বই পড়ার ইচ্ছা হলো তার। জেল থেকে তাকে সেই বই দেওয়া হলে সে বইখানি পড়ে ফেলল এবং তারপর থেকে সে একেবারেই অন্য মানুষ—এতটাই বদলে গেল! এই যে দিব্য

স্ফুলিঙ্গ, ভালো হওয়ার এই যে শক্তি, এ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। কখনও না কখনও সে প্রকাশ পাবেই। সেইজন্যই বলছিলাম—কারোর পতনই চিরস্থায়ী নয়; সবই সাময়িক। বেদান্ত সে কথাই বলে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, নরকে যাওয়ার রাস্তা ত্যাগ করে নিজের কল্যাণসাধনের জন্য যে মানুষ সচেষ্ট হয়, সে জীবনের শ্রেষ্ঠ স্তরে উঠে যায়। একটি আলোর কিরণ এসে তার হৃদয় উদ্ভাসিত করে দেয়, ফলে নৈতিক জীবনযাপন তার কাছে শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো *স্বাভাবিক* হয়ে যায়, তার জন্য তাকে আর সংগ্রাম করতে হয় না। এই শ্লোকে এই গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতটিই দেওয়া হয়েছে।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

—'যে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে, কামনার বশীভূত হয়ে কর্ম করে, সে সিদ্ধিলাভ করে না, সুখও না, পরম গতিও না।'

যঃ শাস্ত্র বিধিম্ উৎসৃজ্য, 'যে শাস্ত্রীয়বিধি অমান্য করে'। *শাস্ত্র* মানে বিজ্ঞান। আবার ঐ শব্দের দ্বারা আমাদের ধর্মশাস্ত্রগুলিকেও বোঝায়। ধর্মশাস্ত্রগুলিকে মানব কেন? মানব এই জন্য যে, সেগুলি আমাদের সুন্দর জীবনের পথনির্দেশ দেয়। প্রশ্ন হতে পারে—শাস্ত্র যদি আমাদের অন্যায় কিছু করতে বলে? তাহলে বুঝতে হবে ওটি কোন শাস্ত্রই নয়। শাস্ত্রনামধারী কোন গ্রন্থ যদি বলে—'অস্পৃশ্যতার নিয়ম মেনে চল,' আমাদের বলতে হবে, 'না, মানব না', কারণ ওগুলি ভুয়ো শাস্ত্র। যদি কোন শাস্ত্র *শ্রুতি*-নির্ভর হয়, তাহলে তা কখনওই ও কথা বলবে না। *শ্রুতি* বলে, প্রত্যেকের সত্তাই দিব্য। যে *স্মৃতি*-র শিক্ষা শ্রুতিবিরোধী হবে, সে শিক্ষার কোন মূল্য নেই। সে শিক্ষা মানতে আমরা বাধ্য নই। কিন্তু শ্রুতিভিত্তিক যে শাস্ত্রীয় শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয় তা আমাদের কল্যাণের জন্যই; তাই সে শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করব। তাই বলা হচ্ছে, শাস্ত্রের শিক্ষা মেনে চল। খাদ্য বা পথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত *শাস্ত্র* যেমন আমাদের বলে দেয় দৈনিক কতটা ক্যালরি, কতটা স্নেহজাতীয় খাদ্য আমাদের খাওয়া দরকার অথবা কী ধরনের খাদ্য খেলে আমাদের শরীর সুস্থ থাকবে, তেমনি ধর্মশাস্ত্রও আমাদের বলে দেয় কোন্ পথে গেলে, কীভাবে জীবনযাপন করলে আমাদের মঙ্গল। দুটিই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকেই আমরা অনুসরণ করি। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাওয়া দাওয়া করে যেমন আমরা শরীরটাকে ঠিকঠাক রাখি, তেমনি জগতে আরো নানা ধরনের বিজ্ঞান আছে, যেমন অধ্যাত্মবিজ্ঞান। অধ্যাত্মবিজ্ঞান হচ্ছে

জীবনের উচ্চতম স্তরে ওঠার বিজ্ঞান। জীবনের শ্রেষ্ঠ দিকটি তা আমাদের কাছে উন্মোচিত করে। পথ্যবিজ্ঞান শরীরবিষয়ক *শাস্ত্র,* অধ্যাত্মবিজ্ঞান মানসিক ও নৈতিক *শাস্ত্র।* এখানে তাই বলা হচ্ছে, যে শাস্ত্রের অনুশাসন সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে কেবল *কাম* অর্থাৎ 'প্রবণতা বা বাসনার' বশবর্তী হয়ে কর্ম এবং আচরণ করে; *ন স সিদ্ধিম্ অবাপ্নোতি,* 'সে কখনও *সিদ্ধিলাভ* করতে পারে না', অর্থাৎ সাফল্য বা পূর্ণতালাভ করতে পারে না। শুধু তাই নয়, *ন সুখম্,* 'সুখও না'; *ন পরাং* গতিম্, 'পরম গতিও না।' তাই বিধান দেওয়া হচ্ছে, *শাস্ত্র* অনুসরণ কর, শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করো না।

এখানে আমি একটা কথা বলছি। আমাদের সনাতন যে পরম্পরা চলে আসছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে *শ্রুতি* বা উপনিষদ্ই সর্বোচ্চ শাস্ত্র। যে শিক্ষা উপনিষদ্-বিরোধী, তা আমাদের বিচারে *শাস্ত্র* নয়। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে আমরা কয়েক শতাব্দী ধরে সেই সব শাস্ত্রই অনুসরণ করে এসেছি যা *শ্রুতির* শিক্ষা অমান্য করেছে। অস্পৃশ্যতা বা জাতপাতের ঔদ্ধত্য এইরকম একটি পন্থা যা *শ্রুতি*-বিরোধী। শ্রুতি সাম্যের কথা বলে, ভেদাভেদের কথা বলে না। *শ্রুতি* বলে সব জীবের মধ্যে এক আত্মা বিরাজ করছেন। আমরা সে কথা কানে তুলিনি। তাই আমাদের অনেক শাস্ত্রে এমন এমন অংশ আছে যা শাস্ত্রপদবাচ্য নয়। আমরা তাই সেগুলি বর্জন করছি। আমাদের সনাতন প্রজ্ঞা অনুযায়ী, *শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সি,* '*শ্রুতি* এবং *স্মৃতি*-র মধ্যে বিরোধ হলে, একমাত্র *শ্রুতি*-ই শিরোধার্য'। বর্তমান যুগে আমাদের নতুন শাস্ত্র হয়েছে, যেমন সংবিধান। আমাদের সংবিধানে মানুষের ঐক্য, মানুষের মর্যাদা, মানুষের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। এটিই যথার্থ *শাস্ত্র*। যে শাস্ত্র মানুষে মানুষে বিভেদ রচনা করে, তা শাস্ত্র নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'শাস্ত্রকে অনুসরণ কর' বলতে বোঝাচ্ছে '*শ্রুতি*-কে অনুসরণ কর'। *শ্রুতি* কখনও কোন মানুষের বিরুদ্ধে কথা বলবে না, কারণ *শ্রুতি* সর্বজনীন। এখানেই *সনাতন* শব্দের প্রাসঙ্গিকতা। *সনাতন ধর্ম* বা চিরকালীন ধর্মের ভিত্তি *শ্রুতি*। কিন্তু *স্মৃতি* তা নয়। *স্মৃতি* দৈনন্দিন জীবনযাপনের *ধর্ম,* অথবা একটা *যুগ* বা বিশেষ কালের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম, যাকে আমরা *যুগধর্ম* বলি, তাই। ভারতে যাঁরা সনাতনপন্থী তাঁরা *শ্রুতি* ও *স্মৃতির* এই পার্থক্যটি মেনে চলেন। আমরাও তাই মানছি। যে-সব স্মৃতিশাস্ত্র মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টির কথা বলে, সেগুলি আজ খারিজ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে মানুষের ঐক্যের কথা বলা হচ্ছে, আমরা সানন্দে তা গ্রহণ করছি কারণ তা শ্রুতি-স্বীকৃত। শাস্ত্রগুলিকে নিয়ে এমন সূক্ষ্ম, চুলচেরা

বিচার, এমন চমৎকার পার্থক্য নির্ণয় বিশ্বে আর কোথাও নেই। *শ্রুতি* শাশ্বত; *স্মৃতি* হচ্ছে, যাচ্ছে। এই কারণে গত পাঁচ হাজার বছরে আমাদের দেশে বহু স্মৃতিশাস্ত্রের উদ্ভব হলেও *শ্রুতি* কিন্তু একটিই, কারণ তার উপজীব্য চরম, অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন বা আত্যন্তিক সত্য। সেই সত্য মানবসত্তা সম্বন্ধীয় সত্য, মানবিক সম্পর্ক সম্বন্ধীয় সত্য, সকল জীবের অন্তরে নিহিত দেবত্ব সম্পর্কিত সত্য। এখানেই শ্রুতির প্রামাণ্যতা। তাই *স্মৃতি*-র স্থান *শ্রুতি*-র নিচে। *স্মৃতি* যদি *শ্রুতি*-কে অনুসরণ করে তাহলেই তাকে *শাস্ত্র* বলে মানা চলে, তা না হলে শাস্ত্র হিসাবে স্মৃতির কোন দাম নেই। *স্মৃতি ও শ্রুতির মধ্যে এই পার্থক্যটি মনে রেখেই আলোচ্য শ্লোকের মর্ম বুঝতে হবে।* শ্লোকে বলা হয়েছে, *যঃ শাস্ত্র বিধিম্‌ উৎসৃজ্য*, 'যে শ্রুতির অনুশাসন লঙ্ঘন করে, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ভাঙে'; *বর্ততে কামকারতঃ*, 'এবং নিজের ঝোঁকের বশে কাজে প্রবৃত্ত হয়'; *ন স সিদ্ধিম্‌ অবাপ্নোতি*, 'সে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতালাভ করতে পারে না'; শুধু তাই নয়, *ন সুখং ন পরাং গতিম্‌*, '[সে] না পায় সুখ, না পরম গতি', অর্থাৎ মোক্ষ। পরের শ্লোকটিও আমাদের *শাস্ত্র* মেনে চলতে বলবে এবং পরবর্তী অধ্যায় শুরুই হবে অর্জুনের একটি প্রশ্ন দিয়ে। কী প্রশ্ন? অর্জুন জিজ্ঞাসা করবেন—যে শাস্ত্র মেনে চলবে না, তার কী দশা হবে?

একথা ভুললে চলবে না শাস্ত্রীয় বিধিগুলি আমাদের মঙ্গলের জন্যই দেওয়া হয়েছে। আয়ুর্বেদের একটি শিক্ষার কথাই ধরুন, যা অন্যান্য শাস্ত্রেও পাওয়া যায়। সেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যখন খাব তখন যেন পাকস্থলীর মাত্র অর্ধেকটা খাদ্য দিয়ে ভরাই; এক-চতুর্থাংশ জলের জন্য এবং বাকিটা বায়ু চলাচলের জন্য খালি রাখতে হবে। এই অনুশাসনটি না মেনে যদি আমরা আকণ্ঠ খাই, তাহলে কষ্ট পাব। মানুষের শরীরের গঠন পর্যবেক্ষণ করেই এই বিধান দেওয়া হয়েছে; অতএব এটি *শাস্ত্র।* এইরকম অনেক শাস্ত্রীয় বিধি আছে যা মেনে চললে আমাদের কল্যাণ হবে, অন্যথায় আমাদের ভুগতে হবে। এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন :

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণস্তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

—'অতএব, কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণস্বরূপ [পথনির্দেশক] হোক। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ জেনে এই সংসারে কর্ম করা উচিত।'

অতএব, তোমার জ্ঞানের উৎস বা *প্রমাণ* হলো *শাস্ত্র*। শাস্ত্রকে মেনে চল। তাতে তোমার কল্যাণ হবে। আমি আগেই বলেছি *শাস্ত্র* শব্দটির সঠিক তাৎপর্য আমাদের বুঝতে হবে। শ্রুতি যে-সব সত্যের কথা বলে, তা যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত হয়েছে এবং এখনও সেগুলি পরীক্ষণীয়, অর্থাৎ সেগুলিকে বাজিয়ে নেওয়া যায়। আদি শঙ্করাচার্যের ভাষায় শ্রুতির সত্য হলো *বস্তুতন্ত্রজ্ঞান*, অর্থাৎ 'বস্তুর যথার্থ জ্ঞান', মনের কল্পনাপ্রসূত জ্ঞান নয়। অনেক *স্মৃতি-ই শাস্ত্র* হিসাবে চলে আসছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে *শ্রুতি*-র সত্য নেই। তাই শুধু নয়, অনেক সময় তাদের শিক্ষা *শ্রুতি*-বিরোধী। যেমন কোন কোন *স্মৃতি* বলে—মেয়েদের কোন অধিকার নেই। একটি স্মৃতিতে পড়েছি, ভোর চারটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত মেয়েদের শুধু কর্তব্যই করে যেতে হবে। অধিকারের নাম যেন তারা মুখে না আনে। এ ধরনের কথা *শ্রুতি* অনুমোদন করে না। শ্রুতির দৃষ্টিতে নারী, পুরুষ সকলেই সমান। কিন্তু আমরা *স্মৃতির* দোহাই দিয়ে *শ্রুতি*-র নির্দেশ অমান্য করেছি। *শাস্ত্র* এবং শাস্ত্র বলে কথিত অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য যে থাকতে পারে, তা আমরা তলিয়ে দেখিনি। এখন সে বিচারের সময় এসেছে। তাই, এখানে শ্লোকে যে *শাস্ত্র*-কে অনুসরণ করার কথা বলা হচ্ছে, তা অকাট্য। বলা হচ্ছে, তোমার জ্ঞানের উৎস এই *শাস্ত্র।* কিন্তু কোন্ বিষয়ের জ্ঞান? *কার্যাকার্য ব্যবস্থিতৌ*, 'কি করা উচিত এবং কি না করা উচিত, সে বিষয়ে'। এটি জানতে গেলে শাস্ত্রকে অনুসরণ করতে হবে। বাইরের জীবনের নানা বিষয় জানতে গেলে যেমন শরীর বিজ্ঞান আছে, চিকিৎসাশাস্ত্র আছে, ঠিক তেমনি অন্তর্জীবন সম্পর্কে জানতে গেলেও একটি অধ্যাত্মশাস্ত্র আছে। প্রথম শাস্ত্র বলে দেয় শরীরকে কি করে সুস্থ, সতেজ ও সবল রাখা যায়; দ্বিতীয় শাস্ত্র জানিয়ে দেয় কেমন করে অন্তর্জীবনকে পুষ্ট করতে হয়, পবিত্র রাখা যায়। শেষের এই শিক্ষাটি কেবল অধ্যাত্মশাস্ত্রই দিতে পারে। অধ্যাত্মশাস্ত্র বলে দেয় কোন্‌টি *কার্য*, অর্থাৎ 'কর্তব্য' এবং কোন্‌টি *অকার্য*, অর্থাৎ 'করা উচিত নয়'। এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রামাণ্য। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন—শাস্ত্রকে অনুসরণ কর।

তাই, *জ্ঞাত্বা*, এই সত্য 'জেনে'; *শাস্ত্র বিধান উক্তং কর্ম কর্তুম্ ইহার্হসি*, 'শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান কর।' এই জাতীয় কর্মই কেবল করা উচিত, কারণ *শাস্ত্র* যা বলেন, তা সকলের কল্যাণের জন্য; মানুষে মানুষে বিরোধ বাধান শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হতে পারে না। আর যদি তা হয়, বুঝতে হবে সেটি আর যাই হোক *শাস্ত্র* নয়। তখনই তাকে *শাস্ত্র* বলব যখন তার শিক্ষা নির্বিচারে প্রত্যেকের কল্যাণ করবে, যেমন শরীর বিজ্ঞান। যদি শাস্ত্র আমার মঙ্গল করে এবং আর

দশজনের অমঙ্গল ডেকে আনে, তাহলে তাকে *শাস্ত্র* বলা যায় না। সব জীবের প্রতি যে শাস্ত্রের সমদৃষ্টি এবং শ্রদ্ধার ভাব, সেই প্রকৃত শাস্ত্র কখনও কারো অমঙ্গল চিন্তা করতে পারে না। এক আত্মা সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন। তাই প্রকৃত *শাস্ত্র* কখনও বৈষম্যমূলক শিক্ষা দিতে পারে না। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রের কোথাও কোথাও বলা আছে, *শূদ্র* বেদপাঠ করলে তার কানে গরম সীসে ঢেলে দেবে। এ শাস্ত্রের কথা নয়, এ 'আমাদের নিজেদের গোঁড়ামিকে *শাস্ত্র* বলে চালানো হয়েছে'। গোঁড়ামি অনেক ধরনের আছে, যেমন এক শ্রেণিকে আর এক শ্রেণির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেওয়া, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার। এসব ভাব আমাদের মধ্যে বিস্তর চোখে পড়ে। উচ্চ শ্রেণির শক্তিশালী মানুষ এমন সব আইন তৈরি করে, যা তাদের শক্তি বাড়ায় এবং দুর্বলকে আরো দুর্বল ও অসহায় করে তোলে। এগুলি কি 'আইন' না আইনের নামে তামাসা? এ সমস্ত বেআইনি আইনের বিরুদ্ধে আজ লড়াই শুরু হয়েছে। বস্তুত, বহু সমাজে এই বেআইনি আইনের শাসন বহাল রয়েছে। যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল, তারা সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে হয়তো একটা আইন প্রণয়ন করেছে এবং বলেছে সকলকে সেই আইন মেনে চলতে হবে। এমন যেসব আইন বা নিয়ম-কানুন, তার বিরুদ্ধে আজ প্রতিবাদ হচ্ছে। সে প্রতিবাদ কখনও মৃদু, কখনও বা তীব্র। এই স্বেচ্ছাচারী, চূড়ান্ত অমানবিক আইনকে কেন্দ্র করেই অনেক দেশে বিপ্লবের জন্ম হয়েছে।

ফরাসী বিপ্লবের কথাই ধরুন। সে দেশের অভিজাত শ্রেণির মুষ্টিমেয় মানুষ এবং ক্যাথলিক চার্চ সাধারণ মানুষকে আইনের সাহায্য নিয়ে এমন নির্মমভাবে শোষণ করত যে তাদের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়েছিল। চার্চ ও অভিজাতশ্রেণিই তখন ফ্রান্সের হর্তাকর্তা বিধাতা। সমস্ত সম্পত্তি তাদেরই হাতে। সাধারণ মানুষের কথা বলার কোন ক্ষমতাই ছিল না। এই দুরবস্থা চরমে ওঠে চতুর্দশ লুই থেকে শুরু করে ষোড়শ লুই-এর রাজত্বকালে। কিন্তু এই সময়েই এমন কিছু বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ওদেশে জন্মেছিলেন যাঁরা আর চুপ করে থাকতে পারেননি। তাঁরা মানুষের অধিকারের কথা এমনভাবে বলতে লাগলেন যে সাধারণ মানুষ সচেতন হয়ে উঠল। তারই ফলশ্রুতি ১৭৮৯-এর বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী বিপ্লব যা ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিপ্লবের আগুন কয়েকদিনের মধ্যেই দেশের সবকিছু ওলোট-পালোট করে দিল। রাজা, রানী এবং হাজার হাজার অভিজাত মানুষ খুন হলেন; দেশের সমস্ত সম্পত্তি সাধারণ মানুষের করায়ত্ত হলো। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কারো আর কিছু রইল না।

বিপ্লবের আগে ফরাসী দেশের 'অবৈধ' আইনকানুনগুলি বৈধতার মুখোশ পরে থাকলেও পুরোপুরি নৈরাজ্যজনক ছিল। আমরা একটি কথা প্রায়শই বলে থাকি—'আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকার'। রাজনীতির ভাষায় কথাটি শুনতে ভালো। কিন্তু সে আইন যদি একপেশে হয়, তবে তার শুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়, কারণ তা কিছু ক্ষমতাবান লোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৈরি। সে আইনের বিরোধিতা আমরা করি। জনগণ যদি সে আইনের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে ধ্বংস হয়, তবে পুরনো, দুষ্ট আইন-ই বহাল থাকবে; আর তারা সফল হলে নতুন আইন তৈরি হবে যা আগের তুলনায় অনেক বেশি নৈতিক ও সকলের পক্ষে কল্যাণকর। নিখুঁত আইন কখনও কোন সমাজেই হবে না। কিন্তু আগের চেয়ে ভালো আইন তো হতেই পারে, যার সাহায্যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণচিন্তা সম্ভব।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, *আদর্শ সমাজ সেইটিই যেখানে ন্যায় ও আইন এক সূত্রে গ্রথিত।* আইনের অভাব নেই, কিন্তু অন্যায়ের ওপর ভিত্তি করেই অধিকাংশ আইন প্রণীত। সেই আইন কোন কাজের নয়। সমাজে ন্যায়নীতির ভাব জাগ্রত হলে তবেই আইন এবং ন্যায়ের সহাবস্থান সম্ভব। এটি হলে বুঝতে হবে সে সমাজ সুস্থ। ভারতে আজ অবিচার, অনাচারের যথেষ্ট দৌরাত্ম্য। তার কারণ আইন ওপরতলার কিছু মানুষের হাতের মুঠোয়। তারাই সব নিয়ন্ত্রণ করছে। দেশের মানুষকে তাই নিজেদের মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। গণতন্ত্রে নাগরিকদের সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিরাট রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক সংঘর্ষ ছাড়াই আমরা এদেশে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করেছি। এখন দরকার একটু সচেতনার। কোথাও অন্যায় দেখলেই ঐক্যবদ্ধভাবে তার প্রতিবাদ করতে হবে। এই সচেতন প্রয়াসই সমাজে ন্যায়নীতি বা *ধর্ম*-কে রক্ষা করতে পারে। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, একথা আমরা সকলেই জানি; অতএব একটা জায়গায় আমাকে থামতে হবে। প্রত্যেক মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা আছে—সে স্বাধীনতাকে আমি সম্মান করব। এই মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে তবেই সমাজ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। দেশের বর্তমান সমাজ এই লক্ষ্য থেকে এখনও বহু দূরে। এর জন্য উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা চাই, যে-শিক্ষা দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলবে, যে শিক্ষা বলে দেবে সমাজে আমার ভূমিকা কী। সমাজ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন নই। আমি নাগরিক; তাই আমার একটা দায়িত্ব আছে। পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ মানুষের মধ্যেও যদি এই সচেতনতা আসে তাহলে দেশের চেহারা একেবারে বদলে যাবে। আজ

ভারতবর্ষের শতকরা এক ভাগ লোকের মধ্যেও এই চেতনা আছে কিনা সন্দেহ। আমরা শুধু বয়সের হিসাবেই নাগরিক। শরীরের একটা নির্দিষ্ট বয়স হলেই তখন নাগরিক হওয়া যায়। কিন্তু মন? নাগরিক হবার উপযুক্ত মন তো এখনও তৈরি হয়নি আমাদের; সমাজ থেকে অন্যায় ও অবিচার দূর করার সদিচ্ছা তো এখনও জাগেনি; নিজেদের কাঁধে সে দায়িত্ব তুলে নেবার কথা একবারও তো মনে হয় না আমাদের। অথচ এই দৃষ্টিভঙ্গিই গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একজনকে যথার্থ নাগরিক করে তোলে।

শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে বলছেন ঃ *তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণম্ তে। শাস্ত্র*-কে তোমার পথপ্রদর্শকরূপে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সংবিধানে আপত্তিকর তেমন কিছু নেই, কিন্তু এর রূপায়ণ অতি কদর্য। সংবিধানে জাতিভেদ দূরীকরণ, অস্পৃশ্যতা নিবারণের মতো উচ্চ মানবিক আদর্শ সবই আছে। এরকম শাস্ত্রকে অবশ্যই আমরা সম্মান করতে পারি, কিন্তু যেভাবে এই মহৎ আদর্শগুলি রূপায়িত হয়ে থাকে, তাতে ষোলো আনাই গলদ। ফলে প্রকৃত সাম্য, সত্যিকারের ন্যায়বিচার সমাজে নেই। এর একমাত্র প্রতিকার সতর্ক সচেতনতা, এমনকিছু দায়িত্ব-সচেতন, সমাজ-সচেতন মানুষের আজ বড় প্রয়োজন যাঁরা অন্যায় ও অঘটন দেখলেই রুখে দাঁড়াবেন। এটি এখন আমাদের মস্ত দায়িত্ব। গীতার শিক্ষা যেমন একদিকে মানুষকে তার আন্তরজীবন গঠনে উৎসাহিত করে, তেমনি অন্যদিকে তার বাইরের জীবনটিকেও সুষমভাবে গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে *যোগ*-এর কথা বলা হয়েছে, তাতে বহির্জীবনের কর্মদক্ষতা ও অন্তর্জীবনের আধ্যাত্মিক বিকাশ, এই দুটি দিকই স্থান পেয়েছে। কপট ও দুরভিসন্ধিমূলক সমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবগুলি অনুশীলন করা বড়ই কঠিন। তা করতে হলে সামাজিক সুস্থিরতা চাই। এই কারণেই জনসাধারণের বোঝা দরকার দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য বলতে ঠিক কী বোঝায় এবং কীভাবে তারা সেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সচেষ্ট হতে পারে। এইরকম সমাজ তৈরি হলে তবেই মানুষ খুব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে *পরস্পর ভাব* বা 'পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতার' কথা বলা হয়েছে। এই ভাবের ওপর ভিত্তি করে যে সমাজ গড়ে ওঠে, তা কতই না সুন্দর, কত না আকাঙ্ক্ষিত! আগামী দিনে এই সমাজই আমাদের লক্ষ্য। গণতন্ত্র আমাদের কাছে আজ একটা রাজনৈতিক ধারণামাত্র। কিন্তু এই ধারণাটিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরেও সম্প্রসারিত করতে হবে। গণতন্ত্র সম্পর্কে এই বিস্তীর্ণ চেতনা সমাজকে সর্বোচ্চ

আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভারতীয় গণতন্ত্রের এই আধ্যাত্মিক সৌরভ, এই আধ্যাত্মিক অভিমুখীনতা আজ একান্ত প্রয়োজন। ভারতীয় গণতন্ত্রের এই বিকাশ তার শাশ্বত অধ্যাত্ম পরম্পরার সঙ্গে খুবই মানানসই হবে, সন্দেহ নেই। এই কাজটি ভারতের মানুষকে করতে হবে।

The Eternal Values for a Changing Society-নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত আমার প্রথম বক্তৃতাটির শিরোনাম 'Enlightened Citizenship and Our Democracy'। মার্জিত নাগরিকত্ব এবং আমাদের গণতন্ত্র বিষয়ে আলোচনা সেখানে স্থান পেয়েছে। চতুর্থ খণ্ডের নাম দেওয়া হয়েছে 'Total Human Development Through Democracy'। Total development বা পূর্ণ বিকাশ কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উন্নতি বলতে আমরা টাকাকড়ি, আরাম এবং বেশি, আরো বেশি ভোগের জিনিসই বুঝি। হ্যাঁ, সেটাও এক ধরনের উন্নতি বটে; তবে খুবই সাধারণ মানের উন্নতি। তার দ্বারা তো আর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধগুলি জাগ্রত হবে না, তার দ্বারা তো আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব হবে না। আর তা না হলে মানুষের পূর্ণবিকাশ হবে কী করে? পূর্ণ বিকাশের জন্য যেমন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শারীরিক উন্নতি প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির। তার জন্য দরকার বৈদান্তিক ভাবনার আশ্রয় নেওয়া। 'Enlightened Citizenship and Our Democracy' শীর্ষক বক্তৃতায় আমি এসব কথাই বলেছি।

শাস্ত্র নিয়ে অনেক কথা বলা হলো। এখন আসছি শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ *জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং,* 'শাস্ত্র যে বিধি ও নিষেধের কথা বলেছেন, তা জেনে'; *কর্ম কর্তুমিহার্হসি,* 'সেই আলোয় কর্ম করবে'। অর্থাৎ শাস্ত্র যা বলছেন, তা বুঝে তুমি তোমার কর্তব্য করবে। মনে করুন, আমি দেখলাম পথে একজন শক্তিশালী, বিত্তবান মানুষ একজন গরিবের ওপর অত্যাচার করছে। এক্ষেত্রে আমাদের শাস্ত্র বা সংবিধান আমাকে কী বলছে? বলছে—তুমি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ কর। তা যদি করি, তবেই আমার *শাস্ত্র* অনুযায়ী কাজ করা হলো। ঠিক সেইরকম, আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও শাস্ত্র বলছে—লোভী হয়ো না। তা যদি হও তাহলে তুমি তোমার চরিত্র হারাবে। তোমার পতন হবে। কেন? তার উত্তর এই, লোভের জীবন আর চরিত্র, দুটো একসঙ্গে হয় না। একটি আরেকটির বিরোধী। আপনি যদি উন্নত চরিত্রের মানুষ হতে চান, তাহলে লোভ আপনাকে বিসর্জন দিতে হবে। আমরা সকলেই ভালো

চরিত্রের মানুষ হতে চাই; এবং সেইজন্যই ভোগ্যবস্তুর জন্য উন্মত্ততা আমাদের দমন করতে হবে। এখানে যে *শাস্ত্রকে* অনুসরণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এইভাবেই তার তাৎপর্য বুঝতে হবে। আমাদের সংবিধানে কি আছে তা আমাদের সকলের অবশ্যই জানা চাই। যে ছাত্র তার দেশের সংবিধানের ব্যাপারে কিছুই জানে না, সে আর কিসের শিক্ষিত? কী শিক্ষা সে পাচ্ছে? গীতার জ্ঞানের সঙ্গে যদি আমরা নিজের নিজের দেশের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংবিধানের জ্ঞানটিকে মিশিয়ে নিতে পারি, তবে সেই সমন্বিত, সুসংহত জ্ঞান প্রত্যেক নাগরিককে মানবিক বিকাশের উচ্চতর স্তরে, অর্থাৎ পূর্ণতার লক্ষ্যে নিয়ে যাবে।

ইতি দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগ যোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

'দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগ যোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত'।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

ত্রিবিধ শ্রদ্ধা সম্পর্কে অনুসন্ধান

গত রবিবার আমরা গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করেছি। সেখানে শেষের শ্লোকটিতে বলা হয়েছে ঃ *তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণম্ তে কার্যাকার্য ব্যবস্থিতৌ,* 'সকল আচরণ ও কাজে তুমি শাস্ত্রের ওপর নির্ভর কর'। এ কথা বলার কারণ, *শাস্ত্র* হচ্ছে বিজ্ঞান। দেহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেমন শরীরবিজ্ঞান, অন্তর্জীবনের জন্য তেমনি অধ্যাত্মবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র। খাদ্য নির্বাচনের ব্যাপারে যেমন আপনারা খাদ্যবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করেন, তেমনি অন্তর্জীবনকেও পুষ্ট করার জন্য আপনাদের শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করতে হবে, কারণ শাস্ত্রের মধ্যে জীবনের পথনির্দেশ আছে। এতেই আপনার কল্যাণ নিহিত। দেহের কোন অঙ্গের প্রতি দুর্ব্যবহার করলে, সে বিদ্রোহ করবে; তখন আর সে আপনাকে সাহায্য করবে না। তাই দেহবিজ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্রের বিধান মেনে আপনাকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। এটি যেমন আপনাকে করতে হয়, ঠিক তেমনি অন্তর্জীবন অর্থাৎ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সুরক্ষার জন্যও আপনাকে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। জীবনে কি করা উচিত, আর কি নয়—তা অধ্যাত্মবিজ্ঞানই বলে দেয়। এটিই ছিল ষোড়শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের উপদেশ।

এই প্রসঙ্গে গত রবিবার আমি এও বলেছিলাম যে, সব লিখিত গ্রন্থই *শাস্ত্র* নয়। শাস্ত্রের সেই সব অংশ, যা যুক্তিগ্রাহ্য এবং যা কারো অকল্যাণ করে না, কেবল সেই অংশগুলিরই শাস্ত্রীয় মূল্য আছে এবং সেগুলিই গ্রাহ্য। কোন *শাস্ত্র* যদি আপনাকে মানুষ খুন করতে বলে, তাহলে সেই নির্দেশ গ্রহণীয় নয়। কোন কোন শাস্ত্রে এমন কথা থাকলেও থাকতে পারে। কেবল সেই শাস্ত্রই *শাস্ত্র* বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান পদবাচ্য, যা আপনার আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়তা করে *এবং* অন্যেরও কল্যাণ করে। জড় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা সেই সব বিজ্ঞানবিষয়ক শাস্ত্রের সাহায্য নিই। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমাদের তাই প্রকৃত

অধ্যাত্মশাস্ত্রের শরণাপন্ন হতে হবে। জড় বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞান—দুটিই চাই। দুটিকেই তাদের নিজের নিজের ক্ষেত্রে অনুসরণ করুন। তাহলে আপনারও মঙ্গল, জগতেরও কল্যাণ।

এখন অর্জুনের একটি প্রশ্ন দিয়ে সপ্তদশ অধ্যায় শুরু হচ্ছে।

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১॥

অর্জুন বললেন—'হে কৃষ্ণ, যাঁরা শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে যজ্ঞ করেন, তাঁদের নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক?'

এই অধ্যায়ে *সত্ত্ব, রজঃ* এবং *তমঃ,* এই তিনটি *গুণ*-এর দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জীবন ও কার্যকলাপ আলোচিত হয়েছে। আপনারা পূজাই করুন বা খাওয়া দাওয়াই করুন অথবা যজ্ঞই করুন, দেখবেন এ-সব ব্যাপারে মানুষে-মানুষে কত প্রভেদ! এই যে পার্থক্য, তা ঐ *সত্ত্ব, রজঃ* এবং *তমঃ,* তিনটি গুণের জন্য। সেই কারণে, শেষ কয়েকটি শ্লোক বাদ দিলে, এই অধ্যায়ের প্রায় সবটুকু জুড়েই তিনগুণের আলোচনা। অর্জুন তাই জিজ্ঞাসা করছেন ঃ কেউ হয়তো কোন শাস্ত্রের ধার ধারেন না, অথচ হৃদয়ের শ্রদ্ধা দিয়ে তিনি পুজো-অর্চা করছেন, এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির জীবনের প্রকৃতিটি কী? তিনি কি *সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক? তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ,* 'হে কৃষ্ণ, সেই ব্যক্তির নিষ্ঠা কীরকম'; *সত্ত্বমাহো রজস্তম্, 'সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক?'* এটিই অর্জুনের প্রশ্ন।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২॥

শ্রীভগবান বললেন—'দেহধারী জীবের *শ্রদ্ধা* ত্রিবিধ যা তাদের *সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক* প্রকৃতি থেকে জাত। তা (আমার কাছে) শোন।'

মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভারতবর্ষে কী গভীর অনুসন্ধান হয়েছে তা শ্রীকৃষ্ণের এই কথা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। মানুষের মন, মনের ওপর ক্রিয়াশীল বিভিন্ন

শক্তি এবং কর্ম ও ব্যবহারে সেই মন কিভাবে প্রকাশিত হয়, এ দেশের মনীষীরা তা গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। বাস্তবিক, মনকে জানা খুবই প্রয়োজন। ভারতীয় ঋষিরা তাই গোড়া থেকেই মনস্তত্ত্ব চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং তার পিছনে বহু সময় ব্যয় করেন। সাংখ্য দর্শন সেই চর্চা শুরু করেছিল; পরে বেদান্ত দর্শন তা আরো এগিয়ে নিয়ে যায়। এর ফলে মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারতের প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। আমরা ইন্দ্রিয়গুলির কার্যকলাপ গভীরভাবে অনুসন্ধান করে এই সত্য উপলব্ধি করেছি যে, মনই ইন্দ্রিয়গুলিকে চালায়। সেই উপলব্ধি থেকেই এ দেশে মনের চর্চা শুরু হয় এবং কালক্রমে তা উচ্চাঙ্গের মনোবিজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। পাশ্চাত্যেও মনোবিজ্ঞান ছিল, কিন্তু তা বহির্মুখী। তাকে বড়জোর ব্যবহারিক মনস্তত্ত্ব বলা যায়, কারণ তা মূলত বাইরে থেকে দেখা। ফ্রয়েড-এর আবির্ভাবে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে একটু গভীরতা এল, কারণ তিনি মানুষের মনের ভিতর একটু উঁকিঝুঁকি দিলেন। কিন্তু সেই মনের ভিতর তিনি কী দেখতে পেলেন? কেবল জঞ্জাল। হিংসা ও যৌনক্ষুধায় পরিপূর্ণ। ঐ সময় থেকেই পাশ্চাত্যে ব্যক্তিমনের গভীরে গিয়ে তাকে তলিয়ে দেখা শুরু হয় এবং দিন দিন এই অনুসন্ধান আরো গভীর থেকে গভীরতর স্তরে এগিয়ে চলেছে। ঐ সব দেশে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আজ মনোবিজ্ঞানের গবেষণা হচ্ছে এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে তা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে, যেমন মনোরোগবিদ্যা, মনঃসমীক্ষণ ইত্যাদি। এমনকি মানব-প্রকৃতি ও তার ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিশুদ্ধ এক বিজ্ঞান গড়ে তোলারও চেষ্টা সেখানে হচ্ছে। কিন্তু এই যে মনোরাজ্যে ডুব দেওয়ার পাশ্চাত্য প্রচেষ্টা, তার পিছনে প্রাচীন ভারতীয় মনীষার অবদান কিছু কম নয়। এখানে গীতাতেও দেখছি, সেই অসাধারণ মনোবিশ্লেষণ চলেছে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন ঃ তুমি *শ্রদ্ধা*-র কথা বলছিলে। যে শাস্ত্রবিধি অগ্রাহ্য করেও শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করে, সে উপাসনার প্রকৃতিটি কী তা তুমি জানতে চাইছ। তাহলে শোন ঃ *ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা,* 'শ্রদ্ধা তিন রকমের'; দেহিনাম্, 'মানুষদের'। এখানে মানুষকে বোঝাতে গিয়ে একটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটি *'দেহী'* অর্থাৎ 'যার দেহ আছে।' *দেহ* মানে 'শরীর' এবং 'যিনি শরীরের মধ্যে বাস করেন', তিনি *দেহী।* আমরা যেমন বলি *গৃহী* বা গৃহস্থ। 'যিনি *গৃহ* অথবা বাড়িতে বাস করেন', তিনিই *গৃহী।* তেমনি শরীরটাও তো একটা *গৃহ*। কার গৃহ? যিনি দেহের ভিতর থাকেন, তাঁর। *দেহী* বলতে এখানে তাঁকেই বোঝানো হচ্ছে। আপনি তো আর দেহ *নন;* আপনি দেহের

মধ্যে বাস করছেন, এই যা। হয় আপনি দেহটিকে চালাচ্ছেন, নয় আপনি দেহের দ্বারা চালিত হচ্ছেন। এখানে তাই একটি বিশেষ পরিভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে— 'স্বভাবজা', অর্থাৎ 'স্বভাবজাত'। *সা শ্রদ্ধা,* 'সেই শ্রদ্ধা' তিন রকম। আগের আগের অধ্যায়ে *স্বভাব* শব্দটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। স্বভাব মানে সংস্কার যা প্রত্যেকেরই নিজস্ব। একটি মনের সঙ্গে আর একটি মনের কত না তফাৎ। কত রকমেরই না মন আছে। অতীত অভিজ্ঞতা, অতীত কর্ম, জগতের সঙ্গে বহুরকম ঘাত প্রতিঘাত—এসব নিয়েই আমাদের মন গড়ে ওঠে এবং আকারিত হয়। মনের এই অবস্থাটিকেই স্বভাব বা 'আপনার নিজস্ব প্রকৃতি' বলে। ভবিষ্যতে এই প্রকৃতিকে আপনি পাল্টাতে পারেন, শোধরাতে পারেন আবার নিচেও নামতে পারেন; কিন্তু এখন তাকে যেমন বা যে অবস্থায় দেখছেন, সে তাই। মনোবিদ ম্যাকডুগাল (McDougall) একেই 'disposition', অর্থাৎ ধাত বা প্রবণতা বলেছেন। ভবিষ্যতে অনেক কিছুই ঘটতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার ধাতটি 'এইরকম'। মনের এই স্থিতিকেই *স্বভাব* বলে এবং সেই *স্বভাব* থেকেই *শ্রদ্ধা* জন্ম নেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, *শ্রদ্ধা স্বভাব* দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সেই কারণেই তাকে বলা হচ্ছে *স্বভাবজ,* 'নিজের প্রকৃতি বা স্বভাবজাত'। তিনরকম *শ্রদ্ধা* কী কী? *সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চ ইতি তাং শৃণু, 'সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, রাজসী শ্রদ্ধা এবং তামসী শ্রদ্ধা'। তাং শৃণু,* শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'তাদের বিষয় আমার কাছ থেকে শোন'।

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ।। ৩।।

—'হে ভারত [অর্জুন], প্রত্যেকের *শ্রদ্ধা* তার সংস্কার অনুযায়ী হয়। এই জীব শ্রদ্ধাপূর্ণ। যিনি যেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তিনি তেমনই।'

এই শ্লোকে সাধারণভাবে মানুষ সম্পর্কে আর একটি কথা বলা হচ্ছে। কথাটি কী? *সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি,* 'প্রত্যেক মানুষের *শ্রদ্ধা* তার মনের সংস্কার অনুযায়ীই হবে।' কারো মনের সংস্কার যদি আর একজনের সংস্কার থেকে আলাদা হয়, তবে তার শ্রদ্ধাও অন্যধরনের হতে বাধ্য। তাই বলা হচ্ছে, *সত্ত্বানুরূপা,* 'ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতি অনুযায়ী'; শ্রদ্ধা ভবতি, 'শ্রদ্ধা হয়'। প্রত্যেকের শ্রদ্ধা তার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ীই হবে।

এরপর বলা হয়েছে *শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো,* '*শ্রদ্ধা* যেমন, এই পুরুষও

তেমন'। অর্থাৎ, যার ভিতর যেমন *শ্রদ্ধা,* তার প্রকৃতিটিও সেইরকম। *যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ,* 'বাস্তব জীবনে যিনি যেমন, সে তাঁর শ্রদ্ধার অনুরূপ।' তাহলে দেখতে পাচ্ছি মানুষের মনের গঠন কী বিচিত্র! সংস্কার এবং শ্রদ্ধা এই দুটি জিনিস কতটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতিটি কর্মেই আপনার সংস্কার এবং শ্রদ্ধা প্রতিফলিত হবে। তাই আমাদের ভিতর যাঁর যেমন শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধার দ্বারাই আমরা চালিত হব। এতে আর আশ্চর্য কী? পরের শ্লোকে '*শ্রদ্ধা* যেমন, এই পুরুষও তেমন', এই ভাবটিকে শ্রীকৃষ্ণ আরো বিস্তার করছেন। বলছেন ঃ

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪॥

—'*সাত্ত্বিকরা* দেবগণকে পূজা করেন; *রাজসিক*-রা যক্ষ ও রাক্ষসগণকে পূজা করেন; অন্য ব্যক্তিরা—*তামসিক-রা*—প্রেত ও ভূতগণের পূজা করেন।'

মনে করুন ধর্মের নামে কেউ কিছু করছেন। লক্ষ্য করলেই দেখবেন সেই কর্মের পিছনে এক ধরনের *শ্রদ্ধা* রয়েছে। মানুষে মানুষে এই শ্রদ্ধার তারতম্য ঘটে, তার কারণ সংস্কার বা মানসিক গঠন অথবা স্বভাবের বিভিন্নতা। *সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক—শ্রদ্ধা* এই তিন রকম। যেমন ব্যক্তির *স্বভাব* হবে, অধ্যাত্মজীবনে, পূজা-অর্চনায় এবং পূজ্য বস্তুর প্রতি তাঁর *শ্রদ্ধা-ও* সেই ধরনের হবে।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্, 'সাত্ত্বিক মানুষ মঙ্গলময়, শ্রেষ্ঠ দেবতাদের পূজা করেন'। সত্ত্বগুণসম্পন্ন হওয়ার জন্যই তাঁদের এই প্রবণতা। *যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ,* 'যাঁদের *শ্রদ্ধা রাজসিক,* তাঁরা যক্ষ ও রাক্ষসদের পূজা করেন', অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত সত্তার আরাধনা করে থাকেন। এই সব সত্তা অতি ভয়ঙ্কর এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ। এই কারণেই রাক্ষসদের পৈশাচিক বলা হয়। এদের পূজা করাই *রাজসিক* ব্যক্তিদের পছন্দ এবং প্রবণতা। *প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসাঃ জনাঃ,* আবার 'যাঁদের মন *তামসিক,* তাঁরা ভূতপ্রেতের পূজা করতে ভালবাসেন।' পিশাচের এবং পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মার অর্চনা তাঁদের খুব পছন্দ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যাঁর যেমন ধাত, তাঁর তেমন পূজা। শুধু পূজা কেন, *প্রত্যেক* কাজেই ব্যক্তির এই রুচি ও প্রকৃতির ছাপ পড়ে। যেমন ধরুন তপস্যা ও দান। সে সব কাজেও প্রবণতার প্রভাব সুস্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ পরে দৃষ্টান্ত দিয়ে এ কথা

বলবেন। আপাতত এই শ্লোকে আমাদের বাহ্য কর্ম ও আচরণের ওপর প্রবণতার প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ পূজার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আসলে মনটাই কাজ করে। মন *সাত্ত্বিক* হলে কাজও *সাত্ত্বিক* হবে। মন *রাজসিক* হলে কাজও রাজসিক হয়। আর মন যদি *তামসিক* হয়, তাহলে কাজকর্মও *তামসিক* হতে বাধ্য। এ কথার তাৎপর্য এই, আপনার মনের প্রবণতাটি লক্ষ্য করুন এবং তাকে আরো উন্নত করুন। বাইরে থেকে পৃথকভাবে কাজের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করে লাভ নেই; *তার চেয়ে যে শক্তি আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করে, সেই শক্তিকে মার্জিত করুন।* মানুষের জীবনে এ কথার ব্যঞ্জনা অত্যন্ত গভীর।

অনেকদিন আগে একখানা ইংরেজি বই পড়েছিলাম। তাতে বলা হয়েছে মানুষ তার মন্দ কাজকে ভালো কাজে রূপান্তরিত করতে পারে; তার জন্য তার মানসিকতা পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে সে তো আবার খারাপ কাজ শুরু করতে পারে! এখন হয়তো আপনি খারাপ কাজ করছেন না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় ভবিষ্যতে আপনি তা করবেন না; কারণ মনের মন্দ সংস্কার, যা সকল কর্মের মূল, তা তো অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। তাই, এসব কোন কাজের কথা নয়। যেখান থেকে কর্মের উৎপত্তি, সেই শিকড়টাকে ধরুন। সেই শিকড়টা কী? সেটি আমাদের 'মানসিক সংস্কার বা প্রবণতা'। তাকে মার্জিত করে, শোধন করে, উচ্চ স্তরে ওঠান—প্রথমে *তমো* থেকে *রজে*, তারপর সেখান থেকে *সত্ত্বে।* এইভাবে এগোলে তবেই স্থায়ী একটা চরিত্র তৈরি হয়। তা না হলে, পাঁচ মিনিট আপনি ভালো সেজে থাকলেন, খুব দান-ধ্যান করলেন। কিন্তু তারপরই আবার দুর্দান্ত হয়ে উঠে মানুষ খুন করলেন। এটা সম্ভব, কারণ আপনার মূল প্রকৃতি তো বদলায়নি। আর প্রকৃতিই মানুষকে ভালো বা মন্দ কর্মে প্রবৃত্ত করে। শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলে দিলেন যে, মানসিক প্রবণতাই *শ্রদ্ধা*-র ভিত্তি। অতএব, *কেবল* এটা না করা, ওটা না করার থেকেও যেটা বড় কথা, তা হলো মানসিক প্রবণতার গতিপথ বদলে দেওয়া, তাকে ঊর্ধ্বমুখী করা। মনের সঙ্গে এই লড়াই চালাতেই হবে। শিশুদের ক্ষেত্রেও এই শিক্ষাটি মনে রাখতে হবে। 'এটা করবে না, ওটা করবে না'—তাদের এসব বলে কোন লাভ নেই। যে মন অনভিপ্রেত কাজের উৎস, তাদের সেই মনটিকে ক্রমশ শুদ্ধ করে তুলতে হবে, উচ্চ ভূমিতে তুলে দিতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে,* তামসিক ব্যক্তিরা 'ভূত এবং প্রেতাত্মার পূজা করে'।

অনেক ধর্মে ও বহু সমাজেই এই ধরনের পূজার্চনা চালু আছে। আমাদেরও ছিল। কিন্তু মহান আচার্যরা এসে আমাদের মহত্তর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের অতীত কার্যকলাপের নিন্দা না করে তাঁরা শুধু দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা যা করি তার চেয়েও প্রকৃষ্ট, মহৎ বস্তু আছে। শুধু নিন্দা করে কাউকে তাঁর কর্ম থেকে নিবৃত্ত করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন তাকে শিক্ষার আলো দেওয়া। ভারতবর্ষে ঠিক তাই হয়েছিল। সবই হয়তো পথ, কিন্তু উৎকৃষ্টতর, শুদ্ধতর পথও তো আছে। সেটিকে বেছে নেব না কেন? শ্রীকৃষ্ণ এখন *তপস্* অর্থাৎ তপস্যার কথা বলবেন।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

—'দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত এবং কামনা ও আসক্তিরূপ শক্তিতে বলান্বিত হয়ে যে সব ব্যক্তিরা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘোর তপস্যা করে...'

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তপস্যা বিষয়ে বলছেন। প্রকৃত তপস্যা কী, তা শঙ্করাচার্য *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্* ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন। *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি* থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি তপস্যার অনবদ্য এক সংজ্ঞা দিয়েছেন। সেই শ্লোকে বলা হচ্ছে—*মনসশ্চ ইন্দ্রিয়াণাঞ্চৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ,* 'ইন্দ্রিয়গুলির এবং মনের শক্তির একাগ্রতাই পরম *তপস্যা* বলে কথিত।' সব সাফল্যের মূলেই এই *তপস্যা। তপস্যা* ছাড়া কোন বড় কাজ হতে পারে না। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্* তাই বলেছেন, *তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব,* 'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে [অর্থাৎ পরম সত্যকে] জানো'। এখানে গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ তপস্যার কথা বলছেন। শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক এই তিনরকমের তপস্যার কথাই তিনি আলোচনা করবেন।

তপস্যা বলতে সাধারণত আমরা দৈহিক 'কঠোরতাই' বুঝি, কিন্তু বেদান্তে এর তাৎপর্য আরো গভীর। বেদান্ত বলে, শুধু শরীরকে নিগ্রহ করলেই হবে না, বাক্য ও মনের সংযমও চাই; অর্থাৎ বাচিক ও মানসিক তপস্যাও চাই। যেমন ধরুন, আমার মন নিচে নামছে এবং আমি তাকে ওপরে টেনে তোলার চেষ্টা করছি, সেইটিই প্রকৃত *তপস্যা।* আবার হয়তো ভিতরে ভিতরে স্বার্থবুদ্ধি

জেগে উঠছে এবং আমি তা টের পেয়ে শাসনের সুরে বলছি—'না, আমি তোমাকে আসতে দেব না।' এই ধরনের সতর্কতা, যা মনকে সর্বদা একটা উচ্চভূমিতে স্থির থাকতে সাহায্য করে, সেটিই মানসিক *তপস্যা। একে জ্ঞান-তপস্যা-*ও বলে। এই তপস্যা বেশি লোক করেন না। তাঁরা অন্যান্য তপস্যাদি করে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ এই জাতীয় তপস্যাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন—*সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক* । সকলের জন্য এক তপস্যা নয়। সংস্কার বা মানসিক প্রবণতা অনুসারে মানুষ নানারকম তপস্যা করে থাকে।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ, 'যারা শাস্ত্রবিরুদ্ধ অর্থাৎ অধ্যাত্মবিজ্ঞান বিরোধী ঘোর তপস্যা করে'; *দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ, 'দম্ভ ও অহংকার-যুক্ত* হয়ে'; অর্থাৎ তাদের তপস্যার পিছনে দম্ভ ও অহংকার থাকে। তপস্যার উদ্দেশ্য দম্ভ ও অহংকার নির্মূল করা। কিন্তু এ জাতীয় তপস্যার ফলে তাদের ঐ দুটি জিনিসই বেড়ে যায়। *কাম রাগ বলান্বিতাঃ, 'কাম* অথবা কামনা এবং *রাগ* অথবা আসক্তিতে বলীয়ান হয়ে' তারা এই তপস্যা করে। তাদের তপস্যা কামনা ও আসক্তিতে পরিপূর্ণ। সংসারী মানুষও এরকম করে এবং এই আচরণের পিছনে এক ধরনের মনোভাব নিহিত, যা থেকে তমোগুণ এবং রজোগুণের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়।

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ।। ৬।।

—'নির্বোধ তারা, দেহস্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে এবং দেহের অন্তর্বর্তী [আত্মস্বরূপ] আমাকে কষ্ট দেয়; তাদের আসুরব্রতধারী বলে জানবে।'

কর্শয়ন্তঃ, 'যে নিজের শরীরকে প্রভূত কষ্ট দেয়', যে কষ্ট দেবার প্রয়োজন নেই; *শরীরস্থং ভূতগ্রামম্ অচেতসঃ,* তারা 'নির্বোধের মতো দেহের ইন্দ্রিয়গুলিকে' ক্লিষ্ট করে। আর লোকে ভাবে তারা সর্বদা *তপস্যা* করছে! *মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং,* 'হৃদয়ে অবস্থিত আমাকেও তারা পীড়া দেয়'; *তান্ বিদ্ধি আসুর নিশ্চয়ান্,* 'এই ধরনের মানুষকে *আসুরিক* ব্রতধারী বলে জেনো।' তারা মোটেই সাত্ত্বিক নয়। এই ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমরা অনেক সমাজেই দেখতে পাই। এমনকি আধুনিকতার পীঠস্থান আমেরিকাতেও বহু লোক এই জাতীয় আচার-অনুষ্ঠান করে থাকে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, বছর দশেক আগে এক আমেরিকান গুরুর আটশো চেলা মেক্সিকোয় গিয়ে আত্মহত্যা করে। ওটিও

এক ধরনের তপস্যা, যদিও অর্থহীন। এরকম লোক সর্বত্রই আছে, আমাদের নিজেদের সমাজেও এমন তপস্বীর কিছু কমতি নেই। কিন্তু এই জাতীয় তপস্যা *শাস্ত্র বিহিতম্* অর্থাৎ শাস্ত্র অনুমোদিত নয়। এর দ্বারা তারা সকলেরই দুর্ভোগ ডেকে আনে। এই হলো *আসুরী* প্রকৃতির তপস্যা। তারপর,

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭॥

—'সকলের প্রিয় আহারও তিন রকমের; এবং যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও [তাই]। তাদের প্রভেদ শোন।'

সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক, মনের এই তিন প্রবণতার ভিত্তিতে খাদ্যের ব্যাপারেও পছন্দ সব আলাদা। *আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ,* 'তিন ধরনের মানুষের তিনরকম আহার পছন্দ'। *যজ্ঞঃ,* 'যজ্ঞ'; *তপস্,* 'তপস্যা'; *তথা দানং,* 'এবং দান'-এর ব্যাপারেও তাই। যাঁরা যজ্ঞ করেন, তাঁদের মধ্যে যেমন *সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক,* এই তিন প্রকৃতির মানুষ আছেন, তেমনি যাঁরা তপস্যা করেন আমরা দেখেছি, তাঁদের মধ্যে এই পার্থক্য বিদ্যমান। দানের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। *তেষাং ভেদমিমং শৃণু,* 'আমার কাছ থেকে তাদের প্রভেদ শোন'। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি তোমার কাছে ব্যাখ্যা করছি।' *দান* বলুন, *তপস্যা* বলুন, *যজ্ঞ* বলুন, এমনকি দৈনন্দিন *আহার*-এর ব্যাপারেও লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সব কাজের পিছনে আছে মন। *এটি জানা একান্ত প্রয়োজন।* আমরা সকলেই কাজ করি, কিন্তু রুচি, প্রবণতা, মন—সব আলাদা। মহাকবি ভাস-এর 'অভিমার' বলে একটি কবিতা আছে। আমি প্রায়শই তা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিই। তা হলো ঃ

প্রাজ্ঞস্য মূর্খস্য চ কার্য যোগে
সমত্বং অভ্যেতি তনুঃ ন বুদ্ধিঃ—

এর অর্থ ঃ 'একজন জ্ঞানী এবং একজন মূর্খ—দুজনেই কাজ করেন, দুজনার একইরকম দেহ। কিন্তু তাঁদের মন দুটি একেবারে আলাদা।'

প্রাজ্ঞ যিনি, তাঁর একধরনের মন, আর *মূর্খ* যে, তাঁর আর এক ধরনের, যদিও বাইরে থেকে দেখলে তাঁদের দেহ এবং দেহের কাজকর্ম সব একরকম। কিন্তু তলিয়ে বিচার করলে দেখতে পাই, মন এবং তার প্রতিক্রিয়াগুলিই আসল, কারণ সেগুলিই আমাদের চরিত্র গড়ে তোলে। তাই মনটিকে ঠিকমতো চালানো

চাই, তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া চাই। আমাদের শাস্ত্রগুলি এই বিষয়টির ওপর সব থেকে বেশি জোর দিয়েছে। সাধারণত মন নিয়ে আমরা অত ভাবি না, কর্মের মধ্যে পড়ে তার কি দশা হলো, তা আমরা খুঁটিয়ে দেখি না; আমাদের যত দুশ্চিন্তা কাজ নিয়ে। কিন্তু কাজের মধ্যে মনের ভিতর কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, সেটিও লক্ষ্য করা দরকার। তাই মনকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাচ্ছি, কিভাবে গড়ে তুলছি, সেটিই মস্ত প্রশ্ন। আমরা ভাবি কেবল বাইরের জগতেই বুঝি মনকে তৈরি করে। তা কিন্তু ঠিক নয়। আমাদের প্রত্যেক কর্মও মনকে গড়ে তোলে। আধুনিক রোবোগুলির কাজকর্ম কেবল বাইরের জগৎকেই প্রভাবিত করে। কিন্তু তাদের নিজেদের ভিতর কোন পরিবর্তন আসে না। রোবোর অন্তর্জগৎ বলে কিছু নেই। সে নিজেকে ভেঙেগড়ে নতুন করে গড়ে তুলতে পারে না। সে ক্ষমতা তার নেই। তাকে যেটুকু শক্তি দেওয়া হয়েছে, সে কেবল সেটুকুই খরচ করতে পারে। বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। এদিক থেকে সে অন্ধ। কিন্তু মানুষ তো আর যন্ত্র নয়। তার মন আছে, অন্তর্জগৎ আছে। তাকে সে শক্তিশালী করতে পারে, আবার দুর্বলও করতে পারে। ভালো অথবা মন্দ দুই করার শক্তিই তার আছে। তাই জীবনের সব কাজেই সচেতনভাবে মনের যত্ন নিতে হবে, দেখতে হবে সব কাজের মধ্য দিয়ে সে সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে কি না। *এটি গীতার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।* এই শিক্ষাকে কাজে লাগালে তবেই দৈনন্দিন জীবন ও কর্মের মাধ্যমে আমাদের চরিত্রবল ও কর্মদক্ষতা বাড়বে।

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ *সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক,* এই তিনরকমের আহারের কথা বললেন। কিন্তু লক্ষণীয়, আহারের প্রসঙ্গ করলেও কোন বিশেষ খাদ্য দ্রব্যের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এখানে কেবল খাদ্যের উৎকর্ষের কথাই বলা হয়েছে। আমরা আমাদের নিজেদের অভিরুচি অনুসারে খাদ্য নির্বাচন করে বলি—এটি *তামসিক, রাজসিক* অথবা *সাত্ত্বিক।* গীতা কিন্তু তা বলছেন না। শ্রীকৃষ্ণ এখানে কোন খাদ্যের নাম উচ্চারণ করছেন না। এত রকমের খাদ্য! তিনি কোন্‌টির নাম করবেন। একজনের কাছে যেটি খাদ্য, অন্যের কাছে সেটিই অখাদ্য বা বিষ। তাই কোন একটি বিশেষ খাদ্যদ্রব্যের নাম করে আপনি বলতে পারেন না—এটি *সাত্ত্বিক* খাদ্য। এই ভুলটি আমরা প্রায়শই করে থাকি এবং বলি যে, এই খাদ্য *সাত্ত্বিক,* এই খাদ্য *রাজসিক* বা এই খাদ্য *তামসিক।* যা কিছু মানুষের মনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে, কেবল তার ভিত্তিতেই তাদের রাজসিক, তামসিক অথবা সাত্ত্বিক আখ্যা দেওয়া যায়।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮॥

—'আয়ু, উদ্যম, শক্তি, স্বাস্থ্য, প্রসন্নতা, রুচিবর্ধক এবং সরস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর. মনোরম খাদ্যই সাত্ত্বিকদের প্রিয়।'

সাত্ত্বিক মানুষরা কয়েক ধরনের খাদ্য পছন্দ করেন। সেগুলি কী? না—নাম দিয়ে তাদের ঠিক বোঝান যাবে না, তাদের গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলিই আসল। তাই খাদ্যের তালিকা না দিয়ে এখানে শুধু তাদের বৈশিষ্ট্যগুলিই বলা হয়েছে। যে খাদ্য খেয়ে আপনার দেহ এবং মনে নিম্নলিখিত শুভ প্রতিক্রিয়াগুলি হবে, জানবেন সেগুলিই *সাত্ত্বিক* খাদ্য। যেমন, যে-সব খাবার *আয়ুঃ* অর্থাৎ 'পরমায়ু' বাড়ায়। যে খাদ্য খেয়ে আয়ু কমে যায়, তা *সাত্ত্বিক* নয়। দ্বিতীয়ত, যে খাবার খাবেন, তা খেয়ে যেন আপনি অনুভব করতে পারেন যে আপনার মধ্যে *সত্ত্ব* বা 'উদ্যম' আসছে। অর্থাৎ, খাদ্য আপনার দেহ ও মনকে যেন অনুপ্রাণিত করে। তৃতীয়ত, খাদ্য যেন আপনার শরীরে *বল* বা 'শক্তি' যোগায়। যে খাদ্যে এসব গুণ নেই তা *সাত্ত্বিক* মানুষদের উপযুক্ত নয়। এরপর আসছে *আরোগ্য* বা 'ব্যাধিশূন্যতা' এবং *সুখ,* অর্থাৎ 'প্রফুল্লতা'। খাদ্য খেয়ে যেন আপনি প্রসন্ন হতে পারেন—বিষণ্ণ, বিমর্ষ ও উদাসীন হলে চলবে না। যে খাদ্য মনে ঐসব ভাব জাগাবে, সে খাদ্য কোন কাজে আসবে না। শুধু তাই নয়, *সাত্ত্বিক* খাদ্য রুচিকর এবং রুচিবর্ধক হবে। বলা হচ্ছে *প্রীতিবিবর্ধনাঃ।* তা যদি হয়, তাহলে খেতে ভাল লাগে। তারপর *রস্যাঃ, সাত্ত্বিক* খাদ্য 'সরস' হবে; *স্নিগ্ধাঃ,* 'স্নিগ্ধ' হবে; *স্থিরা,* 'পুষ্টিকর' এবং *হৃদ্যা,* অর্থাৎ 'মনোরম' হবে। কোন খাবার দেখেই যদি অশ্রদ্ধা হয়, তবে *সাত্ত্বিক* ব্যক্তি তা গ্রহণ করেন না। *আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ,* 'এই জাতীয় খাদ্য সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা খুব পছন্দ করেন।' পরের দুটি শ্লোকে আরো দু-ধরনের খাদ্যের কথা বলা হবে। সেগুলি আলোচনা করলে *সাত্ত্বিক* খাদ্যের মহিমা আরো স্পষ্ট হবে।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯॥

—'যেসব খাদ্য তিক্ত, অম্ল, লবণাক্ত, ঝাল, অতি উষ্ণ, শুষ্ক, এবং অত্যন্ত প্রদাহকর এবং যা দুঃখ, শোক ও রোগের সৃষ্টি করে, সেগুলি *রাজসিক* ব্যক্তির প্রিয়।'

রাজসিক ব্যক্তি সেই সব খাদ্য পছন্দ করেন যা *কটু,* 'তেতো'; *অম্ল,* 'টক'; *লবণ,* 'নোনতা'; *অতি উষ্ণ,* 'মুখ পুড়ে যায় এমন গরম'; *তীক্ষ্ণ,* 'বিষ ঝাল'; *রুক্ষ,* 'শুকনো; এবং *বিদাহিনঃ,* 'প্রদাহকর'। এই জাতীয় খাদ্য *'দুঃখ, শোক* এবং *আময়* অর্থাৎ রোগ সৃষ্টি করে', *দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ।* এক আধবার আপনি গুরুপাক খাবার খেতে পারেন, কিন্তু রোজ রোজ খেলে আপনার পেটের অসুখ হতে পারে। পাকস্থলীর আবরণ অতি কোমল। নিত্য এই ধরনের গরগরে ঝাল-তেল-মশলাদার খাদ্য খেলে সেই আবরণ প্রদাহিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু *রাজসিক* ব্যক্তির এই ধরনের আহারই পছন্দ। এই ধরনের আহারের ক্ষতিকারক দিকগুলি সম্পর্কে হাজার লেকচার দিন, তিনি সেসব কথা কানেই তুলবেন না। কারণ তাঁর রুচিটাই ঐরকম। ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। একদল বাচ্চাকে তিনরকমের খাবার দিন। দেখবেন প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী পছন্দের খাবারটি তুলে নিচ্ছে। এর থেকেই আমরা একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসতে পারি। তা এই যে, এই ধরনের মানুষ হলে এইরকম খাদ্য পছন্দ করবেন।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

— '*তামসিক* ব্যক্তিদের প্রিয় সেই খাদ্য, যা অসিদ্ধ, রসকষহীন, দুর্গন্ধময়, বাসী, উচ্ছিষ্ট এবং অশুদ্ধ'।

যারা *তামসিক,* অর্থাৎ অত্যন্ত তমোভাবাপন্ন, তারা বেশি কাজকর্ম করতে চায় না। সংগ্রাম তাদের ধাতে নেই। এসব অলস প্রকৃতির মানুষ কী ধরনের আহার পছন্দ করে? বলা হচ্ছে, *যাতযামং,* এক প্রহর আগে রান্না করা ঠাণ্ডা, 'অসিদ্ধ' খাবার; *গতরসং,* 'বিস্বাদ'; *পূতি,* 'দুর্গন্ধময়'; *পর্যুষিতং,* 'আগের দিনের রান্না'; *উচ্ছিষ্টম্,* 'এঁটো'; এবং *অমেধ্যম্,* অর্থাৎ 'অপবিত্র' খাদ্য। *তামসিক* ব্যক্তিরা এই ধরনের খাবার পছন্দ করে, কারণ তারা কুঁড়ে—পরিশ্রম করতে চায় না। বিনা পরিশ্রমে যা পাওয়া যায়, সেটিই তাদের কাছে পরম উপাদেয়। এইটিই তাদের প্রবণতা।

তাহলে আমরা *সাত্ত্বিক, রাজসিক* এবং *তামসিক,* এই তিন শ্রেণির মানুষ এবং তাদের কি ধরনের খাদ্য পছন্দ, তা দেখলাম। একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, এখানে কিন্তু কোন বিশেষ খাদ্যের নাম করা হয়নি। শুধু

যেসব খাদ্য আমরা খাই, তাদের গুণগুলির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। *সাত্ত্বিক* মনের অধিকারী যাঁরা, তাঁরা পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেন। খেতে দিলে তাঁরা বলেন ঃ 'এটা পরিষ্কার তো?' খাদ্যের দিকে তাকালেই অবশ্য বোঝা যায় সেটি আমাকে টানছে কিনা।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদ্বিষ্টো য ইজ্যতে ।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

—'ফলাকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তিদের দ্বারা, বিধিসম্মতভাবে, কেবল যজ্ঞের ওপর মন স্থির করে যে *যজ্ঞ* অনুষ্ঠিত হয়, সেই *যজ্ঞ সাত্ত্বিক*।'

এবার শ্রীকৃষ্ণ *যজ্ঞ* প্রসঙ্গে আসছেন। তিনি বলছেন, তিন প্রকৃতির মানুষ তিনরকম যজ্ঞ করে থাকেন। *সাত্ত্বিক যজ্ঞ* সেইটিই যা নিষ্কাম ব্যক্তিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। নিষ্কাম ব্যক্তিদের বলা হচ্ছে *অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ*। আমি টাকাপয়সা রোজগারের জন্য *যজ্ঞ* করছি না, শুদ্ধ ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে *যজ্ঞ* করছি। যজ্ঞের ফল কামনা না করা—এখানে এই বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই যজ্ঞ *বিধিদৃষ্টো* হবে, অর্থাৎ 'শাস্ত্রসম্মত' হবে। শাস্ত্র যেমন বলছেন, সেভাবেই তাঁরা *যজ্ঞ* করবেন। শাস্ত্র কী বলছেন? *মনঃ সমাধায়,* 'কেবল যজ্ঞের ওপর মন নিবদ্ধ রেখে'; *যষ্টব্যম্ এব ইতি,* 'যজ্ঞের জন্যই *যজ্ঞ* করা কর্তব্য, এই মনোভাব নিয়ে।' এছাড়া যজ্ঞ করার অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁদের থাকে না। এই হলো সাত্ত্বিক মনের ধর্ম। *সাত্ত্বিক* মানুষ যে পূজাই করুন, তা এই ধরনেরই হবে।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

—'কিন্তু, হে অর্জুন, ফল আকাঙ্ক্ষা করে দম্ভ প্রকাশের জন্যই যে *যজ্ঞ* অনুষ্ঠিত হয়, জেনো, তা *রাজসিক*।'

এখন *রাজসিক* যজ্ঞের লক্ষণগুলি বর্ণনা করা হচ্ছে। *অভিসন্ধায় তু ফলম্,* 'ফল আকাঙ্ক্ষা করে' এই যজ্ঞ করা হয়। অর্থাৎ এই যজ্ঞের পিছনে আমার একটা অভিসন্ধি আছে; কোন কিছু লাভ করার জন্যই আমি যজ্ঞ করছি। আর কী লক্ষণ? এই যজ্ঞের মধ্যে লোক-দেখানো-ভাব বা 'দম্ভের' প্রকাশ থাকবে, *দম্ভার্থম্।* অর্থাৎ, যজ্ঞ দেখে লোক যেন বলতে বাধ্য হয়, 'হ্যাঁ, অমুক একটা

যজ্ঞ করল বটে!' এই বাহ্যিক ঠাটঠমক *রাজসিক* মনোভাবসম্পন্ন মানুষের কাছে খুব মূল্যবান। বিয়ে-থার সময় দেখেন না, কত জাঁকজমক? এর পিছনে একটাই মনোভাব—দেখ আমি কী বিরাট আয়োজন করেছি! আমার কত বিত্ত। সম্প্রতি কাগজে একটা বিয়ের খবর খুব ফলাও করে ছাপা হয়েছে। বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত সেই বিয়েতে নাকি পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এক একটা নিমন্ত্রণপত্রের খরচই পড়েছে পনেরো (?) টাকা! এই হলো দম্ভের অভিব্যক্তি।

রাজসিক মনেই এই জাতীয় দম্ভ স্থান পায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এই মন নিজেকে জাহির করবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ *রাজসিক* ভক্ত গরদের ধুতি আর গলায় সোনার চেন ঝুলিয়ে পুজো করতে বসবে। ভগবানের কাছে এসব অর্থহীন হলেও *রাজসিক* ভক্ত ঐভাবেই তাঁর পুজো করবে; তার ভিতরের *শ্রদ্ধা* তাকে ঐভাবে পুজো করতে বাধ্য করবে। না করে সে পারবে না। এই গেল *রাজসিক* যজ্ঞের কথা।

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩॥

—'শাস্ত্রবিধিশূন্য, অন্নদানবিহীন, মন্ত্রবর্জিত, দক্ষিণাবিহীন এবং শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞকে *তামসিক* বলা হয়।'

এবার আসছে *তামসিক* যজ্ঞের কথা। তার লক্ষণগুলি কী? বলা হচ্ছে, *বিধিহীনম্*, 'শাস্ত্রবিধিশূন্য'; অর্থাৎ শাস্ত্রের কোনরকম তোয়াক্কা না করে, নিজের খেয়ালখুশি মতো এবং সুখের জন্যই যে যজ্ঞ করা। *অসৃষ্টান্নং*, সে যজ্ঞে 'কোন অন্নদান করা হয় না'। যজ্ঞে সাধু ও গরিব মানুষদের খাওয়ানো একটা রীতি। কিন্তু *তামসিক* ব্যক্তি ঐসব নিয়মের ধার ধারে না। আবার সে যজ্ঞ *মন্ত্রহীনম্*, 'মন্ত্রহীন'; *অদক্ষিণম্*, 'দক্ষিণাবিহীন'; এবং *শ্রদ্ধাবিরহিতং*, 'শ্রদ্ধাশূন্য'। অর্থাৎ, যজ্ঞকে সার্থক করে তুলতে যা যা দরকার, তার কোনকিছুই নেই। *তামসিক* ব্যক্তির কাছে এসবের কোন মূল্য নেই। সে যা ভালো মনে করে তাই করে থাকে। এই হলো *তামসিক যজ্ঞ।* তাহলে দেখা গেল যজ্ঞ এবং আহার, সবই তিন ধরনের। এখন আসছে *তপস্যার* কথা।

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

—'দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন এবং জ্ঞানীদের পূজা; পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসাকে কায়িক তপস্যা বলা হয়।'

শারীরং তপ হলো 'কায়িক তপস্যা' বা শারীরিক তপস্যা। সেগুলি কী? *পূজনং,* অর্থাৎ 'পূজা অথবা সম্মান করা'। কাদের? *দেব, দ্বিজ, গুরু এবং প্রাজ্ঞ*—এই চারজনকে। *দেব* হলেন দেবতা; *দ্বিজ,* অর্থাৎ যাঁর নবজন্ম হয়েছে, যিনি শুদ্ধ ব্যক্তি বা *ব্রাহ্মণ,* যিনি স্থূল জীবন অতিক্রম করে উচ্চতর জীবনে প্রবেশ করেছেন। *দ্বিজ* মানে যাঁর দ্বিতীয়বার জন্ম হয়েছে। প্রথম জন্ম দৈহিক, দ্বিতীয় জন্মটি আধ্যাত্মিক। আগে, যাঁদের আধ্যাত্মিক জন্ম হয়েছে, এদেশে তাঁদেরই *ব্রাহ্মণ* বলা হতো। এখন ব্রাহ্মণ একটা জাতে এসে ঠেকেছে, যার কোন মূল্যই নেই। প্রকৃতপক্ষে, যাঁরা দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবনের দ্বার যাঁদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে, তাঁরাই *দ্বিজ,* অর্থাৎ 'দ্বিতীয়বার জাত'। এঁরাই *ব্রাহ্মণ,* এঁরাই যে কোন দেশে পূজ্য, অর্থাৎ পূজা পাবার যোগ্য ব্যক্তি। বাবা-মা প্রথম জন্ম দেন; দ্বিতীয় জন্ম দেন *গুরু*। গুরুর তাই এত সম্মান।

ব্রাহ্মণের পর *গুরু* এবং *প্রাজ্ঞ,* অর্থাৎ *জ্ঞানী*-দের পূজা করার কথা আসছে। *গুরু* যেমন পূজনীয়, তেমনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও শ্রদ্ধেয়। সরকার বা শাস্ত্র নির্দেশ দিন আর নাই দিন, এমন মানুষ সব সুস্থ সমাজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকলের সম্মান পেয়ে থাকেন। এর কারণ আমরা তাঁদের ভালবাসি, তাঁদের ওপর নির্ভর করি।

তারপর, *শৌচম্* বা দৈহিক শুচিতা; *আর্জবম্,* 'সরলতা' বা সততা। *আর্জবম্* কথাটি এসেছে *ঋজু* অর্থাৎ 'অকপটতা' বা সারল্য থেকে। *ঋজু*-র ঠিক বিপরীত হলো *কুটিল,* যার অর্থ 'কূটবুদ্ধি'।

তারপর আসছে *ব্রহ্মচর্যম্* বা 'ব্রহ্মচর্য', অর্থাৎ শারীরিক সংযম; *অহিংসা,* অর্থাৎ, মানুষ, জীবজন্তু অথবা প্রকৃতিকে 'হিংসা না করা', তাদের ক্ষতি না করা। এগুলি সবই *অহিংসা*-র অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত সভ্য সমাজেই *অহিংসা* একটি মস্ত গুণ। *হিংসা* সভ্য সমাজের অঙ্গ নয়, যদিও সমাজে অহরহ হিংসার প্রকাশ দেখা যায়। এর কারণ আমরা নিজেদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত করিনি, সংযত হতে শিখিনি। শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে বলছেন—মানুষ আগে দৈহিক সংযম অভ্যাস করুক। এগুলিকেই *শারীরং তপ* বা ' দৈহিক *তপস্যা'* বলে। কী গভীর কথা! যে সমাজে বেশির ভাগ মানুষ আত্ম-সংযত, সেখানে আর গাদা গাদা পুলিশের দরকার হয় না। শহরের মহল্লায় মহল্লায় কেন আজ এত থানার

ছড়াছড়ি? তার কারণ দুষ্টু লোকের আধিক্য। কিন্তু সমাজকে শোধন করার এটি সঠিক রাস্তা নয়। যে-সব তপস্যার কথা এতক্ষণ বলা হলো, সেগুলি যদি আমরা অভ্যাস করি, তাহলে আর বাহ্য নিয়ন্ত্রণের অতটা দরকার হবে না। আমি যদি নিজেই সংযত থাকি, তাহলে আমাকে শাসন করার জন্য আর বাইরের কাউকে প্রয়োজন হয় না। তাই সমাজে আজ এই আত্ম-সংযম, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বড়ই দরকার। আধুনিক সমাজ এই সংযমের কথা প্রায় ভুলতেই বসেছে। তপস্যার ভাব একেবারেই কমে গেছে; ফলে চতুর্দিকে কেবল হিংসা, অপরাধপ্রবণতা, অতৃপ্তি ও অশান্তির ছড়াছড়ি।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

—'যে বাক্য অনুদ্বেগকর, সত্য, মধুর ও হিতকর এবং বেদ অধ্যয়ন—এগুলিকেই বাচিক তপস্যা বলে।'

এই *বাঙ্ময় তপস্যার* কথা *মনুস্মৃতি*-তেও পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ *সত্যং ব্রুয়াৎ* , 'সত্য কথা বল'; *প্রিয়ং ব্রুয়াৎ*, 'যা শ্রুতিমধুর, তাই বল'; *মা ব্রুয়াৎ সত্যং অপ্রিয়ম্*, শ্রোতার কাছে 'অপ্রিয় সত্য বলো না', কারণ তাতে সে দুঃখ পাবে। সত্য হলেও কোন কথা যদি অপ্রিয় হয়, তবে তা বলো না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করুন একজন দৃষ্টিহীন মানুষকে আপনি ডাকছেন। আপনি কি তাকে এই বলে সম্বোধন করবেন—'ওহে অন্ধ!'? কথাটি সত্য, কিন্তু অপ্রিয়। তাকে 'অন্ধ' বললে তার বুকে গিয়ে বাজবে, সে কষ্ট পাবে। যা সত্য তা বলতেই হবে, কিন্তু চেষ্টা করুন যাতে আপনার কথা শুনে মানুষ সুখী হয়, আনন্দ পায়। প্রিয় বাক্য বলার অর্থ এই নয় যে, আপনি মিথ্যা বলবেন। না, তা কখনও বলা উচিত নয়। *মনুস্মৃতি* সে কথাই বলছেন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *অনুদ্বেগকরং বাক্যং*, অর্থাৎ 'তোমার কথা যেন অন্যের উদ্বেগের কারণ না হয়।' এমনভাবে কথা বল যাতে তাদের মানসিক শান্তি ভঙ্গ না হয়। এটি বাচিক তপস্যার প্রাথমিক দিক। সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে হবে, সে কথা যেন *সত্যম্* বা 'সত্য' হয়; অসত্য বলো না। এটি হলো বাচিক তপস্যার দ্বিতীয় দিক। তারপর বলা হচ্ছে, তোমার বাক্য যেন *প্রিয়ং*, 'শ্রুতিমধুর' হয়; এবং *হিতং*, শ্রোতার 'কল্যাণ' করে। অর্থাৎ একই সঙ্গে তোমার কথা মধুর ও হিতকর হবে। তারপর বলা হয়েছে, *স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব*, 'এবং

নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন'। কেন? তা করলে মন একটা উঁচু অবস্থায় থাকবে; *বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে,* একেই 'বাচিক তপস্যা' বলা হয়।

দেহ, মন এবং বাক্য—এই তিনটিকে অবলম্বন করে আমাদের দৈহিক, বাচিক এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। এই শ্লোকে বাচিক প্রতিক্রিয়ার কথাই বলা হয়েছে। কথা সমাজের মঙ্গল ও অমঙ্গল, দুই করে। খারাপ কথা সমাজকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তেমনি আবার ভালো কথা সমাজকে উন্নত করতে পারে। তাই কোন কথা বলতে হলে ওজন করে বলা উচিত। সাত্ত্বিক মানুষ তাই করেন। একেই *বাক্* বা বাচিক তপস্যা বলে। যাঁরা এই তপস্যা করবেন তাঁদের মনোভাব এইরকম হবে ঃ 'যা সত্য, কেবল তাই বলব; যদি তা সত্য না হয় অথবা যদি তার সত্যতা সম্পর্কে সংশয় থাকে, তাহলে আদপেই মুখ খুলব না'। সত্যি কথা; এসব ক্ষেত্রে কথা বলার থেকে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। আর যদি কথা বলতেই হয়, খুব হিসেব করে বলব। ভেবে দেখুন, এরকম করতে হলে মনের কতটা সংযম চাই! বস্তুত সব বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার মধ্যে এই সংযমটি অনুস্যূত হয়ে আছে। কী সেই সংযম? যা সত্য, কেবল তাই বলব। নৈতিক চিন্তাধারায় আবার, যা সকলের পক্ষে কল্যাণকর, কেবল সেই কথা বলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কথাকে সংযত ও শুদ্ধ করে তোলার কী চমৎকার শিক্ষা! আমাদের বহু শাস্ত্রেই বাক্‌সংযমের ওপর প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ কথাই তো মানুষে-মানুষে সম্পর্ক গড়ে তোলার যোগসূত্র, ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম। এই মাধ্যমটিকে কেমনভাবে ব্যবহার করছি তার ওপর আমাদের সুখদুঃখ অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই কথা বলতে হলে সতর্ক হয়েই বলা উচিত। এটি আমাদের মস্ত দায়িত্ব। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই কোনরকম বিবেচনার ধার ধারে না; যা মুখে এল তাই বলে গেল। ফলে সর্বত্র নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজ যতটা না ক্ষতি করে, তার চেয়ে অনেক বেশি সর্বনাশ করে কথা। দুম্ করে একটা কথা বলার ফলে হয়তো একটা সংসারই ভেঙ্গে গেল! এরকম তো দিনরাত হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষেত্রে। একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন ভাষণ রাজনৈতিক পরিবেশকে অত্যন্ত জটিল করে তুলতে পারে। অতএব, বেদান্ত যে মহৎ শিক্ষাটি দিচ্ছে, তা এই ঃ 'বাক্যকে সংযত কর'।

শুধু কথা দিয়েই আমরা মানুষকে কত না কষ্ট দিই! আপনি হয়তো কাউকে শারীরিকভাবে আঘাত করলেন না, কিন্তু তার সম্পর্কে এমন কটূক্তি করলেন,

এমন গালমন্দ করলেন যে তার মানসিক শান্তি চুরমার হয়ে গেল। বাক্‌শক্তি কেবল মানুষেরই আছে। কোন জন্তুর এ ক্ষমতা নেই। অতএব এই প্রচণ্ড শক্তিকে পরিশীলিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। আমাদের *সনাতন ধর্মেও* এর ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে।

আগেও আমি আলোচনা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্যের লেখা *বিবেকচূড়ামণি* থেকে (শ্লোক সংখ্যা ৩৬৭) একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছি। সেখানে বলা হয়েছে—*যোগস্য প্রথম দ্বারং বাঙ্‌নিরোধঃ,* অর্থাৎ 'যোগের প্রথম দ্বারটি হলো বাক্‌-সংযম'। অসাধারণ কথা! তাই, যে কথা মধুর, সকলের পক্ষে কল্যাণকর, অথচ সত্য—শুধু সে কথাই বলুন। মানুষের জিভে বাগ্‌দেবী সরস্বতী বাস করেন—ভারতে এরকম একটি কথা প্রচলিত আছে। প্রত্যেক শিশুকে এই কথাটি স্মরণ করিয়ে বলুন—'তোমার কথা যেন সত্য, মধুর ও হিতকর হয়'। আজ আমাদের শিশুদের এই সংযমের শিক্ষা দেওয়া চাই, তাতে তাদের অশেষ মঙ্গল হবে। আজকে যে সংকট দেখা দিয়েছে তার জন্য আমরাই দায়ী, কারণ এই সৎশিক্ষা দেওয়ার কথা আমাদের মনে ওঠেনি। এই হলো *বাঙ্‌ময় তপস্‌,* অর্থাৎ 'বাচিক তপস্যা'। *বাক্‌* মানে 'শব্দ' অথবা 'কথা'। আমি মনে করি ভারতবর্ষে আজ এই তপস্যার খুব প্রয়োজন। যে-কথা মানুষে-মানুষে সম্পর্কের সেতু বাঁধতে পারে, আবার তাকে ভাঙতেও পারে, ভাবতে হবে তাকে কি করে সংযত রাখা যায়। 'কথার চাবুক' বলে একটি কথা আছে। যারা দুর্মুখ, তারা ঐ কথার চাবুক মেরে মানুষকে দুঃখ দেয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই আমাদের এ ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছেন।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬॥

—'মনের প্রসন্নতা, শান্ত ভাব, নীরবতা, আত্ম-সংযম, ভাবের শুদ্ধতা—একেই মানসিক তপস্যা বলে।'

একেই *মানসম্‌ তপঃ* বা 'মানসিক তপস্যা' বলে। কীভাবে মানসিক স্তরে তপস্যা করা যায়? তপস্যা মানে 'নিজেকে ক্রমাগত ভালো করার চেষ্টা বা সংগ্রাম'। হতাশায় পড়ে আপনার মন হয়তো কখনও নিচে নামছে। আপনি ঠিক টের পেয়েছেন। অমনি চেষ্টা করে, বিচার করে আপনি মনকে আবার টেনে তুললেন। মনের এরকম নিম্নগামী অবস্থায় নিজেকেই প্রশ্ন করতে হবে—

'কেন আমার মন বিচলিত হবে? কেন সে অশান্ত হবে? আমি মনকে শান্ত রাখবই রাখব।' এইরকম লাগাতার সংগ্রাম চাই। তবেই মন প্রশান্ত থাকবে। কেউ হয়তো আমাকে গালমন্দ করে দিব্যি চলে গেল; হয়তো কি বলেছে না বলেছে, পরে সে ভুলেও গেল। কিন্তু আমি মনে মনে সেই কথাগুলিকে লালন করে হতাশায় ভুগছি। এই যে মানসিক অবনমন, এটি হতে দেওয়া চলবে না। বিচার করে এসব আবর্জনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং মানসিক প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। এই যে মনের সাথে লড়াই, এটিই *তপস্যা।* প্রতিদিন এই তপস্যা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। এই তপস্যার গুরুত্ব কতটা তা আমাদের বোঝা দরকার।

মনের ধর্মই থেকে থেকে অসুখী হওয়া, উন্মত্ত হওয়া। এই মনকে সর্বতোভাবে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এই যে কাজ, এই যে প্রয়াস—এটিই *তপস্যা।* শ্লোকে বলা হয়েছে *মনঃ প্রসাদঃ।* এখানে *প্রসাদ* মানে 'শান্ত প্রসন্নতা'। তাই মনের শান্তভাব ও প্রসন্নভাবকে বলা হয় *মনঃ প্রসাদঃ* । আপনি সবসময় এমন প্রশান্ত ও প্রসন্ন যে, আপনার কাছে যে আসবে, সেই উৎসাহিত হবে; আপনাকে দেখে কেউ কখনও ঝিমিয়ে পড়বে না। তাহলেই দেখুন, আমরা সমাজের আর পাঁচজন মানুষকে সুখীও করতে পারি, আবার দুঃখীও করতে পারি। মনে করুন, আপনার বাড়িতে এমন কেউ আছেন যিনি সর্বদাই গোমড়ামুখে বসে থাকেন। কোন ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ নেই, সবকিছুতেই তাঁর অনীহা। শুধু তাই নয়, চারপাশে যা হচ্ছে সবই তাঁর চোখে বিষ! নিন্দার ফুলঝুরি ছুটছে তাঁর মুখে। এমনটি যদি হয়, তাহলে চারপাশের মানুষের জীবন কিরকম দুর্বিষহ হয়ে উঠবে, একবার ভেবে দেখুন। তাই সর্বদা মনে রাখতে হবে, আমরা সকলের সঙ্গে আছি, সকলের সঙ্গেই আদান প্রদান করতে হবে আমাদের এবং তা যখন করতেই হবে তখন প্রসন্ন হয়ে সে কাজটি কেন সম্পন্ন করব না, মনের উচ্চতর ভূমিতে উঠে কেন সে ভূমিকাটি পালন করব না? এই কারণেই শ্লোকে মানসিক প্রশান্তির কথা বলা হয়েছে।

চিত্ত প্রসাদের পর উল্লেখ করা হয়েছে *সৌম্যত্বং,* অর্থাৎ 'দয়ার্দ্রতা' বা কোমলতা, অর্থাৎ যে শোভন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনি অন্যদের অভ্যর্থনা করে থাকেন। অমার্জিত এবং রূঢ় হওয়া কারোরই উচিত নয়, যদিও অনেকেই তাই। কিন্তু তাঁরা কেন ওরকম হবেন? তার কারণ তাঁরা মনটিকে শুদ্ধ করেননি। সভ্য মানুষ *সৌম্য* বা ভদ্র হয়ে থাকেন। তাই কেউ আপনার কাছে এলে তাঁকে

স্বাগত জানান, দুটো মিষ্টি কথা বলুন। যাতে এটা করতে পারেন, তার জন্য মনকে পরিশীলিত করা দরকার, মনকে তালিম দেওয়া চাই।

এরপর আসছে *মৌনম্,* বা 'নীরবতা'। এর একটি গভীর ব্যঞ্জনা আছে। *মৌনম্* বলতে এমন একটা অবস্থা বোঝায় যখন মন নিবিড়ভাবে চিন্তা করছে। মৌন বলতে সব সময় নির্বাক হয়ে থাকা নয়; কথা নিশ্চয় বলব, তবে যখন বলার মতো সত্যিই কিছু আছে, তখনই বলব। বাকি সময় চুপচাপ থাকব। গভীর চিন্তাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই চুপচাপ থাকতে পারেন। একটা কথা আমি প্রায়শ বলে থাকি—কথা ও চিন্তার অনুপাতটি বিপরীতধর্মী; অর্থাৎ চিন্তা বেশি হলে কথা কমে যাবে, আবার যেখানে চিন্তা কম, সেখানে বাগাড়ম্বর বেশি। তাই এমন একটি মানসিক অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যে, যথার্থ প্রয়োজন হলে তবেই আমরা কথা বলব, নচেৎ চুপচাপ শান্ত হয়ে থাকব। মানুষ যদি এই ভাবটি ঠিকঠিক আয়ত্ত করতে পারে তাহলে জগতের অশেষ কল্যাণ হবে। আচার্য শঙ্করের মতে, *মনন শক্তি-ই মৌনম্।* অর্থাৎ 'নীরবতা হচ্ছে চিন্তাশক্তি'। তাই মাঝে মাঝে চুপচাপ থাকা খুব ভালো। সমাজে আছি বলেই অনেকসময় আমাদের কথা বলতে হয়। কিন্তু সুযোগ পেলেই যেন আমরা মৌন থাকতে পারি। বেশি বকবক করে জগতের শান্তিভঙ্গ করবেন না, যা আমরা নিত্য করে থাকি। তাই *মৌনম্* বা বাক্‌সংযম মনের একটি অসাধারণ গুণ। বাচালতায় ভারতের মানুষ সবার শীর্ষে। ফলে আমাদের জীবনও অন্তসারশূণ্য হয়ে পড়ছে। মৌন থাকার অনেক মূল্য। কথায় প্রচুর শক্তির অপচয় হয়। সেই শক্তি বাঁচিয়ে চিন্তায় এবং কর্মে ব্যয় করা উচিত। তপস্যার এই শক্তি থেকেই আপনি আপনার ব্যক্তিত্ব বিকশিত করতে পারবেন। তাই প্রাণশক্তির অপব্যয় করতে নেই। যত্রতত্র তা খরচ না করে তাকে একাগ্র করতে হবে। এই গেল *মৌনম্* বা 'নীরবতার' প্রসঙ্গ।

আত্মনিগ্রহঃ মানে 'আত্মসংযম'—অর্থাৎ স্ব-শাসিত, সুনিয়ন্ত্রিত মন। এই মন নিজেই নিজেকে বশে এনেছে এবং সেই মন দিয়েই সে ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটিই একমাত্র উপায়। তাই প্রথমেই মনকে সংযত হওয়ার শিক্ষা নিতে হবে। এই যে আত্মসংযমের সংগ্রাম, এটিই *তপস্* বা তপস্যা। যখন আমরা আত্মসংযমে প্রতিষ্ঠিত হব, তখন আর তপস্যার প্রয়োজন হবে না কারণ সংযম তখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এখনও তা স্বাভাবিক হয়নি বলেই তপস্যা বা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

এরপর *ভাব সংশুদ্ধিঃ।* এই কথাটির অর্থ 'উদ্দেশ্যের সততা' বা 'ছলনারাহিত্য'। এর ঠিক বিপরীত হলো শঠতা। *ভাব* হলো মানসিক প্রবণতা। এই প্রবণতাটিকে শুদ্ধ, পবিত্র করে তুলতে হবে; ভাবে কোনরকম মলিনতা থাকলে চলবে না। এটিই *ভাবসংশুদ্ধির* তাৎপর্য।

ইতি এতৎ, 'এই সব'; *তপো,* 'তপস্যা'-কে; *মানসম্ উচ্যতে,* 'মানসিক (তপস্যা) বলা হয়'। মনের এই গুণ যদি সামান্য পরিমাণেও আমরা অর্জন করতে পারি, তাহলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত সুন্দর, কত না অর্থবহ হয়ে উঠবে! তাহলে পরপর তিনটি শ্লোকে আমরা শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক—এই তিন ধরনের তপস্যার কথা জানলাম। পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে এই ত্রিবিধ তপস্যা এবং *দান*-এর কথা আলোচিত হবে।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

—'এই ত্রিবিধ তপস্যা, নিষ্কাম, একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিদের দ্বারা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলে [তাকে] সাত্ত্বিক [তপস্যা] বলে।'

একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা ভাব নিয়ে যখন এই দৈহিক, বাচনিক এবং মানসিক তপস্যা করা হয়, তখন তাকে *সাত্ত্বিক তপস্যা* বলে। অন্য আর এক মনোভাব নিয়ে করলে তাকে *রাজসিক* এবং পৃথক আর এক ভাব নিয়ে করলে তাকে *তামসিক তপস্যা* বলা হয়।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং, 'পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে এই তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়। কীরকম শ্রদ্ধা? সেই শ্রদ্ধায় যেমন একদিকে নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকে, তেমনি জগৎ ও জীবনের সত্যের প্রতিও অটুট আস্থা থাকে। একেই *শ্রদ্ধা* বলে। *শ্রদ্ধা*-র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলেছেন, শ্রদ্ধা হলো *আস্তিক্য বুদ্ধি* অর্থাৎ 'সামগ্রিক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।' নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে চললে যেমন সুখী হওয়া যায় না, তেমনি প্রাণে উৎসাহও আসে না। তখন হতাশা পেয়ে বসে আমাদের। কিন্তু ইতিবাচক মনোভাব আমাদের আনন্দে রাখে, উদ্বুদ্ধ করে। এখানেই *শ্রদ্ধা*-র প্রাসঙ্গিকতা, অর্থাৎ এমন একটি মন যা ইতিবাচক ভাবে পরিপূর্ণ। *পরয়া* মানে 'পরম'; *শ্রদ্ধয়া,* 'শ্রদ্ধার সঙ্গে'; তপ্তং, 'এই *তপস্যা* অনুষ্ঠিত হয়'। কীরকম তপস্যা? *তপস্তৎ ত্রিবিধং,* 'এই তিনরকমের তপস্যা'—শরীরের, বাক্যের এবং মনের—যা আগে বলা হয়েছে। কার দ্বারা এই তপস্যা

অনুষ্ঠিত হয়? বলা হচ্ছে, *যুক্তৈঃ নরৈঃ,* 'একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিদের দ্বারা'; এবং *অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ,* 'যাদের ফলের আকাঙ্ক্ষা নেই', অর্থাৎ প্রতিদানে আমি কিছু চাই না—এইরকম একটা মনোভাব। *সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে,* এইরকম তপস্যাকে 'সাত্ত্বিক বলে'। *সাত্ত্বিক* তপস্বীর দৃষ্টিভঙ্গি এইরকম যে, 'আমি, এর থেকে কোন লাভ চাইছি না, আমার প্রকৃতিই এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করা'। আমাদের ছোটবেলায় ভালো কিছু করলেই বাবা-মার কাছে গিয়ে বলতাম, 'আমি এটা করেছি, আমাকে পুরস্কার দাও।' শিশুদের এটাই স্বভাব। কিছু করলেই তারা উপহার চায়। পরিণত, বিচক্ষণ মানুষ কিন্তু তা চান না। তাঁরা ভালো বলেই ভালো। ভালো হওয়াটাই তাঁদের প্রকৃতি। এইটিই *সাত্ত্বিক* মনোভাব।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮॥

—'সাধুবাদ, সম্মান ও পূজা পাবার আশায়, দম্ভের সঙ্গে যে তপস্যা করা হয়, তাকে এখানে অস্থায়ী ও অনিশ্চিত *রাজসিক* [তপস্যা] বলা হয়।'

সৎকারমানপূজার্থং, '*সৎকার, মান* ও *পূজা* পাবার আশায়' যারা এই তপস্যা করে থাকে। *সৎকার* মানে—চারপাশে মানুষের প্রশংসা, বাহবা, সাধুবাদ; *মান* হলো 'সম্মান', এবং *পূজা,* 'আরাধনা'। কীভাবে তারা এই তপস্যা করে? *দম্ভেন চৈব,* 'এবং দম্ভের সঙ্গে' বা অহংকারের সঙ্গে। যে তপস্যা সাধুবাদ, সম্মান ও পূজা পাবার আশায় দর্পের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, তাকে *রাজসিক* তপস্যা বলা হয়। এই হলো *রাজসিক* তপস্যার লক্ষণ। কিন্তু এই তপস্যা *চলম্,* 'অস্থির'; এবং *অধ্রুবম্,* 'অনিশ্চিত'। এই *রাজসিক* তপস্যা ক্ষণস্থায়ী— হয় আবার যায়; এই হচ্ছে তার প্রকৃতি। কিন্তু *সাত্ত্বিক* তপস্যা স্থির ও অপরিবর্তনীয়। একটানা, একভাবে তা চলতে থাকে।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯॥

—'ভ্রান্ত ধারণাবশত, নিজের শরীরের পীড়ার দ্বারা অথবা অন্যের সর্বনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয়, তা *তামসিক* বলে কথিত।'

কোন কোন তামসিক মানুষও তপস্যা করেন। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে? তারা সে তপস্যা করে 'ভ্রান্ত ধারণাবশত', *মূঢ়গ্রাহেণ,* বুঝে সুঝে করে না। একটা মোহের

বশে মনে ইচ্ছা এল, তপস্যা করি, আর অমনি তপস্যায় লেগে গেল। কীভাবে তারা তপস্যা করে? *আত্মনো যৎ পীড়য়া,* 'নিজের শরীরকে পীড়া দিয়ে'। যেমন মনে করুন, কেউ হয়তো শরীরে কাঁটা বিঁধিয়ে গাড়ি টানছে। এরকম তপস্যাও কেউ কেউ করে, তবে তা *তামসিক* তপস্যা। আবার অন্য কেউ কেউ 'অন্যের ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়েও' তপস্যা করে, *পরস্যোৎসাদনার্থং।* তামিল ভাষায় একে বলে *মাট্টা মারণ।* এসব মানুষও তপস্যা করে, কিন্তু অন্যের ক্ষতি করার মতলব নিয়ে। এইসব তপস্যাকে *তামসিক* বলা হয়। এসব ক্ষেত্রেও শরীর, বাক্য এবং মন সংযত, কিন্তু তার উদ্দেশ্য অন্যের উৎসাদন বা বিনাশ।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ *দানম্,* অর্থাৎ দানের প্রসঙ্গ তুলেছেন। দান তিন রকমের। প্রথমে *সাত্ত্বিক* দানের কথা বলা হচ্ছে ঃ

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

—'উপযুক্ত স্থানে, কালে ও পাত্রে, প্রতি উপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান দেওয়া হয়, সেই দান *সাত্ত্বিক* বলা হয়।'

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সাত্ত্বিক দানের আলোচনা করেছেন। ঋগ্বেদেও দান সম্পর্কে একটি স্তোত্র আছে। তার নাম *'দান স্তুতি'।* বাস্তবিক, দান যেন ভারতবাসীদের রক্তে। একসময় এই দানের ভাবটি এদেশে খুবই প্রাধান্যলাভ করেছিল। আমাদের সবধরনের সাহিত্যেই তাই দানের জয়গান। তাকে সর্বদাই অতি উচ্চ আসন ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই দানের পিছনে যে মনস্তত্ত্বটি কাজ করে তা এই ঃ আমার হয়তো এমন কিছু আছে যা অন্যের নেই; অতএব আমি তা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেব। মিলেমিশে ভোগ করব। শতশত বছর ভারতে এই ভাবটিই চালু ছিল। আতিথ্য ও দানের জন্য ভারতবর্ষ চিরদিনই বিখ্যাত। এমন দিন ছিল যখন পকেটে একটা পয়সা না নিয়েও আপনি সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে পারতেন। স্থানীয় মানুষরাই আপনার সেবাযত্ন ও দেখাশোনা করতেন। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী এভাবেই তখন দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরে বেড়াতেন। চলার পথে স্থানীয় মানুষ তাঁদের আতিথ্য দিয়েছেন, পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই হলো *দান* । সব ব্যাপারটাই এমন স্বাভাবিক ছিল যে, যাঁরা সেবা করতেন তাঁরা যেন ধন্য হয়ে যেতেন। তখনকার দিনে কাশীতে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। বছরে একবার তীর্থযাত্রীরা পায়ে হেঁটেই সেখানে

যেতেন। কি পথে, কি কাশীতে—কোথাও তাঁরা অভুক্ত থাকতেন না। সর্বত্রই দান ও সেবা পেতেন। আবার ঘরে ফেরার সময়েও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো। যুগ যুগ ধরে এই ধারা চলে এসেছে। এখন অবশ্য দিনকাল বদলেছে।

এখানে বলা হচ্ছে, *দাতব্যম্ ইতি যদ্দানং,* 'যে-দানের পিছনে এই মনোভাব কাজ করে, "আমার দিতে মন চাইছে, আমার দেওয়া উচিত", সে দান *সাত্ত্বিক*।' এখানে দান করা হচ্ছে এই ভাব নিয়ে যে, 'দেওয়া উচিত'। কাকে দান করা হচ্ছে? *দীয়তে অনুপকারিণে,* 'যার প্রত্যুপকারের ক্ষমতা নেই', তাকে। আপনি যদি গ্রহীতার কাছ থেকে প্রতিদানের আশা করেন এবং তাঁর যদি প্রতিদানের সামর্থ্য থাকে, তাহলে তা আর *দান* হলো না। ওটা একটা আপস চুক্তি বা ব্যবসায়িক লেনদেনের ব্যাপার হলো। দানের যে পবিত্র মহিমা, তার ছিটেফোঁটাও সেখানে থাকল না। কিন্তু প্রকৃত যে *দান,* সেখানে আপনাকে কোন প্রতিদান দেবার ক্ষমতা গ্রহীতার নেই। তাঁর সাহায্য বা সেবা প্রয়োজন এবং আপনি নিঃশর্তে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে সেবা করছেন, দান দিচ্ছেন। ব্যস, ঐখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল। *উপকারী* বলতে তাঁকেই বোঝায় যিনি আপনার উপকারের পরিবর্তে আপনাকে কিছু দিয়ে থাকেন বা করে থাকেন। এখানে, দানের ক্ষেত্রে, কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক বিপরীত। এখানে গ্রহীতা *অনুপকারী,* অর্থাৎ তিনি এমন এক ব্যক্তি, যাঁর প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা নেই।' এটি যদি হয়, তবে সে দান *সাত্ত্বিক*।

দেশে কালে চ পাত্রে চ, 'উপযুক্ত স্থানে, কালে এবং পাত্রের কথা বিবেচনা করে'। অর্থাৎ *দান* করার সময় এই বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে। তা যদি করেন, তবেই সে দান *সাত্ত্বিক।*

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

—'কিন্তু প্রত্যুপকারের আশায়, অথবা ফল কামনা করে অথবা ক্লিষ্ট চিত্তে যে দান দেওয়া হয়, বলা হয় সেই দান *রাজসিক*।'

এখন রাজসিক দানের লক্ষণগুলি বর্ণনা করা হচ্ছে। কী সেই লক্ষণ? প্রথমত, *যত্তু প্রত্যুপকারার্থং,* 'ফেরৎ পাবার আশায় যা দেওয়া হয়'। এই জাতীয় দানের পিছনে একটা প্রেরণা কাজ করে। কী সেই প্রেরণা? 'আমি তোমাকে

এটি দিচ্ছি বটে, কিন্তু বিনিময়ে তোমার কাছ থেকে এই জিনিস চাই।' এটি *রাজসিক* ভাব। অথবা, *ফলমুদ্দিশ্য,* 'কর্মের ফল কামনা করে'; এক্ষেত্রে দানের যে ফল, তার প্রতি আসক্তি থাকে; *দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং,* এবং বহুক্ষেত্রে 'অনিচ্ছার সঙ্গে দান দেওয়া হয়।'

এই যে 'অনিচ্ছার সঙ্গে দেওয়া', এই প্রসঙ্গে আমাদের বার্মার (বর্তমানে 'মায়ানমার') অভিজ্ঞতা মনে পড়ছে। ১৯৪০-৪২ পর্যন্ত যখন আমরা বার্মায় ছিলাম, তখন ওদেশে বৌদ্ধ এবং হিন্দু ব্যবসায়ীরা সেখানকার জনপ্রিয় রামকৃষ্ণ মিশন হসপিটালে কিছু কিছু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতেন। সেই দান সংগ্রহ করার জন্য মিশনের এক সাধু তাঁদের কাছে যেতেন। সাধুকে দেখামাত্রই বৌদ্ধ ব্যবসায়ীরা দানের অর্থ দিয়ে দিতেন এবং সাধুটি যে তাঁদের কাছে গিয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটি চুকে যেত। কিন্তু কোন হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছে গেলে, তিনি বলবেনই বলবেন, 'আগামিকাল আসুন না', অথবা 'পরশু আসুন'। তখনকার দিনে তাঁরা এইরকম বলতেন। কিন্তু একজন বৌদ্ধ কখনও তা করবেন না। তাঁরা দানের মহিমা বোঝেন, তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেন। কিন্তু হিন্দু ব্যবসায়ীরা ক্লিষ্ট চিত্তে, খুব অনিচ্ছার সঙ্গে দিতেন। যদি আপনার দিতে ইচ্ছে হয় দিন; না ইচ্ছে থাকলে দেবেন না—এই তো ব্যাপার! সাধুটি যে বহু দূর থেকে সাহায্যের জন্য এসেছেন, তাঁরাও যে ব্যস্ত মানুষ, তাঁদের যে হাসপাতালের রুগীদের সেবা করতে হয়—সে বোধ ঐ হিন্দু ব্যবসায়ীদের ছিল না।

আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯২৯-৩০ সালে আমি যখন মহীশূরে ছিলাম, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনে আমরা গরিবদের খাওয়াতাম। তার জন্য আমাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হতো। একদিন ঐ কাজে আমি এক বন্ধু অধ্যাপকের কাছে গিয়েছি। তিনি সাফ সাফ বলে দিলেন, 'দেখুন মহারাজ, আমি ভগবান এবং ধর্মটর্ম বিশ্বাস করি না। তাই ভগবান এবং ধর্মীয় ব্যাপারে আমি কিছু দিতে পারব না। তবে, হ্যাঁ, আমি গণেশ বিশ্বাস করি।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'আপনি যখন এসেইছেন, তখন আমার কিছু দেওয়া উচিত।' একথা বলে তিনি চেকবই বার করলেন। আমি ভাবলুম তিনি বুঝি হাজার দশেক, অথবা এক হাজার, নিদেন পক্ষে একশো টাকা দেবেন। কিন্তু ওমা! তিনি এক টাকার একটি চেক কেটে আমার হাতে দিলেন! এই হলো অনিচ্ছার সঙ্গে দেওয়া। আমিও সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে লক্ষ্য করলুম।

এই সব কাজের মধ্যে দিয়ে আপনি মানুষের চরিত্র বুঝতে পারবেন। তাই গীতা এখানে যা বলছেন, তা কোন কষ্টকল্পনা নয়, এটি বাস্তব সত্য। এসব ক্ষেত্রে দাতার মনোভাব হচ্ছে—'দিতে না পারলেই বাঁচতুম'!

শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে বলেছেন, 'প্রত্যুপকারের আশায়, অথবা ফল কামনা করে, অথবা ক্লিষ্টচিত্তে যে দান দেওয়া হয়, বলা হয় সেই দান *রাজসিক*।' সুখের বিষয়, গত কয়েক বছরে দানের ব্যাপারে ভারতীয়দের মনোভাবেরও বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগের তুলনায় এখন সাত্ত্বিক দানের পরিমাণ বাড়ছে। আগে ভালো কিছু করতে হলে অর্থবান মানুষদের কাছে দৌড়তে হতো। *এখন অর্থবানরাই ভালো কাজের পিছনে ছুটছেন।* এখন তাঁরা এসে বলেন, 'আমার অর্থ আছে। সে টাকাকে আপনারা ভালো কাজে লাগাতে পারেন?' এই ইতিবাচক পরিবর্তনে, সমাজে *সাত্ত্বিক* দান-প্রবণতার উন্মেষে আমি খুব খুশি।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

—'অনুপযুক্ত স্থানে ও কালে, অযোগ্য পাত্রে, অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞার সঙ্গে যে দান দেওয়া হয়, তা *তামসিক* বলে কথিত।'

অদেশকালে যদ্দানং, 'অনুপযুক্ত স্থানে ও কালে' যে দান করা হয়; *অপাত্রেভ্যঃ*, 'অযোগ্য পাত্রে'; *অসৎকৃতম্*, 'শ্রদ্ধা ও সম্মান ছাড়া' এবং *অবজ্ঞাতং*, 'অবজ্ঞাভরে'; *তৎ তামসম্ উদাহৃতম্*, 'সেই [দান] তামসিক বলে কথিত'। আগের শ্লোকে যে *রাজসিক* মনোভাবের কথা বলা হয়েছে, এখন তা আরো নিম্নমুখী হয়ে *তামসিকতায়* পরিণত হয়েছে।

নিজের কথা এসে গেলেও এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে একটা ঘটনা না বলে পারছি না। বিদেশে গেলে সাধারণত আমি টাকাকড়ি সঙ্গে নিই না। সঙ্গের সাথী শুধু প্লেনের টিকিট। বিমানবন্দরে কেউ না কেউ আমাকে নিতে আসেন বলেই টাকাপয়সা নিতাম না। কিন্তু তার ফলে দু-তিনবার বেশ মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। একবার হয়েছিল সিডনীতে। সেবার আমি আমেরিকা থেকে সেখানে যাই। কিন্তু এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখি সব ভোঁ ভাঁ—কেউ কোথাও নেই, কেউ নিতে আসেন নি আমাকে। একটা ভুল বোঝাবুঝির ফলেই এমনটি হয়েছিল। আসলে হয়েছিল কি, আমি যাঁদের অতিথি হব, তাঁরা ভেবেছিলেন আমি পরের দিন যাচ্ছি। এর কারণ আন্তর্জাতিক সময়-সীমা পার হলেই, প্রচলিত হিসেব

অনুসারে আপনার এক দিন বেশি বা কম হবে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। এই ভুল বোঝাবুঝির ফলেই আমাকে কেউ নিতে আসেননি। এদিকে আমার অবস্থাটা একবার ভাবুন! সিডনী এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আছি, অথচ পকেটে কোন টাকাপয়সা নেই। এয়ারপোর্টের এক কোণে হঠাৎ এক ভদ্রলোককে চোখে পড়ায় তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'আমি একটা ফোন করব; দশটা সেন্ট ধার দিতে পারেন?' অত্যন্ত বিরক্তি ও অবজ্ঞার সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'না, আমি দেব না'। আমি তখন বলি ঃ 'দেখুন, ফোন করলেই আমার বন্ধুরা কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বেন এবং তখনই আপনার পয়সা আপনাকে মিটিয়ে দেব। দয়া করে দশটা সেন্ট ধার হিসাবে দিন।' কিন্তু ভদ্রলোক একটা পয়সাও বার করতে চাইলেন না; আমার ওপর খুব বিরক্ত তিনি। কিছুক্ষণ পর, কি জানি তাঁর কি হলো—কুড়িটা সেন্ট আমার দিকে অবহেলাভরে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন আপনার পয়সা।' তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে পয়সা কটা নিলাম আমি এবং যথাস্থানে ফোন করতেই মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই ওঁরা সব এসে গেলেন। তখন আমি ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে তাঁর দেওয়া পয়সা ফিরিয়ে দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই নেবেন না, কারণ ও পয়সা তো তিনি ভিক্ষা হিসাবে দিয়েছেন। এটা গেল এক অভিজ্ঞতা।

অ্যামস্টার্ডামেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে অবশ্য ওঁরা আমাকে ফোন করতে দিয়েছিলেন, কারণ আমি তাঁদের আশ্বস্ত করতে পেরেছিলাম এই বলে যে, আমার বন্ধুরা আসছেন। তাঁরাই ফোনের পয়সা মিটিয়ে দেবেন। আমি ডঃ রমা পোল্ডারম্যান (Dr. Rama Polderman)-কে ফোন করতেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওঁরা সব এসে গেলেন এবং ভদ্রলোককে পয়সা দিয়ে দিলেন। এই সব অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় পৃথিবীর সর্বত্রই কিছু মানুষ আছেন যাঁরা উপযুক্ত ক্ষেত্রেও অনিচ্ছা ও অবজ্ঞাভরে দান করে থাকেন, যেমন গীতার এই শ্লোকগুলিতে বলা হচ্ছে।

ব্যাপারটি যথার্থই ভাববার; কারণ দান করতে হলে উদার হস্তে এবং খোলা মনেই করা উচিত। হাত গুটিয়ে দান হয় না। *তৈত্তিরীয় উপনিষদে* (১/১১/৩) *দান* সম্পর্কে সুন্দর একটি আলোচনা আছে। সেখানে দেখা যায় সমাবর্তন উৎসবের ভাষণে আচার্য ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে কিছু মূল্যবান উপদেশ দিচ্ছেন। নাগপুরের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সমাবর্তনে এই উপদেশাবলি আজও আবৃত্তি করে। সে যাই হোক, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-এ বলা হচ্ছে ঃ

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, দান হিসাবে 'যা দেবে, শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবে'। *অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্,* 'অশ্রদ্ধাপূর্বক দিও না', কারণ তাতে দানের মূল্য কমে যায়। তারপর বলা হয়েছে, *শ্রিয়া দেয়ম্,* 'সামর্থ্য অনুসারে দান করবে'। অর্থাৎ দান যেন আপনার সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আপনি হয়তো পাঁচটি টাকাই দিচ্ছেন, কিন্তু এই বোধ করে দিন যে, তার বেশি দেবার ক্ষমতা আপনার নেই। *ভিয়া দেয়ম্,* 'ভয়ে ভয়ে দেবে', কারণ দানের উপলক্ষ্যটি এত মহৎ, কিন্তু আপনি যে পরিমাণ দান দিচ্ছেন তা অতি সামান্য। *হ্রিয়া দেয়ম্,* 'বিনয়ের সঙ্গে দেবে'। *হ্রী* মানে লজ্জা বা বিনয়। লজ্জা কেন? লজ্জা এই ভেবে যে, আপনারা এতবড় একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছেন, অথচ আমি নগণ্য মানুষ; এত সামান্য দান কী করে হাতে তুলে দিই? দান এমন সলজ্জভাবেই করা উচিত। *সংবিদা দেয়ম্,* 'জেনে বুঝে দাও'। অর্থাৎ দান যে উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে, সেটি জানতে হবে। প্রকল্পটি যদি আপনার কাছে মহৎ মনে হয়, তখনই দান করবেন, তার আগে নয়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-এ আচার্য তাঁর সমাবর্তন ভাষণে *দান* সম্পর্কে এই কথাগুলি বলেছেন। ভাষণ শুরু হয়েছে এই কথাগুলি দিয়ে—*সত্যং বদ,* 'সত্য বলবে'; *ধর্মং চর,* 'ধর্মের পথ অনুসরণ করবে'; *স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদঃ,* 'অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ত্যাগ করবে না'। এইভাবে শুরু করে, আচার্য পরে দানের প্রসঙ্গে এসেছেন। তাই, কাউকে কিছু দিতে হলে এমনভাবে দিন, যেন তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত না লাগে। তাহলেই তা ঠিক ঠিক দান হবে; নচেৎ নয়। আমাদের ভিতর এই ভাব সঞ্চারিত হলে তবেই এই সংসার বাসযোগ্য ও আনন্দদায়ক হবে এবং আমরাও পূর্ণতালাভের পথে এগিয়ে যাব।

এইভাবে বিভিন্নরকম আহার, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানের বিবরণ গীতায় দেওয়া হয়েছে।

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩॥

—'বলা হয়, "ওঁ, তৎ, সৎ" ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম। প্রাচীনকালে তার দ্বারাই বেদ, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞাদি নির্মিত হয়েছে।'

ওঁ তৎ সৎ হলো পরম সত্য বা সত্তা ব্রহ্মের নাম। *ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দেশো,* '*ওঁ তৎ সৎ* এর নাম'। *ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ,* 'ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম বহু পরিচিত।' *তৎ* একটা পারিভাষিক নাম। *তৎ* বলতে সেই সত্তা বা সত্যকে

বোঝায়, যা এই পরিবর্তনশীল জগতের পিছনে নিহিত আছে। সেই সত্তাকে তৎ বলা হয়েছে কেন? তার কারণ, এই মুহূর্তে চোখ দিয়ে তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাই তৎ বলে সম্বোধন করছি। আমাদের চোখের সামনে যা রয়েছে, অর্থাৎ এই দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যক্ত জগৎ, তাকে সংস্কৃত ভাষায় আমরা *ইদম্* বলি। এই *ইদম্* একটি বস্তু বলেই তাকে আমরা আঙুল দিয়ে দেখাতে পারি। বস্তুকে জানা যায়, তাকে আঙুল দিয়ে দেখানো যায়। কিন্তু সেই পরম সত্তা, অর্থাৎ তৎ, কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়। তা *ইদম্*-এর পারে। তাই তাকে আমরা তৎ বলি, অর্থাৎ 'সেই' পরম সত্তা। সেই সত্তাকে আমরা *অদঃ*-ও বলে থাকি। *অদঃ* শব্দটির অর্থ 'সেখানে' বা 'ঐটি', যাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে নির্দেশ করা যায় না, যা ইন্দ্রিয়ের জালে ধরা পড়ে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, *ইদম্* ও *অদঃ*, এই দুটি শব্দ রয়েছে। *অদঃ* হলো তৎ-এর আর এক নাম। কিন্তু *ওঁ* আরো ব্যাপক। তা হলো পরম সত্তার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। তা যেমন একদিকে ইন্দ্রিয়গোচর ও দৃশ্যমান এই জগৎ সম্পর্কে প্রযোজ্য, অন্যদিকে তা ইন্দ্রিয়াতীত জগৎকে বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। ওঁ সর্বাত্মক। তার ভিতর সবই পড়ে—ব্যক্ত জগৎ এবং যা এই প্রকাশকে অতিক্রম করে আছে, তাও। গোটা *মাণ্ডূক্য উপনিষদ্* জুড়ে এই *ওঁ* শব্দের ব্যাখ্যা আছে। সেখানে 'জাগ্রত', 'স্বপ্ন' ও 'সুষুপ্তি' এই তিনটি অবস্থার সঙ্গেই ব্রহ্মের অভিন্নত্ব দেখানো হয়েছে। *প্রণব* বা *ওঁ*-এর আলোচনা *প্রশ্ন উপনিষদ্, বৃহদারণ্যক* এবং অন্যান্য উপনিষদেও আছে। বাস্তবিক, *ওঁ* হলো পবিত্রতম শব্দ। বৌদ্ধ, জৈন এবং হিন্দুদের কাছে ব্রহ্মের প্রতীক, এই *ওঁ* পরম শ্রদ্ধার বস্তু। আজ এই পবিত্রতম প্রতীকের সমাদর ভারতবর্ষের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে।

ওঁ তৎ সৎ হলো নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের নাম। কিন্তু এই নাম একই সঙ্গে আবার ব্যক্তি-ঈশ্বরকেও বোঝায়। পঞ্চম অধ্যায়ে *পুরুষোত্তম* বা পরম দিব্য পুরুষের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তা দেখেছি। তাই ব্রহ্ম *সগুণ,* আবার একই সঙ্গে *নির্গুণ। ওঁ তৎ সৎ* বললে তার মধ্যে সবই এসে পড়ে। বৈদিক পরম্পরায় এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ *মন্ত্র। ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ,* 'এ কথা সুবিদিত যে ব্রহ্ম তিন নামে পরিচিত'—*ওঁ তৎ সৎ*। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্* বলছেন ঃ *প্রাণাঃ বৈ সত্যম্,* 'জাগতিক শক্তিগুলি সত্য'; কিন্তু ব্রহ্ম বা আত্মা হলো *সত্যস্য সত্যম্,* 'সত্যেরও সত্য', অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরম সত্য।

ব্রাহ্মণাঃ তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা, 'তার দ্বারা বহু পূর্বে ব্রাহ্মণগণ

অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তিরা, বেদসমূহ এবং যজ্ঞাদি সৃষ্ট হয়েছিল।' তাদের সকলের মধ্যেই আপনারা এই *ওঁ তৎ সৎ* মন্ত্রটি পাবেন। এবার শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি শব্দকে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করবেন।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্‌ ॥ ২৪ ॥

—'তাই "ওঁ" উচ্চারণ করে, শাস্ত্রবিধান অনুসারে, বেদবাদিদের যজ্ঞ, দান ও তপস্যা সর্বদা অনুষ্ঠিত হয়।'

তাৎপর্য এই—যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা শুরু করার আগে *ওঁ* উচ্চারণ করুন। এটি শাস্ত্রের নির্দেশ। ভারতের যেখানেই যান, সেখানেই এই রীতি দেখতে পাবেন। প্রথমে *ওঁ* উচ্চারণ করে, তারপর অন্য যেকোন মন্ত্র উচ্চারণ করুন। তাই সব মন্ত্রের সূচনা *ওঁ* দিয়ে। যাঁরা বেদজ্ঞ এবং অন্যান্য শাস্ত্র জানেন, তাঁরা সবসময় এই *ওঁ*-এর ওপর জোর দিয়ে থাকেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌-এর একটি অনুচ্ছেদ জুড়ে এই *ওঁ*-এর আলোচনা আছে। মনে করুন, আপনি হয়তো কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমি কি এই কাজটা করব?' উত্তর পেলেন, '*ওঁ*'। অর্থাৎ করুন। *ওঁ* মানে এখানে 'অনুমতি'। আর অন্য কিছু বলার দরকার নেই। এসব কথা *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌*-এ পাবেন। এইভাবে *ওঁ* নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত *ওঁ* অনন্ত দিব্যসত্তা ব্রহ্মের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে, ব্রহ্ম সর্বগত এবং একই সঙ্গে সর্বাতীত, অর্থাৎ তিনি সবকিছুর মধ্যে, আবার সবকিছুর ঊর্ধ্বে। *ওঁ* দুয়েরই বাচক। *মাণ্ডুক্য উপনিষদ্‌ ওঁ*-এর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন অ, উ, ম হলো *অউম্‌ বা ওম্‌।* কিন্তু *ওঁ*-এ একটি *অমাত্র* বা অনুচ্চারিত ধ্বনিও আছে। সেটিকে *চন্দ্রকলা* (È) বলা হয় এবং তার ওপর আবার একটি বিন্দু (৺) দেওয়া হয়। এই সব মিলিয়ে *ওঁ*। এই যে অ, উ, ম, এই তিনটি জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি, আমাদের এই তিন অবস্থাকে বোঝায়। বাকি যে কলা ও বিন্দু (৺), তা *তুরীয়* বা অব্যক্ত সত্তার দ্যোতক। *মাণ্ডুক্য উপনিষদ্‌*-এ এই চারটির বর্ণনা আছে। এর মধ্য দিয়ে আমরা যে স্বরূপত আত্মা, তা বোঝানো হয়েছে। *জাগ্রৎ* অবস্থায় আত্মা প্রকাশিত, *স্বপ্ন* অবস্থাতেও আত্মা প্রকাশ পাচ্ছেন, *সুষুপ্তি* অবস্থাতেও আত্মা পূর্ণভাবে উপস্থিত আছেন, কিন্তু অপ্রকাশিত। এই তিনটি অবস্থার পারে যে চতুর্থ বা *তুরীয়* অবস্থা, তা ইন্দ্রিয়াতীত, অনির্বচনীয়

অনুভূতির অবস্থা বা স্থিতি। এইভাবে ওঁ-এর চারটি অঙ্গ এবং আমাদের অভিজ্ঞতার চারটি পর্যায়ের মিল দেখান হয়েছে। অতএব, 'ওঁ বিশ্বাত্মক', অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের প্রতীক। মাণ্ডূক্য *উপনিষদ্* শুরুই হচ্ছে এইভাবে—*ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ ইদং সর্বম্,* অর্থাৎ 'এই বিশ্ব *ওম্* ছাড়া অন্য কিছুই নয়'। অখন্ড সত্তার মধ্যে আপাতখণ্ড সত্তাকে মিলিয়ে দেবার কী অসাধারণ মহামন্ত্র! মন কতটা শুদ্ধ হলে তবেই এই সাধারণীকরণ বা সমন্বয় সম্ভব, তা একবার ভেবে দেখুন! তাহলে সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই, *ওঁ* পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জগৎ—দুই।

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

—' "তৎ" উচ্চারণ করে এবং কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে মুমুক্ষুদের দ্বারা নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দানকর্ম অনুষ্ঠিত হয়।'

ব্রহ্মবাচক এই তৎ শব্দ উচ্চারণ করে, ব্যক্তিগতভাবে কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে, *মোক্ষ*-কামী বা মুক্তিকামী ব্যক্তিরা নানারকম *যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান* করে থাকেন। তৎ-এর উদ্দেশ্য হলো আমাদের সকল কর্মে সেই পরম সত্যটিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। ছোট্ট একটি শব্দ তৎ, কিন্তু কী তার অপার মহিমা একবার ভেবে দেখুন!

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে ।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

—'হে পার্থ, "সৎ" শব্দটি অস্তিত্ব [অর্থাৎ যা আছে] এবং উৎকর্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়; তেমনি আবার এই "সৎ"-শব্দ শুভকর্ম অর্থেও প্রযুক্ত হয়।'

ওঁ তৎ সৎ-এর তৃতীয় ও শেষ ব্রহ্মবাচক শব্দটি *সৎ।* এবার তার কথা আসছে। *সৎ* শব্দটি নানা অর্থেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন, *সদ্ভাবে,* অর্থাৎ 'অস্তিত্ব অর্থে'; এবং *সাধুভাবে,* 'উৎকর্ষ অর্থে'। যেমন আমরা বলি *সৎ পুরুষ।* তার মানে কী? তার মানে 'ভালো মানুষ'। আবার বলি *সৎকর্ম,* অর্থাৎ 'ভালো কাজ', *সৎ বিচার* বা 'ভালো চিন্তা' ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে *সৎ* বলতে ভালোত্ব বোঝাচ্ছে। তারপর বলা হয়েছে *সাধুভাবে। সাধুভাব* কথাটির মধ্যে কল্যাণ বা শুভচেতনা নিহিত আছে। *সৎ ইতি এতৎ প্রযুজ্যতে,* '*সৎ*, এই শব্দ,

এসব অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে', অর্থাৎ *সৎভাব* এবং *সাধুভাব,* এই অর্থে। তারপর, *প্রশস্তে কর্মণি তথা,* 'যেখানেই কোনরকম প্রশংসনীয় কাজ হচ্ছে'; *সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে,* 'সেখানেও আমরা *সৎ*-শব্দটি ব্যবহার করতে পারি।' *প্রশস্তে কর্মণি* মানে, 'অত্যন্ত শুভকর্মে'। খুব শুভকর্মে এই *সৎ* শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। *সদ্ভাব, সাধুভাব এবং প্রশস্তে কর্মণি* ইত্যাদি শব্দগুলির দ্বারা কি ধরনের কর্ম করা উচিত, তার একটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭॥

—'যজ্ঞে, তপস্যায় এবং দানে নিষ্ঠাও "সৎ" [নামে] আখ্যাত; এ জাতীয় কর্মও (অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম), তাও "সৎ" বলে অভিহিত হয়।'

যজ্ঞ, দান ও তপস্যায় মনের যে দৃঢ় নিষ্ঠা, তাকেও *সৎ* বলে। মন যদি চঞ্চল ও দোলায়মান হয়, তবে তা *সৎ* হলো না। কিন্তু *যজ্ঞ, দান ও তপস্যা* করার সময় আপনার মনটি যদি দৃঢ় ও অবিচলিত থাকে, তাহলে তাকে *সৎ* বলা যাবে। *কর্ম চৈব তৎ অর্থীয়ং,* 'ঈশ্বর-সম্পর্কিত অথবা তৎ-সম্পর্কিত যে কাজই আপনি করুন না কেন'; *সৎ ইতি এব অভিধীয়তে,* 'তাকেও *সৎ* বলা হয়।' *তৎ অর্থীয়ং* মানে, 'সেই পরম সত্য অথবা তৎ লাভের উদ্দেশ্যে'। এই জাতীয় কর্মে সেই মনোভাবটিকে আমরা *সৎ* বলতে পারি। এইভাবেই *ওঁ তৎ সৎ,* এই তিনটি শব্দের আলাদা আলাদা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে *ওঁ* হলো ঈশ্বরের সামগ্রিক নাম।

শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরী, শিষ্যের মনটিকে দ্বৈতভূমির ঊর্ধ্বে তুলে অনন্ত চৈতন্যের সঙ্গে একীভূত করে দেবার জন্য যখন তাঁকে বেদান্তশিক্ষা দিলেন, তখন ধ্যানে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন; তখন তাঁর মনের নাশ হলো, রইলো শুধু আত্মা। তিন দিন তিন রাত ঐ জড় সমাধিতে রইলেন তিনি। কিন্তু তোতাপুরী যখন শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে চাইলেন তখন তাঁকে কতকগুলি মন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়েছিল। সেইসব মন্ত্রের একটি ছিল এই *ওঁ তৎ সৎ।* ভাবগম্ভীর স্বরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ঐ ঘরটিতে এই মন্ত্র বারবার উচ্চারণ করে তবেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মনটিকে সাধারণ ভূমিতে নামাতে পেরেছিলেন। মনকে উচ্চস্তরে তোলার যেমন মন্ত্র আছে, তেমনি তাকে নামিয়ে আনারও নানারকম মন্ত্র আছে। এগুলি আমাদের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের

আবিষ্কার, যা পরম সম্পদ। সে যাই হোক, এখানে আমরা দেখলাম যে, যেসব কর্ম তৎ-এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত, তাদেরও *সৎ* বলা হয়।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

—'হে পার্থ, অশ্রদ্ধার সঙ্গে যে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, [তাকে] *অসৎ* বলা হয়; তা না ইহলোকে, না পরলোকে ফলপ্রদ হয়।'

সপ্তদশ অধ্যায়ের এটি অন্তিম শ্লোক। আগের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ *সৎ*-এর আলোচনা করেছেন। এই শ্লোকে *অসৎ*-এর কথা বলছেন। *অসৎ* হলো *সৎ*-এর ঠিক বিপরীত। সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দটির গভীর তাৎপর্য। কেরলের 'মালয়ালাম' ভাষায় খারাপ বা দুষ্ট লোককে *অসৎ* বলা হয়।

যে 'যজ্ঞই অনুষ্ঠিত হোক', *হুতং;* অথবা 'দান করা হোক', *দত্তং;* অথবা 'তপস্যা' করা হোক, *তপস্ তপ্তং; অশ্রদ্ধয়া,* 'অশ্রদ্ধার সঙ্গে'। যখন শ্রদ্ধা ছাড়া কোন যজ্ঞ, দান অথবা তপস্যা করা হয়; *অসৎ ইতি উচ্যতে পার্থ,* 'হে অর্জুন, সেগুলিকে তখন অসৎ বলা হয়।' সৎ এবং অসৎ এর মধ্যে কী আকাশ-পাতাল তফাৎ! এরকম *অসৎ* মানুষ, *নো ইহ,* 'এই জীবনে' যেমন মহৎ কিছু লাভ করতে পারে না, তেমনি, *ন চ তৎ প্রেত্য,* 'পরলোকেও না'। এ ধরনের মানুষ একেবারেই পথভ্রান্ত, তিনি পথ হারিয়েছেন। কেন? তার উত্তর এই যে, তাঁর কাজের ধরণ-ধারণ সব *অসৎ;* তাঁর ভিতর *সৎ*-ভাবের কোন বালাই নেই। জীবন থেকে যদি সত্যকে নির্বাসন দিলাম, তাহলে জীবনে আর থাকল কী? সে তো এক অর্থহীন বোঝা। এই মহৎ শিক্ষাটি আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, শূন্যর নিজস্ব কোন মূল্য নেই। পরপর দশটা শূন্য বসিয়ে যান—দেখবেন, কোন যোগফলই হবে না। কিন্তু ঐ শূন্যগুলোর আগে একটা ১ বসিয়ে দেখুন, অমনি ঐ একের সান্নিধ্যে শূন্যগুলো উজ্জ্বল ও অর্থবহ হয়ে উঠবে। তখন ঐ একের পর যত শূন্য বসাবেন, অঙ্কের হিসাবে তাদের মূল্য ততই বাড়তে থাকবে। ঠিক সেইরকম, প্রথমে তৎ *সৎ*-কে রেখে আপনি যা করবেন, তাই সব অর্থে সুন্দর, অর্থবহ এবং কল্যাণকর হবে। তাই আপনার জীবনে প্রথমে '১' বসান, তারপর যত ইচ্ছে শূন্য বসান। জীবন এরকমই হওয়া উচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলেছেন—আগে ঈশ্বর, পরে জগৎ। আপনার জীবনে আগে ঈশ্বরকে বসান, পরে আর যা কিছু। তা যদি করেন,

তাহলে সবকিছুই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু তা না করে, যদি ঈশ্বরকে জীবন থেকে সরিয়ে দেন, তাহলে যা কিছু করবেন, সব পণ্ডশ্রম হবে।

শঙ্করাচার্য তাঁর উপনিষদ্ ভাষ্যে বলছেন ঃ *তদাত্মনা বিনির্মুক্তঃ জগৎ অসৎ সম্পদ্যতে,* 'ব্যক্ত জগৎ থেকে আত্মাকে সরিয়ে নিলে জগৎ অসৎ হয়ে যায়', তখন তার আর অস্তিত্ব থাকে না। শূন্যগুলোর প্রথমে যে '১' বসিয়েছেন, তাকে সরিয়ে নিন, দেখবেন শূন্যগুলো সব অর্থহীন হয়ে পড়েছে। আবার যেই '১' যথাস্থানে বসাবেন, অমনি তার ভিতর থেকে অর্থ ফুটে উঠবে। সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। তাই *ঈশোপনিষদ্*-এর প্রথম শ্লোকে বলা হচ্ছে— *ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বম্,* 'ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকেই সেই এক সত্য বা পরমেশ্বরের দ্বারা আবৃত করতে হবে।' তা যদি করেন, তাহলে জগৎ সত্য হয়ে উঠবে। তাই, বহুর পিছনে যে পরম এক বিরাজ করছেন, সে সম্পর্কে সচেতন হন। তাহলে বহুর অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। ইংরেজ কবি শেলী কী বলেছেন? তিনি বলছেন, ' "বহু"র পরিবর্তন হয়, নাশও হয়, কিন্তু "এক" অপরিবর্তিত থাকে।' বেদান্ত তাই জোরের সঙ্গে বলেন, 'বহু'র পিছনে যে পরম 'এক' রয়েছেন, সেদিকে যাও। বহুর ভিতর দিয়ে গিয়ে মানুষ যখন সেই একে পৌঁছায়, তখন জগতের আপাত-বহুত্ব নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বৈচিত্র্য তখন দিব্য সৌন্দর্যে ঝলমল করে ওঠে; সব কিছুর মধ্যে একের উপস্থিতি অনুভব করার দরুন তখন আর কোন কিছুকে বর্জন করতে হয় না। এই অনুভূতি জীবনকে ঠিক ঠিক আনন্দময় করে তোলে, বাঁচতে তখন উৎসাহ আসে। বেদান্ত চায়, মানুষ পূর্ণ উৎসাহ, পূর্ণ উদ্যম, পূর্ণ আনন্দ নিয়ে বাঁচুক। জীবনটা শূন্য, হেলাফেলা, কিছুই করার নেই জীবনে—এরকম একটা নেতিবাচক ভাব বেদান্ত বরদাস্ত করে না। জীবনকে শূন্য বা ফাঁকা মনে করলে প্রাণে উৎসাহ আসবে কী করে? তাই বেদান্ত বলে—এই যে বৈচিত্র্যময় বিশ্ব, সেই বৈচিত্র্যের পিছনে এক পরম সত্য লুকিয়ে আছে। সেই সত্যটিকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে।

এই সপ্তদশ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পেলাম, *সত্ত্ব, রজঃ* ও *তমঃ,* এই তিনটি গুণ বা শক্তি প্রতি মুহূর্তে যেমন আমাদের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে, তেমনি প্রকৃতির মধ্যেও সেগুলি সক্রিয়। এই তিনটি গুণ থেকেই আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও সাম্যভাবের উদ্ভব। এই তিনটি ভাবই মানুষের জীবনে ভীষণভাবে প্রকাশ পায়। *তামসিক* মন হলে, সে মানুষের ব্যবহার একরকম, *রাজসিক* হলে আর এক রকম। আবার যে মানুষের মন *সাত্ত্বিক,* তাঁর আচরণ অসাধারণ সুন্দর। আমরা

যদি নিজেদের এবং অন্যদের ভিতরটা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখি, তাহলে একথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারব এবং আমাদের মনটিকেও ক্রমশ নিচের স্তর থেকে ওপর দিকে টেনে তুলতে পারব।

আমি প্রায়শই বলি যে, *রজোগুণ* এবং *তমোগুণ* ভারতীয় রাজনীতিকে গ্রাস করে রেখেছে। আর রেখেছে বলেই সেখানে এত চরিত্রহনন, হিংসা, কলহ, আর কুৎসার ছড়াছড়ি। নির্বাচনের ঠিক আগেই দেখবেন নানারকম গণ্ডগোলের সূত্রপাত হবে! এমনি সময়ে ঐ ধরনের অতটা নোংরামি হয় না। যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের মধ্যে যদি সামান্য *সত্ত্বগুণ* আসে, তাহলে রাজনীতির চেহারাটাই পাল্টে যাবে, ভদ্র রাজনীতির উদয় হবে। এর থেকেই বুঝতে পারবেন, তিনটি গুণ সংক্রান্ত যে তত্ত্বের কথা এই অধ্যায়ে আলোচিত হলো, মানুষের জীবনে তার প্রভাব কতখানি! বাবা-মা যদি *রাজসিক* অথবা *তামসিক* ধরনের মানুষ হন, তো তাঁদের ব্যবহার একরকম হয়; আবার তাঁরা যদি সামান্য *সত্ত্বগুণ*সম্পন্ন হন, তাহলে দেখবেন কী চমৎকার তাঁদের ব্যবহার। *রজোগুণ* শক্তি দেয়; *রজোগুণ* ছাড়া কর্মশক্তি আসে না। কিন্তু সেই শক্তিকে ইতিবাচক এবং গঠনমূলক হতে হবে এবং সেই শক্তিকে সকলের কল্যাণের কাজে লাগাতে হবে। সেটি তখনই সম্ভব হবে যখন *রজোগুণ*, কিছুটা হলেও, *সত্ত্বগুণের* দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। *রজোগুণ সত্ত্বের* দ্বারা মার্জিত হলে তবেই সামাজিক জীবন গঠনমূলক ও সৃষ্টিধর্মী হতে পারে। এখানে কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে আমাদের কেউই শুধু *রজোগুণ* বা *সত্ত্বগুণ* বা *তমোগুণ*-এ তৈরি নয়। তিনটি গুণ সকলের মধ্যেই আছে, তবে পরিমাণগত তারতম্য আছে। কারো মধ্যে *তমোগুণ*-এর ভাগ বেশি, তার সঙ্গে একটু *সত্ত্বগুণ*-ও আছে, অথবা *রজোগুণ* বেশি, *সত্ত্বগুণ* সামান্য। কারো মধ্যে হয়তো আবার *সত্ত্বের* প্রাধান্য, তার সঙ্গে একটু একটু *রজো ও তমোগুণ।* তাই প্রয়োজন কেবল গুণগুলির মধ্যে ভারসাম্য আনা, তাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা। আমাদের লক্ষ্য হবে মনটিকে *সত্ত্ব* অভিমুখী করা। তাহলে রজঃ এবং তমঃ আমাদের দাস হয়ে থাকবে, ইচ্ছেমতো তাদের আমরা কাজে লাগাতে পারব। কোন গুণই একেবারে ফ্যালনা নয়; এমনকি তমোগুণও কাজে লাগে। যেমন ক্রোধ। মনোবিজ্ঞানের মতে, যা আগেই বলেছি, আমাদের জীবনে ক্রোধেরও মূল্য আছে। তেমনি যন্ত্রণারও উপযোগিতা আছে। আপনার শরীরে যন্ত্রণা থাকলে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন, সেই যন্ত্রণার কোন উদ্দেশ্য আছে কি না। দেখবেন, তিনি বলবেন, 'যন্ত্রণা আপনাকে বাঁচিয়ে রাখে'। সত্যি কথা। যন্ত্রণা না থাকলে বাঁচা দুষ্কর। মনে করুন, আপনি আগুন

স্পর্শ করে যদি জ্বলন অনুভব না করেন, তাহলে তো আগুনের থেকে আপনি হাতই সরাবেন না; হাতটাই তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তাই যন্ত্রণার আবশ্যকতা আছে, তারও এক ইতিবাচক দিক রয়েছে। সে দিক থেকে বিচার করলে জীবনে দুঃখকষ্টেরও একটা দাম আছে, কারণ সেইসব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি।

এইভাবে তিনটি গুণের আলোকে যদি আমরা নিজেদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারি, তাহলে আমাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবে, নতুন নতুন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হবে। সেক্ষেত্রে এমন সব নর-নারীর আবির্ভাব হবে যাঁদের মধুর আচরণে বহু মানুষ আকৃষ্ট হয়ে সমাজে সুখ, শান্তি এবং সুসম্পর্কের ভিত্তিতে জীবনযাপন করতে সক্ষম হবেন। সাংখ্যদর্শনের মতে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনগুণের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। একমাত্র মানব জীবনেই এই খেলাটিকে খুব কাছ থেকে আমরা দেখতে পারি। কিন্তু বস্তুজগতেও যে এই শক্তিগুলি কাজ করে চলেছে, তা বুঝতে হলে আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানোর প্রয়োজন।

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

'শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় এখানেই সমাপ্ত'।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষ-সন্ন্যাস-যোগ

সন্ন্যাসের মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভের পথ

আজ আমরা অষ্টাদশ অধ্যায়ে প্রবেশ করছি। এটি গীতার শেষ অধ্যায় এবং বেশ দীর্ঘ। আগের সতেরটি অধ্যায় জুড়ে যেসব চিন্তা, ভাব ও আদর্শ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বলা হয়, এই অধ্যায় তার সারাৎসার। অর্জুনের একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু হচ্ছে এই অধ্যায়। অর্জুনের যে প্রশ্ন, সে তো *আমাদেরও* প্রশ্ন। আমাদের সকলেরই তো সেই একই সমস্যা। আগের আগের অধ্যায়গুলিতে অর্জুন যেসব প্রশ্ন করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তার যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু তবুও অর্জুনের মনে প্রশ্নের বিরাম নেই। ঠিক আমাদেরই মতো। এসব প্রশ্ন নিরন্তর আমাদের মনেও ওঠে। এই অধ্যায়ে অর্জুন আবার প্রশ্ন তুলেছেন : আমি কি চুপচাপ থাকব না কর্ম করব? কাজ করা ভাল, না শান্ত হয়ে থাকা ভাল? কাজ না করে তো কেউ বাঁচতে পারে না, অথচ কাজ করলেও তো ঝামেলা। তাহলে কোন্ পথ বেছে নেব?

লোকমান্য তিলক তাঁর বিখ্যাত দু-খণ্ডের *গীতা রহস্য*-এ বলেছেন : আপনি যদি কাজ করেন, কোন না কোন সমস্যা আসবেই; আপনি যদি কোন কাজ না করেন, তাহলে কোন সমস্যা আসবে না। হিন্দুরাও সিদ্ধান্ত নিলেন : ভাল কথা, আমরা তাহলে কোন কাজ করব না! কিন্তু করব না, মুখে বললে কি হবে, মনে তো বাসনা গজগজ করছে! এ হলো এক ধরনের ভণ্ডামি বা তঞ্চকতা যা আমাদের জীবনে প্রবেশ করেছে। হৃদয় চাইছে, কিন্তু মনে মনে বলছি, আমি কিছুই করব না। এই যে ভাবের ঘরে চুরি—এর থেকেই যত সমস্যা।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে—

গীতার 'কর্মযোগ' নামক তৃতীয় অধ্যায়ের ৬ নম্বর শ্লোক এটি। ঐ অধ্যায়টিও অর্জুনের একটি প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। কর্ম না অকর্ম? কোন্‌টি

শ্রেয়? এই ছিল অর্জুনের জিজ্ঞাসা। সেখানে নিশ্চয় করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, কাজ না করে বসে থাকার চাইতে কাজ করা অনেক ভাল। উল্লিখিত ঐ যষ্ঠ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ 'যারা কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছে, অথচ মন যাদের জগতের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর দিকে অবিরত ছুটছে, তারা *মিথ্যাচারী*, অর্থাৎ "ভণ্ড"।' তারপর পরের শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ *যস্ত্ব ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য*, 'কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে'; *অসক্তঃ*, 'অনাসক্ত' হয়ে; *কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগম্ আরভতে*, 'কর্মযোগের দিকে কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে চালিত করেন'; *স বিশিষ্যতে*, 'তিনি [আগের ঐ মিথ্যাচারী অপেক্ষা] শ্রেষ্ঠ'। তিনিই প্রকৃত *যোগী*। তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এই দু-ধরনের মানুষের উল্লেখ করেছিলেন। এখন এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে ফের সেই প্রশ্ন উঠেছে।

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১॥

অর্জুন বললেন—'হে মহাশক্তিশালী হৃষীকেশ, হে কেশিবিনাশক (শ্রীকৃষ্ণ), আমি সন্ন্যাসের ও ত্যাগের স্বরূপ পৃথক পৃথক ভাবে জানতে ইচ্ছা করি।'

হে মহাবাহু কৃষ্ণ, *সন্ন্যাস* ও *ত্যাগ*-এর তত্ত্ব আমি আলাদা আলাদাভাবে জানতে চাই। সন্ন্যাস কী? ত্যাগের অর্থই বা কী? সন্ন্যাস মানে সংসার ছেড়ে সাধু বা সন্ন্যাসিনী হওয়া—তা না হয় বোঝা গেল; কিন্তু ত্যাগ? ত্যাগ মানেও তো বর্জন করা, কিন্তু কী বর্জন? সেটিও কী সন্ন্যাসের মতোই, কাজকর্ম ছেড়ে বনে চলে যাওয়া? এই প্রশ্ন এখানে উঠেছে এবং এই অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তার ওপর আলোকপাত করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ভারতের জাতীয় আদর্শ *ত্যাগ* ও *সেবা*। *ত্যাগ* মানে পরিত্যাগ করা বা ছেড়ে দেওয়া এবং *সেবা* হলো পরিচর্যা। এই দুটিই আমাদের আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই ত্যাগের কথা বলবেন। *সন্ন্যাস* প্রসঙ্গে বলা চলে যে এটি পারিভাষিক শব্দ, অর্থাৎ এক বিশেষ অর্থবোধক শব্দ। তার কারণ সকলেই তো আর সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছেন না; তাই কেবল বিশেষ অর্থেই ঐ শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে দুটি জিনিস বলবেন। এক—*ত্যাগ* ও *সন্ন্যাস*-এর পার্থক্য। দুই—*সন্ন্যাস* অথবা *যোগ*, কোন্‌টিকে ভিত্তি করে আমরা আমাদের জীবন গড়ে তুলব।

শ্রীভগবান্ উবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২॥

শ্রীভগবান বললেন—'ঋষিরা *কাম্য* কর্মের ত্যাগকে *সন্ন্যাস* বলে জানেন; জ্ঞানীরা সমস্ত কর্মের ফলত্যাগকে *ত্যাগ* বলেন।'

কবয়ো বিদুঃ, 'ঋষিরা বলেন' যে, *কাম্যানাং কর্মনাং,* জাগতিক লাভ এবং স্বর্গসুখ ইত্যাদি সব 'কামনাপ্রসূত কর্মের'; *ন্যাসং,* 'ত্যাগ', হলো *সন্ন্যাসং,* 'সন্ন্যাস'। *ন্যাস* মানে 'বর্জন'; *সং ন্যাস হলো,* 'সম্যকরূপে বর্জন'। *বিচক্ষণাঃ,* 'জ্ঞানীরা'; *প্রাহুঃ,* 'বলেন'; *সর্বকর্ম ফলত্যাগং,* 'সব কাজের *ফল* ত্যাগ করাই; হলো *ত্যাগং,* 'ত্যাগ'। আপনি কর্ম ত্যাগ করছেন না, আপনি 'শুধু কর্মের ফলগুলো ত্যাগ করছেন'—এই হচ্ছে *সর্ব কর্ম ফল ত্যাগ।* এইভাবে কাজ করাকেই *ত্যাগ* বলে। *ভক্তি* এবং *জ্ঞান* দুই পথেই এই ত্যাগ সম্ভব। ভক্তিতে আপনি আপনার সব কাজের ফল ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করে দেন; জ্ঞান-পথে কর্মফল থেকে মনটিকে সরিয়ে নিতে হয়। কর্মফলের প্রতি আসক্তি আসলে আমিত্বের প্রতি আসক্তি। আপনি আর আমি আলাদা—এই পার্থক্যবোধ থেকেই আমিত্বের জন্ম। তাই যখন অহং বা আমিত্বের প্রতি আসক্ত হই, তখন কর্মের ফলের প্রতিও আমার অনুরক্তি আসে।

গীতায় *সর্ব-ভূত-হিতে-রতাঃ* এবং *লোক-সংগ্রহ* এই দুটি কথা পাওয়া যায়। কথা দুটি সমার্থক। এর তাৎপর্য হলো—'আমি সমাজের জন্য, জগতের সকলের কল্যাণের জন্য কর্ম করি'। ফলে, নিজের পৃথক সত্তাটি যেন অবলুপ্ত হয়ে যায়। এভাবে কাজ করলে নিজের আমিত্ব মুছে যায়, মানুষ তখন জগতের সকলের সঙ্গে একাত্মবোধ করে। মা-বাবারা এভাবেই তাঁদের সন্তানের সঙ্গে একাত্মবোধ করে কাজকর্ম করে যান। কিন্তু এই ভালবাসা ও সমমর্মিতাকে কি পরিবারের গণ্ডির বাইরেও ছড়িয়ে দেওয়া যায় না? গীতা আমাদের সেইটি করতে বলছেন। আপনি যখন সমাজে আছেন, তখন সমাজের কথাও ভাবতে হবে বৈকি। আর আজকের সমাজ তো শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আজ তা আন্তর্জাতিক স্তরে পরিব্যাপ্ত।

আমাদের *সনাতন ধর্মের* যে ইতিহাস, তাতে দেখা যায় বৈদিক যুগে বহুরকম যজ্ঞের চল ছিল। বহু মানুষ স্বর্গে যাওয়ার লোভে যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞ করার

পিছনে ছিল নানান কামনা বাসনা। 'এই যজ্ঞ করলে আমি এই পাব, ঐ যজ্ঞ করলে ঐ পাব'—এইরকম একটা ভাব আর কি! এইভাবে বেশকিছু কাল চলার পর কিছু মানুষ বুঝতে পারলেন যে, স্বর্গে যাওয়ার জন্য এই ধরনের ক্রিয়া-কর্মের অনুষ্ঠান করা বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। তাই ঐজাতীয় অনুষ্ঠান বর্জন করে তাঁরা গৃহত্যাগ করলেন। গৃহত্যাগ করলেন এইজন্য যে, বাড়িতে থাকলে ঐসব ক্রিয়াকলাপ তাঁদের করতে হবেই। অথচ যাগযজ্ঞে তাঁদের রুচি নেই। অতএব সমাজ সংসার ছেড়ে তাঁরা সন্ন্যাসী হয়ে বনে চলে গেলেন। বনে গিয়ে তাঁদের আর ক্রিয়া-কলাপের দায় রইল না। কেবল ধ্যান-চিন্তা এবং আত্ম অনুসন্ধানেই তাঁরা মগ্ন হলেন। এইভাবে কালক্রমে এক নতুন অধ্যাত্মজীবনের অভ্যুদয় হলো, যা আগেকার রক্ষণশীল ও কর্মকাণ্ডভিত্তিক জীবন থেকে স্বতন্ত্র। স্বর্গসুখ ভোগের আশায় নানারকম বৈধী ক্রিয়াকর্ম সাধারণের মধ্যে আগের মতোই চলতে লাগল, কিন্তু এই ধ্যানপ্রবণ আরণ্যক জীবন ও সত্যলাভেচ্ছু কিছু মানুষের জীবন একেবারে অন্য খাতে বইতে লাগল। স্বর্গটর্গ তাঁদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। কিন্তু সাধারণ মানুষের মন থেকে স্বর্গের আকর্ষণ গেল না। যাবে কী করে? স্বর্গে কত না সুখ! বলা হয়, পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়; কিন্তু স্বর্গে গেলে যা চাইবেন, তাই পাবেন—অথচ 'ঘাম ঝরাতে' হবে না। এইসব সুখ কল্পনা করে মানুষ একটা স্বর্গ বানিয়েছে। অন্যদিকে, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ বললেন, 'আমরা স্বর্গ চাই না। স্বর্গে যাওয়ার অভিলাষে কোন কর্ম করার প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরা ঐসব কর্ম ছাড়াই থাকব।' বাস্তবিক, বনে গেলে কেউ আর সকাম বৈধী ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করেন না। তাছাড়া বিস্তারিতভাবে ঐ সব অনুষ্ঠান করতে গেলে যে-সব জিনিস দরকার, বনে-জঙ্গলে তা পাওয়াও যায় না। তাই বিরল কিছু মানুষ বনে গিয়ে ধ্যান এবং চিন্তা নিয়েই রইলেন। ঐটিই হলো তাঁদের সাধনজীবনের প্রধান অবলম্বন। অন্যদিকে যাঁরা *গৃহস্থ,* যাঁরা সংসারেই রইলেন, তাঁরা বাসনার বশে কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে লাগলেন। এইভাবেই দুটি পৃথক জীবনধারার উদ্ভব হয়। পরে শ্রীকৃষ্ণ এসে বললেন, *ত্যাগের* দ্বারা, অর্থাৎ 'কর্মের ফল ত্যাগ করে', যদি কেউ জীবনে *সন্ন্যাসের* ভাবটি বজায় রাখতে পারেন, তাহলে তিনি প্রকৃতপক্ষে *সন্ন্যাসী*-ই। ঠিক কথা। কর্মফলের প্রতি অনাসক্ত হয়ে, পবিত্র জীবনযাপন করে, কেউ সমাজের সেবা করছেন—এটি কত না সুন্দর! গীতা আমাদের জীবন-সমস্যা সমাধানের জন্য এই শিক্ষাই দিয়েছেন। সমস্যাটি কী? সমস্যা এই যে, একদিকে দেখা যায় আত্মকেন্দ্রিক পার্থিব মানুষ ইহলোকে ও

পরলোকে সুখের সন্ধান করতেই ব্যস্ত। ভোগ ছাড়া তারা আর কিছু বোঝে না। এই হলো একধরনের মানুষ। অন্যদিকে আর এক ধরনের মানুষ আছে, যারা ভোগসুখ বর্জন করে, এই জাগতিক জীবনকে ধিক্কার দিয়ে তপস্বী হয়ে অরণ্যে চলে যায়। অরণ্যের তপস্বীরা যেমন সংসারী মানুষ দেখলেই তিতিবিরক্ত হয়, তেমনি সংসারীদের চোখেও তপস্বীরা আজব বস্তু! আমাদের ইতিহাসে বরাবর এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পেয়েছে।

একবার শঙ্করাচার্য মণ্ডন মিশ্র-র কাছে গেছেন। উদ্দেশ্য, তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র বিচার করবেন। মণ্ডন মিশ্র তখনকার দিনের যশস্বী দার্শনিক ও ডাকসাইটে কর্মকাণ্ডী। শঙ্করাচার্যের মাথা ন্যাড়া। মুণ্ডিতমস্তক শঙ্করাচার্যকে দেখামাত্র মণ্ডন মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মাথা ন্যাড়া কেন?' সংস্কৃতে এই প্রশ্নটিকে রহস্যভরে বললেন, কুতো মুণ্ডি? অর্থাৎ, 'এই ন্যাড়া আবার কোত্থেকে?' শঙ্করাচার্যও ক্ষণকাল বিলম্ব না করে উত্তর দিলেন, 'ঘাড় থেকে ওপর পর্যন্ত!' অর্থাৎ আমার ঘাড় থেকে ওপর পর্যন্ত কামানো বা মুণ্ডিত।

বলাবাহুল্য, মণ্ডন মিশ্র গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন। তখনকার দিনে ঐরকম একটা ভাব ছিল। কোন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসীর উপস্থিতি সুনজরে দেখা হতো না। সংসারী মানুষ ভাবতেন ওটা অলক্ষণ বা অশুভ। কর্মকাণ্ডের অনুগামী ও বনবাসী সন্ন্যাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও ঐরকম একটা দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। যাগযজ্ঞের সমর্থক যাঁরা, তাঁদের মন ছিল ভোগবাসনায় পরিপূর্ণ। তা চরিতার্থ করার জন্য তাঁরা যেমন নানারকম কর্মের অনুষ্ঠান করতেন, সন্ন্যাসীরাও তেমনি আবার অর্থহীন কর্মকাণ্ডের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য অরণ্যে গিয়ে পরিব্রাজকের মননশীল জীবন অতিবাহিত করতেন। তখনকার দিনে বনে যাওয়া সহজ ছিল। ঘর ছেড়ে কিছু দূর গেলেই জঙ্গল। আজকে জঙ্গল খুঁজে পেতে গেলে আপনাকে হাজার মাইল যেতে হবে—তাও সে ঘন জঙ্গল আপনি নাও পেতে পারেন। তখনকার দিনে ঘটনাপ্রবাহ ভারতবর্ষে এই এক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। কর্ম? না, সন্ন্যাস? এই ছিল বড় প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে গীতার শিক্ষা দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। এটিই গীতার বিশেষ সৌন্দর্য, বিশেষ মহিমা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়ে দিচ্ছেন সন্ন্যাস জীবনের উৎকর্ষ আপনি ঘরে বসেই আয়ত্ত করতে পারেন, তার জন্য সংসার ছেড়ে আপনাকে অরণ্যবাসী হতে হবে না। এখানে থেকে অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিক সংগ্রাম চালিয়ে এবং বাইরে অনাসক্তভাবে মানুষের সেবা করেই যে কেউ ইচ্ছে করলে *সন্ন্যাসী* হতে পারেন। সংসারে বাস করেও পরমবস্তু লাভ করা সম্ভব।

মহাভারত এবং *শ্রীমদ্ভাগবত*-এর বেশ কিছু শ্লোকে এই সব কথা আলোচিত হয়েছে। *হিতোপদেশ*-এর দ্বিতীয় ভাগে (সন্ধি, ৯০) একটি শ্লোক পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে ঃ

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিনাং
গৃহেষু সর্বেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্মণি যঃ প্রবর্ততে
নিবৃত্ত রাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥

আপনি অধ্যাত্মজীবন গড়ে তোলার জন্য তপস্যার উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে তপোবনে যেতে চাইছেন! বলা হচ্ছে—না, আপনি গৃহকেই *তপোবনম্*, অর্থাৎ 'তপোবন' করে তুলতে পারেন। কেন একথা বলা হলো? বলা হলো এই জন্য যে, *বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিনাং*, 'মনে যাদের ইন্দ্রিয়ের প্রতি আসক্তি আছে, তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে বনে গেলেও প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হবে'। কারণ মন তো তাদের সঙ্গেই যাবে। ঘরবাড়ি ছাড়লেই তো আর মনের আসক্তি উবে যাবে না। *রাগ* অর্থাৎ আসক্তিপূর্ণ মন নিয়ে বনে গেলেও ত্যাগের ফল তারা পাবে না। তাই, *গৃহেষু সর্বেন্দ্রিয় নিগ্রহঃ তপঃ*, 'গৃহে থেকেও ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত রাখাই প্রকৃত তপস্যা।' অতএব, *অকুৎসিতে কর্মণি যঃ প্রবর্ততে*, 'যিনি সমাজের নির্দোষ কর্মে নিযুক্ত আছেন'; *নিবৃত্ত রাগস্য*, 'এবং যিনি আসক্তি জয় করেছেন'; *গৃহং তপোবনম্*, 'তাঁর গৃহই তপোবন হয়ে যায়।'

অধ্যাত্ম জগতের মনীষীদের এইটিই সিদ্ধান্ত। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গ আলোচনা করে সেই উপদেশই দিয়েছেন এবং বলেছেন, এখানে বসেই এখনই আমরা উপলব্ধির স্বর্ণশিখরে উঠতে পারি। তার জন্য আমাদের অরণ্যে, বা স্বর্গলোকে যাওয়ার দরকার নেই। কারণ যে সত্য আমরা খুঁজছি, তা আমাদের ভিতরেই রয়েছে। তাই তাকে লাভ করার জন্য আবার কোথায় ছুটোছুটি করব? সত্য 'এখানেই' আছে, *ইহ, ইহ, ইহ*। ধরুন কেউ একজন বললেন ঃ 'আমি বৈজ্ঞানিক হতে চাই। বিজ্ঞানমনস্ক হতে চাই। এখানে ওখানে গিয়ে আমি বিজ্ঞানসম্মত মনটিকে লাভ করব।' আপনি কি একথা শুনে অবাক হবেন না? ভাববেন না, এ আবার কোন্ দেশী কথা! মনকে তো এখানেই বিজ্ঞানসম্মত করে গড়ে তোলা যায়। বিজ্ঞানমনস্কতা মানে তো সত্যের অনুসন্ধান। আপনি

সত্যের অনুসন্ধান করুন, মনকে পরিশীলিত করুন, তাহলে এখানেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এখানে ওখানে ছোটাছুটি করে কী লাভ? এ যেন সেইরকম কথা হলো। মনে করুন একজন বলছেন, 'আমি অক্সিজেন নিতে অমুক জায়গায় যাব'। কেন? আমরা যেখানে আছি সেখানেই তো অক্সিজেন রয়েছে। নাক দিয়ে টেনে নিলেই হলো। ঠিক তেমনি, এ কথা বলার কোন অর্থই হয় না যে, 'অমুক জায়গায় গিয়ে আমি ধার্মিক হব'। এখানে ধার্মিক হতে বা অধ্যাত্মজীবন যাপন করতে বাধা কোথায়? উপনিষদের এই সত্য গীতার মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম অকপটে ব্যক্ত হয়েছিল এবং এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে। 'এখানে' এবং 'সেখানে'—মাত্র দুটি শব্দ দিয়ে তিনি সারসত্যটি প্রকাশ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ' "*হেথা, হেথা*", হলো *জ্ঞান;* "*হোথা, হোথা*" *অজ্ঞান*।' ভাষাটি একবার লক্ষ্য করুন। যদি ভাবি সত্য 'সেখানে', তাহলে সেটি অজ্ঞান। আর যদি বুঝতে পারি, সত্য 'এখানেই', সেটি জ্ঞান। এই অন্তিম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সেই *জ্ঞান* আমাদের দিচ্ছেন।

আপনার সামনে দুটি পথ খোলা আছে। আপনি স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে কাজ করতে পারেন, আবার জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়েও কাজ করতে পারেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত অধ্যাপক সোরোকিন (Sorokin) বলেছেন, আধুনিক সভ্যতায় পরোপকার মনোবৃত্তির একান্ত অভাব এবং তার ফলেই মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। বার্ট্রান্ড রাসেলও বলেছেন যে, মানুষের হৃদয়ে অন্যের প্রতি একটু ভালবাসা থাকা প্রয়োজন। সেই ভালবাসা এলে মানবজীবনের বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে। সোরোকিন, রাসেল এবং অন্যান্য বহু মনীষীও বলেছেন যে, ক্ষুদ্র আমিত্বের বাইরে যাবার ক্ষমতা মানুষের আছে। তার জন্য দরকার জগৎটাকে একটু উদার দৃষ্টিতে দেখা, বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। গীতারও মূল বক্তব্য এইটিই। গীতার *যোগ* সকলের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এক অনবদ্য শিক্ষা। এই শিক্ষা বলে, আমার কর্মের যাবতীয় ফল সকলের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, তা *কেবল* আমার সুখভোগের জন্য নয়। তাহলে এই শ্লোকগুলিতে *কাম্য কর্ম*-এর ত্যাগ এবং *সর্ব-কর্ম-ফল-ত্যাগ,* এই দুটির সংজ্ঞা পাওয়া গেল।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩॥

—'কোন কোন দার্শনিকরা বলেন সকল কর্ম দোষযুক্ত, তাই [সেগুলি] ত্যাগ করা উচিত; আবার অন্য কেউ কেউ [বলেন] *যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা* রূপ কর্ম ত্যাগ করা অনুচিত।'

একে প্রাহুঃ মনীষিণঃ, 'কোন কোন মনীষী বলেন'; ত্যাজ্যং *দোষবৎ ইতি কর্ম,* 'সকল কর্ম দোষযুক্ত, এই কারণেই তা ত্যাগ করা উচিত।' *ত্যাজ্যং* মানে 'ত্যাজ্য' বা বর্জনীয়। কেন? *দোষবৎ,* 'কারণ তা দোষযুক্ত'; *ইতি একে মনীষিণঃ প্রাহুঃ,* 'একদল পণ্ডিত এইরকম বলে থাকেন'। তাঁরা বলেন : 'কর্ম দোষের মূল; ওসব বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়'। এ হলো একটা মত। আবার অন্য মতও আছে। সেখানে বলা হচ্ছে, *যজ্ঞ, দান, তপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি চ অপরে,* 'অন্য কেউ কেউ বলেন, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা, এই তিনরকম কর্ম কারো ত্যাগ করা উচিত নয়।' *যজ্ঞ* হলো উৎসর্গ—আধ্যাত্মিক অর্থেও বটে এবং বৈধী ক্রিয়া অর্থেও; *দান* মানে অন্যকে সাহায্য করা; এবং *তপঃ* হলো তপস্যা বা আত্ম-সংযম। অন্যান্য জ্ঞানীরা বলেন এই তিনরকমের কর্ম কারো ত্যাগ করা উচিত নয়।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪ ॥

—'হে ভরতশ্রেষ্ঠ, *ত্যাগ* সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত শোন। *কারণ,* হে নরশার্দূল [অর্জুন], বলা হয়েছে ত্যাগই ত্রিবিধ।'

ভরতসত্তম, 'হে ভরতশ্রেষ্ঠ' [অর্জুন]; আমি এ বিষয়ে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলছি। *নিশ্চয়ং* মানে 'সিদ্ধান্ত'; সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তটি কী? বলছেন, *ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ।* সিদ্ধান্তটি শ্রীকৃষ্ণ একটু পরে বলবেন; এখানে শুধু সামান্যভাবে তিনি ত্যাগের বর্ণনা দিচ্ছেন। বলছেন, '*ত্যাগ* অথবা কর্মত্যাগ, হে নরশার্দূল, তিন ধরনের বলে সুপরিচিত'। আগের অধ্যায়ে যেমন বলা হয়েছে, *ত্যাগ*-এর ক্ষেত্রেও *সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ,* এই তিনগুণের প্রভাব সুস্পষ্ট। এখানে যা বলা হচ্ছে, তার সত্যতা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই কোন না কোন সময়ে আমরা বুঝতে পারব।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

—'যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়; তা করাই উচিত; [কারণ] মনীষীদের মতে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা চিত্তশুদ্ধিকারক।'

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যজ্ঞ, দান তপস্যা এবং আত্মসংযম কারোরই ত্যাগ করা উচিত নয়। এগুলি 'অবশ্যই করা উচিত', *কার্যম্ এব। কেন? যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্,* 'যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা—এই তিনটি মানুষের চিত্ত শুদ্ধ করে।' এগুলি আমাদের করতেই হবে, কারণ আমরা তো উন্নত হতে চাই। এগুলি সেই উন্নতির সহায়ক। এগুলি আমাদের মনটিকে শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর করার উপায়। বলা হয়েছে *পাবনানি,* 'চিত্তশুদ্ধিকর'; মনকে আধ্যাত্মিক পথে বিকশিত হওয়ার উপযুক্ত করে তোলে। *মনীষিণাম,* 'মনীষীদের'। তাৎপর্য এই, যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এইসব কর্ম কখনও বর্জন করবেন না। কারণ তাঁরা এসবের মূল্য বোঝেন। তাঁরা জানেন এগুলি মনকে শুদ্ধ করে।

এই শিক্ষা মেনে চললে দেহের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আপনি সকলের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবেন। এইভাবে ক্ষুদ্র 'আমিত্ব' পরিমার্জিত হয়ে, মন পরিশুদ্ধ হয়ে হৃদয়ের বিস্তার ঘটবে—আপনার ভিতরকার সবরকমের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু *যজ্ঞ, দান, তপস্যা,* এই তিনটি *ঠিক ঠিক* ভাবে করলে, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করলে, তবেই এই রূপান্তর ঘটবে। পরবর্তী শ্লোকে এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন ঃ

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬॥

—'কিন্তু, হে পার্থ, এইসব কর্মও আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে করা উচিত; এটিই আমার শ্রেষ্ঠ নিশ্চিত মত।'

ইতি মে নিশ্চিতং মতম্ উত্তমম্, 'এটিই আমার দৃঢ় এবং সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত'। সিদ্ধান্তটি কী *এতান্যপি তু কর্মাণি,* 'এমনকি এসব কর্ম' যথা *যজ্ঞ, দান* ও *তপস্যা; কর্তব্যানি,* 'করা উচিত', করা আমাদের কর্তব্য। কেমন করে করব? বলা হচ্ছে, *সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ,* 'সব আসক্তি ও ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে'। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই বিষয়ে এটিই আমার দৃঢ় ও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এমনকি এসব কর্ম করার সময়েও অনাসক্ত হয়ে, মনের সঙ্কীর্ণতা বিসর্জন দিয়ে, নিজেই কর্মের ফল ভোগ করব, এই আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে করতে হবে। *লোকসংগ্রহ,* অর্থাৎ 'জগতের সবার মঙ্গলের জন্য কর্ম

করছি', এই ভাবটি মনের মধ্যে সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে। তবেই মানুষ তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। তা না হলে দৈহিক ও মানসিক সঙ্কীর্ণতার দাপটে সমাজে হিংসা, কলহ ও সবরকমের দুঃখকষ্ট বাড়তেই থাকবে। তাই প্রকৃতির দেওয়া জৈবিক সীমাবদ্ধতা আমাদের অতিক্রম করতেই হবে, আর তা করা সম্ভব আমাদের উচ্চতর প্রকৃতির সাহায্যে। তাই *জৈবিক প্রকৃতির বিলোপসাধনের জন্য আপনার মানবিক প্রকৃতিকে বিকশিত করুন, শক্তিশালী করুন। এখানেই আধ্যাত্মিক জীবনের গুরুত্ব।* দৈহিক স্তরে বেঁচে থাকার অর্থ প্রকৃতির হাতের পুতুল হয়ে থাকা। জীবজন্তুরা সেভাবেই বাঁচে; আমরাও হয়তো বেশিরভাগ সময় সেভাবেই বাঁচি। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সীমার পর আমাদের প্রকৃত সত্তার মহিমাকে প্রকাশ করতেই হবে। কারণ আমরা তো আর জড় ধূলিকণা নই, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির গোলাম নই। আমাদের অন্তর্নিহিত একটি স্বরূপ আছে, তার নিজস্ব শক্তি আছে। যখন ভিতরের সেই শক্তিগুলিকে জাগ্রত করে আমরা কাজে লাগাই, তখন চারিত্রিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক—এক কথায় সবরকমের বিকাশ সম্ভব হয়। প্রশ্ন করতে পারেন—'আধ্যাত্মিক উন্নতির কী দরকার? কেনই বা আমি আধ্যাত্মিক দিক থেকে উন্নত হতে যাব?' তার উত্তর এই—সেটিই তো আপনার প্রকৃত স্বরূপ। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী উন্নত হয়ে তার স্বরূপে পৌঁছতে পারে না; বাইরের প্রকৃতির কোন বস্তুই তা পারে না। পারে একমাত্র মানুষ। তাই আমাদের ধীরস্থির পদক্ষেপে সেই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে এবং সেই অগ্রগতির প্রথম ধাপই হলো বৈরাগ্য, অর্থাৎ কর্মের ফলের প্রতি অনাসক্তি। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়েছিল এই প্রসঙ্গ দিয়ে। এখানে অবশ্য ঐ একই বিষয়ের অন্যান্য দিকগুলি তুলে ধরা হচ্ছে।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে ।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭॥

—'অবশ্যকরণীয় নিত্যকর্মের ত্যাগ কিন্তু ঠিক নয়। অজ্ঞানতাবশত তার ত্যাগ তামসিক বলে কথিত।'

নিয়তস্য কর্মণো তু, 'কিন্তু বিহিত নিত্যকর্মের'; *সন্ন্যাসঃ ন উপপদ্যতে*, 'ত্যাগ উচিত নয়', মানুষকে তা করতে হবে। *নিয়ত* কথার অর্থ 'নির্দিষ্ট' বা বিহিত, যেমন সকলের কল্যাণের জন্য অবশ্যপালনীয় কতকগুলি কর্তব্য রাষ্ট্র

নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়, সেইরকম আর কি। এইসব নিয়মকানুন সকলের ভালর জন্য। তাই সকলকেই তা মেনে চলতে হয়। সেইরকম, আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুলি দেওয়া হয়েছে যা আমাদের মেনে চলা উচিত। চিকিৎসকের নির্দেশ কি আমরা মেনে চলি না? চলি। তাই বলা হচ্ছে, *ন উপপদ্যতে,* 'ত্যাগ করা উচিত নয়'; কোনগুলি? *নিত্যকর্মগুলি* বা 'বিহিত কর্তব্যগুলি'। *মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ,* 'নিছক অজ্ঞানতাবশত তার ত্যাগ'; *তামসঃ পরিকীর্তিতঃ,* ঐ ধরনের ত্যাগকে *'তামসিক ত্যাগ* বলে', অর্থাৎ ঐ ত্যাগ *তমোগুণসম্ভূত।* তাই দেখা যায়, আমাদের মধ্যে যখন *তমোগুণ*-এর প্রাবল্য ঘটে, তখন আমাদের এবং সকলের কল্যাণের জন্য যেসব কর্মের বিধান দেওয়া আছে, সেগুলিকেও আমরা অগ্রাহ্য করি, বর্জন করি। এই ত্যাগকে কিন্তু তামসিক বলা হয়েছে।

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

—'যিনি শারীরিক দুঃখকষ্টের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করেন, তিনি *রাজসিক* ত্যাগ করে ত্যাগের ফল লাভ করেন না।'

দুঃখম্ ইত্যেব যৎ কর্ম, 'এই কর্ম অতি দুঃখজনক', অতএব আমি তা ত্যাগ করব, এই মনে করে যে ত্যাগ করা হয় তা *রাজসিক* ত্যাগ। *দুঃখম্,* 'যে কাজ দৈহিকভাবে কষ্টকর'; আবার, *কায়ক্লেশ,* 'শারীরিকভাবে যন্ত্রণাদায়ক' এই ভয় থেকে; *ত্যজেৎ,* যদি কর্ম 'ত্যাগ করা হয়'; তাহলে এই ত্যাগ *রাজসিক। কৃত্বা রাজসং ত্যাগং,* 'এই ধরনের *রাজসিক ত্যাগ* করে; *স নৈব ত্যাগফলং লভেৎ,* 'তিনি কখনও সেই ত্যাগের ফল লাভ করতে পারেন না।'

এরপর *সাত্ত্বিক ত্যাগ*-এর প্রসঙ্গ আসছে।

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন ।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

—'হে অর্জুন, আসক্তি ও ফল ত্যাগ করে, কেবল কর্তব্যবোধে যে নিত্য কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই *ত্যাগ সাত্ত্বিক* বলে বিবেচিত।'

স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ, 'সেই ত্যাগ *সাত্ত্বিক* বলে পরিচিত'; সে ত্যাগ কীরকম? *কার্যম্ ইত্যেব যৎ কর্ম ক্রিয়তে,* 'এই কার্য করা উচিত বলেই করছি',

এই মনোভাব থেকে যে কাজ করা হয়। সংস্কৃতে *কার্যম্* মানে, 'কর্তব্য'— অর্থাৎ এই বিবেচনা যে, এ কাজটি আমার করা উচিত। এই ধরনের যে কাজ, তা *কার্যম্*, অর্থাৎ 'আমি যা করতে বাধ্য'। এবং *নিয়তং* মানে, 'যে কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।' কিন্তু এই কাজ কীভাবে করা হয়? *সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব*, 'আসক্তি এবং কর্মের ফলকামনা ত্যাগ করে'। এইরকম *ত্যাগ* করতে পারলে তবেই তা *সাত্ত্বিক ত্যাগ।* ত্যাগের মধ্যে এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণ আগেই বলেছেন, ত্যাগও *সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক* এই তিনরকম। এখন তিনি বলছেন ঃ

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে ।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

—'সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ত্যাগী, [যিনি] জ্ঞানী ও সংশয়শূন্য, [তিনি] অপ্রীতিকর কর্মকে দ্বেষ করেন না, আবার শুভকর্মেও আসক্ত হন না।'

এইরকম কর্মী *মেধাবী* বা 'বুদ্ধিমান'; এবং *ছিন্নসংশয়ঃ*, 'সব সংশয় থেকে মুক্ত'। কীরকম তাঁর প্রকৃতি? *ন দ্বেষ্টি অকুশলং কর্ম,* 'অশুভ কর্মকে দ্বেষ করেন না'; এবং *কুশলে ন অনুষজ্জতে,* যিনি 'শুভকর্মেও আসক্ত হন না।' অর্থাৎ অশুভ কর্ম তাঁকে ভয় দেখাতে পারে না, আবার শুভকর্মের প্রতিও তাঁর কোন আসক্তি নেই। *ত্যাগী,* তিনি, 'ঐ ধরনের ত্যাগসম্পন্ন'; এবং *সত্ত্বসমাবিষ্টো, 'সত্ত্বগুণে* প্রতিষ্ঠিত।' অর্থাৎ এই ব্যক্তির মনটি *সত্ত্বগুণে* পরিপূর্ণ। আবার তিনি *মেধাবী,* 'অত্যন্ত বুদ্ধিমান'। সেই বুদ্ধি কী ধরনের? সেই বুদ্ধিকে সংস্কৃত ভাষায় *মেধা* বলা হয়। এই শব্দের অতি গভীর মহিমা। যোগ দর্শনে বলা হয়েছে, নির্মল বুদ্ধি যখন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে ওঠে, তখনই তা *মেধায়* রূপান্তরিত হয়। আপনার মানসিক শক্তি হয়তো এখন খুবই সাধারণ স্তরের, কিন্তু সেই শক্তিকে পরিশীলিত করা যায়, মার্জিত করে তাকে এমন স্তরে টেনে তোলা যায় যখন শেষপর্যন্ত তা *মেধাশক্তিতে* পর্যবসিত হয়। তাহলে *মেধাবী* শব্দের অর্থ কী দাঁড়াল? শুভ ও সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। *মেধাবী* শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শঙ্করাচার্য ভারী সুন্দর বলেছেন ঃ *মেধয়া আত্মজ্ঞান লক্ষণয়া,* '*মেধা*-র স্বরূপ হলো *আত্মজ্ঞান* অথবা আত্মা সম্পর্কে জ্ঞান; *প্রজ্ঞয়া সংযুক্তঃ,* 'প্রজ্ঞাযুক্ত'। অর্থাৎ এই *মেধা* হলো সেই ধরনের বুদ্ধি যা আত্মাকে স্পর্শ করেছে এবং তা থেকেই প্রজ্ঞার উদ্‌বোধন বা জাগরণ। এই *মেধা* যাঁর আছে, তিনিই

প্রকৃত *মেধাবী*—শঙ্করাচার্যের দেওয়া সংজ্ঞার মর্ম এই। বেদে এই মেধাশক্তির খুব প্রশংসা করা হয়েছে। 'আমাকে মেধা দাও'—এই প্রার্থনামন্ত্র বেদে উচ্চারিত হয়েছে। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্*-এও মেধার স্তুতি করে বলা হয়েছে—'আমাকে *মেধাশক্তি* দাও'। *মেধা* সাধারণ বুদ্ধি নয়, এটি উচ্চতম, আলোকোজ্জ্বল, সূক্ষ্ম বুদ্ধি। আমাদের ঋষি-মুনিরা জানতেন, যে মানসিক শক্তি আমাদের মধ্যে দিনরাত প্রবাহিত হচ্ছে তাকে ক্রমাগত পরিশুদ্ধ করে তোলা সম্ভব। যদি সংস্কৃতির কথা বলেন, তবে সেক্ষেত্রেও তার উন্নতি হয় কেবল তখনই, যখন আমাদের এই মানসিক শক্তি সূক্ষ্ম ও পরিমার্জিত হয়। একজন অসভ্য বর্বরের কথাই ধরুন। তার আচার ব্যবহার ঐরকম কেন? তার কারণ, তার মানসিক শক্তি নিতান্তই স্থূল ধরনের। কিন্তু এইটাই শেষ কথা নয়। এই মানুষই আবার একদিন ভদ্র, নম্র, সুজন হয়ে উঠতে পারেন। যখন তা হয়, তখন মুগ্ধ না হয়ে আমরা পারি না।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে মানসিক শক্তিকে আমাদের পরিশুদ্ধ করে তুলতে হবে এবং এই পরিমার্জন বা মাজা-ঘষা চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছলে তবেই *মেধাশক্তি* জাগবে; জাগবে এই জন্য যে মানসিক শক্তিতে তখন আত্মার একটু ছোঁয়া লেগেছে। কি সাংস্কৃতিক জীবনে, কি আধ্যাত্মিক জীবনে, সর্বত্র অগ্রগতি এইভাবেই এসেছে এবং আসে। একসময় আমরা আদিম মানুষ ছিলাম। আজ আমরা সভ্য ও সংস্কৃতিবান হয়েছি। কিন্তু কীভাবে এই রূপান্তর ঘটেছে? আমাদের ভিতরের মানসিক শক্তিকে পরিবর্তিত করেই এই বিবর্তন সম্ভব হয়েছে। তার পিছনে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল, নিজেদের শুদ্ধ করে তোলার উদ্যম ছিল। গোড়ায় তো আমরা পরস্পরকে ধ্বংস করতাম; এমনকি মানুষ মানুষের মাংসও খেত। কিন্তু আজ তো তা করি না। এখন আমরা সভ্য। কিন্তু এটা ঘটল কী করে? আমাদের অন্তরের পরিবর্তন ঘটিয়েই এটি সম্ভব হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি এবং মন কিছুটা সংযত হওয়ার ফলে মানসিক শক্তি শুদ্ধ হয়ে আজ আমাদের এই রূপান্তর, এই প্রগতি। সকল মানব-প্রগতির লক্ষ্যই চিত্তের এই সংশুদ্ধি। এমনকি স্কুল-কলেজে যারা পড়াশুনা করতে যায়, তাদেরও এভাবে বিকশিত হতে হবে, যদিও এ দিকটার দিকে এখন আমরা তেমন দৃষ্টি দিই না বা গুরুত্ব দিই না। তার ফলে প্রায়শই দেখা যায়, তথাকথিত এই শিক্ষা পেয়ে কেউ কেউ আরো বর্বর হয়ে ওঠে। অতটা বর্বরতা সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না। এর কারণ বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে না, তার সত্তার গভীরতম দিকটিকে ছুঁয়ে যেতে পারে

না। ফলে মন যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়; তার কোন উন্নতি এবং শুদ্ধি হয় না। লাভের মধ্যে মাথায় ঢোকে কিছু পুঁথিপড়া জ্ঞান। আর এর জন্য মানুষের মন আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সারা বিশ্বেই এই ব্যাপার ঘটছে। ফুটবল খেলার মাঠে কী বীভৎস দুর্ঘটনা ঘটে তা আমরা খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাই। এর একটা কারণ খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউ কেউ অতি হিংস্র, বর্বর এবং স্থূল স্বভাবের; অথচ তাঁরা শিক্ষিত! কিন্তু স্কুল-কলেজের শিক্ষা থাকলে কি হবে, তাঁরা তাঁদের মনটিকে আদৌ উন্নত করার চেষ্টা করেননি; তাই তাঁরা অমার্জিতই রয়ে গেছেন। রাজনৈতিক দলগুলিকে লক্ষ্য করুন। তারা যুবসম্প্রদায়কে আরো স্থূলতা, আরো হিংসার পথে যেতে বাধ্য করছে। এসবের কারণ একটিই—মনের কোন উন্নতি হচ্ছে না, চিত্তের কোন রূপান্তর ঘটছে না। কিছু তথ্য, কিছু অসংলগ্ন জ্ঞান মস্তিষ্কে ঢুকছে, ঐ পর্যন্ত—জীবনের গুণগত মানের কোন উন্নতি হয়নি। কিন্তু মানুষকে যদি মূল্যবোধের শিক্ষা না দেওয়া হয়, তাহলে সমূহ বিপদ। আগামী পঞ্চাশ বছরে সমাজ এমন সব বিকৃত মানুষে ভরে যাবে যারা হিংসা দিয়ে তৈরি! উন্মত্ত, হিংস্র সব সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হবে। এ আশঙ্কা আজ বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ করছেন। তাই নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন—'আমি কি *মেধাবী?*' অর্থাৎ, আপনি কি আপনার মনের শক্তিকে শুদ্ধ করেছেন, তার রূপান্তর ঘটাতে পেরেছেন? একাজ আপনাকেই করতে হবে, অন্য কেউ আপনার হয়ে করে দিতে পারবে না। অবশ্য এ কাজে বাইরে থেকে প্রেরণা ও সাহায্য আপনি অবশ্যই নিতে পারেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে ভিতরের শক্তিকে সূক্ষ্ম ও মার্জিত করে তোলাই প্রধান কাজ। সবরকমের বিকাশ ও উন্নতি এই বিশেষ অনুশীলনের ফল। এই অনুশীলনের ওপর যদি আমরা জোর দিই, তাহলে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। শিশুর যখন সাত থেকে দশের মধ্যে বয়স, তখন তাকে সস্নেহে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, তার ভিতরে যে শক্তি আছে তা শুদ্ধ করতে হবে। বলতে হবে, দেখো—আমরা জামাকাপড় পরিষ্কার করি। সেইরকম তোমার মনটিকেও একটু পরিষ্কার করবে না কেন? সেটাও করা দরকার। কিন্তু মন তো আর সাবান জলে পরিষ্কার করা যায় না; তার জন্য চাই *জ্ঞান*।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে (৩৮নং শ্লোকে) বলা হয়েছে ঃ *ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে,* 'জ্ঞানের মতো পবিত্র এ জগতে আর কিছু নেই'। তাহলে

দেখা যাচ্ছে একমাত্র জ্ঞানই মনকে শুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু সে জ্ঞান কি পুঁথিগত জ্ঞান? স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের জ্ঞান? না, ও জ্ঞান নয়। ও জ্ঞান চিত্ত শুদ্ধ করতে পারে না। সে পারে অধ্যাত্মজ্ঞান, ঐ জ্ঞানের মধ্যেই চরিত্র শোধন ও চরিত্রকে বিকশিত করার শক্তি নিহিত আছে। এখানে *জ্ঞান* বলতে এই অধ্যাত্মজ্ঞানের কথাই বলা হয়েছে। যদি শিশুরা এইভাবে বিকশিত হতে পারে, তাহলে তারা যে ভবিষ্যতে শুধু শিক্ষিত হয়ে উঠবে তাই নয়, তারা সংস্কৃতিবানও হবে। জীবনে সংস্কৃতির প্রবেশ তখনই হয়, যখন আমাদের ভিতরটা শুদ্ধ হয়, সূক্ষ্মভাব ধারণের উপযুক্ত হয়। নাহলে সংস্কৃতির আশা দুরাশা মাত্র। এই দিকটার ওপর আমাদের বিশেষ জোর দিতে হবে, কারণ অল্প বয়সেই আমাদের মধ্যে সবরকম শক্তির প্রাচুর্য থাকে। তখন আমরা ভালমতো খাই, খেলাধূলা করি; এক কথায় তখন আমাদের মধ্যে এত উৎসাহ ও প্রেরণা কাজ করে যে সে সময়ে আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। কিন্তু এই অদম্য উৎসাহ, উদ্দীপনা ও শক্তির প্রাচুর্যকে যদি আমরা গঠনমূলক ও সৃজনধর্মী কাজে নিয়োজিত না করি, তাহলেও বিপদ। বিপথচালিত যুবশক্তি একটা গোটা জাতির সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। স্থূল, জড়বাদী, ভোগসর্বস্ব বিশ্বের প্রায় সমস্ত সমাজেই আজ এটা ঘটতে দেখছি। এরকম হওয়ার কারণ, বৈষয়িক উন্নতির পর যে দ্বিতীয় পদক্ষেপটি নেওয়া প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ মানসিক শক্তিকে মার্জিত করা, তা আদৌ নেওয়া হয়নি। গীতার শিক্ষা অনুযায়ী তাই মানস শক্তিকে পরিশুদ্ধ করে তাকে *মেধা*-য় পরিণত করতে হবে। যিনি তা করবেন, তিনিই *মেধাবী* হবেন।

ছিন্নসংশয়ঃ, 'তাঁর সব সংশয় দূরীভূত হয়েছে'। ছিন্নসংশয় হলে তাঁর মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না। এই শ্লোকে আমাদের মনটিকে এইভাবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

—'দেহাভিমানী ব্যক্তির দ্বারা সকল কর্ম নিঃশেষে ত্যাগ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, তিনি ত্যাগী বলে অভিহিত হন।'

এখানে শ্রীকৃষ্ণ সাধারণভাবে, সচরাচর যা ঘটে থাকে, সে কথাই বলেছেন। *ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণি অশেষতঃ,* 'দেহধারী মানুষ পুরোপুরি

কর্মত্যাগ করতে পারে না।' তাৎপর্য এই, আমাদের শরীর আছে; শরীরের মধ্যেই আমাদের নিবাস। যতদিন আমাদের এই শরীর আছে এবং দেহ-সচেতনতা থাকবে ততদিন আমরা কর্ম ত্যাগ করতে পারি না। *দেহভৃতা,* অর্থাৎ 'যাদের শরীর আছে'; *কর্মাণি ত্যক্তুং ন শক্যং,* 'কর্মসমূহ ত্যাগ করতে পারে না'; কীভাবে? *অশেষতঃ,* 'সম্পূর্ণভাবে'। সামগ্রিকভাবে কেউ কর্মত্যাগ করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে একটি কথা যোগ করেছেন। কী কথা? *যস্তু কর্ম ফল ত্যাগী স ত্যাগী ইত্যভিধীয়তে,* 'সেই ব্যক্তিই *ত্যাগী* যিনি শুধু কর্মের ফলটুকু ত্যাগ করেন', *কর্ম* নয়। কারণ কর্ম না করে পারা যায় না; যেহেতু আমাদের দেহ আছে, সেইহেতু কোন না কোন *কর্ম* আমাদের পিছু ধাওয়া করবেই। তাই বলা হচ্ছে, কর্মের ফলটি ত্যাগ কর। এরকম যিনি করেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগী বলে অভিহিত হন।

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্ ।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

—'ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্র—কর্মের এই ত্রিবিধ ফল, মৃত্যুর পর অত্যাগী ব্যক্তিদের হয়, কিন্তু যাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁদের কখনও হয় না।'

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্লেষণটি কী অসাধারণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, দেখুন। তিনি বলছেন, *ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্,* অর্থাৎ *'কর্মফল* তিন রকমের'; *অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রং চ। 'অনিষ্টম্,* ''অনভিপ্রেত'', *ইষ্টং,* ''অভিপ্রেত'', এবং মিশ্রং, ''মিশ্রিত''। কর্মফল, এই তিনটির মধ্যে, যেকোন একধরনের হবেই হবে—*ইষ্টং, অনিষ্টম্ অথবা মিশ্রং।* কিন্তু এই কর্মফল কাদের ওপর বর্তাবে? তার উত্তরে বলা হচ্ছে, *অত্যাগিনাং,* অর্থাৎ 'যারা ত্যাগের অর্থ বোঝে না', বোঝে না যে কর্মের ফল সর্বদা ত্যাগ করা উচিত। এই সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ যারা, তাদেরই তিনরকমের কর্মফলে বারবার ভুগতে হবে। কোন ফল বাঞ্ছিত, কোন ফল অবাঞ্ছিত, আবার কোন ফল হবে মিশ্র। *ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ,* 'কিন্তু যাঁরা কর্মফল ত্যাগ করেছেন, তাঁদের আর এসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না'। জ্ঞানী এবং মূর্খের এইখানেই তফাৎ।

পরের শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন ঃ

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

—'হে মহাবলশালী [অর্জুন], সকল কর্মের সিদ্ধির যে পাঁচটি কারণ, যা বেদান্তে বলা হয়েছে, তা আমার কাছে জানো।'

সাংখ্যে, অর্থাৎ বেদান্তে, যেখানে শুধু চরম জ্ঞানের কথাই বলা হয়েছে। বাস্তবিক, কর্ম করতে করতেই মানুষ ক্রমশ জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়। আমরা আগেও দেখেছি শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন (৪র্থ অধ্যায়, ৩৩ সংখ্যক শ্লোক)—*সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে,* 'হে অর্জুন, সব কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে'। সব কর্মের স্রোত শেষপর্যন্ত জ্ঞানের সমুদ্রে মিশে যায়। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন ঃ *সাংখ্যে কৃতান্তে,* 'সাংখ্য দর্শনে [অর্থাৎ বেদান্তে], যা *কৃতান্ত* বা ''কর্মকাণ্ডের অন্ত'' অর্থাৎ জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে'; *পঞ্চ এতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে,* 'সকল কর্মের পিছনে এই যে পাঁচটি কারণ বা হেতু থাকে, তা আমার কাছ থেকে জেনে নাও। কারণগুলি শ্রীকৃষ্ণ একটু পরে বলবেন। এখন আমরা এই প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যাটি একটু আলোচনা করি। তিনি বলছেন, এই শ্লোকের *সাংখ্য* শব্দের অর্থ বুঝতে হবে বেদান্ত, অর্থাৎ সেই শাস্ত্র যাতে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিকে শ্রেণিবদ্ধ বা বিন্যস্ত করা হয়েছে। কপিল ও অন্যান্য সাংখ্যবাদীরাও এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। অসম্ভব ক্ষুরধার ছিল তাঁদের মনীষা। বস্তুত, কপিলই বিশ্বের প্রথম মনোবিজ্ঞানী যিনি জগৎকে সাংখ্য দর্শনটি উপহারস্বরূপ দিয়ে গেছেন। প্রাচীনকালের মানুষ যে বাইরের জগৎ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সাংখ্যবাদীরাই সর্বপ্রথম মানুষকে নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, এ বিষয়ে তাঁরাই হোতা। শ্লোকে এর পর বলা হচ্ছে, *সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্,* 'সকল কর্মের লক্ষ্য সিদ্ধ করতে গেলে'; *পঞ্চ এতানি কারণানি,* আপনার দরকার 'এই পাঁচটি কারণ'। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সব কাজের পিছনেই পাঁচটি হেতু থাকবে। এই হেতু বা কারণগুলির কথা পরের শ্লোকে বলা হচ্ছে।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

—'দেহ এবং দেহের কর্তা, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, নানাবিধ পৃথক প্রচেষ্টা এবং পঞ্চমত, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা [সকল কর্মের এই পাঁচটি কারণ]।'

কী গভীর বিশ্লেষণ এবং কী গহন চিন্তা এই বক্তব্যে নিহিত! কর্মের কারণগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই বলা হচ্ছে *অধিষ্ঠানং*, 'দেহ', যা সকল কর্মের ভিত্তি। শরীর না থাকলে কর্মও নেই। তাই কর্মের প্রথম করণটি, অর্থাৎ কার্যসাধনের উপায়টি হলো শরীর। *তথা কর্তা*, 'এবং কর্তা'; অর্থাৎ শুধু দেহ নয়, অহঙ্কারবিশিষ্ট মানুষটিকেও চাই, যে সঙ্কল্প করে 'আমি এই কাজটা করব'। তাই *কর্তা* হলো কর্মের দ্বিতীয় উপায়। *করণং চ পৃথগ্বিধম্*, 'বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি'। এগুলি সব *করণং* বা কাজের উপায়। *কারণং* হলো 'কারণ'; *করণং* হলো 'উপায়' অর্থাৎ যার সাহায্যে করা হয়। *বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা*, 'নানাধরনের কর্মপ্রচেষ্টা ও পদ্ধতি'; এটি হলো কর্মের চতুর্থ মাধ্যম। সব কাজের পিছনেই এই চারটি উপকরণ থাকবে। সবশেষে পঞ্চম উপকরণটির কথা বলা হয়েছে। এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যাকে আমরা *দৈবম্* বলে থাকি। কেউ কেউ অবশ্য একে ভাগ্য বা বরাতও বলে থাকেন। ব্যাপারটাকে একটু বুঝিয়ে বলি। মনে করুন, আমরা একটা কাজে হাত দিয়েছি। সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু কাজটা শেষপর্যন্ত ভেস্তে গেল। কিছু একটার অভাব নিশ্চয় ঘটেছিল যার ফলে আমরা সফল হতে পারলাম না। এইটি হলো ভাগ্য যাকে ইংরেজিতে আমরা destiny বলি। এটি এমন সূক্ষ্ম জিনিস যা বুঝিয়ে বলা দুষ্কর। এই ভাগ্য বা *দৈবম্* হলো পঞ্চম উপকরণ। ভারতীয় চিন্তাধারায় কিন্তু আমরা বলি যে, এই ভাগ্য আর কিছুই নয়—এ হলো অতীত কর্মের ফল। এছাড়া আর কোন ভাগ্য বা destiny-তে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাস করি না যে, কোন ব্যক্তি আমাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বা পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে। শয়তানের ধারণা বেদান্তে নেই। সংস্কৃত সাহিত্যে নীতিমূলক একখানি অসাধারণ গ্রন্থ আছে। তার নাম *হিতোপদেশ। ঐ গ্রন্থে* (মিত্রভাব, ৩৩) ভাগ্য বা *দৈবম্*-এর একটি সুন্দর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : *পূর্বজন্ম কৃতং কর্ম, তৎ দৈবং ইতি কথ্যতে*, 'অতীতে, অর্থাৎ আগের আগের জন্মে কৃত কর্মগুলিই এই জন্মে ভাগ্যরূপে কাজ করে চলেছে'। তাই আমাদের ভাগ্য আমরাই গড়ে তুলেছি। আমরাই আমাদের ভাগ্যের রূপকার, বাইরের কেউ নয়। বেদান্ত এবং *সনাতন ধর্ম* একথা মানে না যে দূরের গ্রহ-নক্ষত্রই আমাদের দুর্ভোগের কারণ। আমরা তো যত দোষের বোঝা, হয় বইরের কারো ঘাড়ে চাপাতে চাই, নয়তো গ্রহ-নক্ষত্রের ওপর। বেদান্ত বলে—না। আমাদের অতীত কর্মগুলোই পরিণতিলাভের প্রতীক্ষা করে বসে থাকে এবং তারপর এক বিশেষ মুহূর্তে

আত্মপ্রকাশ করে আমাদের এখনকার কর্মকে প্রভাবিত করে। সাফল্য অথবা ব্যর্থতা তারই ফলশ্রুতি। এই আমাদের প্রত্যয়। শেকস্‌পীয়ের-ও সেই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'প্রিয় ব্রুটাস, দোষ নক্ষত্রের নয়, দোষ আমাদের ভিতরেই, কারণ আমরা অধম।' আমরা আমাদের কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত নই। তা যদি হয়, যত দোষ নন্দ ঘোষের ওপর চাপিয়ে কী লাভ? গ্রহনক্ষত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কী হবে?

তাহলে আমরা কর্মের পাঁচটি উপায় দেখলাম। কী কী? *অধিষ্ঠানং, কর্তা, করণং পৃথগ্বিধম্, বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা এবং দৈবম্।* কাজ করতে গেলে একজন *কর্তা* চাই, যে মনে করে 'আমি একটা কিছু করতে চাই'। এইরকম মনোভাব থাকতে হবে। কিন্তু যখন আপনি গভীর ঘুমে ডুবে আছেন, তখন আর আপনি *কর্তা* নন। তখন আপনি কেবল *অধিষ্ঠানং,* অর্থাৎ শরীর। *কর্তা* হবেন কখন? যখন আপনি জেগে উঠে ভাববেন—'আমি অমুক কাজটা করব'। *করণং* অনেক ধরনের—আমার নিজের ভিতরে *করণ*গুলি, আবার তার সঙ্গে যুক্ত হয় বাইরের *করণগুলি* । এগুলো সব যেন কাজের যন্ত্র। তারপর আসছে *বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা,* অর্থাৎ এই করণগুলোকে নানাভাবে ব্যবহার করা যাতে কর্ম ফলপ্রসূ হয়। এগুলিকে *চেষ্টা* বা 'কর্ম' বলা হয়, আবার প্রণালীও বলা হয়। মাখন পেতে গেলে দই মন্থন করতে হয়। এটি *চেষ্টা* । কিন্তু মন্থন করতে হলে তো একটি মন্থনদণ্ড চাই এবং ঘোল রাখার একটি পাত্রও চাই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অনেক রকমের *করণ* আছে। তারপর *কর্তা*-রূপে আপনি আছেন, যিনি কাজটি করছেন এবং দেহ বা *অধিষ্ঠান* যা সকল কর্মের ভিত্তি। সর্বশেষে আসছে *দৈবম্* বা অদৃষ্ট। অদৃষ্ট কী? এটি এমন এক অজ্ঞাত শক্তি যা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি না। কিন্তু বুঝি আর নাই বুঝি, সেই শক্তি কাজ করে চলেছে। তাই *করণ* হিসাবে তাকেও স্বীকার করতে হবে, তাকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না। কর্মের চারটি উপকরণ হয়তো উপস্থিত, কিন্তু তাতেও যে আপনার কর্মোদ্যোগ সফল হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। নাও হতে পারে। তাই তাকে আমরা *দৈবম্* বলছি। সব দর্শন এবং পৃথিবীর সব ধর্মেই অদৃষ্টের ধারণাটি স্থান পেয়েছে। উর্দু ভাষায় অদৃষ্টকে *কিস্‌মত* বলা হয়। কিন্তু আমাদের দর্শনে আমরা তাকে *আমাদের অতীত কর্মের* ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করি। আমাদের অতীত কর্মের ফলগুলি যেন আমাদের সত্তার গভীরে লুকিয়ে থাকে এবং একদিন অকস্মাৎ তাদের আবির্ভাব হয়। তাই আমরা একে *কর্মফলম্* বা কর্মফল বলি। তাই মনে রাখতে হবে প্রত্যেক কর্মের পিছনে পাঁচ পাঁচটি করণ থাকবেই

থাকবে। মহাভারতেও এই শ্লোক আছে। *অত্র* মানে 'এই বিশেষ পরিস্থিতিতে'। তাই, *দৈবম্*-কে অগ্রাহ্য করবেন না, যদিও একথা সত্যি যে *দৈবম্* বা দৈবকে ঠিক কথা দিয়ে বোঝানো যায় না।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

—'শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা মানুষ ন্যায় বা তার বিপরীত যে কাজই করে, এই পাঁচটি তার কারণ।'

শরীর, বাক, অথবা মনস্, 'দেহ, বাক্য, অথবা মন', এগুলির দ্বারা মানুষ ভাল বা মন্দ যে কাজই করুক না কেন, সব কাজের পিছনেই এই পাঁচটি কারণ থাকে। এ জগতে আপনি যে কাজই আরম্ভ করুন, *ন্যায্যং বা বিপরীতং বা* 'ন্যায় অথবা তাঁর বিপরীত অন্যায়'; *পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ,* 'তার কারণ এই পাঁচটি' যা আগের শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মের এই পাঁচটি কারণের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

—'এরকম হওয়া সত্ত্বেও যে, অশুদ্ধ বুদ্ধিবশত, শুদ্ধ আত্মাকে কর্তারূপে দেখেন, সেই দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ঠিক ঠিক দেখেন না।'

এবার সিদ্ধান্ত আসছে। কিন্তু তার আগে একটু ভাবা দরকার, এই যে পাঁচটি কারণের কথা এতক্ষণ বলা হলো যা সব কাজের পিছনেই থাকে, আপনার বা আমার জীবনে তার তাৎপর্য কী? তাৎপর্য এই, সত্যি সত্যি যখন সকল কর্মের নেপথ্যে এই পাঁচটি কারণই বর্তমান, তখন যদি অজ্ঞতাবশত আপনি ভাবেন, আদি শঙ্কর যেমন বলেছেন, যে *আত্মানং কেবলম্,* 'শুদ্ধচৈতন্য' হলো *কর্তারম্* বা 'কর্তা' তাহলে আপনি কারণগুলিকেই আত্মা বলে ভুল করেছেন এবং দাবী করছেন 'আমি এটা করেছি, আমি ওটা করেছি'। এরকম ভাবা নির্বোধের কাজ। বলা হচ্ছে, যারা এমন ভাবে, তারা *দুর্মতিঃ,* 'বিকৃত মনের মানুষ'। তাদের চিন্তা ভুল। কেন তারা এরকম ভাবে? *অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ,* 'কারণ তাদের মন অমার্জিত'। *কৃত* মানে 'মার্জিত'; *অকৃত* মানে 'অমার্জিত'। অসংস্কৃত মনের অধিকারী হওয়ার দরুন তারা বুঝতেই পারে না যে শুদ্ধ আত্মা কর্তা নন, তিনি

কিছুই করেন না; ফল যা হবার তা ঐ পাঁচটি কারণ থেকেই উদ্ভুত। অর্থাৎ পাঁচটি কারণই সব কর্মের ফলদাতা। সংস্কৃতে *সুমতিঃ* এবং *দুর্মতিঃ* বলে দুটি শব্দ আছে। প্রথমটির অর্থ 'ভাল মন', দ্বিতীয়টির অর্থ 'খারাপ মন'। *সু* উপসর্গটি 'ভাল' অর্থেই সর্বদা ব্যবহার করা হয়; কিন্তু *দুঃ* উপসর্গ দেখলেই বুঝতে হবে 'মন্দ'। এই কারণেই কেউ কারো নাম রাখতে হলে 'দুর্যোধন' রাখেন না। ও নাম মহাভারতেই একবার আমরা পেয়েছি। কেউ আর তারপর ঐ নামের পুনরাবৃত্তি করতে চাননি। তাই সু-যুক্ত হলেই ভাল এবং *দুঃ*-যুক্ত হলেই সর্বদা খারাপ। যেমন *সুখম্* এবং *দুঃখম্।* প্রথমটির অর্থ 'সুখ', দ্বিতীয়টির অর্থ ঠিক তার বিপরীত—'দুঃখ'।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাই বলতে চাইছেন, অহংভাব ত্যাগ কর; কারণ আত্মা নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন না। এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলে তবেই তুমি *সুমতিঃ*, না হলে *দুর্মতিঃ*।

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

—'যিনি অহংবোধ [অর্থাৎ আমি কর্তা, এই বোধ] থেকে মুক্ত, যাঁর বুদ্ধি (ভাল বা মন্দে) অলিপ্ত, তিনি এইসব মানুষকে হত্যা করেও হত্যা করেন না এবং (ঐ কর্মের ফলের দ্বারা) বদ্ধ হন না।'

যিনি দ্বৈত ভূমির, অর্থাৎ সকল দ্বন্দ্বের পারে গিয়ে পারমার্থিক জ্ঞানলাভ করেছেন, যেন তাঁরই চরম স্তুতি করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই শ্লোকটি উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে, *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো,* 'যিনি আমিত্ব বোধ থেকে মুক্ত', যিনি অহংবোধের ঝঞ্ঝা অতিক্রম করেছেন; *বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে,* 'যাঁর বুদ্ধি অমলিন' বা কলুষতামুক্ত; সেই ব্যক্তি, *হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্,* 'যদি তিনি [চারপাশের] সব লোকজনদের মেরেও ফেলেন'; *ন হন্তি ন নিবধ্যতে,* 'তিনি হত্যা করেন না, বদ্ধও হন না।' এই অতিশয়োক্তি করা হয়েছে শুধু এইটি বোঝানোর জন্য যে, তিনি আদৌ কারো ক্ষতি করতে পারেন না। আর যদি করেনও, তাহলেও সেটা মারাত্মক ধরনের কিছু হবে না।

যদি মহাত্মা গান্ধী ভাবতেন, 'আমি সবাইকে ধ্বংস করব, তবে সেটা প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস না হয়ে একটা সৃষ্টিকার্য বা গঠনমূলক কিছু হতো। তা কখনওই ধ্বংসের চেহারা নিত না, কারণ তাঁর সমগ্র সত্তা সকলের সঙ্গে একাত্ম

হতে শিখেছিল। তাই আলোচ্য শ্লোকে, পারমার্থিক জ্ঞানলাভ করলে যে অবস্থা হয়, তার এত বেশি স্তুতি করা হচ্ছে। এরকম মানুষের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ এত গভীর যে, তাঁরা যাই করুন না কেন, তা সকলের হিতকর হবেই হবে। কারো অকল্যাণ করবেন—এ তাঁদের চিন্তার বাইরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রজ্ঞার মহিমা বোঝাবার জন্য এখানে অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে যে, তাঁরা যদি হত্যাও করেন, তবে সে হত্যা হত্যা নয়, তা হত্যা বলে গণ্য হবে না, ঐ কর্মের ফল তাঁদের বদ্ধ করতে পারবে না। কেন? তার কারণ তাঁরা *অহং* বা আমিত্ব বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা যা করেন, তা ঈশ্বরের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে করেন, একটা দিব্য মহৎ উদ্দেশ্যে করেন। তা হলে এই শ্লোকে আমরা বেদান্তের একটি ভাব পাচ্ছি। কী সেই ভাব? ভাবটি হলো—আমাদের শেষপর্যন্ত ভালমন্দের যে দ্বন্দ্ব, তার পারে যেতে হবে, কারণ চরম যে সত্য সেখানে ভাল বা মন্দ বলে কিছুই নেই। দুয়ের অতীত সেই তত্ত্ব। ভাল এবং মন্দ, দুটিই বন্ধন—দুটিই আমাদের সীমিত করে। হ্যাঁ, মন্দের চেয়ে ভাল অবশ্যই ভাল; কিন্তু দুটিই বন্ধন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা দিয়ে প্রথম কাঁটাটি তুলে ফেলতে হয়, তারপর দুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হবে। প্রথম কাঁটাটি মন্দ এবং দ্বিতীয় কাঁটাটি ভাল। ভাল কাঁটা দিয়ে মন্দ কাঁটাটি তুলে ফেলে দুটিকেই ত্যাগ করতে হয়। ভাল আর মন্দের এই সম্পর্ক! মন্দকে দূর করতে গেলে ভালর সাহায্য নেওয়া চাই, তারপর ভালর বাইরে চলে যেতে হয়। তা যেতে পারলে তখন আমরা দেখব আমরা অনন্ত আত্মা। আমাদের এই যে প্রকৃত স্বরূপ, সেখানে ভাল বা মন্দ কিছুই পৌছতে পারে না।

পাশ্চাত্যের মিশনারীরা আমাদের এই বেদান্তের চরম ভাবটি ধরতে পারেননি। তাই তাঁরা এর অপব্যাখ্যা করে বলেছেন হিন্দুদের নীতি বা নৈতিকতা বলে কোন পদার্থ নেই। এখন অবশ্য সে ভাব অনেকটা পাল্টে গেছে। পাশ্চাত্যের বহু মানুষ এখন বুঝতে পারছেন যে, হ্যাঁ, অতীন্দ্রিয় অবস্থা বলে একটা অবস্থা আছে। সে অবস্থাটিকে কোনভাবেই ভাল বা মন্দের তকমা দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। জাগতিক স্তরে, পার্থিব জীবনে, আমরা কাউকে ভাল বা মন্দ বলে বিশেষিত করতে পারি। কিন্তু যাঁর ভিতর 'আমি করি', 'আমি কর্তা'—এই ভাব নেই, যাঁর বুদ্ধি শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ নির্মল, তিনি যদি হত্যাও করেন, তবে তা হত্যা পদবাচ্য নয় এবং সেই কর্ম তাঁর পক্ষে বন্ধনের কারণ হবে না। এই ঘোষণার প্রকৃত অর্থ হলো, এমন মানুষ যাঁরা, তাঁরা একত্বের জ্ঞানলাভ করেছেন, সকলের সঙ্গে তাঁদের ঐক্যটি তাঁরা উপলব্ধি করেছেন।

ফলে তাঁরা কখনওই এমন কিছু করবেন না যা অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। তাঁরা সর্বদা সকলের কল্যাণই করে যাবেন। যিনি নিখুঁত মানুষ, তিনি কি কারো ক্ষতি করতে পারেন? কখনওই না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যে নাচতে জানে, তার পা কখনও বেতালে পড়ে না।' যাঁরা নিপুণ নাচিয়ের নাচ দেখেছেন, তাঁরা জানেন একথা কতখানি সত্যি। শিল্পী স্বচ্ছন্দে নেচে চলেছেন, কিন্তু তাঁর তাল কখনও ভঙ্গ হচ্ছে না, পা এদিক সেদিক ভুল জায়গায় পড়ছে না। ঠিক তেমনি, যাঁর ব্রহ্ম অনুভূতি হয়েছে, যিনি শুদ্ধতা ও প্রেমের বিগ্রহ হয়ে গেছেন, তিনি কখনও অন্যায় করবেন না, কারোর ক্ষতি করবেন না। কেন? তিনি যে সকলের মধ্যে নিজেকেই দেখছেন। পরম ঐক্যের অনুভূতি তাঁর হয়েছে। এই শ্লোক তাই সেই অসাধারণ অবস্থার জয়গান করছে। বেদান্তেও আপনারা এইরকম স্তুতি অনেক পাবেন। স্তুতির পর তার ভাষ্যে বলা হচ্ছে—এই রকম মহাত্মা কাউকেই হত্যা করতে পারেন না, কারণ সকলের সঙ্গে, সবকিছুর সঙ্গে তিনি এক হয়ে গেছেন।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা ।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

—'জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা—কর্মের কারণ [এই] তিনরকম। করণ, কর্ম ও কর্তা—এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়।'

এখানেও এক অপূর্ব বিশ্লেষণের মুখোমুখি হচ্ছি আমরা। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *জ্ঞানং* অথবা 'জ্ঞান'; *জ্ঞেয়ং,* 'জ্ঞেয়', অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বা যে সত্য আমাদের জানতে হবে এবং *পরিজ্ঞাতা,* অর্থাৎ 'জ্ঞাতা' বা যিনি জানছেন—এই তিনটি হলো জ্ঞানের তিন দিক। বেদান্তে জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতাকে একত্র করে *ত্রিপুটি* বলা হয়। চরম বৈদান্তিক অনুভবে এই তিনটি আর আলাদা থাকে না, মিলে মিশে এক হয়ে যায়। *জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং* এবং *পরিজ্ঞাতা,* এই তিনটি কর্মের ত্রিবিধ কারণ। *কর্মচোদনা* একটি পারিভাষিক শব্দ। *চোদনা* মানে 'কারণ'। কীসের কারণ? কর্ম-প্রবৃত্তির। তারপর বলছেন, *করণং কর্ম কর্তেতি,* '[কর্মের] উপায়, ক্রিয়া এবং কর্তা'; এই তিনটিকে সম্মিলিতভাবে *কর্মসংগ্রহঃ* অথবা 'কর্মের ভিত্তি' বা আশ্রয় বলা হয়। করণ, কর্ম এবং কর্তা—এই তিনটিকে আশ্রয় করেই কোন কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আগেই বলেছি *কর্মচোদনা* একটি বিশেষ পারিভাষিক শব্দ। *কর্মসংগ্রহঃ*—এটিও তাই। কর্মের দুটি দিক—একটি মানসিক, অন্যটি শারীরিক। মানসিক দিক বা অঙ্গটি হলো *কর্মচোদনা* এবং শারীরিক দিকটি হলো *কর্মসংগ্রহঃ।* মনে করুন কোন কিছু করার একটা ইচ্ছা আপনার মনে জেগেছে। সেই ইচ্ছাটি যখন নির্দিষ্ট আকার নিল, তখন সেইটি *কর্মচোদনা* । তারপর এক সময় সেই ইচ্ছাটিকে আপনি রূপ দিলেন, যেমন কুমোর ঘট তৈরি করে, সেইরকম। ঘট তৈরি করতে হলে কুমোর কী করে? প্রথমে সে মাটি নেয়, তারপর সেই মাটি সে চাকে দেয়। চাকটি হলো করণ বা যন্ত্র। তারপর তা দিয়ে ঘটটি তৈরি করে। এই তিনটি হলো কর্মের *কর্মসংগ্রহঃ*-এর দিক। এইভাবে, *কর্মচোদনা* ও *কর্মসংগ্রহঃ,* এ হলো কর্মের মনস্তাত্ত্বিক এবং বাহ্যিক দিক। জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা—এগুলি মানুষের মনোগত দিক, মনের ভিতরকার ব্যাপার। বাহ্যত তা আবার *করণং, কর্ম এবং কর্তা,* 'কর্মের মাধ্যম, কর্ম এবং কর্তা'-রূপে অভিব্যক্ত হয়। এই তিনটি নিয়ে *কর্মসংগ্রহঃ* বা কর্মের বাহ্য, ব্যক্ত অবস্থা।

'আমি এটা করব'—এই প্রেরণা যতক্ষণ মনে না জাগছে, ততক্ষণ কিছুই ঘটে না। কিন্তু যেই ইচ্ছা জাগল, অমনি তা *জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং এবং পরিজ্ঞাতা*-র রূপ নেবে। অর্থাৎ আমি কী করব বা করতে চাই, কী বিষয় নিয়ে আমি কাজ করব, ইত্যাদি—এগুলি কেবল মনই বিবেচনা করে। বিবেচনা-টিবেচনা করে মন যেই সিদ্ধান্তে এল, অমনি কর্মের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পাবে। তাই প্রত্যেক কাজের পিছনেই একটা মানসিক প্রেরণা থাকবেই থাকবে; ওটি একান্ত প্রয়োজনীয়। ওটি না থাকলে বাইরের জগতে কেউ কোন কাজ করতে পারে না।

করণং মানে যন্ত্র, যার মাধ্যমে কাজ করা যায়। যেমন কুমোরের চাক, চাষির হাতের কোদাল, অথবা ডাক্তারের হাতে ছুরি বা কাঁচি—এগুলি সবই *করণ।* বাইরের কর্মজগতে এগুলির একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অন্তর্জগতেও *করণ* আছে। সেটি হলো মনের তাগিদ বা প্রেরণা। মন যখন ভাবে 'আমি এটা করব বা ওটা করব', কেবল তখনই ঐ চিন্তা কর্মরূপে বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের ভিতরের বেশিরভাগ ভাবনাই কর্মের রূপ নেয় না; বহু কল্পনা কল্পনাই থেকে যায়। কেবল কিছু কিছু চিন্তাভাবনা যেগুলি বেশ জোরালো, যেগুলির পিছনে তীব্র বাসনার ঠেলা আছে, সেগুলিই বাহ্য জগতে কর্মরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

—'সাংখ্য দর্শনে বলা হয়, জ্ঞান, ক্রিয়া ও কর্তা *গুণভেদে* তিনরকম। সেগুলিও মন দিয়ে শোন।'

জ্ঞান, কর্ম এবং কর্তা, এদের প্রত্যেকটিই *সাত্ত্বিক, রাজসিক* অথবা *তামসিক,* এই তিনরকমের হতে পারে। *জ্ঞান*-এর কথাই ধরুন। তা *সাত্ত্বিক জ্ঞান* হতে পারে, *রাজসিক জ্ঞান* হতে পারে, আবার *তামসিক জ্ঞান*-ও হতে পারে। কর্মের ক্ষেত্রেও দেখি, কর্ম *সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক*-এই তিন ধরনেরই হতে পারে। *কর্তা*-র বেলাতেও তাই। কপিল এবং অন্যান্য সাংখ্যবাদীরা তিন গুণের ভিত্তিতে এই শ্রেণিবিভাগ করেছেন। এই বিন্যাস *ত্রিধা এব,* 'তিনরকমই'; *গুণভেদতঃ,* 'তাদের গুণগত পার্থক্য অনুসারে'; এবং *প্রোচ্যতে,* 'ব্যাখ্যাত হয়েছে'; *গুণসংখ্যানে,* 'গুণের আলোচনায় সমৃদ্ধ মহান দর্শনে', অর্থাৎ সাংখ্য দর্শনে। সাংখ্য দার্শনিকরাই বিশ্বের প্রাচীনতম মনোবিজ্ঞানী, যাঁরা মানুষের মনের গহনে ডুব দিয়ে মনকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন। কপিল তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। প্রগাঢ় তাঁর দর্শন ও অন্তর্দৃষ্টি। সেই সুবাদেই মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে আমাদের এত অগ্রগতি। মানুষের সত্তার গভীরে ডুব দিয়ে, তাঁর অন্তরতম কোরকটিতে পৌঁছে, সেখানে আমরা শাশ্বত *পুরুষ* বা আত্মাকে আবিষ্কার করেছিলাম, যে আত্মা দেহ-মন সংঘাতের পিছনে নিত্য বিরাজমান। শরীর ও আত্মা যেন দুটি ভিন্ন প্রান্ত বা মেরু। এবং সেই দুই-এর মাঝামাঝি ইন্দ্রিয়গুলিকে, *মন, বুদ্ধি*-কে সাংখ্যবাদীরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

গুণভেদতঃ, গুণের তারতম্য অনুসারে *জ্ঞান, কর্ম* ও *কর্তা*-র প্রত্যেকটিকে আমরা *সত্ত্ব, রজঃ* এবং *তমঃ,* এই তিন গুণের যেকোন একটি শ্রেণিতে ফেলতে পারি। সাংখ্যদর্শনে একথা বলা হয়েছে। *যথাবৎ শৃণু তান্যপি,* 'সেইসব শ্রেণিবিন্যাসের কথা যা আমি ব্যাখ্যা করছি, তাও মন দিয়ে শোন।'

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

—'সেই জ্ঞানকেই সাত্ত্বিক [জ্ঞান] বলে জেনো যার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সর্বভূতে এক, অভিন্ন ও অক্ষয় সত্তাকে [মানুষ] দর্শন করে।'

এই শ্লোক থেকে *সত্ত্ব, রজঃ* ও *তমঃ*, এই তিনগুণের দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানের ব্যাখ্যা শুরু হলো। এখানে *সাত্ত্বিক জ্ঞান*-এর প্রসঙ্গ হচ্ছে। *সাত্ত্বিক জ্ঞান* কী? এক অসাধারণ সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে, *সর্বভূতেষু যেন একম্ ভাবম্ অব্যয়ম্ ঈক্ষতে*, 'যার দ্বারা মানুষ বহুরূপে প্রতিভাত সবকিছুর মধ্যে এক অবিনাশী সত্তাকে দেখে'; *অবিভক্তং বিভক্তেষু*, 'আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও [যা] অভিন্ন'; *তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্*, 'তাকে *সাত্ত্বিক জ্ঞান* বলে জেনো'। কেন তাকে *সাত্ত্বিক জ্ঞান* বলা হলো? এই জন্য যে, ঐ জ্ঞানের দ্বারা মানুষের দৃষ্টিতে *একম্ ভাবম্*, 'ঐ ঐক্য' অর্থাৎ অদ্বয় আত্মবস্তু ধরা পড়ে। শঙ্করাচার্য বলেছেন, *ভাব শব্দঃ বস্তু বাচী*, অর্থাৎ 'এখানে *ভাব* শব্দের অর্থ *বস্তু*, পরম সত্তা'। সোজা কথায় বলতে গেলে, জগতের বৈচিত্র্যময় সকলের ও সবকিছুর মধ্যে এক অখণ্ড সত্তাকে যিনি স্পন্দিত হতে দেখেন, তাঁর জ্ঞানই *সাত্ত্বিক* জ্ঞান। *অবিভক্তং বিভক্তেষু*, 'আপাত-বিভক্ত সবকিছুর ভিতর অবিভক্ত'; ভারী চমৎকার বর্ণনা। আপনি এবং আমি আপাতদৃষ্টিতে বিভক্ত বা ভিন্ন; কিন্তু দুজনের মধ্যে এক আত্মাই বিরাজ করছেন। নিজে অখণ্ড হয়েও এমনভাবে আছেন *যেন* মনে হয় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে তিনি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছেন। মানুষ ধীরে ধীরে কেমন করে জ্ঞানের সন্ধানে ক্রমাগত এগিয়ে যায়, এখানে সেই গভীর সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথমে *তামসিক*, তারপর *রাজসিক* এবং সবশেষে সর্বোচ্চ *সাত্ত্বিক* জ্ঞানের দিকেই মানুষ এগিয়ে চলে। *সত্ত্বজ্ঞান* হলে মানুষ উপলব্ধি করে, বৈচিত্র্যে বা বিভিন্নতার আড়ালে একটি সত্যই বিরাজ করছে। এ যেন অনেকটা পদার্থবিজ্ঞানীর 'unified field energy' বা একীভূত ক্ষেত্র-শক্তির অন্বেষা। বিভিন্ন শক্তিক্ষেত্র আছে; আইনস্টাইন সেগুলিকে একীভূত করার চেষ্টা করলেন। এখানে জ্ঞান *সাত্ত্বিক* হওয়ার প্রয়াসী। কিন্তু যে জ্ঞান ভাবায় যে এগুলি আলাদা, সে জ্ঞান *রাজসিক* এবং যে জ্ঞান তারও নিচে, তা *তামসিক*। ভারতীয় অদ্বৈত দৃষ্টি কিন্তু বহুকাল আগেই বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, ঐ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল জগতের প্রতিটি বস্তুর ভিতরেই সেই অদ্বিতীয় সত্তা *পূর্ণমাত্রায়* বিদ্যমান। *অবিভক্তং*, 'অখণ্ড'; *বিভক্তেষু*, 'সব আপাতখণ্ড বস্তুর মধ্যে'। এ অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব। গভীর ভাব। এই কারণেই *সাত্ত্বিক* জ্ঞান অতি গভীর ও সুসূক্ষ্ম।

মানবকৃষ্টি ও সভ্যতার ওপর এই সাত্ত্বিক জ্ঞানের অসামান্য প্রভাব। যতক্ষণ এই জ্ঞান মানুষের মধ্যে না জাগছে, ততক্ষণ ঐক্য, শান্তি ও সম্প্রীতি

আকাশকুসুম কল্পনা। অন্যদিকে, *রাজসিক* ও *তামসিক* জ্ঞান বিরোধ, হিংসা ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। অতএব, এই জ্ঞান যদি আমাদের হয় যে আমরা সব এক, তাহলে অন্যান্য যত কিছু মহৎ ভাবনা সব আপনিই আসবে। এটিই সাত্ত্বিক জ্ঞানের মহিমা।

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

—'কিন্তু যে জ্ঞান সকল জীবের মধ্যে পৃথক পৃথক বস্তু [আত্মা] দেখে, সে জ্ঞান *রাজসিক* বলে জেনো।'

এখানে *রাজসিক* জ্ঞানের লক্ষণ বলা হচ্ছে। সেটি কী? *পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানং,* 'সেই জ্ঞান, যাতে সবকিছুই পৃথক বা আলাদা'; *নানাভাবান্,* 'জগতে বহু ধরনের বস্তু রয়েছে'; *পৃথক্ বিধান্,* 'তারা সকলেই একে অন্যের থেকে আলাদা'; *পৃথক্* মানে 'ভিন্ন'; *বেত্তি,* 'এইরকম মনে করে'; *সর্বেষু ভূতেষু,* 'সর্বভূতে'; তৎ *জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্,* 'সেই জ্ঞান, জেনো, *রাজসিক*'।

এই রাজসিক জ্ঞান সমাজের পক্ষে বেশ ক্ষতিকর। তাই যাঁরা অন্যদের পথ দেখাবেন, তাঁদের মধ্যে অন্তত এমন কিছু মানুষ থাকা দরকার যাঁরা এই রাজসিক জ্ঞানের উর্ধ্বে উঠবেন।

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্ ।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২॥

—'কিন্তু যে জ্ঞান তুচ্ছ, অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীনভাবে একটি মাত্র কার্যদেহকে সমগ্র মনে করে, তাতেই আসক্ত হয়, বলা হয়, সেই জ্ঞান *তামসিক*।'

কাকে *তামসিক* জ্ঞান বলে? *যৎ তু কৃৎস্নবৎ একস্মিন্ কার্যে,* যে জ্ঞান 'একটিমাত্র বস্তু বা কার্যকে [দেহকে] সমগ্র মনে করে', তাতেই সীমাবদ্ধ। ফল বা কার্যকেই সাধারণত মানুষ দেখতে পায়; সেই ফলের পিছনে কি আছে, তা দেখে না। *সক্তম্ অহৈতুকম্,* তার ফলে 'তার প্রতি অকারণে বা অযৌক্তিকভাবে আসক্ত হয়'; *অতত্ত্বার্থবৎ অল্পং চ,* এবং সেই জ্ঞান 'ভিত্তিহীন এবং অল্প'। সেই যে অল্প জ্ঞান, যার সঙ্গে তত্ত্বের কোন সম্পর্ক নেই, যা সত্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাকেই *অল্পং* বা 'তুচ্ছ' *তামসিক* জ্ঞান বলা হয়েছে।

জগতের সব খণ্ড বস্তুর মধ্যে কেবল একটি অখণ্ড সত্তাই আছে—তাঁকেই আমরা ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আত্মা বলি। যে নামেই ডাকি না কেন, যে শব্দই ব্যবহার করি না কেন, তিনিই সকল সত্যের সার-সত্য, অর্থাৎ সকল সত্যের পরম ভিত্তি। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*-এর ভাষায়, *এতৎ সত্যম্, তৎ সত্যস্য সত্যম্,* 'এটি সত্য, কিন্তু সেই [ব্রহ্ম] সত্যের সত্য'। এই জগৎ সত্য; কিন্তু সর্বোচ্চ সত্তা, সব সত্যের ঊর্ধ্বে যে পরম সত্য, তাই। তাই *সত্যস্য সত্যম্* কথাটির অনন্ত গভীরতা। একথা বলা হচ্ছে না যে অন্যগুলি সত্য নয়; সত্য। তবে আপেক্ষিক সত্য। তাদের যদি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন তো দেখবেন সেই সব খণ্ড সত্য এক অখণ্ড সত্যে বিধৃত। সেই পরম সত্যকেই সত্যের সত্য বলা হচ্ছে। ব্রহ্ম সেই অখণ্ড পরম সত্য, যা জগতের যাবতীয় সত্যের পিছনে বর্তমান। জগৎ সত্য। স্থূল জড়প্রকৃতির পিছনে যেসব শক্তি ক্রিয়াশীল, সেগুলিও সত্য। উপনিষদ্ তাই বলেছেন, *প্রাণাঃ বৈ সত্যম্, তেষাম্ এষ সত্যম্,* 'বিশ্বের সব প্রাণশক্তি, যা কাজ করে চলেছে, তা সত্য। কিন্তু আত্মা সেই সত্যেরও সত্য।' তাই *সত্যস্য সত্যম্,* এটি বেদান্তের এক মোক্ষম বাণী। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ 'হিন্দু ধর্মমতে মানুষ মিথ্যা থেকে সত্য অভিমুখে যায় না, তার যাত্রা নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যের দিকে'। জাগতিক সত্যও সত্য, কিন্তু নিম্নতর সত্য। মানুষ যখন এই সত্যে তৃপ্ত না হয়ে চরম সত্যকে জানতে চায়, তখন সে এই *সত্যস্য সত্যম্*-এর জন্য ব্যাকুল হয়। সেইটিই *সাত্ত্বিক জ্ঞান*।

যে জ্ঞান একটিমাত্র কার্য বা দেহে সীমাবদ্ধ, যেন সেইটিই সব, তা অযৌক্তিক, অযথার্থ, অসত্য, অতি তুচ্ছ *তামসিক* জ্ঞান। যারা স্থূলবুদ্ধির মানুষ, যাদের কোন মানসিক প্রশিক্ষণ নেই, তারা ঐক্যের কথা ভাবতে পারে না; তারা মনে করে সব বস্তুই পৃথক। শিশুরাই তাই ভাবে। কিন্তু বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্রমশ *রাজসিক* জ্ঞানে পৌঁছে যাই। কেউ কেউ আবার *সাত্ত্বিক* জ্ঞানও লাভ করেন। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে *সাত্ত্বিক* জ্ঞান সঞ্চারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তা যদি হয়, তাহলে মানবসমাজের আশা আছে। যে সমাজে মানুষের *সাত্ত্বিক* জ্ঞান যত বেশি, সে সমাজ তত সুস্থির ও ঐক্যবদ্ধ, সহযোগিতার ভাব সেখানে তত প্রবল।

ধর্ম-জগতের দিকে তাকান। দেখবেন *তামসিক* ভাব সেখানে কি তীব্র—সব আলাদা আলাদা! আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ, এই হচ্ছে সেখানকার মনোভাব। এই

ধরনের তামসিকভাবাপন্ন ধর্মবেত্তারা যুক্তিহীন দাবি করে বসেন, 'আমার ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ, আমার ধর্মই শেষ কথা।' যদি প্রশ্ন করেন, 'কেন মশাই?' তাহলে তাঁরা বলবেন, 'আমাদের শাস্ত্র সে কথাই বলছে।' কিন্তু সমস্যা হলো সকলের শাস্ত্রই তো সেই দাবি করছে! তার সমাধান কী? অতএব, এই জাতীয় অতিশয়োক্তি ধর্মকে *তামসিক* করে তোলে। এর উর্ধ্বে *রাজসিক* বোধ। কিন্তু সূক্ষ্মতম হলো *সাত্ত্বিক* চেতনা, যে চেতনা বলে দেয় এক পরম সত্যই সব ধর্মের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ঋগ্বেদে সেই অদ্বিতীয় সত্যের কথাই উচ্চারিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—*একম্ সদ্, বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি,* 'সত্য এক, ঋষিরা তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।' বাস্তবিক, পরম সত্য একটিই। খ্রিস্টানদের সত্য এক, মুসলমানদের সত্য আর এক এবং হিন্দুদের সত্য আর এক—এরকম তো নয়। সত্যের কোন জাত, কোন ধর্ম আছে নাকি? চরম সত্য নানারকম হতে পারে না, তা একটিই। আমরা তাকে নানাভাবে প্রকাশ করি, এই যা তফাৎ। ধর্মক্ষেত্রে এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, একেই *সাত্ত্বিক* চেতনা বা *সাত্ত্বিক* জ্ঞান বলা হচ্ছে। বহুকাল আগেই ভারতবর্ষে এই সাত্ত্বিক জ্ঞানের উন্মেষ হয়েছিল এবং যুগ যুগ ধরে সযত্নে আমরা সেই বোধটিকে লালন করে এসেছি। তার ফলে আমাদের মধ্যে সংহতির ভাব বিশ্বের যে কোন দেশের চাইতে বেশি। ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত ভারতের সব মহান আচার্যরাই *সাত্ত্বিক* শিক্ষা দিয়ে গেছেন। সেই শিক্ষার চরম অভিব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—যত মত, তত পথ। অর্থাৎ সব ধর্মই ঈশ্বরলাভের এক একটি পথ। ভারতবর্ষের আর্যদৃষ্টি বৈচিত্র্যের মধ্যে সর্বদা ঐক্যকেই দেখেছে এবং সেই সত্যদৃষ্টিকে তার জীবনচর্যায় রূপায়িত করেছে। সংহতি বা সমন্বয়ের এই ভাবটি ভারতীয় সংস্কৃতির মহত্তম অবদান। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তাই সম্রাট অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভগুলিতে এই বাণী উৎকীর্ণ হয়েছিল : 'একমাত্র *সমন্বয়*-ই সত্য।' একবার ভাবুন তো, কত কাল আগে এই সত্য উচ্চারিত হয়েছিল যে 'ঐক্যই সত্য, বিরোধ নয়।' যেহেতু পরম সত্য একটিই, সেইহেতু 'ঐক্যই কেবল সত্য।' সংস্কৃতে বলা হয়, *সমন্বয় এব সাধুঃ*। এই কারণে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের ভাবটি উদ্রিক্ত করতে হলে *সাত্ত্বিক* জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন।

শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, বিভিন্ন ভাষা ও জাতির মধ্যেও সংহতির ভাবটি জাগাতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন এই *সাত্ত্বিক* জ্ঞান। সমাজে নানা ধরনের মানুষ বসবাস করেন। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করে রাখে কে? এই সাত্ত্বিক জ্ঞান। প্রত্যেক বহুজাতিক সমাজে, যদি মানুষে-মানুষে সংহতি গড়ে তুলতে হয়, যদি

সামাজিক শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে সাত্ত্বিক জ্ঞানের বিকাশ চাই। আমাদের দর্শনে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে। বহু মানুষ সেই শিক্ষা অনুসরণ করে আপ্তকাম হয়েছেন। গত পাঁচ হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের মানুষ এই বিষয়ে অনুশীলন ও নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। শুধু বর্তমানকালেই নানা বাহ্যিক কারণে এর অন্যথা হচ্ছে। কিন্তু আশা করা যায়, জনসাধারণের মধ্যে এই সাত্ত্বিক জ্ঞানকে পরিপুষ্ট করে বর্তমান সংকট আমরা কাটিয়ে উঠব। *সংহতি* চাই। ভাষা, কৃষ্টি, সামাজিক নিয়মকানুন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকুক, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে সংহতি চাই। বৈচিত্র্য দেখে আমরা ভয় পাই না, কারণ বহুর মধ্যে 'এক'-কে দেখতে জানি আমরা এবং সেই কারণেই ভারতের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। ইন্দোনেশিয়ারও ঐ এক আদর্শ। ওঁদের ভাষায় ওঁরা বলেন—'ভিন্নেকা এক্কা তুংগাল' (*Bhinneka ekka tungal*)। এটা সাত্ত্বিক আদর্শ। সব সমাজেই বহুরকমের মতাদর্শ থাকবে। কেবল একটি মাত্র মত থাকবে—এ হতে পারে না। প্রথম দিকে ইসলাম একটি ঐক্যবদ্ধ বা এক মতাবলম্বী ধর্ম হিসাবেই তার যাত্রা শুরু করেছিল; কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তা দু-টুকরো হয়ে শিয়া ও সুন্নী এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো। তাহলেই দেখুন, তাঁদের মধ্যেও সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয় হওয়া প্রয়োজন; না হলে পারস্পরিক লড়াই লেগেই থাকবে, যা আজ পাকিস্তানের মতো মুসলিম দেশগুলিতে হচ্ছে। ভারতবর্ষের মতো জীবনের সর্বস্তরে এতো বিপুল বৈচিত্র্য আর কোথাও নেই; [কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সাত্ত্বিক জ্ঞানের দৌলতে এ সমাজ আজও টিকে আছে।] অতএব সব জাতির পক্ষে এই জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন।

ইউরোপের দিকে তাকালে দেখতে পাই সেখানকার দেশগুলি সব ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। শুধু পশ্চিম ইউরোপেই যে এটি হচ্ছে, তা নয়। পূর্ব ইউরোপেও এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সমাজকে ঐক্যবদ্ধ, সুস্থ এবং শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হলে *সাত্ত্বিক জ্ঞান* অপরিহার্য। এই জ্ঞানের আলো যত বেশি মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে ততই মঙ্গল। আপনি চেক, সাইবেরিয়ান, ক্রোয়াটিয়ান, জার্মান, ফরাসি, অথবা ইংরেজ? হতে পারেন। কিন্তু তাতে কী? আপনারা তো সকলেই মানুষ। চেহারা এবং ভাষা আলাদা হলেও মানুষ হিসাবে তো আপনারা সকলেই এক। আর যদি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, তবে তো আর কথাই নেই। তখন আমাদের ভিতরকার চরম ঐক্যটি আমাদের দৃষ্টিপথে জ্বলজ্বল করবে। তাই পরস্পর শান্তিতে বসবাস করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।

অন্তর্নিহিত একত্বের এই প্রত্যয় জাগ্রত হলে তবেই নিখুঁত সংহত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে।

এরপর আসছে কর্ম সম্বন্ধে পরবর্তী গুণের কথা।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

—'অনাসক্ত, রাগ-দ্বেষ বর্জিত ফলাভিলাষশূন্য ব্যক্তির দ্বারা যে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকে *সাত্ত্বিক* [কর্ম] বলা হয়।'

প্রথমে *জ্ঞান*-এর কথা আলোচিত হয়েছে। এবার *কর্ম*-এর কথা বলা হচ্ছে। কীরকমভাবে কর্ম করলে তাকে *সাত্ত্বিক কর্ম* বলা যাবে? যখন *নিয়তং*, অর্থাৎ কোন 'বিহিত' কর্ম; *সঙ্গরহিতম্*, 'অনাসক্তভাবে'; *অরাগ দ্বেষতঃ কৃতম্*, 'অনুরাগ ও ঘৃণাবর্জিত হয়ে অনুষ্ঠিত হয়'; *অফল প্রেপ্সুনা*, 'কর্মফলের অভিলাষী নয় এমন ব্যক্তি দ্বারা'; অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে কাজ করে, সে ফল ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করে। যৎ, 'এমন যে কাজ'; তৎ *সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে*, 'তা *সাত্ত্বিক* বলে বিবেচিত।'

এবার *রাজসিক কর্ম*-এর সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে। বলা হয়েছে,

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

—'কিন্তু আবার নিজের জন্য ফল কামনা করে অথবা অহঙ্কারের সঙ্গে বহু কষ্টসাধ্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তা *রাজসিক* বলে পরিগণিত।'

এতো আমরা সব সমাজেই ভূরি ভূরি দেখছি। কী দেখছি? 'বাসনাতাড়িত হয়ে' কিছু পাওয়ার জন্য যখন কেউ কোন কাজ করে, *কামেপ্সুনা; সাহঙ্কারেণ*, 'বেশ অহঙ্কারের সঙ্গে'; তখন 'আমি করছি' এই ভাবটা তার মধ্যে প্রবল থাকে। *ক্রিয়তে বহুলায়াসং*, সে 'প্রচণ্ড চেষ্টা করে কাজটি সম্পন্ন করে'। কখনও কখনও সে চেষ্টা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অর্থাৎ অত কষ্টের প্রয়োজন নেই, কিন্তু তবুও আমরা করি। তৎ *রাজসম্ উদাহৃতম্*, 'ঐ ধরনের কর্ম *রাজসিক।*' দেশে বিদেশে সর্বত্রই এই চিত্র।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

—'মোহের বশে, ফলাফলের কথা চিন্তা না করে, শক্তি ও ধনক্ষয়, পরপীড়ন এবং নিজের সামর্থ্য বিচার না করে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাকে *তামসিক* বলা হয়।'

সেই কর্মকে *তামসিক* বলা হয়, 'যা মোহবশত আরম্ভ করা হয়', *মোহাৎ আরভ্যতে।* সব দিক বিবেচনা না করে, মনে করুন, আমি একটা কাজ আরম্ভ করলাম। এই ধরনের কাজ মোহপ্রসূত। অর্থাৎ ঝোঁকের বশে একটা কাজে হাত দিলাম। কাজটা শুভ হবে, কি অশুভ হবে, সে কথা একবার চিন্তাও করলাম না। কাজটা মনে হলো করতে হবে, অমনি হুট্ করে শুরু করে দিলাম। অথচ সেই কাজটি করলে হয়তো আমার শক্তি ও অর্থক্ষয় হবে; আবার এও হতে পারে আমার সেই কর্মের দ্বারা অন্যের পীড়া হলো। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথাও বলা হচ্ছে। তা হলো—'এ ধরনের কাজ হয়ত আমার সাধ্যের বাইরে'। *তামসিক কর্ম*-এর এই সব লক্ষণ। বলা হচ্ছে, *অনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্,* যে কর্ম আমাদের 'শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে', তা যদি করি তাহলে তা *তামসিক কর্ম।* কাজ শুরু করার আগে আমাদের প্রকৃত সামর্থ্যের কথাও ভেবে দেখতে হবে বৈকি। তা না করে, সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে, মোহের বশে যখন আমরা প্রাণপাত করি, তখন তা তামসিক কর্মে পর্যবসিত হয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত গুণভিত্তিক *জ্ঞান* ও *কর্ম*-এর তিনরকম শ্রেণিবিন্যাস আমরা পর্যালোচনা করলাম। এরপর আসছে *কর্তা,* অর্থাৎ 'যিনি কর্ম করেন', তাঁর প্রসঙ্গ।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

—'যে কর্তা আসক্তি থেকে মুক্ত, কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত, সাফল্য ও ব্যর্থতায় নির্বিকার, [তাঁকে] *সাত্ত্বিক* বলা হয়।'

তিনিই *সাত্ত্বিক কর্তা* যাঁর এই গুণগুলি আছে। কোন্ কোন্ গুণ? প্রথমে বলা হয়েছে, *মুক্ত সঙ্গঃ,* অর্থাৎ তিনি 'আসক্তিশূন্য'। তারপর, তিনি *অনহংবাদী,* 'তিনি অহং-এর ওপর নির্ভর করেন না।' *অহংবাদী* তিনি, যিনি রাতদিন 'আমি' 'আমি' করছেন। এর বিপরীত হলো *অনহংবাদী,* 'যিনি অহং-কে ফুলিয়ে

ফাঁপিয়ে তোলেন না।' *ধৃতি উৎসাহ সমন্বিতঃ,* 'যিনি *ধৃতি* [অর্থাৎ ধৈর্য] এবং উৎসাহযুক্ত'। *ধৃতি* প্রসঙ্গে আমি আগেই বলেছি, এই শব্দের ব্যঞ্জনা অতি গভীর। মোটামুটি এর অর্থ 'দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি'। যখন কোন কাজে ধৈর্য সহকারে আমরা লেগে থাকি, তখন তা *ধৃতি।* কাজ করতে গিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিল, আর তখনই আমরা কাজ ছেড়ে পালালাম, সেটি *ধৃতি* নয়, ধৃতির অভাব। *ধৃতি* হলো শুদ্ধ, তীব্র, অবিচল ইচ্ছাশক্তি। তার সঙ্গে থাকবে উৎসাহ বা উদ্যম। তা যদি থাকে, তবে তা *সাত্ত্বিক*। তারপর, *সিদ্ধসিদ্ধ্যোঃ নির্বিকারঃ, সাত্ত্বিক কর্তা* 'কাজের ফলাফলের ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার'। কাজের সফলতা বা ব্যর্থতা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা তাঁর নেই। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করেন, কিন্তু তার *সিদ্ধি,* 'সাফল্য', অথবা *অসিদ্ধি,* 'ব্যর্থতা', নিয়ে উত্তেজিত হন না। *কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে,* সেই 'কর্তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়।'

এবার *রাজসিক* কর্তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে ঃ

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

—'যিনি অভিলাষী, কর্মফললিপ্সু, লোভী, হিংসুক, অশুচি, সহজে পুলকিত অথবা বিষাদগ্রস্ত হন, তিনি রাজসিক [কর্তা] বলে পরিচিত।'

এখানে রাজস্কি কর্তা-র গুণগুলি বলা হচ্ছে। *রাগী,* 'আসক্তিপূর্ণ'; *কর্মফলপ্রেপ্সুঃ,* 'কর্মের ফল লাভ করতে খুবই উৎসুক'; *লুব্ধঃ,* 'লোভী'; *হিংসাত্মকঃ,* 'পরপীড়া করেন'। অর্থাৎ, তাঁর কাজকর্ম অন্যের ক্ষতি করে, অন্যদের কষ্ট দেয়। *অশুচিঃ,* তাঁর মন 'অশুদ্ধ'। তাঁর এই অশুদ্ধ মনটি তাঁর কাজেকর্মে ফুটে ওঠে। *হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা,* তিনি এমন 'কর্মী, যিনি কখনও হর্ষ অনুভব করেন, আবার কখনও শোকগ্রস্ত হন'। এই হলো তাঁর কাজের ধারা। এমন যে *কর্তা,* তাঁকে *রাজসিক* বলা হয়। এরপর *তামসিক* কর্তার কথা বলা হচ্ছে।

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

—'অসংযতচিত্ত, অমার্জিত, উদ্ধত, অসৎ, বিদ্বেষপরায়ণ, অলস, হতাশ এবং দীর্ঘসূত্রী কর্তা *তামসিক* বলে কথিত হয়।'

এই শ্লোকে আমরা *তামসিক* কর্তার সংজ্ঞা পাচ্ছি। এই *তামসিক* কর্তার লক্ষণ কী? প্রথমত, তিনি *অযুক্তঃ,* মন তাঁর একান্ত 'অসংযত', অর্থাৎ মানসিক সংযমের বালাই নেই। *প্রাকৃতঃ,* 'খুব অমার্জিত'। এমন মানুষকে 'অভদ্র' বললেও অত্যুক্তি হবে না। তার ওপর আবার *স্তব্ধঃ,* 'উদ্ধত'; *শঠঃ,* 'অসৎ'; *নৈষ্কৃতিকঃ,* 'বিদ্বেষপরায়ণ'; *অলসঃ,* 'কুঁড়ে'; *বিষাদী,* 'হতাশাগ্রস্ত'; এবং সবশেষে *দীর্ঘসূত্রী,* অর্থাৎ 'আঠারো মাসে বছর'; কাজ ফেলে রাখা তাঁর স্বভাব। এই হলো *তামসিক* কর্তার গুণের ফিরিস্তি! চারপাশের জীবনের দিকে তাকালে এমন মানুষের সাক্ষাৎ অতি সহজেই পাওয়া যায়।

ইংরেজি প্রবাদে আছে, 'দীর্ঘসূত্রীতা কাল হরণ করে'। এই প্রসঙ্গে আমার ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। তখন আমি স্কুলে পড়ি। ক্লাস সেভেন-এর ছাত্র। সেদিন নির্দিষ্ট কোন ক্লাস ছিল না। তাই মাস্টারমশাই ক্লাসে ঢুকেই বললেন, 'ছেলেরা, শোন। Procrastination is the thief of time।' কথাটার অর্থ হলো—'দীর্ঘসূত্রীতা সময় চুরি করে', অর্থাৎ কাল হরণ করে। ছেলেরা কথাটা ধরতে পারল না। আমরা তাই জিজ্ঞাসা করলাম, 'সেটা আবার কী স্যার?' মাস্টারমশাই চমৎকার মানুষ ছিলেন তিনি আমাদের কথা শুনে প্রথমে বোর্ডে একটা পুতুলের মাথা আঁকলেন, পরে সেই মাথার পিছন দিকে রেখা টেনে, চারগুচ্ছ চুল ঝুলিয়ে দিলেন। এবার তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই যে মাথা, এটি হলো সময়। এই মাথা কখনও স্থির থাকে না, সর্বদাই দুলছে। এখন, এই মাথাটিকে কী উপায়ে ধরা যায়? কীভাবে সময়কে তোমরা ধরবে? দেখ, এই চারগুচ্ছ চুল দুলতে দুলতে একসময় তোমাদের কাছে যখন আসবে, তখনই তাদের পাকড়াও করতে হবে। তা যদি না করতে পার, তাহলে তোমাদের আবার একটি সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে।' ইংরেজিতে বলে, 'Take time by the four locks' —অর্থাৎ 'সময়ের চারটি ঝুঁটি ধরে তাকে আটকাও'। এই ভাবটিকেই ছবি এঁকে তিনি বোঝাচ্ছিলেন। আমরা সবাই তো খুব খুশি। মাস্টারমশাই-এর রসবোধ দেখে বেদম হাসছিলাম। আমাদের হাসতে দেখে এবার তিনি বললেন, 'ছেলেরা, তোমাদের অদম্য হাসিতে পেয়ে বসেছে দেখছি। এই অদম্য বা 'irrepressible' কথাটায় খট্‌কা লাগায় একজন প্রশ্ন করল, 'ইরিপ্রেসিবল্‌' মানে কী স্যার?' মাস্টারমশাই সে কথা শুনে তড়িঘড়ি বোর্ডে গিয়ে যেই না 'irrepressible' শব্দটি লিখেছেন, অমনি হুড়মুড় করে বোর্ডটি ভেঙে পড়ল! তাতে আমাদের হাসি আরো বেড়ে গেল। আমাদের স্কুল জীবনের এটি এক মজার ঘটনা। কিন্তু ঐ ঘটনাটির মধ্য দিয়েই আমরা শিক্ষা

পেয়েছিলাম যে গড়িমসি বা গয়ংগচ্ছভাব কাল হরণ করে। সময়ের ঝুঁটি ধরতে পারলে জীবনে অনেক কাজ করা যায়। আমি অনেককে প্রায়শই বলি, 'সময়ের অভাব, তাই যা করা কর্তব্য তা করে উঠতে পারছ না—এ দোহাই দিও না'। মন যদি নিজের বশে থাকে তাহলে একজন চব্বিশ ঘণ্টায় যে কাজ করবে, অন্যরা, যাদের মন এলোমেলো, তা পারবে না। উইনস্টন চার্চিল-এর চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন; আপনার এবং আমারও তাই। কিন্তু চার্চিল এক দিনে যে পরিমাণ কাজ করতেন, আমরা কি তা পারি, না করি? মনকে কি করে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় সে কৌশলটাই আমরা জানি না। সেটি আমাদের শিখতে হবে। 'সময়ের অভাব'—এ অজুহাত দিয়ে লাভ নেই। যদি অভিযোগ করতেই হয়, তবে নিজের মনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করুন যে, মন সময়ের সদ্ব্যবহার জানে না। তাই এখানে, এই শ্লোকে যে দীর্ঘসূত্রতার কথা বলা হয়েছে, সেটি *তামসিক* গুণ। এই কথাটির ওপরই এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নৈষ্কৃতিকঃ মানে 'বিদ্বেষী', যে সর্বদা অন্যের নিন্দা করে বেড়ায়। এই প্রবণতাটি আজ আমাদের সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। এই যে অন্যের খুঁত ধরা, অন্যকে ছোট করার বদভ্যাস, এটি ছাড়তে হবে, কারণ এটি *তামসিক* ভাব। এটি বিকৃত মনের লক্ষণ। *বিষাদী,* 'হতাশ', মাঝে মাঝেই মুহ্যমান হয়ে পড়ে। *দীর্ঘসূত্রী,* 'যে গড়িমসি করে'; অর্থাৎ 'আজ নয়, কাল', 'কাল নয়, পরশু'—কাজ করতে গেলেই এই ভাব যাকে পেয়ে বসে। *তামসিক কর্তা* এই ধরনের।

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু ।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ।। ২৯।।

—'হে ধনঞ্জয় [অর্জুন], গুণ অনুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিনরকম প্রভেদ নিঃশেষে এবং পৃথক পৃথকভাবে বলছি শোন।'

এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *বুদ্ধি* এবং *ধৃতি*-কেও তিনভাগে বিন্যস্ত করা যায়, কারণ তাদেরও *সাত্ত্বিক, রাজসিক* এবং *তামসিক* ভাব আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি তোমাকে এদের পার্থক্য বুঝিয়ে বলছি, অর্জুন; তুমি তা শোন। আগেই বলেছি সংস্কৃত ভাষায় *ধৃতি* একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ শব্দ। *ধৃতি*-র অর্থ ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তি ছাড়া চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। কীরকম ইচ্ছাশক্তি? সমাজমুখী ইচ্ছাশক্তি। উন্নত চরিত্রের মূলে থাকে এই ধরনের ইচ্ছাশক্তি, যা সমাজের

সকলের কল্যাণের কথা মনে রাখে। যাঁদের এই ইচ্ছাশক্তি আছে, তাঁদের একটাই চিন্তা—'কিসে সবার মঙ্গল হয়'। যতরকম ইচ্ছাশক্তি আছে, এইটিই তাদের মধ্যে মহত্তম। সংস্কৃতে তাকেই *ধৃতি* বলা হয়েছে। *প্রোচ্যমানম্,* শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'আমি তোমাকে এই বিষয়ে পরিষ্কার করে বলছি'; *পৃথক্ত্বেন,* 'পৃথকভাবে'; এবং *অশেষেণ,* 'নিঃশেষে'।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে ।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

—'হে পার্থ, যে বুদ্ধিতে বাহ্য কর্মমার্গ এবং আন্তর ধ্যানমার্গ, বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মোক্ষ [সম্পর্কে] জানা যায়, সেই বুদ্ধি *সাত্ত্বিক।*'

সাত্ত্বিক বুদ্ধি কীরকম? *সা বুদ্ধিঃ,* 'সেই বুদ্ধি'; *যা বেত্তি,* 'যা জানে'; *প্রবৃত্তি* অথবা 'কর্ম'; এবং *নিবৃত্তি* অথবা 'কর্মত্যাগ'; *কার্য অকার্যে,* 'কর্তব্য ও অকর্তব্য'; *ভয় অভয়ে,* 'ভয় এবং অভয়'; *বন্ধং মোক্ষং চ,* 'এবং বন্ধন ও মুক্তি'; *পার্থ সাত্ত্বিকী,* যে বুদ্ধি এইগুলি বুঝতে পারে, 'হে অর্জুন, [সেই বুদ্ধি] *সাত্ত্বিক*।' অর্থাৎ যে বুদ্ধি কর্মমার্গ ও ধ্যানমার্গের রহস্য জানে, যে বুদ্ধি বোঝে কি করা উচিত আর কি নয়, কোন্‌টি অনুমোদিত এবং কোন্‌টি নিষিদ্ধ কর্ম, যে বুদ্ধি, ভয় ও অভয়ের কারণ জানে, বন্ধন ও মোক্ষের রহস্য বুঝতে পারে, হে অর্জুন, সেই বুদ্ধিই *সাত্ত্বিক*। *রাজসিক* ও *তামসিক বুদ্ধি*-র সঙ্গে তুলনা করে *সাত্ত্বিক বুদ্ধি*-র মাধুর্যটি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

—'হে পার্থ, যে বুদ্ধি দ্বারা *ধর্ম* ও *অধর্ম* এবং কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্পর্কে বিকৃতভাবে জানা যায়, সেই বুদ্ধি *রাজসিক*।'

যে বুদ্ধি *অযথাবৎ প্রজানাতি,* 'বিকৃতভাবে জানে' *ধর্ম* এবং *অধর্ম* এবং কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্পর্কে, তা *রাজসিক* বুদ্ধি। অর্থাৎ বুদ্ধি অশুদ্ধ হওয়ায় ধারণাগুলি স্বচ্ছ নয়। রাজসিক বুদ্ধি এই ধরনের; তা ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে, বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মের মধ্যে পার্থক্য করতে জানে না।

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা ।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

—'তমোগুণ দ্বারা আচ্ছন্ন যে বুদ্ধি *অধর্মকে ধর্ম* মনে করে এবং সব বিষয়কে বিপরীতভাবে দেখে, হে অর্জুন, সেই বুদ্ধি *তামসিক* ।'

অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি *তামসিক;* তা ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য বোঝে না। এই ধরনের বুদ্ধি *অধর্ম*-কে *ধর্ম* মনে করে এবং *ধর্ম*-কে *অধর্ম।* সব কিছুতেই তার বিপরীত বুদ্ধি। সব কিছুই সে উল্টোভাবে দেখে। যা ঠিক, তাকে সে ভুল ভাবে; যা ভুল, তাকেই সে ঠিক মনে করে। যা অন্যায়, তার দৃষ্টিতে সেটিই ন্যায়। এরকম হওয়ার কারণ, তার বুদ্ধি *তমসাবৃতা,* মোহ বা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

—'হে পার্থ, ব্রহ্মে সমাহিত একনিষ্ঠ যে *ধৃতি* দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই *ধৃতি সাত্ত্বিক* ।'

এবার *ধৃতি*-র প্রসঙ্গ আসছে। মানুষের জীবনে এই *ধৃতি*-র অপরিসীম মূল্য। কিন্তু তার কারণ কী? কারণ এই যে, আমাদের সব আবেগের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড শক্তি নিহিত থাকে। এই আবেগ যদি সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে ইচ্ছাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে তার দ্বারা কত মহৎ কাজই না সম্ভব হতে পারে। এখন প্রশ্ন—কীভাবে এই ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত করা যায়? তার উত্তর—ইচ্ছাকে সঠিকভাবে, সঠিকপথে পরিচালিত করে। এটিই একমাত্র পথ। হিটলারেরও ইচ্ছাশক্তি, আবার বুদ্ধেরও ইচ্ছাশক্তি। হিটলারের ইচ্ছাশক্তি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে এবং বুদ্ধের ইচ্ছাশক্তি অগণিত মানুষের জীবন আনন্দ ও শান্তির সৌরভে পরিপূর্ণ করে দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের জীবনে *ধৃতি* বা প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন আছে; শুধু তাকে ঠিক পথে চালনা করতে হবে।

এই শ্লোকে *সাত্ত্বিক ধৃতি*-র বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। *সাত্ত্বিক ধৃতি* কিরকম, তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী,* 'হে অর্জুন, সেই ইচ্ছাশক্তি *সাত্ত্বিক'; ধৃত্যা যয়া ধারয়তে,* 'যে ধৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।' কী নিয়ন্ত্রিত হয়?

মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়, ক্রিয়াঃ, 'মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গুলির যাবতীয় কাজকর্ম'। সারথি যেমন ঘোড়াগুলির লাগাম শক্ত করে ধরে রাখে, তেমনি এই সাত্ত্বিক ধৃতিসম্পন্ন মানুষের দেহ-মনরূপ যন্ত্রগুলিও সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। এটি হলে তবেই আমরা সরাসরি গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারি। মানুষের ভিতর বহু রকমের শক্তি খেলে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে আবার অনেক শক্তি পরস্পরবিরোধী—এক শক্তি আপনাকে একদিকে টানছে, আর এক শক্তি আর এক দিকে। কিন্তু যখন আমাদের মধ্যে *ধৃতি* আসে, তখন আমরা শক্তিগুলিকে সংহত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। কিন্তু কী সেই শক্তি যার সাহায্যে মানুষ তার মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে শাসন করে, তাদের সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে বাধা করে?' তার উত্তরে বলা হচ্ছে, *যোগেন অব্যভিচারিণ্যা,* 'অব্যভিচারী *যোগ*-এর দ্বারা' অথবা 'সুনিয়ন্ত্রিত *যোগ*-এর দ্বারা'। সেই *যোগ* কি ধরনের? নিরবচ্ছিন্ন বা নিত্য *যোগ;* ধৃতিশক্তিযুক্ত যোগ; *ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী,* 'হে অর্জুন, সেই ইচ্ছা *সাত্ত্বিক'* । এই যে লক্ষ্য, এর মধ্যে কোন রহস্য বা অবাস্তবতা নেই। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর *সম্ভাবনা সকলের মধ্যেই আছে।* আমি আমার মানসিকশক্তিকে প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে রূপান্তরিত করে মানবকল্যাণের কাজে লাগাতে চাই—একথা মনকে বলতে হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের দ্বারা শক্তিগুলিকে একত্র করে দুর্জয় সঙ্কল্পশক্তি জাগ্রত করতে হবে। সেই শক্তি জাগলে তাকে আমি জনহিতকর কাজে লাগাব। একেই *সাত্ত্বিক* ইচ্ছা বলে। আর তা না হয়ে যদি শক্তিগুলি বিপথগামী হয়, তবে তা, হয় *রাজসিক* বা রাক্ষুসে, নয় তো *তামসিক* ইচ্ছায় পর্যবসিত হবে। ইচ্ছা যত *সাত্ত্বিক* হয়, সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই যে *ধৃতি* বা সাত্ত্বিক ইচ্ছাশক্তি, এটি *যোগ*-এর মাধ্যমে স্থির ও দৃঢ় হয়—তার প্রবাহ অবিরাম একটানা চলতে থাকে, কখনও তা দুর্বল হয় না। এই *সাত্ত্বিক ধৃতি* মানুষের জীবনে পরম আশীর্বাদস্বরূপ। এই ইচ্ছাশক্তি লাভ করার জন্য আমরা যদি সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে পারি তাহলে বুঝতে হবে আমাদের শিক্ষা সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়েছে।

বুদ্ধি এবং *ধৃতি,* এই দুয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। *বুদ্ধি* হলো বিচার করার ক্ষমতা এবং *ধৃতি* বা ইচ্ছাশক্তি হলো সেই শক্তি যা আমাদের এগিয়ে যেতে উদ্দীপিত করে। তাই *বুদ্ধি* এবং *ধৃতি* যেন হাতধরাধরি করে চলে। বুদ্ধিরই একটা বিশেষ দিক হলো *ধৃতি* যা আমাদের চালিত করে সবকিছু ঘটায়। জ্ঞান নিজে কিছু ঘটায় না, ঘটায় ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই জ্ঞান কর্ম হয়ে

আত্মপ্রকাশ করে; সে এমনই কর্মপ্রবাহ যা জগৎকে আলোড়িত করে, নাড়া দিয়ে যায়। এইটিই *ধৃতি* বা শুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির ভূমিকা।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শুদ্ধ অটল ইচ্ছাশক্তিই ভগবান। যাঁর এরকম ইচ্ছাশক্তি আছে তিনি সাধারণ মানুষ নন, তিনি দিব্যপুরুষ। স্বয়ং ঈশ্বরেরই এক বিরাট 'ইচ্ছা' রয়েছে। আমাদের দর্শনে বলা হয় ঈশ্বরের তিনটি দিক— *ইচ্ছা, জ্ঞান* এবং *ক্রিয়া* । *ইচ্ছা* হলো 'অভীপ্সা'; *জ্ঞান* হলো অভিপ্রেত বাসনার 'জ্ঞান' বা সে সম্পর্কে সচেতনতা এবং *ক্রিয়া হচ্ছে* সেই ইচ্ছা অনুযায়ী 'কর্ম'। এই বিশ্বসংসার সেই পরম পুরুষ বা দিব্য সত্তার *জ্ঞান, ইচ্ছা* এবং *ক্রিয়া*-র ফল। ব্যক্তি হিসাবে আমাদেরও জ্ঞান, ইচ্ছা এবং ক্রিয়া আছে। তবে এখনও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত থাকায় তাদের কার্যকারিতা খুবই সীমিত। ওইগুলিকে আমাদের পরিশুদ্ধ করতে হবে, বিকশিত করতে হবে, তাদের বিস্তার ঘটাতে হবে। এইটিই আমাদের কাছে মস্ত একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন, আপনার শক্তিকে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ করে তুলুন। তামসিক শক্তিকে রাজসিক শক্তিতে রূপান্তরিত করুন এবং তারপর রাজসিক শক্তিকে সাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত করুন। মানুষের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির এই ক্রমবিকাশ ঘটানোই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, কারণ একমাত্র প্রবল, অবিচল, মানবমুখী ইচ্ছাশক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারে।

যুক্তি বা জ্ঞান কেবল আমাদের কিছু তথ্য দিতে পারে। কিন্তু সেই জ্ঞানকে কর্মে পরিণত করতে হলে ধৃতি বা প্রবল ইচ্ছাশক্তি চাই। শুধু তাতেও হবে না; সেই ইচ্ছাশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও শুদ্ধ হতে হবে। তা যদি হয়, একমাত্র তখনই তাকে সমাজহিতৈষী, লোকহিতকর ইচ্ছা বলা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ এই যোগের শিক্ষাই দিয়েছেন। যে কোন ক্ষেত্রেই সিদ্ধিলাভ করতে গেলে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। কিন্তু দেখতে হবে সেই শক্তি যেন নিজের আখের গুছানোর কাজে ব্যয়িত না হয়ে, সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ *আমাদের মধ্যে* এই ধরনের ইচ্ছাশক্তির উদ্‌বোধনের কথাই বলেছেন এবং এই কাজ আমাদের নিজেদের চেষ্টায় করতে হবে।

গান্ধীজীর এই ধরনের ইচ্ছাশক্তি ছিল। তিনি সত্য সত্যই একজন ধৃতিমান পুরুষ ছিলেন। জীবনের রাশ তিনি এমন চমৎকারভাবে টেনে রাখতেন যে প্রতিটিক্ষণ শুধু মানুষের কল্যাণের কাজেই নিয়োজিত হতো। অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবনী তো আমরা সকলেই পড়েছি। প্রতিদিন ভোর চারটেয়

ঘুম থেকে উঠতেন। তারপর প্রার্থনা এবং কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর তাঁর আসল কাজ শুরু হতো। সে কাজ জাতির সেবা। নিয়ম করে, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনি সব কাজ করে যেতেন। যদি কেউ দু-মিনিটের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, দু মিনিট অতিক্রান্ত হলেই তিনি অতিথিকে তাঁর ঘড়িটি দেখিয়ে দিতেন। অর্থাৎ বলতে চাইতেন ঃ 'আপনি এবার আসুন, কারণ অন্যরা অপেক্ষা করছেন'। প্রচণ্ড নিয়মনিষ্ঠ এবং কর্মতৎপর ছিলেন তিনি, কিন্তু সর্বদা সহৃদয়। কখনও কাউকে আঘাত করতে চাননি। তাঁর জীবনের একটা ঘটনা বলি। একবার তিনি সিমলায় ভাইসরয় লর্ড আরউইন (Erwin)-এর কাছে আলাপ-আলোচনার জন্য গেছেন। কথাবার্তা চলল রাত তিনটে পর্যন্ত। কিন্তু ঠিক তার পরই তিনি ঘুমোতে গেলেন। ঐ তাঁর আর একটা ক্ষমতা! যখন ইচ্ছা ঘুমোতে পারতেন। সে রাতে তিনি এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে ঠিক চারটের সময়, যেমন অন্য দিনে ওঠেন, বিছানা ছাড়লেন এবং প্রভাতী ভ্রমণ শুরু করলেন। তাঁর জীবনের এই যে ঘটনা, এ হলো ধৃতির প্রকাশ। এ *ধৃতি* সামান্য নয়, এ হলো দীপ্তিমান ধৃতি যা জাতির কল্যাণে সতত নিবেদিত। গান্ধীজীর মতো মানুষের যে ধৃতি, তার যদি এক কণাও আমাদের মধ্যে আসতো, তাহলে ভারতের চেহারাটাই বদলে যেত!

আলোচ্য শ্লোকে *অব্যভিচারী* যোগের কথা বলা হয়েছে। *অব্যভিচারী যোগ* মানে 'নিত্য'যোগ। এরকম নয়, আপনি আজ যোগে আছেন, আগামিকাল তা থেকে সরে গেলেন। না, তা নয়। এ এমন দৃঢ় যোগ যে, তা আপনার জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। গান্ধীজীর জীবনে এই নিত্যযোগের প্রকাশ দেখা যায়। এই যে যোগ, তার কোন কমাবাড়া নেই, ওঠাপড়া নেই। আমাদের মধ্যে এবং আমাদের শিশুদের ভিতর এই যোগের ভাবটি জাগাতে হবে। এদেশে এবং বিদেশে মানুষ যখন গীতার চর্চা করবেন এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন, আমার স্থির বিশ্বাস, ধীরে ধীরে তাঁদের এই ধরনের মহৎ চরিত্র গড়ে উঠবে। এখানে জ্ঞানের অভাব নেই, প্রেরণার অভাব নেই; শুধু প্রয়োজন এই শিক্ষাগুলিকে জীবনে পরীক্ষা করে দেখা। জীবন তো একটা গবেষণাগার। আমাদের প্রতিনিয়ত নিজেকেই প্রশ্ন করতে হবে—'আমার মধ্যে কি এই ইচ্ছাশক্তি, এই শুভ বুদ্ধি জাগছে?' তবেই জীবন একটা মহৎ উদ্দেশ্যে চালিত হবে। এই ইচ্ছাশক্তি ব্যাপকভাবে জাগ্রত হলে পৃথিবীটাই স্বর্গ হয়ে যাবে। গীতার শিক্ষা অনুযায়ী যদি আমরা আমাদের চরিত্রটি গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমাদের এই ভারতবর্ষই স্বর্গপুরীতে রূপান্তরিত হবে।

মানুষের চরিত্রশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাই এই শিক্ষার গুরুত্ব অতি গভীর। আমাদের সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু মানসিকশক্তি আছে। কিন্তু তার বর্তমান রূপ অপরিশোধিত তেলের মতো। খনিজ তেলকে ব্যবহার উপযোগী করতে হলে তাকে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোধন করতে হয়। চরিত্রকেও ঠিক তেমনি মেজেঘষে উন্নত করতে হয়। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং প্রতিদিনের কাজকর্মের প্রেক্ষাপটে যখন মানসিক শক্তিকে ক্রমাগত শুদ্ধ করে তোলার প্রয়াসী হই আমরা, তখন আমাদের মধ্যে *বুদ্ধি,* সংযত বিচার এবং *ধৃতি* অথবা ইচ্ছাশক্তির অরুণোদয় হয়। তখন আমাদের চিন্তা, ধারণাশক্তি এবং বিচার স্বচ্ছ হয়ে ওঠে এবং সেই জ্ঞান এমনভাবে সব কাজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় যে চারপাশের পরিবেশ বদলে যায়—প্রগতি, আনন্দ ও কল্যাণের বান ডাকে। শোধনের এই কাজ তাই শৈশব থেকেই শুরু করতে হবে। মানসিক শক্তি নিয়ে আমরা কী করছি? এই প্রশ্ন করলে আপনারা হয়ত বলবেন—আমরা তাকে কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছি। কিন্তু মূল প্রশ্ন এই—আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিকে সমন্বিত করে, মনুষ্যত্বের প্রেরণা দ্বারা জারিত করে, সেগুলিকে আরো বিকশিত করে তোলার প্রয়াসী হয়েছি কী? তা যদি হয়ে থাকি, তবেই আমরা সমাজের অলংকার বা ভূষণ হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। মানসিক শক্তির এই ইতিবাচক বিকাশ শিক্ষাকে আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং দর্শনের কাছাকাছি নিয়ে আসে; এই জাতীয় চারিত্রিক বিকাশের ফলে সমাজের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে ওঠেন আপনি—অভিশাপ নয়। আমরা নিজেদের *সাত্ত্বিক* করে গড়ে তুলতে পারি, আবার *তামসিক* বা *রাজসিক* হয়ে, রাক্ষসের মতো দুরাচারী হয়ে, সকলের সুখ-শান্তি ধ্বংস করতেও পারি। সবটাই আমাদের হাতে। আজ আমাদের চতুর্দিকে রাক্ষসের ছড়াছড়ি। তাই কি করে স্থূল মানসিক শক্তিকে পরিশোধিত করে, তাকে পবিত্র ও দিব্যায়িত করে তোলা যায়—আমাদের কাছে এটাই একটা মস্ত চ্যালেঞ্জ। কী করে তা করব? তার উত্তরে বলতে পারি, যে তিনটি গুণের কথা আলোচনাসূত্রে গীতায় বারবার এসেছে, সেই *গুণ* সম্পর্কিত জ্ঞানের দ্বারা আমাদের শক্তিগুলিকে আমরা পরিশুদ্ধ করতে পারি। অপরিশোধিত তেলকে শোধন করেই তো তা দিয়ে নানারকম পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী তৈরি করা হয়। এও ঠিক তেমনি। স্থূল, অমার্জিত মানসিক শক্তিকে ক্রমাগত শুদ্ধ করে তমোগুণ থেকে রজোগুণে এবং রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে উঠতে হবে আমাদের। মন যখন *সাত্ত্বিক* হয়, সেটিই তখন মনের শুদ্ধতম অবস্থা; সে অবস্থায় মন সর্বদা প্রশান্ত, করুণায় পরিপূর্ণ; সকলের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতিতে সমৃদ্ধ।

ভারতীয়দের মধ্যে আজ প্রচুর *রাজসিক* শক্তি জেগেছে। আগে এর অভাব ছিল; তাই শক্তির এই অভ্যুদয়কে স্বাগত জানাতেই হবে। কিন্তু এই শক্তিকে এবার *সাত্ত্বিক* শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। পরিবর্তিত সেই শক্তি হবে সৃষ্টিধর্মী ও গঠনমূলক যা সকলকে সুখী করবে, বহুমুখী কল্যাণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটিই ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ আমরা দিন দিন অনেককিছুই গড়ে তুলছি, ক্রমশই উন্নত দেশ হিসাবে স্বীকৃত হচ্ছি। তাই রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে ওঠার চেষ্টা আপনাকেই করতে হবে, এ কাজ আপনার হয়ে অন্য কেউ করে দিতে পারবে না। পাঁচ বছর বয়স থেকেই প্রত্যেক শিশুর মধ্যে একটু একটু করে এই গুণ যাতে বিকশিত হয়, বড়দের তা দেখতে হবে এবং প্রয়োজন মতো শিশুদের পথনির্দেশ দিতে হবে। কোনমতেই লক্ষ্যটিকে ভুললে চলবে না। শিক্ষা ও ধর্মের ব্যাপারে ইচ্ছাশক্তিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, তাকে শুদ্ধ করে তোলার দায় আমাদের বহন করতেই হবে।

বুদ্ধি শব্দটি আমরা প্রথম পেয়েছি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ '*বুদ্ধির* আশ্রয় নাও।' তাই বুদ্ধির বিকাশ ঘটান। তা ঘটাতে পারলে আপনার সমস্ত জীবনটাই বদলে যাবে। কারণ মানুষের মানসিক শক্তির বিবর্তনের সূক্ষ্মতম ও শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি এই বুদ্ধি। সেই বিকশিত বুদ্ধি কীরকম? তা উজ্জ্বল, বিচারশীল এবং কর্মশক্তি-সমৃদ্ধ, কারণ বুদ্ধির স্তরে *ধৃতি* বা ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে।

আগেই বলেছি *বুদ্ধি* আর *ধৃতি* হাত ধরাধরি করে চলে। এখানে গীতাতেও দেখছি দুটির আলোচনা একসঙ্গে করা হচ্ছে। প্রথম তিনটি শ্লোকে বুদ্ধির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং পরবর্তী তিনটি শ্লোকের বিষয় ধৃতি। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এই *ধৃতি সাত্ত্বিক,* যা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কীভাবে তা করে? বলা হয়েছে, *যোগেন অব্যভিচারিণ্যা,* 'ধৃতির পিছনে যে আত্মা রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে একাগ্র ঐক্যানুভূতির দ্বারা'। আমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছাশক্তির পিছনে শাশ্বত আত্মা বর্তমান। সেই আত্মা যখন ইচ্ছাশক্তিকে প্রভাবিত করে, তখন সেই ইচ্ছাশক্তির আমূল রূপান্তর ঘটে যায়। তার উত্তরণ ঘটে এই বোধে—'আমি সকলের সঙ্গে অভিন্ন'। এই যে দিব্য, অপার্থিব ইচ্ছাশক্তি, তা কি কখনও কারো অনিষ্ট করতে পারে? কখনও না। সে এক অপরূপ অবস্থা!

পাশ্চাত্যেও এই বিষয় নিয়ে বহুরকম আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু মানুষের মধ্যেই যে ঈশ্বর আত্মগোপন করে আছেন, এখনও তাঁরা টের পাচ্ছেন না। পাশ্চাত্যের খ্রিস্টতত্ত্ববিদদের ধারণায় মানুষ পাপী, সে শুধু পাপই করে; তার ভিতর দিব্য স্ফুলিঙ্গের লেশমাত্র নেই। যিশুখ্রিস্ট কিন্তু এ ধরনের শিক্ষা দিয়ে যাননি। তিনি ঠিক এর উল্টো কথাই বলেছেন। বলেছেন, 'ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য আমাদের ভিতরেই'। খ্রিস্টান ধর্মবেত্তাদের মতই যদি সত্য হতো, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরীয় সত্তা যদি না থাকত, তাহলে মানুষের ইচ্ছা দুর্দমনীয় অহংকারের হাতিয়ার হয়ে শুধু মানুষের চরম সর্বনাশই করে যেত। পাশ্চাত্যের এই ভ্রান্ত ভাবনার বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে দার্শনিক নিৎসের (Nietzsche) মতাদর্শে। নিৎসে 'সুপারম্যান'-এর কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই অতিমানবের এমন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি যে দুনিয়া ওলোটপালোট করে দিতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন—এই ইচ্ছাশক্তিকে তিনি কোন্ উদ্দেশ্যে কাজে লাগান? নিৎসে বলছেন, 'এই অতিমানব হিংসায় পরিপূর্ণ কর্ম ও আচরণের মধ্য দিয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন'। এই আচরণের কারণ কী? কারণ, তিনি সকলের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন না। তিনি জগতের ওপর কেবল আধিপত্য করে যাবেন—এই তাঁর প্রকৃতি!

গীতায় বা বেদান্তে আমরা যে মহামানবের চিত্রটি পাই, তা কিন্তু একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি সকলের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন; সকলের কাছে তিনি আশীর্বাদস্বরূপ। সেই ধৃতির কথাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে। সেই যে বিশ্বাত্মক *ধৃতি*, তা কী করে আসে? কেন আসে? আসার কারণ, *যোগেন অব্যাভিচারিণ্যা*, যোগের দ্বারা সেই ইচ্ছাশক্তি পরম শক্তির আধার যে অদ্বিতীয় শাশ্বত আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য, যা সকলের মধ্যেই বিরাজ করছেন, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। শুদ্ধচৈতন্যের সঙ্গে সংযোগ হলে ইচ্ছার রূপ বদলে যায়। ভারতবর্ষ যে অতিমানবকে সম্মান করে, তাঁর প্রকৃতি এইরকম। তিনি অনন্ত করুণার আধার; যেমন বুদ্ধ। তিনি অবশ্যই এক মহামানব ছিলেন। আমাদের সময়ে গান্ধীজী ছিলেন এইরকম এক মহামানব বা *মহাত্মা*। *মহাত্মা* তাঁকেই বলা হয় যাঁর আত্মা কারো থেকে বিচ্ছিন্ন না, সকলের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সংযুক্তির ফলেই গান্ধীজীর মধ্যে এত করুণার প্রকাশ হয়েছিল। মানুষের যে বিবর্তন, তার লক্ষ্য এইটিই। আজ এই দর্শন পাশ্চাত্যের প্রত্যেককেই আকৃষ্ট করছে। পুরনো ধারণার রঙে আঁকা, প্রকৃতির হাতে গড়া অতিমানবের হিটলারী মূর্তি এবং অশেষ যন্ত্রণাদায়ক নাৎসী আন্দোলনের ভয়াল বীভৎস ছবি তাঁরা দেখেছেন এবং হাড়ে হাড়ে নিৎসীয় দর্শনের অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পেরেছেন। হিটলার

শক্তিধর অতিমানব অবশ্যই ছিলেন, কারণ তাঁর দেশ অন্যান্য দেশের সঙ্গে যেসব চুক্তি করেছিল, সেসবের তোয়াক্কা তিনি করেননি। কোনরকম সৌজন্যের ধার তিনি ধারেননি। হিংসাদুষ্ট কর্ম ও যথেচ্ছ আচরণের দ্বারা তাঁর যা করার, তা তিনি করে গেলেন। কিন্তু তা টিকল কই? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর কৃতকর্মের সৌধটি ধসে পড়ল, ধ্বংস হলো তাঁর অতি সাধের নাৎসী দর্শন। আজ পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানী আবার ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড জার্মানীতে পরিণত হয়েছে। গোটা ইউরোপ আজ উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত; কারণ একটা বড় ধরনের পরিবর্তন সেখানে ঘটতে চলেছে। আজ গীতার বাণী তাঁদের উদ্দীপিত করছে। যে করুণাঘন আদর্শ মহামানবের কথা গীতায় বলা হয়েছে, তাঁর প্রতি তাঁরা আকৃষ্ট হচ্ছেন। আজ এসব কথা তাঁরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে শোনেন। ১৯৬১ সালে ইউরোপের সতেরটি দেশের বক্তৃতাসফরে গিয়ে এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। মানবিক বিকাশের চরম অবস্থাটির কথা আজ তাঁরা জানতে চান।

বাস্তবিক, আমাদের মানববিকাশের ধারণাটি কী অসাধারণ একবার ভেবে দেখুন! আপনি মহামানব হতে চান? বেশ তো। সে সম্ভাবনা আপনার মধ্যেই নিহিত আছে। শুধু মনে রাখতে হবে, মহামানব হতে গেলে আপনাকে বুদ্ধের মতো হতে হবে—অনন্ত করুণায় ভরা। মহামানবের বর্ণনা দিতে গিয়ে গীতায় বলা হয়েছে, তিনি *সর্বভূত হিতে রতাঃ*—'সর্বভূতের সুখ ও কল্যাণবিধানে নিরত'। এই হচ্ছে মহামানবের প্রকৃতি। এখন আমি একজন সাধারণ মানুষ, নিজেকে নিয়ে, নিজের সীমিত দেহ ও মনকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু মহামানব যিনি, তিনি সহস্র মানুষের মনে, অগণিত মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন; তাদের সকলের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে তাদের সেবা করেন, তাদের স্বার্থরক্ষা করেন। আমাদের প্রত্যেককেই অন্তত এক-শতাংশ মহামানব হয়ে উঠতে হবে। নিজের মধ্যে সেই অনন্ত করুণার ভাবটিকে ধীরে ধীরে বিকশিত করতে হবে। 'চরৈবেতি', 'এগিয়ে চলুন'। আজ হয়তো একভাগ বিকশিত হলো, বাকি নিরানব্বই ভাগ কালে ঠিক বিকশিত হবে। চলা থামাবেন না। সনাতন বেদান্ত বলে, এই হলো প্রকৃত শিক্ষা, মানব বিবর্তনের যথার্থ লক্ষ্য ও ধারা। আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষ এই ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে; শুধু ভাবটিকে এভাবে উপস্থাপিত করতে হবে। এইটিই তপস্যা—আপনার আত্মবিকাশের তপস্যা। এই তপস্যা কেবল অরণ্যনিবাসী যোগীর নয়। এ তপস্যা দৈনন্দিন শত কাজের মধ্যে আপনাকে আমাকেও করতে হবে। কাজের মাধ্যমে আমাদের অন্তর্জগৎটি বিকশিত এবং স্ফুটিত হবে। *বাইরে কর্ম*, সেই সঙ্গে *অন্তরের*

বিস্তার—এই দুয়ের সমন্বয়েই গীতার *যোগ।* এমন যোগী মহাপুরুষরাই, যিশু খ্রিস্টের ভাষায় 'ধন্য' এবং তাঁদের সান্নিধ্য ও জীবনের সংস্পর্শে এসে অন্যরাও ধন্য হয়ে যান।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্,* 'কর্মের কৌশলই যোগ', অর্থাৎ 'কর্মে নিপুণতা ও কুশলতা' চাই। কাজ করে আমরা নানা জিনিস তৈরি করি, মানুষের সেবা করি। অর্থনীতির দৃষ্টিতে, ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবই উৎপাদন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ গেল কাজের একটা দিক। অন্যদিকও আছে। সেটি হলো এই, কাজের মাধ্যমে আমরা অন্তর্জীবনটিকেও উন্নততর, শুদ্ধতর, মহত্তর করে তুলি; সকলের প্রতি আমরা সহানুভূতিশীল হই। এটি কর্মকুশলতার দ্বিতীয় দিক। তাই একই সঙ্গে বাইরের কাজকর্মে নৈপুণ্য এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ দুটিই অর্জন করতে হবে—দুয়ের সমন্বয় চাই। গীতায় যে যোগ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাতে দুটিই গুরুত্ব পেয়েছে।

শিশুদের মধ্যে প্রবল ইচ্ছা দেখা যায়; কিন্তু তার বেশিরভাগই খুব নিম্নস্তরের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা মানুষের অহংকারকে স্ফীত করে, তাকে অহংকারের দাসে পরিণত করে। আমার অহংকার আছে, সেইসঙ্গে প্রবল ইচ্ছাশক্তিও আছে। যাঁরা এ ধরনের মানুষ, তাঁদের আমরা 'দৃঢ়চেতা' বলি, অর্থাৎ প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু এ ইচ্ছা শুদ্ধ নয়। এটি নিছক একগুঁয়েমি। এঁদের ভাব হলো—'আমি আমার মত কোনমতেই বদলাব না'। এটি বিশুদ্ধ ইচ্ছা নয়। শুদ্ধ ইচ্ছা অনমনীয় নয়, তাতে গোঁয়ার্তুমির স্থান নেই। ভুল হলে সে নিজেকে শুধরে নিতে প্রস্তুত। আমরা সাধারণত একরোখা মানুষকেই দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বলে ভুল করি। আসলে কিন্তু তা নয়। প্রকৃত ইচ্ছা নমনীয়। তার দৃষ্টি কল্যাণের দিকে, সত্যের দিকে; তাই প্রয়োজন হলে সে পরিবর্তিত হতে প্রস্তুত। এই হলো শুদ্ধ ইচ্ছার প্রকৃতি। কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দরা কখনও তাদের মত পাল্টাবে না। সমাজে এই ধরনের মানুষের অভাব নেই। মজার কথা, তারা কিন্তু নিজেদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষ মনে করে আত্মপ্রসাদলাভ করে। তা করুন। কিন্তু সত্য এই, যথার্থ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যিনি, তিনি যদি দেখেন তাঁর ভুল হয়েছে, সে ভুল তিনি স্বীকার করেন এবং নিজেকে শুধরে নেন; কারণ তাঁর লক্ষ্য সত্যকে ধরে থাকা, নিজের মতকে যো সো করে আঁকড়ে থাকা নয়। এই পার্থক্যটি আমাদের পরিষ্কার করে বুঝতে হবে।

এবার *রাজসিক ধৃতি*-র কথা বলা হচ্ছে।

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন ।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

—'যে ধৃতি দ্বারা আসক্তিবশত ফলের আকাঙ্ক্ষা করে [মানুষ] ধর্ম, কাম ও অর্থ গ্রহণ করে, হে পার্থ, সেই ধৃতি *রাজসিক।*'

রাজসিক ধৃতি-র বৈশিষ্ট্যগুলি কী? বলা হয়েছে, *যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তে অর্জুন,* 'হে অর্জুন, যে ইচ্ছা *ধর্ম, অর্থ* এবং *কাম'* অর্থাৎ নৈতিক কর্ম, বিত্ত অর্জন এবং ইন্দ্রিয় সুখ 'চরিতার্থ করার কাজে লিপ্ত'; কিন্তু কেন? *প্রসঙ্গেন,* 'আসক্তির মাধ্যমে' এবং *ফলাকাঙ্ক্ষী,* 'ফল কামনা করে'। অর্থাৎ, মন কর্মের ফলের দিকে এই ভেবে ধেয়ে যায় 'আমাকে এই কর্মের ফলটি লাভ করতেই হবে'; এমন হওয়ার কারণ আসক্তি। এমন মানুষ কাজ করেন, নীতিবান, আবার সুখ বা তৃপ্তিও খোঁজেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তিনি *ফলাকাঙ্ক্ষী,* নিজের জন্য অনুকূল ফলটি লাভ করতে উদ্গ্রীব। *রাজসিক ধৃতি* এই ধরনের।

বেশিরভাগ মানুষেরই এই জাতীয় ইচ্ছা বা *ধৃতি* থাকে। আর সেটা যে খুব একটা খারাপ, তাও নয়, কারণ *ধর্ম*-এর একটু ছোঁয়া তাতে আছে। তার ফলে সামগ্রিক ভাবে সমাজের কথাটাও আমাদের মাথায় থাকে। আত্মস্বার্থের কথা বলতে গিয়ে আমি প্রায়শ বলি যে, বেশির ভাগ মানুষই নিজের স্বার্থ আগলাতে চায়। সেটা হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের কল্যাণের সাথে সাথে *অন্যের কল্যাণের* চিন্তা করে স্বার্থবোধটিকে কি একটু মার্জিত বা পরিশীলিত করা যায় না? আপনি নিজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি চান—সেটা দোষের নয়, কারণ আপনি তো সর্বত্যাগী তপস্বী নন। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যের কথাও একটু ভাবুন। আজকের ভাষায় এটিই নাগরিকের লক্ষণ। আমি ভারতের নাগরিক। তাই আমি শুধু *নিজের* সুখ ও কল্যাণ কামনা করি না; আমি চাই আমার দেশের সব মানুষই সুখী হোক। একেই আলোকিত আত্মস্বার্থ বলে। ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক চিন্তায় সর্বপ্রথম এই ভাবনাটির উন্মেষ হয়। ভাবনাটি এককথায় অপূর্ব। স্বার্থবোধের মধ্যে যদি বিচার ও প্রজ্ঞার স্পর্শ না থাকে, তাহলে তা নগ্ন আত্মসর্বস্বতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সর্বদা সতর্ক থাকুন যাতে আপনার স্বার্থবোধ আপনাকে স্বার্থপর না করে তোলে। যাঁরা আলোকিত আত্মস্বার্থের পথে চলতে চান তাঁদের বিশেষ করে সতর্ক থাকতে হবে যাতে নিজের স্বার্থরক্ষা

করতে গিয়ে বিচারশক্তির নির্মল আলোটি নিভে না যায়। সে আলো হারিয়ে গেলে যা বাকি থাকবে তা হলো নির্ভেজাল ব্যক্তিস্বার্থ। একশো বছর আগে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী ডিসরেলী (Disraeli) বা অন্য কেউ বলেছিলেন যে, ব্রিটেনের যেমন চিরস্থায়ী মিত্র বলে কেউ নেই, তেমনি আবার চিরস্থায়ী শত্রু বলেও কেউ নেই; একমাত্র চিরস্থায়ী হলো ব্রিটেনের স্বার্থ। সব দেশই তাই করে। এর মধ্যে কোন লুকোচুরি নেই। একে রাজনৈতিক নৈতিকতা বলে। ব্যক্তিজীবনে কিন্তু এই নৈতিকতা আরো সুদূরপ্রসারী। কিছু নীতি মেনে চললেও রাষ্ট্রের নৈতিক আদর্শ কখনও খুব উচ্চাঙ্গের হতে পারে না। আপনার এবং আমার নীতিবোধ কিন্তু রাজনৈতিক অনুশাসনের অনেক ঊর্ধ্বে যেতে পারে এবং যায়ও। তাই *রাজসিক ধৃতি* ভাল হলেও সেই *ধৃতিকে সাত্ত্বিক* স্তরে টেনে তোলার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। আমাদের এটি বোঝা দরকার যে *রাজসিক ধৃতি* ভাল হলেও এমন কিছু আছে যা তার চেয়েও ভাল। মানুষের মনে সতত এই প্রশ্ন ওঠা উচিত—'এর চাইতে উৎকৃষ্ট কিছু আছে কি? যদি থাকে, সেটা কী?' রাজসিক স্তরে মানুষের প্রতি তাই গীতার আহ্বান—'নিজেকে ছাড়িয়ে যাও'। 'এখন আমি এই স্তরে আছি ঠিক কথা, কিন্তু আমি এই স্তর অতিক্রম করে আরো এক ধাপ উঠব, তারপর আরো এক ধাপ'—এই ধরনের সঙ্কল্প চাই। এবারের পরীক্ষায় আপনি সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছেন; বেশ তো, পরের পরীক্ষায় যাতে ফার্স্ট ক্লাস পান, সেই চেষ্টা করুন। তাই তো মানুষ করে। কখনও বলবেন না, 'আমি খারাপ করেছি।' বেদান্ত বলে, খারাপ থেকে ভাল নয়—ভাল থেকে আরো ভাল, আরো ভাল; যতক্ষণ না শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পার, এইভাবে এগিয়ে চল। তাই ক্রমোন্নতি বা excellence হলো সঠিক শব্দ। প্রতিটি শিশুকে বলতে হবে, 'তুমি তোমার বর্তমান যোগ্যতাকে ছাড়িয়ে যাও। তুমি ভাল ফল করেছ; কিন্তু আরো ভাল করতে পারো।'

প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী, 'আসক্তির কারণে ফলকামী'; অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে, 'আমি চাই কর্মের ফলটি আমার কাছে আসুক।' *ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী*, 'হে অর্জুন, সেই ধরনের ইচ্ছা হলো *রাজসিক।*' আপনি নিজের ভিতরটা তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনার ইচ্ছা *রাজসিক* বা *সাত্ত্বিক।* তারপর নিজের শক্তি অনুসারে তাকে ওপরে টেনে তুলুন। এ কথার অর্থ এই নয় যে প্রতিদিনই আপনি উচ্চতম স্তরে ওঠার জন্য ধস্তাধস্তি করবেন। না, তা নয়। শুধু এই সত্যটি জেনে রাখুন যে আপনি এখন যে অবস্থায় আছেন, তার চেয়েও উন্নত

অবস্থা আছে; এবং সেই অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য একটু একটু সংগ্রাম করতে থাকুন।

এরপর আসছে *তামসিক* ইচ্ছার কথা, যা ভাল তো নয়ই, উল্টে অতি নিম্নস্তরের। প্রকৃত মানুষের পক্ষে এই ধরনের ইচ্ছা অশোভন। শ্রীকৃষ্ণ এই হীন ইচ্ছাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন ঃ

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥

—'হে অর্জুন, যে [ধৃতি] দ্বারা নির্বোধ ব্যক্তি নিদ্রা, ভয়, শোক, অবসাদ এবং আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করে না, সেই *ধৃতি তামসিক*।'

তামসিক ধৃতি কীরকম? বলা হচ্ছে, *যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদম্ এব চ। যয়া,* 'যার দ্বারা', কোন ব্যক্তি মনের এই অবস্থাগুলিকে পরিত্যাগ করে না। অবস্থাগুলি কী কী? *স্বপ্নং,* 'ঘুম'; *ভয়ং,* 'ভয়'; *শোকং,* 'দুঃখ'; *বিষাদং,* 'বিষাদ' বা বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, অবসাদ ইত্যাদি এবং *মদম্,* 'বিষয়মদমত্ততা'। এগুলি মনের স্বাভাবিক অবস্থার লক্ষণ নয়। এই হীন অবস্থার ইচ্ছাকে *তামসিক* বলা হয়েছে। কাদের এই ধরনের ইচ্ছা হয়? যারা *দুর্মেধা,* বা দুর্মতিগ্রস্ত ব্যক্তি, তাদের। *সুমেধা* মানে 'আলোকিত মনের মানুষ'। *দুর্মেধা* তার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ 'নিকৃষ্ট' মনের মানুষ। *ন বিমুঞ্চতি,* তারা এইসব দুর্গুণ 'পরিত্যাগ করে না'; মরণকামড়ে সেগুলিকে আঁকড়ে থাকে। ফলে তাদের কোন উন্নতি হয় না। এ অতি হীন অবস্থা। মানুষ জন্ম পেয়ে কেন পশুর স্তরে পড়ে থাকবেন? পশুদের প্রকৃতি নিয়ে পশুরা বাঁচুক, কিন্তু *আমি* কেন তাদের মতো হব? যারা *তামসিক* প্রকৃতির, তাদের মনে এ প্রশ্ন জাগে না। তাদেরও ইচ্ছা আছে; কিন্তু সে ইচ্ছা দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। তারা ঐটিই চায়। এই ধরনের ইচ্ছাকে *তামসিক* আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তামসিক গুণ থেকেই যতরকম ভয়ের জন্ম। সত্ত্বগুণে ভয়ডর থাকে না। তাই নির্ভীকতারূপ গুণটিকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে।

পৃথিবীতে যত ধর্ম ও যতরকমের দর্শন আছে, তাদের মধ্যে একমাত্র বেদান্তেই ভয়ের কোন স্থান নেই। কারণ ভয় একটা মস্ত দোষ। দোষ বলেই ভয়ের নিন্দা করা হয়েছে। গীতার মতে (১৬/১), সর্বপ্রথম যে গুণটি আমাদের অর্জন করতে হবে, তা হলো *অভয়ং* বা ভয়হীনতা। *অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ।* ঈশ্বর

উপলব্ধি করলে আমাদের কী হয়? তার উত্তরে *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্* বলছেন— আমরা নির্ভীক হই। ভক্তিতেও তাই হয়। *ভাগবতে* বলা হয়েছে, *গচ্ছতাং অকুতোভয়ম্,* অর্থাৎ 'আমরা সেই অবস্থালাভ করি যেখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে "ভয় কোথায়? কোথায় ভয়?" আমাদের দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এই যে *অকুতো ভয়ম্*-এর কথা বলা হয়েছে, এর কী গভীর তাৎপর্য!

ইতর জীবজন্তুর মতো আমাদেরও ভয় আছে। জীবজন্তুরা খুব ভয় পায়। গাছে একটা পাখি বসে আছে। আপনি যদি তার খুব কাছে যান, দেখবেন সে ভয় পেয়েছে। সে ভাববে আপনি তার ক্ষতি করতে চান। অমনি সে উড়ে যাবে। মানুষেরও এই ভয় আছে। বাড়ি থেকে বেরোলেই ভয়। তারপর আছে নানাধরনের সামাজিক অপরাধ। সমাজে যদি অপরাধীদের দৌরাত্ম্য থাকে, তবে নাগরিকদের ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। আমেরিকার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। ওখানকার এক শহরে একজনের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। তাঁকে একটা ছোট খবর দেবার ছিল। কিন্তু ওদেশে কারো বাড়ি গেলেই যে গৃহকর্তা বা কর্ত্রী হুট করে দরজা খুলে আপনাকে স্বাগত জানাবেন, তা নয়। ওরা দরজাই খুলবেন না, কারণ ভয় আছে, যদি কিছু ঘটে যায়! তাই তাঁরা দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করলেন। অন্য সময় হয়তো তাও করবেন না— দরজায় বসানো কাঁচের ঘুলঘুলি দিয়ে প্রথমে দেখে নেবেন যে-মানুষটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি ভাল কি মন্দ। তারপর যদি তাঁরা বোঝেন যে, না—লোকটিকে তো ভালই মনে হচ্ছে, তখনও দরজাটি তাঁরা পুরোপুরি খুলবেন না। ওঁদের এত ভয়! এই আতঙ্কের কারণ ওঁরা এমন এক অনিশ্চিত সমাজে বাস করেন যেখানে অপরাধ আর অপরাধীদের ছড়াছড়ি। কখন যে কি ঘটবে তা কেউ জানে না! *তামসিক* মানুষের সংখ্যা সমাজে বৃদ্ধি পেলে এই দুর্দশাই হয়। সর্বদাই ভয়, ভয়, আর ভয় যেন আমাদের গ্রাস করে থাকে। কিন্তু তবুও বলব, এই ভয় কোন গুণ নয়। এই ভয় জয় করে আমাদের অভী হতে হবে। অন্যদের বিশ্বাস করুন। ভয়ে কম্পমান হয়ে আমরা কেন বাঁচব? ব্যক্তির ও সমষ্টির চিন্তায় এই ধরনের নির্ভীকতা আসা চাই। যে সমাজে মানুষের মধ্যে এই ভাবটি প্রবল, সেটিই উন্নত সমাজ। গুচ্ছের টাকা থাকলেই কোন সমাজকে উন্নত বলা যায় না; যদি সেই সমাজে মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা থাকে, তবেই সেই সমাজ ঠিক ঠিক উন্নত। সেখানে সকলের নিঃশঙ্কতা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। এই কষ্টিপাথরেই কোন সমাজের প্রগতির গুণগতমানটি আপনি নিরূপণ করতে পারবেন। সেই বিচারে আমাদের বর্তমান ভারতীয় সমাজকে

আগের মতো অত উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না। এখন সর্বত্র আতঙ্কের মেঘ, যা আগে ছিল না। আতঙ্ক কি একরকম? সব রকমের আতঙ্কে ভারতের আকাশ ছেয়ে রয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায় সুস্থ সমাজ, ভয়মুক্ত সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এখনও আমাদের বহুদূর যেতে হবে। মহাভারতে (১২/৬৮/৩২ঃ ভাণ্ডারকার সংস্করণ) আছে ঃ

স্ত্রিয়শ্চ আপুরুষা মার্গং সর্বালঙ্কার ভূষিতাঃ।
নির্ভয়া প্রতিপদ্যন্তে যদা রক্ষতি ভূমিপঃ ॥

—যার অর্থ হলো, 'রাষ্ট্র সুশাসিত হলে পুরুষের তত্ত্বাবধান ছাড়াই সালংকারা যুবতীও নির্ভয়ে যেকোন পথে চলাফেরা করতে পারে।' তাহলেই ভেবে দেখুন, এমন আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে হলে আমাদের এখনও কতটা পথ যেতে হবে! কারণ শুধু মহিলারাই নন, এখন পুরুষরাও সন্ত্রস্ত। যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁরাও ভীত। এখন সমাজের যা চেহারা তাতে মনে হয় তাকে ভয়-ভূতে পেয়েছে। এরকম হওয়ার কারণ, গীতার ভাষায়, *তমোগুণ* এখন *রজোগুণ*-কে নিয়ন্ত্রণ করছে।

এবার তিন গুণের দৃষ্টিকোণ থেকে সুখের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হবে। সুখও তিনরকমের—সত্ত্বপ্রধান সুখ, রজোপ্রধান সুখ এবং তমোপ্রধান সুখ।

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

—'হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এখন আমার কাছে ত্রিবিধ সুখ [সম্পর্কে] শোন, যে-সুখ অভ্যাসবশত মানুষ উপভোগ করতে শেখে এবং যার দ্বারা দুঃখের অবসান ঘটে।'

অর্জুন, আমার কাছ থেকে শোন। অর্জুন কী শুনবেন? *সুখং*, 'সুখ' সম্পর্কে, যে সুখ *ত্রিবিধং*, 'তিন প্রকার'। *অভ্যাসাৎ রমতে যত্র*, 'অভ্যাসবশত যে সুখ আপনাকে প্রভূত আনন্দ দেয়'। একথার তাৎপর্য এই যে, যখনই আপনি কোন সুখ পেয়ে থাকেন, তার পিছনে থাকে আপনার অভ্যাস। ফলে স্বভাবতই আপনি অত্যন্ত প্রীত হন। এবং *দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি*, 'সব দুঃখের অবসানও লাভ করেন'। সব দুঃখের আত্যন্তিক অবসান হলে যে সুখ লাভ করা যায়, সেই সুখই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু সেই পরম সুখ লাভ করার আগে আমাদের সুখের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এখন প্রথমে *সাত্ত্বিক* সুখের কথা বলা হচ্ছে; পরে *রাজসিক* এবং *তামসিক* সুখের প্রসঙ্গ করা হবে।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্ ।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ।। ৩৭।।

—'যা শুরুতে বিষের মতো কিন্তু শেষে অমৃততুল্য, বলা হয় সেই সুখ সাত্ত্বিক, যা আত্মার প্রশান্তি ও বুদ্ধি থেকে জাত।'

এই শ্লোকে আমরা *সাত্ত্বিক* সুখের একটি চমৎকার বর্ণনা পাচ্ছি। এই সুখ কীরকম? বলা হচ্ছে, সেটিই *সাত্ত্বিক সুখ* যা শুরুতে দুঃখ দেয়, কিন্তু অন্তে প্রভূত আনন্দ দেয় এবং সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটায়। *অগ্রে বিষম্,* 'প্রথমে বিষের মতো'; *পরিণামে অমৃত উপমম্,* 'শেষে যেন অমৃত'; সেই সুখ *সাত্ত্বিক।* বিনা সংগ্রামে এই সুখ কেউ পায় না। সুতরাং প্রথমটায় একটু সংগ্রাম, একটু প্রচেষ্টার ঝক্কি সামলাতেই হয়। এই সময়টাই একটু কষ্টের। সমস্যা হচ্ছে আমরা কোনরকম দুঃখকষ্ট না সয়েই একেবারে সরাসরি সুখের চাঁদ হাতে পেতে চাই, যা সম্ভব নয়। একটু সংগ্রাম করতেই হবে। *আত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্,* সেই সুখের 'জন্ম *বুদ্ধি* থেকে, যা প্রসন্ন এবং শান্ত।' সাত্ত্বিক স্তরে উঠলে মানুষের জীবনে এই সুখের অনুভূতি হয়। *প্রসাদ* মানে 'প্রসন্নতা' বা নির্মলতা। জল ঘোলা হলে আমরা তাতে একটু নির্মলি ফেলে দিই; আর অমনি জল ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে যায়। মনও সেইরকম স্বচ্ছ হতে পারে। মন স্বচ্ছ হলে আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিশক্তিও স্বচ্ছ হয়। এই চিন্তা ও দৃষ্টির স্বচ্ছতা সাত্ত্বিক সুখ থেকে আসে। আমাদের দেশে কথায় বলে—বড়দের কথা প্রথমটায় শুনতে তেতো, কিন্তু পরে মিষ্টি লাগে। তাই সাধনের প্রথম অপ্রীতিকর কষ্টকর পর্যায়টি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে যেতে হবে। তাহলে আমরা পরবর্তী সুখকর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারব। কিন্তু আমাদের ধৈর্যের অভাব। আমরা এই মুহূর্তেই সুখ চাই। তাই সুখের চেয়ে দুর্ভোগই আমাদের কপালে বেশি করে জোটে।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

—'বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থেকে যে সুখ প্রথমে অমৃত [এবং] শেষে বিষের মতো [মনে হয়], সেই সুখ *রাজসিক* বলে কথিত।'

এই শ্লোকে *রাজসিক* সুখের স্বরূপ বর্ণনা করা হচ্ছে। এই সুখ আসে, *বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ,* 'ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থেকে'। *অগ্রে অমৃত উপমম্,* এই সুখ 'প্রথমে মধুর'। তাই সহজেই এই সুখের প্রতি

আমরা আসক্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু *পরিণামে বিষম্ ইব,* 'পরিণামে বিষতুল্য'; *তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্,* 'সেই সুখকে *রাজসিক* সুখ বলা হয়।'। প্রথমটায় ভাল মনে হলেও পরে খারাপ—এই হলো রাজসিক সুখ। শিশু খেলনা নিয়ে খেলতেই ভালবাসে। ঐ খেলাই তার কাছে আনন্দদায়ক ও সুখকর মনে হয়। কিন্তু স্কুলে যেতে তার গায়ে জ্বর আসে, পড়াশুনায় তার ঘোর অরুচি। এর পরিণাম কী হয়? সে বয়সে বাড়লেও সমাজের গণ্যমান্য একজন হয়ে উঠতে পারে না। যেহেতু সে কোন যোগ্যতা অর্জন করেনি, সেইহেতু সমাজের কাছে তার কোন মূল্যই নেই। তাই আপনি যদি সমাজের এবং নিজের কল্যাণ চান, তাহলে একটু চেষ্টাচরিত্রের দরকার আছে। তাই প্রথমটায় একটু উদ্যমী হন না কেন, সংগ্রামের কষ্ট মাথা পেতে নিন না কেন। কষ্ট না করে তো জ্ঞানলাভ করা যায় না। জিজ্ঞাসা না থাকলে তো আর আপনি বিজ্ঞানী হতে পারবেন না। তাই বলা হয়—সত্যের অনুসন্ধান হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রাণ। জানার কোন ইচ্ছা নেই, অথচ মুখে বলছি আমি বিজ্ঞান চাই, বিজ্ঞান ভালবাসি—তা হয় না। ওরকম হলে বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু টুকরোটাকরা তথ্য হয়তো আপনি পেতে পারেন অথবা কোন যন্ত্রপাতি আপনার হাতে আসতে পারে, কিন্তু তাতে তো বিজ্ঞানী হওয়া যায় না। আমি যদি হাতে একটা ট্রানজিস্টর ঝুলিয়ে বলি—'এই তো আমি বিজ্ঞানকে সঙ্গে রেখেছি'—তাহলে কী হবে? হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই বলতে পারেন যে রেডিও বিজ্ঞানেরই দান। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ঐ ধরনের বিজ্ঞান আপনি হাটবাজার থেকে কিনে সঙ্গে রাখতে পারেন, কিন্তু তাতে তো আর আপনার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটল না, আপনার চিন্তাভাবনাগুলি তো বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠল না। একটা ষাঁড়ের শিঙে রেডিও ঝুলিয়ে দিলে যেমন দেখাবে, আপনার অবস্থাও তদ্রূপ হবে।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা সম্পর্কে ভারতবর্ষের যে চিন্তা তার কোন তুলনা হয় না। শিক্ষাকে আমরা *তপস্* বা তপস্যা বলি। *বিদ্যা* যেহেতু তপস্যা, সেইহেতু তার জন্য আপনাকে সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু আজকাল তপস্যায় কারো আগ্রহ নেই। তাই শিক্ষার সর্বোত্তম সংজ্ঞা হাতের কাছে থাকলে কি হবে, আমরা তা মেনে চলি না। আপনারা এমন সহজ শিক্ষা চান যার মধ্যে কোন কষ্টের ব্যাপার থাকবে না। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কিন্তু আজও জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষ মেহনৎ করে। সেদিক থেকে আমরা অনেক পিছনে পড়ে আছি। ওসব দেশে ছাত্রছাত্রীরা লাইব্রেরিতে গিয়ে মূল গ্রন্থগুলি পড়ে কোন্‌টা কি তা জানার চেষ্টা করে। এখানে, ভারতবর্ষে কিন্তু অনেকেই ঐ কষ্ট স্বীকার

করতে চান না। প্রকৃত জ্ঞানলাভের স্পৃহাই নেই। কেবল যে কোন উপায়ে পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেই হলো! কিন্তু *ওটি* শিক্ষাই নয়। কেন? তার কারণ, ওটি সহজ সুখের পথ, তা থেকে প্রকৃত কোন জ্ঞানলাভ আপনি করতে পারেন না। আপনি অপরিণতই থেকে যান। না আসবে আপনার স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি, না আসবে স্পষ্টভাবে নিজেকে ব্যক্ত করার ক্ষমতা! যিনি জ্ঞানী তিনি দু-এক কথার মধ্য দিয়েই গভীর সব ভাব প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ একশো পাতা লিখলেও, তার সবটুকুই ধোঁয়াটে ও অসংলগ্ন হবে। তাই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত সুখলাভের জন্য মানুষের জীবনে সংগ্রাম অপরিহার্য।

তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে *রাজসিক সুখ* প্রথমে অমৃততুল্য লাগলেও পরিণামে বিষ। *সাত্ত্বিক সুখ* এর ঠিক বিপরীত—তা প্রথমে বিষ, শেষে অমৃত। তাহলে *তামসিক* সুখ কীরকম? বলা হয়েছে ঃ

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

—'যে সুখ প্রথমে ও পরিণামে আত্মাকে মোহগ্রস্ত করে [এবং যে মোহ] নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা থেকে উদ্ভূত, তা তামসিক বলে কথিত।'

তামসিক সুখ *অগ্রে* অর্থাৎ 'শুরুতে' এবং *অনুবন্ধে চ,* 'শেষেও' একেবারেই তুচ্ছ; তা মানুষকে *মোহনম্ আত্মনঃ,* 'মোহগ্রস্ত' হওয়ার দিকে *ঠেলে* দেয়, মানুষের হৃদয়কে অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবৃত করে। এই মোহ আসে কোথা থেকে? *নিদ্রা আলস্য প্রমাদোত্থং,* 'এর জন্ম *নিদ্রা* বা ঘুম, *আলস্য* বা আলসেমি এবং *প্রমাদ* বা অসাবধানতা থেকে'। এসব থেকে *তামসিক* সুখের উৎপত্তি। *তৎ তামসম্ উদাহৃতম্,* 'সেই সুখ *তামসিক* বলে কথিত' হয়ে থাকে। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, আপনার নিজের ভিতরেই হোক বা আপনার চারপাশেই হোক, সুখ এই তিনরকমের হতে পারে এবং লক্ষ্য করলে এদের কোন না কোন একটির নিশান বা ধ্বজা আপনার ভিতরে বা বাইরে পত পত করে উড়ছে দেখতে পারেন। এই জানাটাও ভাল, কারণ তা আপনাকে আরো ভাল কোন কিছুর দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এবং একমাত্র এইভাবেই উন্নতি এবং ক্রমঃবিকাশ সম্ভব। এক জায়গায় পড়ে থাকা কারোরই উচিত নয়। এখন আপনি যে অবস্থায় আছেন, তার চেয়েও উচ্চ অবস্থা আছে। এই যে ক্রমশ

উচ্চতর স্তরে ওঠার অভীপ্সা, এটি মানুষের অতি অবশ্যই থাকা উচিত। তাই যজুর্বেদ একটি কথাই বলেছেন—চরৈবেতি, চরৈবেতি—'এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও'। এক জায়গায় থেমে থেকো না। বেদান্তের এটিই একমাত্র সাবধান বাণী। *উত্তিষ্ঠত জাগ্রত*, 'ওঠো, জাগো'। শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলায় বলেছেন, 'এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও'। হিন্দীতে বলে *আগে বাঢ়ো*। কথা একই—একটি স্তরে চিরদিনের জন্য পড়ে থেকো না।

আমরা যে *বানপ্রস্থ* জীবনের কথা বলে থাকি, তার তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হলো 'এগিয়ে চল। এগিয়ে চল।' বানপ্রস্থীদের মনের কথা যেন এই ঃ আমরা এতকাল অর্থ উপার্জনের চেষ্টায়, নামযশলাভের চেষ্টায়, সংসার জীবনে সুখভোগের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম। সেগুলো সব ঠিকই ছিল। কিন্তু এ সীমিত সুখ নিয়ে আর কতকাল কাটাব? মন, এখন এসবে ক্ষান্তি দাও! এটি ঠিক ভাব, কারণ সত্যিই এসবের চাইতেও গভীরতর আনন্দ, মহত্তর জীবন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সুইস মনস্তত্ত্ববিদ কার্ল যুং তাঁর *'মডার্ন ম্যান ইন সার্চ অফ এ সোল'*- নামক গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করেছেন। বাস্তবিক, আমরা কি সারা জীবন টাকা রোজগার আর ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করেই কাটিয়ে দেব? একটা সময় অবশ্যই আসা চাই যখন আমরা বলতে পারব—না, আর না, যথেষ্ট হয়েছে! এখন আমি অন্তর্জীবনের বিকাশ চাই, যা আমি মামুলী জীবনধারণের নেশায় এতকাল অবহেলা করে এসেছি। বাকি সেই কাজটি এখন আমি করব। জাগতিক প্রাপ্তিকে যুং 'সাফল্য' বলে চিহ্নিত করেছেন; কিন্তু অন্তর্জীবনের বিকাশ বা উত্তরণকে বলেছেন 'সংস্কৃতি'। খাঁটি কথা। কারণ প্রকৃত সংস্কৃতি ভিতরকার ব্যাপার। আপনার কতগুলো ডিগ্রী আছে, তা হলো আপনার সাফল্যের অভিজ্ঞান; আপনি কত টাকা দান করেছেন, কতগুলো খেতাব পেয়েছেন—এ সবই আপনার জাগতিক সফলতার পরিচায়ক। এসব খুবই অভিপ্রেত, সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব নিয়ে বেশিদিন কাটাবেন না। এরপর যুং একটি সুন্দর কথা বলেছেন। বলেছেন—সাফল্যটাফল্য যা কিছু তা জীবনের মধ্যাহ্নের পক্ষেই মানানসই। জীবনকে তিনি দুভাগে ভাগ করেছেন—মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ন। জীবনের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত আপনি সফলতার পিছনে ছুটতে পারেন—শিক্ষা, চাকরি, অর্থ উপার্জন, সন্তান পালন, নামযশ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, এসব চাইতে পারেন। এগুলি সাফল্য। কিন্তু এরপর যখন আপনার জীবনে অপরাহ্ন আসবে, তখন আর ওগুলির পিছনে ছুটবেন না! যুং তারপর সকলকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন ঃ যাঁরা মধ্যাহ্ন জীবনের দর্শন বা ধারা জীবনের

অপরাহ্নেও অনুসরণ করবেন, এই ভুলের মাশুল তাঁদের কড়ায়গণ্ডায় মেটাতে হবে। সেই মাশুলটি কী? 'রুদ্ধ মানব-বিকাশ', অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাবে; যে মহৎ বিকাশের সম্ভাবনা ছিল, তা আর বাস্তবায়িত হতে পারবে না। এ যেন ঠিক ভারতীয় দার্শনিকদের ভাষা! কোন সফলতাকেই ছোট করা হচ্ছে না। শুধু বলা হচ্ছে—এসবের পাট যত তাড়াতাড়ি পার চুকিয়ে ফেলে এগিয়ে যাও; একই জায়গায় ঘুরপাক খেয়ো না। জীবনের কোন পর্বকেই নিন্দা করা হচ্ছে না। আমাদের বয়স বাড়লে কি আমরা শৈশবকে হীনদৃষ্টিতে দেখি? তা তো দেখি না। সেটাও সুন্দর ছিল। কিন্তু এখন পরিণত বয়সেও যদি শিশু থেকে যাই, তাহলে সেটা ঠিক নয়। জীবনের পরবর্তী ধাপে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। 'চরৈবেতি'-র যে নির্দেশ শাস্ত্র দিয়েছে, তার তাৎপর্য এইটিই। এগিয়ে যাওয়ার এই আহ্বানে যদি আমরা সাড়া না দিই পথের ধুলায় আমরা নিক্ষিপ্ত হব; জীবনপ্রবাহ কিন্তু অব্যাহত থাকবে, আমাদের ছাড়াই সে আপন ছন্দে বয়ে চলবে। তখন আমরা হতাশায় ভুগব। আজ 'হতাশা' শব্দটি আধুনিক জীবন ও সাহিত্যে বারবার ঘুরে ফিরে আসছে। কিন্তু এত হতাশা কেন? তার কারণ, যে-পথে চলা অনেক আগেই শেষ করার কথা ছিল, সে পথে এখনও আমরা ঘুরে মরছি। আগে যা করেছি, তা করেছি; কিন্তু আরো কিছু তো করার আছে। কিন্তু এই কর্তব্য ভুলে আমরা উন্নততর কর্মের অযোগ্য হয়ে পড়েছি। ঢেউ যেমন অবাঞ্ছিত বস্তু সৈকতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজে সমুদ্রে মিশে যায়, তেমনি জীবনপ্রবাহও আমাদের বালুকাবেলায় ফেলে দিয়ে আপনগতিতে এগিয়ে চলে। এই হলো গতিহীন মানুষের দুর্গতি! হতাশা তখনই আসে যখন আমাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়, যখন জীবন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। জীবন তো আর বদ্ধ জলা নয়, সে একটি প্রবাহ; তাই তার চলা কখনও থামে না। নদীর মতো সমুদ্রের দিকে সে ধেয়ে যাবেই। আর গতিহীন মানুষ সেই জীবন-নদীর এক পাশে আবদ্ধ জলার মতো অনাদরে পড়ে থাকে। ইন্দ্রিয়ের স্তরে আবদ্ধ থাকার নামই *সংসার*। তাই বলা হয়—*সংসারী* হোয়ো না। এর মানে এই নয় যে আমাদের বাড়িঘর থাকবে না; স্বামী, স্ত্রী বা সন্তান থাকবে না। না, তা নয়। এ সবই আমাদের থাকতে পারে; শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা যেন শুধু এতেই আবদ্ধ না হয়ে পড়ি। 'এর পর কী' এর পর কী আছে?' এই প্রশ্নের সদুত্তর আমাদেরই খুঁজে পেতে হবে। শঙ্করাচার্যের ভাষায়—*ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।*

এই পঙ্‌ক্তিটি শঙ্করাচার্যের একটি বিখ্যাত স্তোত্রে আছে। কী গভীর আবেদন,

কী গভীর আকুতি তাঁর ভাষার! আমাদের প্রচুর অর্থ থাকুক, তাতে দোষ নেই; কিন্তু আমাদের মন যদি সুস্থ হয়, তাতে এ প্রশ্ন ওঠা চাই-ই চাই ঃ *ততঃ কিম্ ততঃ কিম্? ততঃ কিম্?* এরপর কী, এরপর কী? এরপর কী? আমরা যদি মনের কণ্ঠরোধ করি, তাহলে মন এ প্রশ্ন কোনদিনই করবে না। সুস্থ মনেই এ প্রশ্ন উঠবে। ছেলেবেলায় শিশু খেলনা নিয়ে খেলছে। হঠাৎ তার মন বলে উঠল ঃ *ততঃ কিম্?* এরপর কী? তারপর যখন সে একটু বড় হলো, তার মাকে সে বলল, 'মা, আমার একটা বই চাই', 'আমি স্কুলে যেতে চাই' ইত্যাদি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে নিজেকে বিকশিত করার বা নিজেকে উচ্চস্তরে টেনে তোলার প্রথম পদক্ষেপটি সে নিয়েছে। যদি শিশুর এই ক্রমোন্নতি রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, সে একটি জড়বুদ্ধি, অপরিণত ও ক্যাবলাকান্তে পরিণত হবে। কোন শিশুই তা হতে চায় না। বেদান্ত তাই সকলকে মানুষের সম্মান দেয়, যে মানুষ উৎকর্ষের সন্ধানে নিরত, যে মানুষ ক্রমোন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উত্তরোত্তর অসামান্য হয়ে উঠতে চায়। মানুষের বিবর্তনের এই তো অর্থ, এই তো তার পদ্ধতি। এদিক থেকে দেখলে গুণভিত্তিক সুখের এই বর্ণনা নিশ্চল ভোগবাদী সভ্যতার আবর্তে নিক্ষিপ্ত বর্তমান ভারতীয় সমাজের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। তীব্র ভোগলিপ্সা আজ দেশের মানুষকে পেয়ে বসেছে এবং টেলিভিসন সেই মানসিকতার আগুনে দিনরাত ধুনো ছড়িয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলি অনেকদিন আগেই এই উন্মত্ত ভোগপ্রবাহের মধ্য দিয়ে গেছে, এখন আমরাও যাচ্ছি। এ তরঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু সঠিক জীবনদর্শনের দ্বারা আমরা আমাদের সুরক্ষিত করতে পারি। 'এগিয়ে চল, এগিয়ে চল', হলো সেই জীবনদর্শন যাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। আগ্রাসী পণ্যবাদী প্রবণতাকে প্রতিহত করতে হলে যুবসম্প্রদায়কে তেজের সঙ্গে বলতে হবে—'চাই না, চাই না; এসব আমার দরকার নেই। এগুলি আমার জীবনে অপরিহার্য নয়।' একথা বলতে পারা সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ। কোন পিতা তাঁর শিশুকে উৎসাহ দেবার জন্য সাময়িকভাবে তার খেলার সঙ্গী হতে পারেন; কিন্তু তার চাইতেও মূল্যবান কাজ তাঁর আছে। এই ভাবেই ভোগ্যপণ্যবাদী সভ্যতার প্রতিবন্ধকতাগুলি আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি। প্রতিবন্ধকতাগুলির কাছে নীরব আত্মসমর্পণ নয়, তাদের অতিক্রম করে পরিপূর্ণতালাভের জন্য অগ্রগতির উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উত্তরণই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পরবর্তী শ্লোকে সাধারণ একটি সত্য ঘোষিত হয়েছে। কী সেই সত্য?

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

—'পৃথিবীতে বা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন প্রাণী নেই যা এই প্রকৃতিজাত তিনটি গুণ থেকে মুক্ত।'

ত্রিলোকে এমন কেউ নেই বা এমন কিছু নেই যাকে তিনটি গুণ স্পর্শ করেনি অথবা যা তিনগুণের দ্বারা প্রভাবিত নয়। এখানে *সত্ত্বং* শব্দের অর্থ 'প্রাণী'। *ন তৎ অস্তি সত্ত্বং,* 'এমন প্রাণী নেই'; *পৃথিব্যাং,* 'পৃথিবীতে'; অথবা *দিবি দেবেষু বা পুনঃ,* 'বা স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে'; *এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভির্গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ,* যা 'প্রকৃতিজাত তিনটি গুণ থেকে মুক্ত অথবা গুণহীন'। ত্রিগুণাত্মিকা আদি প্রকৃতির এইটিই প্রকাশ। যা কিছু প্রকাশিত বা ব্যক্ত, তা এই তিনগুণের অধীন। তিন গুণের পারে গেলে আপনি আপনার আত্মস্বরূপে পৌঁছে গেলেন।

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা ও নভোবস্তুবিদ্যায় (astrophysics) এক অনন্য অবস্থার কথা স্বীকৃত হয়েছে। সেই অবস্থাটিকে তাঁরা বলছেন 'state of singularity' বা একত্বের অবস্থা। আজকের জগতে বহুত্ব রয়েছে। কিন্তু এক সময় তা ছিল না—যা ছিল তা একত্ব। সেই অখণ্ড 'এক' থেকেই 'বহু' এসেছে। একত্বের সেই অবস্থায় গুণক্রিয়ার কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু জগৎ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে যেই গুণের প্রকাশ হতে শুরু করল, অমনি তিনটি গুণের কাজও আরম্ভ হয়ে গেল। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, সবকিছুই তিনগুণের অধীন। সৃষ্টির আগে যাবতীয় শক্তি একীভূত অবস্থায় ছিল। তারপর একসময় সেই অখণ্ড শক্তিভাণ্ডারে একটু মৃদু আলোড়ন সৃষ্টি হলে তার থেকেই বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। সেই প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে এখনও চলেছে। পদার্থবিদ্যার এক অসাধারণ গ্রন্থে মহাবিস্ফোরণ বা Big Bang তত্ত্ব নিয়ে চমৎকার আলোচনা আছে। বিস্ফোরণের ঠিক পরমুহূর্তের প্রথম অংশে কি ঘটেছিল, তার দ্বিতীয় অংশে কি ঘটেছিল, এসব খুঁটিনাটি বর্ণনা ঐ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। এখন চারপাশে যেসব জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, তখন সেসব কিছুই ছিল না। এমনকি অণু, পরমাণুও না। ছিল কেবল বিশুদ্ধ শক্তি। তারপর ধীরে ধীরে শুরু হলো সেই শক্তির বিভাজন। তাপমাত্রা তত্ত্বে এবং শক্তি মিশ্রণ তত্ত্বে (principle of entropy and energy diffusion) এ সবের বিস্তারিত আলোচনা আছে। এই মিশ্রিত, পরিব্যাপ্ত শক্তি একদিন আবার তার আগের বিশুদ্ধ অবস্থায় ফিরে যাবে। এই সত্যকেই বেদান্ত *সঙ্কোচ* ও *বিকাশ* বলেছে।

সঙ্কোচ হলো সংকুচিত অবস্থা, আর *বিকাশ* হলো প্রসারিত অবস্থা। আদিতে এই মহাবিশ্ব সংকুচিত অবস্থায়, অর্থাৎ একীভূত অবস্থায় ছিল। তারপর এক সময় *বিকাশ* বা বিস্তার হলো মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এবং সেই বিস্তার আজও অব্যাহত আছে। এই হলো মহাবিশ্বের বিবর্তিত হওয়ার ইতিহাস। তারপর একদিন আবার রথের চাকা উল্টোদিকে ঘুরবে, অর্থাৎ involution শুরু হবে। 'ইনভল্যুশন' হলো সংকোচন, যখন বহুত্ব আবার একত্বে ফিরে যাবে। আগের একটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এই একই কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যা কিছু *ব্যক্ত* তা *অব্যক্ত* থেকে এসেছে এবং অব্যক্তেই আবার ফিরে যাবে। এই আসা যাওয়া বারবার ঘটে থাকে। এটিই গীতার শিক্ষা। এখন দেখতে পাব শ্রীকৃষ্ণ অন্য কয়েকটি বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, দেখাবেন কিভাবে মানুষের অধ্যাত্মজীবন উচ্চ থেকে অতি উচ্চস্তরে স্ফুটিত হয়। সর্বোপরি গীতারূপ মহাসংগীতের অন্তিম সুর, অর্থাৎ ঈশ্বরের পাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগতি বা চরম আত্মনিবেদনের সুরটি ধ্বনিত হবে আর কয়েকটি শ্লোক পরে। সেই সুর আমাদের শেষবারের মতো স্মরণ করিয়ে দেবে যে, এই বিশ্ব তাঁর কাছ থেকেই এসেছে, আমরা সকলে তাঁরই মধ্যে বেঁচে আছি, আবার তাঁর কাছেই ফিরে যাব। আমরা এই পরম সত্যটি জানি না। কিন্তু যখন জানব, তখন আমরা গদগদস্বরে বলে উঠব, 'হে প্রভু, ''আমি'' নই, ''আমি'' নই, ''তুমি'' '। বলব—'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, প্রভু'। এটিকে গীতার *চরম শ্লোক* বলা হয়, কারণ এখানেই গীতার বাণী তার চরম পরিণতিলাভ করেছে। গীতার প্রথম দিকের কয়েকটি অধ্যায় শুরু হয়েছিল আত্মপ্রচেষ্টার উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে। তারপর বেশ কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে চলেছে মানব-বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ। সমাপ্তি সংগীতটির উপজীব্য হবে 'কিছুই আমার নয়; সবই তুমি, সবই তোমার।'

বর্তমান শ্লোকটির আলোচনায় আবার ফিরে আসা যাক। এখানে এই যে এত *গুণ* সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে, তার মূল উদ্দেশ্যটি কী? উদ্দেশ্য আমাদের এই কথা বলা যে, আমরা যদি বুদ্ধিমানের মতো জীবনযাপন করি তাহলে এই তিনটি গুণকে আমরা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি। সর্বদা যে আমাদের *গুণ*-এর দাসত্ব করতে হবে, তা নয়। গুণের জালে আমরা বাঁধা পড়ি, তা ঠিক; কিন্তু ঐ জাল কেটে আমরা বেরোতেও পারি। যেমন ধরুন, আমি যদি টের পাই যে, আমার মনের ধরনধারণ *তামসিক*, নিজের সম্পর্কে এই জ্ঞান অবশ্যই আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে *রাজসিক*-এ রূপান্তরিত করতে সাহায্য

করবে। ঠিক সেইভাবে, আমি যদি বুঝি আমার দৃষ্টিভঙ্গিটি *রাজসিক*, তাহলে আমি চেষ্টা করতে পারি তাকে *সাত্ত্বিক* স্তরে টেনে তোলার। এক *গুণ* থেকে আর এক গুণে নিজেকে টেনে তোলার ক্ষমতা আমাদের নিজেদের ভিতরেই আছে, কারণ স্বরূপত আমরা আত্মা, যা তিনগুণের ঊর্ধ্বে। সমস্যা হচ্ছে, এখন আমরা এই সত্যটি জানি না। তাই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি *গুণ* ও তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের চরিত্র গঠনের সহায়ক।

হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতির কথাই ধরুন। এগুলির উদ্ভব রজোগুণ ও তমোগুণের মিশ্রণ থেকে। সমাজে এখন এসবের ছড়াছড়ি। কিন্তু নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, *আমি* কেন আর পাঁচজনের মতো হব? কেন *আমি* হিংসা, দ্বেষকে মনের মধ্যে পোষণ করব? কেন *আমি* তাদের শিকার হব? আমি তো সমাজকে একটুখানি হলেও পাল্টাতে পারি। কীভাবে? নিজের মধ্যে পরিবর্তন এনে। কী সুন্দর ভাব, দেখুন! কে আমাকে বদলে দেবে? আমি নিজেই নিজেকে বদলাব। সত্যি কথা। প্রকৃতি আমার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে না। পৃথিবী অথবা স্বর্গ, কোন কিছু আমাদের পরিবর্তিত করতে পারে না। কিন্তু আমরা আমাদের রূপান্তর ঘটাতে পারি। এই জ্ঞান সম্বল করে আসুন, আমরা নিজেদের পরিবর্তন ঘটাই। আমরা সঙ্কীর্ণ, *তামসিক*, বিরক্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অশান্তির দূত হয়ে অবশ্যই বাঁচতে পারি; সে স্বাধীনতা আমাদের আছে। অনেকেই তো সেইভাবে বাঁচে। কিন্তু এই প্রশ্ন মনে জাগা চাই—'অন্যে বাঁচে বাঁচুক, আমি ঐভাবে কেন বাঁচতে যাব?' তবেই আপনার মধ্যে পরিবর্তন আসবে। বহু দুষ্টপ্রকৃতির মানুষকে সত্যিকারের ভাল মানুষ হয়ে উঠতে দেখা যায়। এটি হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন উদ্যম ও বিবেক। ঐদুটি জিনিস থাকলে, মানুষের মধ্যে যে তিনটি গুণ সক্রিয়, ধীরে ধীরে তার অনুপাতের হেরফের ঘটে যায়। হয়তো *তমোগুণ* একটু থাকবে; *রজোগুণ*—তাও একটু থাকবে। কিন্তু যেই একটু *সত্ত্বগুণের* ছোঁয়া লাগল, অমনি সব বদলে গেল। পারিবারিক জীবনেই দেখুন, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি *রজো* ও *তমোগুণের* প্রাবল্য থাকে তাহলে সংসারে শান্তি ও বোঝাপড়ার ভরাডুবি। কিন্তু দুজনের মধ্যে যেই একটু *সত্ত্বগুণ*-এর উদয় হলো, অমনি শান্তি ফিরে এল। কি পরিবারে, কি সমাজে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সর্বত্রই *সত্ত্বগুণ* হলো সোনার জীয়নকাঠি। কিন্তু আমরা এই সত্য ভুলে গিয়ে ঝগড়া ও লড়াই-এ মেতে যাই; এমন বিদ্রুপ করে মানুষকে কথা দিয়ে আঘাত করি যে, তার ভিতর জঘন্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এইভাবেই আমরা চতুর্দিকে অশান্তি ও দুঃখ ছড়াই এবং নিজেরাও দুঃখ ও অশান্তিতে

জ্বলতে থাকি। তারপর গত্যন্তর না দেখে একদিন রোগ নিরাময়ের জন্য কোন জাদুকরের কাছে ছুটি; আশা—তিনি অলৌকিক উপায়ে, ম্যাজিক দেখিয়ে আমাদের অশান্তি দূর করে দেবেন। কিন্তু প্রশ্ন, জাদুকরের কাছে ছুটতে হবে কেন? ম্যাজিক তো আমরা নিজেরাই নিজেদের দেখাতে পারি। জাদুদণ্ড তো আমাদের হাতেই আছে। কী সেই জাদুদণ্ড? জাদুদণ্ড আর কিছুই নয়—আমাদের ভিতর যে তিনটি গুণ বর্তমান, তাদের আনুপাতিক পরিবর্তন। এটি তো আমরা অবশ্যই ঘটাতে পারি। আগে না হয় এই সত্যটা জানতাম না, কিন্তু এখন তো জানলাম। বেদান্ত তাই বলে যে, কৌশল জানা থাকলে মানুষ নিজেই নিজের প্রভু হতে পারে।

আগে আমরা 'ইচ্ছা' নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি এবং দেখেছি যে ইচ্ছাকে শুদ্ধ করা যায়, সমাজমুখী করা যায়। যে মুহূর্তে আমার মনে এই শুভচিন্তার উদয় হয়—'কী করে আমি আমার ইচ্ছা দিয়ে অন্যকে সুখী করব?' সেই মুহূর্তেই আমার ইচ্ছা রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এখন আমার ইচ্ছাশক্তিকে কেবল নিজের সুখের উদ্দেশ্যেই আমি কাজে লাগাই। আমার আশা—সকলেই *আমার সুখের* জন্য খিদমদ্গিরি করবে। সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন অন্যান্য গ্রহগুলো ঘুরপাক খায়, আমি চাই 'সকলেই সেইরকম আমাকে কেন্দ্র করে, আমাকে সুখী করার জন্য, আমার চারপাশে ঘুরপাক খাবে।' কিন্তু না, অন্যদের কথাটাও ভাবতে হবে। তা যেদিন ভাবব, সেদিন আমাদের মনে সত্ত্বগুণের ছোঁয়া লাগবে। এই কারণেই সেবার এত মহিমা। সেবা করলে মানসিক শক্তি মার্জিত হয়, শুদ্ধ হয়, সমাজমুখী হয়। তাকেই আমরা চরিত্র বলি। চরিত্রবান মানুষ চতুর্দিকে শান্তি, সুখ আর কল্যাণের নির্মল সৌরভ ছড়িয়ে দেন। এইরকম চরিত্রবান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সকলের মধ্যেই আছে। এমনকি যিনি নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে আজ সকলের কাছে পরিচিত, তিনিও নিজের চেষ্টায় এইরকম উন্নত চরিত্রের মানুষ হয়ে উঠতে পারেন। অন্যরা তাঁকে কিছু সৎপরামর্শ এবং প্রেরণা দিতে পারেন, কিন্তু নিজেকে মার্জিত করে তোলার কাজটা নিজেকেই করতে হবে। তাই একথা ভাবা ঠিক নয় যে, আমার আর কোন আশা নেই, অথবা ও উচ্ছন্নে গেছে, ওর আর কিছু হবে না। একটা কথা মনে রাখবেন, আপনি যদি ভাবেন আপনার আর কোন আশা নেই, তাহলে সত্যিই আপনার আর কোন আশা নেই। কিন্তু তা না ভেবে, আপনি যদি উল্টোটা ভাবেন, তাহলে বিলক্ষণ আপনার আশা আছে; আপনি অবশ্যই আপনার বর্তমান দুর্গতি কাটিয়ে উঠবেন। আমরা যেন নিজেদের শ্রদ্ধা করতে শিখি, নিজেদের ওপর বিশ্বাস

যেন কখনও না হারাই। 'আমি পারি, আমি পারব'—এই হলো *শ্রদ্ধা* বা *আত্মশ্রদ্ধা*। এই শ্রদ্ধা থাকলে কোন পরিস্থিতিই আপনাকে দমাতে পারবে না, কারণ আপনি জানেন এই প্রতিকূল পরিস্থিতিও আপনি একদিন অবশ্যই কাটিয়ে উঠবেন। বেদান্তের এক মস্ত অবদান হলো, বেদান্ত আমাদের স্বাবলম্বী হতে শেখায়, সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে বলে। ফলে আমরা আমাদের নিচে নামাতেও পারি, আবার মন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে উচ্চ অবস্থায় টেনে তুলতেও পারি। এই যে মন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানোর কথা বলা হলো তার মানে আর কিছুই নয়, শুধু আমাদের ভিতরে *সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,* এই যে তিনটি শক্তি সক্রিয় তাদের অনুপাতের তারতম্য ঘটানো।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'ত্যাগ ও সেবা—এই দুটিই ভারতবর্ষের আদর্শ।' এই দুটি যে ভারতের সুমহান আদর্শ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যদি আমাদের দেশ আবার এই সনাতন আদর্শকে আঁকড়ে ধরে তাহলে সব সমস্যাই মিটে যাবে। কাঁচা 'আমি'টিকে ত্যাগ করে সেখানে চারপাশের মানুষের জায়গা করে দিতে হবে। শুধু 'আমি' 'আমি' করলেই চলবে না, 'তুমি', 'তুমি'-ও বলতে হবে। অন্যকে আমার জীবন থেকে মুছে দিলে হবে না। 'আমি'-কে একটু কমিয়ে 'তুমি'-কে স্থান দিতে হবে। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ আমি যদি 'আপনাকে' স্থান দিতে চাই, তাহলে আমার জন্য রাখা জায়গার পরিমাণ একটু কমাতে হবে বৈকি। অতএব, আমরা যখন আমাদের জীবনে অন্যকে স্থান দিই, তখন অজ্ঞাতসারে সেটা ত্যাগের অভ্যাসই হয়ে যায়। তখন সেবার ভাব আনার জন্য আর অন্য কোন কসরত করতে হয় না; সেবা তখন স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, অন্যের কথা ভাবা, অন্যের কল্যাণচিন্তা করা কতখানি প্রয়োজন। তা না করলে মানুষের প্রগতি বা বিকাশ সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃতি হবে *রাক্ষসের* মতো—আমরা অন্যদের সুখশান্তি নষ্ট করব এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও ধ্বংস করব। সে বড় করুণ পরিণতি! তা হওয়া উচিত নয়। তাই আমাদের সকলের সামনে এই দুটি রাস্তা খোলা আছে—হয় নিজেকে উন্নত কর, বিকশিত কর; না হয় নিজেকে ধ্বংস কর। আমরা অবশ্যই কল্যাণের পথটিকে বেছে নেব এবং তার জন্য প্রয়োজন নিজের ভিতরকার শক্তিগুলিকে অনুসন্ধানের দ্বারা মার্জিত ও সূক্ষ্ম করে তোলা। এই হলো ধর্ম বা শিক্ষার সার কথা। নিম্নগামী মনটিকে ঊর্ধ্বগামী করা—এছাড়া আর ধর্ম কী? শিক্ষা কী? আমাদের নিম্নতর প্রকৃতি বা জৈবিক প্রকৃতি এত শক্তিশালী যে, তা অবিরত মনকে নিচের দিকে টানে এবং মনও

নেমে যায়। এখন, যেহেতু আমরা আত্মবিকাশের গঠনমূলক পথটিকে বেছে নিয়েছি, সেইহেতু সদ্‌ভাবনার শক্তি আমাদের মনটিকে ধীরে ধীরে উপরে টেনে তুলবে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, *উদ্ধরেদ্‌ আত্মনা আত্মানম্‌* অর্থাৎ 'বিবেকযুক্ত মনের সাহায্যে নিজেই নিজেকে টেনে তোল।' কী চমৎকার কথা! শিশুদের এই শিক্ষা দিয়ে আমরা বলতে পারি, 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, একবার তুলে ধরতেও পারি; কিন্তু চিরকাল কাঁধে করে বইতে পারব না। তোমাকে নিজের শক্তিতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।' নিজেকে নিজে টেনে তোলার এই শিক্ষা শিশুদের দিতে হবে। তাহলে তাদের দায়িত্ববোধ আসবে। এই কথাটি বোঝাবার জন্যই এতক্ষণ গীতা *প্রকৃতির* তিনগুণের কথা বলে যাচ্ছেন, যে গুণগুলি আপনার, আমার, এককথায় সবকিছুর মধ্যেই বিদ্যমান। জড় প্রকৃতিতেও এই গুণগুলি আছে, কিন্তু সেই প্রকৃতি তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যা আমরা পারি। মানুষের সেই সামর্থ্য, সেই স্বাধীনতা আছে। পশুপক্ষী এবং গাছপালার সে ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে, আমাদের মধ্যে বিদ্যমান এই তিনটি গুণের আনুপাতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে, আমাদের ভিতরকার শক্তিগুলিকে মার্জিত করে তুলতে পারি। এই সরল সহজ শিক্ষা সকলেই মেনে চলতে পারেন। এ শিক্ষা সকলের জন্য। এর মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির ব্যাপার নেই। আমরা রাশিয়ায় থাকি, আমেরিকায় থাকি, ভারতবর্ষে থাকি বা আফ্রিকাতেই থাকি, এ শিক্ষা অনুসরণ করায় কোন বাধা নেই। যেখানেই থাকি, মানুষ হিসাবে শক্তিগুলি আমাদের সকলের ভিতরেই আছে এবং সে শক্তিসমূহকে আমাদেরই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদকে কি প্রযুক্তির মাধ্যমে সংশোধন করে অর্থনৈতিক দিক থেকে আমরা জীবনের মান উন্নত করি না? চরিত্রের ক্ষেত্রেও সেই এক কথা। আমাদের মধ্যে সুপ্ত সম্পদ আছে, শক্তি আছে; তাকে আমরা বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সংস্কৃত করে অনিন্দ্য চরিত্র গড়ে তুলতে পারি। তিনগুণের যে আলোচনা, তার চরম সিদ্ধান্ত এইটিই। বস্তুতপক্ষে এ আলোচনা শুরু হয়েছিল ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। তারপর বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তারিত এই সমীক্ষার সিদ্ধান্ত হলো অষ্টাদশ অধ্যায়ের এই চল্লিশ সংখ্যক শ্লোকে।

এবার আমরা কয়েকটি সুন্দর অথচ গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ও অধ্যাত্মভাবনার মধ্যে প্রবেশ করব। প্রথম যে ঘোষণাটির সম্মুখীন হব আমরা তা এই ঃ আমরা যে যে-পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যেই থাকি না কেন, সেখান থেকেই অধ্যাত্মজীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করা সম্ভব। তার জন্য পরিবেশ বদলাবার

দরকার নেই। দরকার নেই এই জন্য যে, যেকোন স্থান থেকেই চরম সত্য উপলব্ধি করা যায়। পরিবেশ বদলালেই যে সত্য আমাদের কাছে আরো স্পষ্টভাবে ধরা দেবে, তা নয়। তাই, যে পরিবেশে আমরা পড়েছি, তাকে যদি মেনে নিই তাহলে ক্ষুব্ধ হওয়ার পরিবর্তে মন-মেজাজ শান্ত হবে এবং সেখান থেকেই চেষ্টা চালিয়ে আমরা সিদ্ধিলাভ করতে পারি। এই অতি গভীর ও কার্যকর শিক্ষাটি এবার আমাদের দেওয়া হবে; যদিও তা দেওয়া হবে এমন ভাষায় যা কারো কারো মনঃপূত না হতেও পারে। কিন্তু যখন আমরা বিচার করে দেখব, তখন বুঝতে পারব সে শিক্ষার মধ্যে জটিলতা কিছুই নেই। তা যেমন সরল তেমনি সঙ্গত।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

—'হে শত্রুতাপন [অর্জুন], ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের এবং শূদ্রদেরও, কর্তব্যকর্মগুলি তাদের স্বভাবজাত গুণ অনুসারে বিভক্ত হয়েছে।'

প্রত্যেক সমাজেই দেখা যায় মানুষ 'তার মনের প্রকৃতি অনুযায়ী' নানা পেশায় নিযুক্ত আছে, *স্বভাব প্রভবৈঃ গুণৈঃ*। গুণগুলি কোথা থেকে আসছে? *স্বভাব* থেকে। *স্বভাব* মানে 'আমাদের নিজস্ব প্রকৃতি'। আমাদের সবার মধ্যেই মানসিক শক্তির একটি ভাণ্ডার আছে যা আমাদের বিশেষ বিশেষ কর্মে এবং বিশেষ ধরনের জীবনযাপনে প্রবৃত্ত করে। মনের সেই প্রবণতাকেই আমরা মেনে চলি, এটাই আমাদের রীতি। যে কাজ আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করে, যে কাজ আমাদের মনের মতো, সে কাজই আমরা করে থাকি এবং সেটাই করা উচিত, কারণ সেটা স্বাভাবিক।

এই রুচিবৈচিত্র্যের ভাবটি প্রকাশ করার জন্যই আমরা *ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য* এবং *শূদ্র* ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করি। ভারতবর্ষে এই সব শব্দগুলি কানে গেলেই জাতিভেদ প্রথার কথা মনে ওঠে, যদিও জাতিবৈষম্যের সঙ্গে শব্দগুলির মূলত কোন যোগ নেই। বস্তুত, অতীতে জাতিপ্রথা একটি ভাবকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। সেই ভাবটি এই ঃ প্রত্যেকটা মানুষ কাজের মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশ করে; তাই সেই কাজই সে বেছে নেয় যা তার পছন্দ। আমাকে যদি এমন কাজ দেওয়া হয় যে কাজের যোগ্য আমি নই, অথবা যে কাজ আমার অপছন্দ, তাহলে সেই কাজের মধ্য দিয়ে আমি আমার অনুভূতিগুলিকে প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশ করতে

পারব না। কিন্তু কাজটি যদি আমার মনোমতো হয়, যে কাজ আমি স্বচ্ছন্দে করতে পারি এমন কাজ হয়, তবে অবশ্যই আমার কাজের উৎকর্ষ অনেক বেশি হবে। তাই জাতিপ্রথার উষালগ্নে যে যার যোগ্যতা ও মনোবৃত্তি অনুযায়ী নিজের নিজের কাজ বেছে নিত, যাতে নিজেকে কাজের মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায়। মনোবৃত্তি অনুযায়ী কাজকেই তখন *ধর্ম* বলা হতো। একজনের *ধর্ম* তাই আরেকজনের ধর্ম থেকে আলাদা হতেই পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের মনীষীরা জীবিকাকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছিলেন। যারা শান্ত, নীরব, অন্তর্মুখ, সহানুভূতিশীল, জ্ঞানপিপাসু এবং আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন, তারা *ব্রাহ্মণ* পদবাচ্য। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় এ নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এরা এক ধরনের মানুষ। সব দেশেই এমন মানুষের দেখা মেলে। এরপর আসছে *ক্ষত্রিয়*। ক্ষত্রিয়রা সর্বদা উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে। তাদের মধ্যে বীরত্ব এবং অন্যান্যগুণ বর্তমান। তৃতীয় হলো *বৈশ্য,* যারা চাষবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে এবং সেই অর্থ নানারকম ভাল কাজে খরচ করে। চতুর্থ হলো *শূদ্র* বা শ্রমজীবী, যারা পরিশ্রম করতে ভালবাসে। তাদের শিক্ষাদীক্ষা খুব বেশি নেই, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধিও নেই, কিন্তু তারা কঠোর পরিশ্রম করতে পারে। প্রত্যেক সমাজেই এ ধরনের মানুষ থাকে।

এই চার শ্রেণির মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এমনকি প্রত্যেক পরিবারেও এক বা একাধিক শ্রেণির মানুষ দেখতে পাবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ যেখানে মানুষ তার প্রকৃতি অনুযায়ী কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। এদিক থেকে দেখলে, গত দুহাজার বছরে ভারতীয় সমাজ অনেকটাই নেমে গিয়েছিল। কারণ ঐ সময়ে জন্মসূত্রে কাজের ধরনধারণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো। বলে দেওয়া হতো—'এই কাজে তোমার অধিকার, অন্য কোন কাজ তুমি করতে পারবে না।' ঐ কাজের ভিত্তিতেই সমাজে তার স্থান হতো। কার কি কাজে ঝোঁক, কার কি দৃষ্টিভঙ্গি, ওসব কোন কিছুকেই আমল দেওয়া হতো না। জন্মের ভিত্তিতেই তখন সব কিছু নির্ধারিত হতো। এইভাবে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অসম্মান করে তার বিকশিত হওয়ার পথ আমরা রুদ্ধ করে দিয়েছিলাম। জন্মের ওপর *বর্ণকে* প্রতিষ্ঠিত করে আমরা *বর্ণের* অপব্যাখ্যা করেছিলাম। *বর্ণ* মানে কিন্তু জীবিকা; অন্তত প্রথমে তাই মনে করা হতো। জীবিকা বহু রকম, যেমন ছুতোরের কাজ, ব্যবসা ইত্যাদি ইত্যাদি। বাবা হয়তো ছুতোরের কাজ করেন। কিন্তু ছেলের ইচ্ছা ব্যবসা

করার। সে তাই করতো। তার এক ভাই হয়তো বলল সে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবে, সে তাই দিল। অন্য আর এক ভাই-এর সাধু হওয়ার ইচ্ছা, তাই হয়তো সে ঋষিকেশে চলে গেল। তখন সকলেই এরকম স্বাধীন ছিল। নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী জীবিকা নির্বাচন করতে পারত। প্রকৃতপক্ষে এইটিই ছিল *বর্ণ* শব্দের অর্থ। এ কথা পাশ্চাত্যের বহু চিন্তাবিদও স্বীকার করেছেন। যেদিন থেকে জন্মকেই জীবিকা ও জীবনের একমাত্র মানদণ্ড করা হলো, সেদিন থেকেই ভারতীয় সমাজের অধঃপতন শুরু হলো এবং কালে সেই অধোগতি মারাত্মক আকার ধারণ করে মানুষের উচ্চাশার নটেগাছটি সমূলে মুড়িয়ে দিয়েছিল। বর্তমান যুগে আমরা সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি। জন্মভিত্তিক জাতের বিচার ভবিষ্যতে আর থাকবে না। জাত নিয়ে উন্নাসিকতা প্রায় যেতেই বসেছে। কিন্তু জাতের ছুঁতমার্গ গেলেও *বর্ণ* তত্ত্বটি থেকেই যাবে, কারণ প্রত্যেক দেশের মানুষই তাঁদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জীবিকা নির্বাচন করবেন। সেটাই স্বাভাবিক। কোন বাড়িতে দেখা যাবে হয়তো একটি ছেলে বসে বসে দিনরাত ধ্যানই করে যাচ্ছে, নয়তো চিন্তামূলক বইপত্র পড়ছে। অর্থ উপার্জনে তার রুচি নেই। ব্যবসা তার ভাল লাগে না। এতো হামেশাই দেখা যায়। তার মাথার মধ্যে যতই আমরা অন্যভাব ঢোকানোর চেষ্টা করি না কেন, সেখানে ওসব কথা ঢুকবেই না। আবার আর একটি ছেলের হয়তো শৈশব থেকেই টাকাপয়সার দিকে ঝোঁক। দিন রাত সে টাকার স্বপ্ন দেখে। বড় হয়ে সে টাকাই রোজগার করবে। সেটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমি একটি ছেলেকে দেখেছি, যে তার মাকে নিয়মিত টাকা ধার দিয়ে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করেছিল। তার প্রকৃতিই ঐরকম। অন্য ছেলেদের হয়তো সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার ইচ্ছা। কেউ হয়তো বলবে—আমি বড় হয়ে পুলিশ হব। ঐটিই তার প্রকৃতি এবং ঐ কাজেই সে সাফল্যলাভ করবে। যে জীবিকায় আমার ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ ও প্রকাশ হবে সেটিই আমার কাছে বরণীয়। যে কাজে আমি সহজ হতে পারব না, যে কাজ আমার চরিত্র ও যোগ্যতার সঙ্গে খাপ খায় না, সে পেশা আমার জন্য নয়। কিন্তু সমাজ যদি উন্নত হয়, তবে ভুল জীবিকা বেছে নিলেও পরে তা পরিত্যাগ করে সঠিক জীবিকাটি গ্রহণ করা চলে। তবে পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তন—তা ঠিক নয়। নতুন জীবিকা আমি তখনই বেছে নিতে পারি যখন তা আমার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হবে। কিন্তু একবার ভেবেচিন্তে কোন জীবিকায় প্রবেশ করলে তাতেই আমাদের লেগে থাকা উচিত, সেই সুযোগের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করাই উচিত। সেই কাজের

মাধ্যমেই আমাদের মুক্তিলাভ করতে হবে। এই শ্লোকে এবং পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর এই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে ঐ কাজের মধ্য দিয়েই আমাদের ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটতে পারে, আমরা মহত্তম আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করতে পারি। আবার কোন্ কোন্ গুণ আমাদের কোন্ কোন্ জীবিকায় প্রবৃত্ত করে, সে আলোচনা পরের কয়েকটি শ্লোকে করা হয়েছে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

—'মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং আস্তিক্যবুদ্ধি—এগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম।'

এখানে ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্যগুলি বলা হচ্ছে। *শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ* । কোন্ কোন্ গুণের কথা বলা হলো? *শমঃ* অর্থাৎ 'মনের সংযম'; *দমঃ* বা 'বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি সংযম'। ইন্দ্রিয়গুলি এমন সুনিয়ন্ত্রিত যে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে পারে না। তার মানে ইন্দ্রিয়গুলি এই ব্যক্তির ওপর প্রভুত্ব করতে পারে না। এরপর *তপঃ* বা 'তপস্যা'-র কথা বলা হয়েছে। তারপর *শৌচম্*, অর্থাৎ দেহ ও মনের 'শুচিতা'। তারপর *ক্ষান্তিঃ* বা 'ক্ষমা'। কেউ তাঁর ক্ষতি করলেও তিনি কিছু মনে করেন না, তিনি লড়াই-এ নামেন না। এ এক অসামান্য গুণ যা কেবল পূর্ণ বিকশিত মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। কোন *ক্ষত্রিয়কে* যদি কেউ এসে আঘাত করে, সঙ্গে সঙ্গে সে তার জবাব দেবে; কিন্তু *ব্রাহ্মণের* প্রকৃতি তা নয়। ব্রাহ্মণের অসম্ভব সহ্যশক্তি। কত সুন্দর আর মহৎ এই সহ্যগুণ! ব্রাহ্মণরা এই মহৎ গুণের অধিকারী। আপনি যদি ব্রাহ্মণ হন তো অন্যরা আপনাকে কষ্ট দিলেও আপনি তাদের কষ্ট দিতে পারবেন না। এই গুণটি ব্রাহ্মণের বিশেষ লক্ষণ। আর একটি চমৎকার গুণ হলো *আর্জবম্* বা 'সরলতা'—মনে কোন কুটিলতা বা ঘোরপ্যাঁচ নেই। কুটিলতা কখন আসে? যখন ব্রাহ্মণের ঐ উচ্চভূমি থেকে আপনি অনেক নিচে নেমে এসে অর্থ এবং ক্ষমতার লোভে ছোটাছুটি করেন। তখন খুব চাতুর্যের প্রয়োজন। কিন্তু ব্রাহ্মণের কুটিল হওয়ার কোন দরকার নেই। *ঋজু* মানে 'সরল', তার ঠিক বিপরীত হলো *কুটিল* বা 'কপট'। যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁদের মন সাধারণত, একটু হলেও, কুটিল হয়ে থাকে।

তারপর, ব্রাহ্মণের অন্যান্য গুণের মধ্যে বলা হয়েছে *জ্ঞানং* বা জ্ঞান—অর্থাৎ সত্যকে জানার ইচ্ছা। এমন অনেক শিশু আছে, বেশিরভাগই তাই, যারা হাতে আম পেলেই তাতে কামড় দেবে। কিন্তু আর একটি শিশু আম পেলে হয়তো ভাবতে শুরু করবে—'এটা কী? খাওয়ার আগে আমি জানতে চাই এটা কী জাতের আম'। তাহলেই দেখুন, আগে জ্ঞান। তারপর *বিজ্ঞানম্*, অর্থাৎ 'সেই জ্ঞাত সত্যকে অনুভব করা' বা অভিজ্ঞতার মধ্যে আনা। *আস্তিক্যম্* কথাটির অর্থ, জীবনের যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য আছে সে সম্পর্কে অটল প্রত্যয়। এমন অনেকে আছেন যাঁরা জগৎ ও জীবনের কোন মানে খুঁজে পান না; তাঁরা শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়েন। কিন্তু *ব্রাহ্মণ* কখনও তা হন না, কারণ তিনি জানেন এই বিশ্বের ও মানবজীবনের পিছনে একটি মহৎ সত্য আছে এবং তিনি তাঁর সন্ধান করেন। *আস্তিক্যম্* হলো *অস্তি ইতি* মনোভাব, অর্থাৎ যে মনোভাব বলে দেয় যে এসবের পিছনে একটি সত্য 'আছে'। সে সত্যকে এখনও হয়তো তিনি দর্শন করেননি, কিন্তু সময় এলে অবশ্যই করবেন। এ যেন অনেকটা ছিপ নিয়ে পুকুরে মাছ ধরতে যাওয়ার মতো। মাছ ধরতে গেলে প্রথমত এই দৃঢ় বিশ্বাস চাই যে পুকুরে মাছ আছে। মাছ নেই জানলে কে আর পুকুরে মাছ ধরতে যাবে? আমরা যাব? যাব না। তাই মাছ ধরার ব্যাপারেও যেমন *আস্তিক্য* বুদ্ধি চাই, তেমনি জীবনের ক্ষেত্রেও এই বোধ থাকা চাই যে, জগতের পিছনে একটি সত্য আছে এবং সেই সত্যটি আমি জানতে চাই। আমি সেই সত্যকে এখন না জানলেও, সত্য আছেই। *আস্তিক্য* হলো এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। একে সংস্কৃতে *শ্রদ্ধা*-ও বলা হয়। শ্রদ্ধার অর্থ 'সামগ্রিক ইতিবাচক মনোভাব'। *কঠ উপনিষদ্*-এর ভাষ্যে শ্রদ্ধার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলেছেন, শ্রদ্ধা হলো *আস্তিক্য বুদ্ধি*—অর্থাৎ, 'মনটি ইতিবাচক সুরে বাঁধা'। অর্থাৎ শ্রদ্ধার অর্থ, 'নিজের ওপর বিশ্বাস এবং জগতের পিছনে যে একটি সারবস্তু আছে, তাতে বিশ্বাস'। এই বিশ্বাস মানবজীবনের এক অনন্যসাধারণ গুণ, যা থেকে আর পাঁচটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আপনি এসে যায়। 'সব কিছুই অর্থহীন'—এই মনোভাব নিয়ে যদি আমরা জীবন শুরু করি, তাহলে গোটা জীবনটাই অর্থহীন হয়ে যাবে। গীতায় আগের একটি অধ্যায়ে (৪/৩৯) সেইজন্য বলা হয়েছে *শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্*। আজ এই সত্যটি উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

তাহলে আমরা দেখলাম যে *ব্রাহ্মণ*-এর বিশেষ কয়েকটি গুণ থাকে। কী কী গুণ? মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযম, তপস্যা, পবিত্রতা, সহ্যশক্তি, সরলতা, জ্ঞান এবং

অধ্যাত্ম অনুভূতি। এই নির্দিষ্ট পথেই তাঁর আনাগোনা, তাঁর কর্মের গতি। এই পথেই তাঁর সিদ্ধি। তিনি যদি এসব ছেড়ে শুধু অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেন, তাহলে খুব একটা সফল হবেন না। এই ব্রাহ্মণ স্বভাবের মানুষ সব সমাজেই দেখা যায়। আমি গোটা পৃথিবী ঘুরেছি এবং এমন অনেক যুবক-যুবতী দেখেছি যারা এই ধরনের জীবনের জন্য উৎসুক। তাদের বলতে শুনেছি, 'আমি এই জীবনই চাই; এই জীবন আমার ধ্যানজ্ঞান।'

এরপর আসছে *ক্ষত্রিয়* প্রসঙ্গ। একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন। সেটি হচ্ছে গুণ। বাবা *ক্ষত্রিয়* হলেই ছেলে *ক্ষত্রিয়* হয় না। যদি ক্ষত্রিয়ের গুণাবলী ছেলের থাকে, তবেই সে *ক্ষত্রিয়* বলে গণ্য হবে। বিচার করে দেখুন—*ক্ষত্রিয়* রাজার সন্তানরা কজন ঠিক ঠিক *ক্ষত্রিয়?* গুণটাই আসল কথা, সে গুণ যে কোন পরিবারের ছেলেমেয়েরই থাকতে পারে। খুব গরিব, অনগ্রসর পরিবারে জন্মালেও কারো মধ্যে ক্ষত্রিয়ের গুণগুলি অবশ্যই থাকতে পারে। এই সহজ সত্যটিকে ভারতের মানুষ অবহেলা করেছে। আমরা চেয়েছি ক্ষত্রিয় পরিবারেই ক্ষত্রিয়রা জন্মাবে। আর সেই কারণে আমাদের মধ্যে বহু অপদার্থ, অযোগ্য ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব হয়েছিল। একজন শক্তিমান রাজার ছেলে হয়তো এক নম্বর বোকা। জন্মসূত্রে সে যেই রাজা হলো, অমনি রাজত্ব রসাতলে গেল। আমাদের ইতিহাসে তো এর ভূরিভূরি নজির আছে। তাই, ক্ষত্রিয়ের সন্তান হলেই যে কেউ ক্ষত্রিয় হবে এমন কোন কথা নেই; সে ক্ষত্রিয়ের অধম হতে পারে। তা হওয়া সম্ভব। তাই এমন কাউকে রাজা হিসাবে নির্বাচন করা উচিত যাঁর সে যোগ্যতা বা গুণগুলি আছে। পরবর্তী শ্লোকে সেই গুণগুলির সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, আমি মনে করি আজ ভারতবর্ষে বহু ক্ষত্রিয় প্রয়োজন—গীতায় যে রকম ক্ষত্রিয়ের কথা বলা হয়েছে, সেই ধরনের ক্ষত্রিয়। এখন ক্ষত্রিয়ের গুণগুলি কি, তা দেখা যাক।

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

—'শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, কর্মদক্ষতা এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করা, দানশীলতা ও শাসনক্ষমতা—এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম বা গুণ।'

শৌর্যং, 'সাহস'; *তেজো*, 'প্রচণ্ড শক্তি'। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের প্রচণ্ড সাহস এবং প্রাণশক্তি। *ধৃতিঃ*, 'প্রবল ইচ্ছাশক্তি'; *দাক্ষ্যং*, 'প্রচণ্ড কর্মকুশলতা'; *যুদ্ধে চ অপি*

অপলায়নম্, 'এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে না পালানো'। *ক্ষত্রিয়* শব্দের এই অর্থ— ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করতে ভয় পায় না। ইতিহাসে আমরা বহুবার পড়েছি—প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের বুকে ক্ষত চিহ্ন থাকবে। যে ক্ষত্রিয়ের পিঠে ক্ষতচিহ্ন থাকে, সে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নয়। কেন? তার কারণ, পালাতে গিয়েই সে আহত হয়েছিল। তাহলেই দেখুন, ঠিক ঠিক ক্ষত্রিয় হতে গেলে তার কতটা সাহস থাকতে হবে! সকলের কি অত সাহস থাকে? থাকে না। এমনকি সব ক্ষত্রিয় সন্তানেরও ঐ প্রচণ্ড সাহস থাকে না। মহাভারতে উত্তর কুমার-এর কথা আছে। তিনি ভয় পেয়ে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়েছিলেন। আমাদের দেশে রাজনীতি করেন বা বিভিন্ন জীবিকায় নিযুক্ত এমন বহু মানুষ আছেন যারা দায়িত্বপালনের অনুপযুক্ত। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে আজ এই ক্ষাত্র তেজের একান্ত প্রয়োজন। সমস্যা দেখলেই আমরা গা ঢাকা দিই; কিন্তু পালাব কেন? যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানো আর সমস্যা দেখলে পালানো—এ একই কথা। সমস্যাকে আমাদের শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। তবেই ক্ষত্রিয়ের মতো আচরণ করা হলো; নাহলে সমস্যা দেখলেই পলায়ন—এ কেমন কথা! তা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অশোভন।

তারপর, *দানম্* অর্থাৎ 'সর্বদা দেবার জন্য প্রস্তুত'। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করার জন্য ক্ষত্রিয়ের হাত সব সময় প্রসারিত। এটি ক্ষত্রিয়ের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। যদি তাঁর চারপাশের মানুষ কষ্টে পড়ে, তিনি এগিয়ে গিয়ে তাদের সাহায্য করেন। আর একটি গুণ হলো *ঈশ্বরভাবঃ,* অর্থাৎ 'নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা'; তিনি অনুভব করেন 'আমার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে; আমি সামান্য, দুর্বল মানুষ নই।' একজনের অনেক টাকা থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মন হয়তো খুব সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের সঙ্কীর্ণতা নেই, সে সর্বদা উদার ও মুক্ত হস্ত। যখন সে কাউকে কিছু দেয়, হৃদয় থেকেই দেয়। রাজস্থানে ভ্রমণের সময় স্বামী বিবেকানন্দ ক্ষত্রিয়ের এই ভাবটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। একটা সময় ছিল যখন আমাদের ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এই ভাবটি খুব দেখা যেত। *ক্ষত্র কর্ম স্বভাবজম্,* এগুলি 'ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম'।

আমি প্রাণ থেকে চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা ক্ষত্রিয়ের এই সব গুণ, অর্থাৎ শক্তি, সাহস, সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সামর্থ্য, এগুলি আয়ত্ত করে। সর্বদা অঘটনের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হওয়া—এ কোন কাজের কথা নয়। স্বামীজী ক্ষত্রিয়ের এই ভাবটিকে পুরুষকার বা পৌরুষ বলেছেন। পৌরুষ হলো শক্তি—এটা নারী

বা পুরুষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। নারী, পুরুষ সকলকেই শক্তিমান বা শক্তিমতী হতে হবে। দুর্বলতা কোন গুণ নয়। আমরা বহুদিন যাবৎ ভেবে এসেছি দুর্বলতা এবং ভয়—এ দুটি নারীর ভূষণ। কিন্তু একেবারেই ভুল কথা। নারীকে আমরা *অবলা*, অর্থাৎ 'দুর্বল' বলে এসেছি! এ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। এ ধরনের সমাজে মেয়েদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, দুর্বল হতে বলা হয়েছিল। তাই তারাও দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং নাম পেয়েছে *অবলা!* কিন্তু এ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত চিন্তা। কারণ সব সমাজেই হাজার হাজার শক্তিমতী, সাহসী মহিলার দেখা পাওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে এইরকম বীরাঙ্গনার অভ্যুদয় হবেই হবে। *সেদিন* তাঁদের *অবলা* দুর্নাম ঘুচবে। যেদিন আমাদের দেশের মানুষ উপনিষদের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে, সেদিন বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যেই ক্ষাত্র গুণের প্রকাশ ঘটবে, কারণ বেদান্তের মূল শিক্ষা হলো—প্রত্যেকের মধ্যেই দেবত্ব নিহিত আছে। আমাদের কাজ শুধু সেই ঘুমিয়ে থাকা দেবত্বকে জাগানো বা প্রকাশ করা। কিন্তু গত কয়েক শতাব্দী জন্মগত ও জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি করে আমরা দেশবাসীর সর্বনাশ করেছি, তাদের স্বাভাবিক বিকাশ অবরুদ্ধ করেছি। শতরকমের সামাজিক কুসংস্কারের নিষ্পেষণে কত সক্ষম মানুষকে আমরা দাবিয়ে রেখেছিলাম! আজ ধীরে ধীরে সেইসব বাধা অপসারিত হচ্ছে। হওয়াই উচিত। মানুষের ভিতরকার সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি পূর্ণভাবে বিকশিত হবে, এটাই তো কাম্য। কিন্তু কয়েক শতক আগে অবদমিত মানুষের উত্থান সম্ভব ছিল না। আমি ঝাড়ুদার হয়ে জন্মেছি, ঝাড়ু হাতে নিয়েই আমাকে মরতে হবে। আমার মধ্যে মহৎ কিছু হবার সম্ভাবনা থাকলেও সমাজ তা মেনে নিত না। সমাজ বলতো—'যেখানে আছ, সেখানেই থাক'। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে জোট বেঁধে আর সবাইকে দাবিয়ে রাখত। একথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন। আর ঐটিই হলো ভারতের পতনের কারণ। পুরোহিত সম্প্রদায়ের তখন এত দাপট যে রাজশক্তিও তাদের সুরে সুর মেলাতে বাধ্য হয়েছিল। এই হলো দু হাজার বছরের ভারতীয় ইতিহাস।

লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ করার এই সব অতীত ঘটনা থেকে বোঝা যায় এক শ্রেণির মানুষের মানসিকতা কী জঘন্য ছিল! এই মানসিকতা আমাদের সামাজিক ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। এদেশের দার্শনিক চিন্তা ও সংস্কৃতির ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল হলেও সামাজিক ইতিহাস নানান বিকৃতিতে পূর্ণ। সে যাই হোক, এখন আর অতীতের সমালোচনা করে লাভ নেই। এখন যেটি করণীয়, তা হলো অতীতের অর্থহীন বৈষম্যগুলি দূর করে

প্রত্যেকের স্বাভাবিক ও সুস্থ বিকাশকে সম্ভব করে তোলা। আজ সে কাজে আমরা হাত দিয়েছি। সৌভাগ্যের কথা, আধুনিক যুগে আমরা যেসব জাতীয় নেতাদের পেয়েছি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও এই। স্বামী বিবেকানন্দ তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকের বিকাশ চাই। তাই এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার কাজে সবাই আত্মনিয়োগ করুন। লক্ষ্য রাখতে হবে কেউ যেন বিশেষ সুযোগ সুবিধা দাবি না করেন। স্বামীজী বলেছেন, 'বিশেষ সুবিধার ব্যাধি যখনই মাথা চাড়া দেবে, সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় ডাঙ্গশ মারো'। ইংল্যান্ডে দেওয়া 'Vedanta and Privilege' ('বেদান্ত এ্যান্ড প্রিভিলেজ') নামক এক বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেন ঃ বিশেষ সুবিধা কেন? তোমার তো নিজের শক্তি-সামর্থ্য আছে। সেগুলোকে কাজে লাগাও, সেগুলো প্রকাশ কর। 'কখনও নিজের জন্য বিশেষ সুবিধা চেয়ো না।' এর জন্য দরকার নাগরিকসুলভ সচেতনতা। সচেতন থাকতে হবে যাতে নিজের জন্য সুবিধার আকাঙ্ক্ষা মনে না জাগে। আর যদি জাগেও, সঙ্গে সঙ্গে সেই বাসনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে হবে। আমরা এইরকম মানুষে পূর্ণ ভারতবর্ষকে দেখতে চাই। দুহাজার বছর ভারতবর্ষের এই রূপ আমরা দেখিনি। এখানেই ভারতীয় ইতিহাসের নবীন অধ্যায়ের গুরুত্ব। বাস্তবিক, এটি অতি গৌরবময় অধ্যায়। দর্শন ও অধ্যাত্ম-জীবনে আমাদের নূতন কিছু পাবার নেই—আমাদের সবকিছুই আছে। কিন্তু যে কাজটি বাকি, তা হলো সমাজ থেকে অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে দূর করে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা। এ কাজটি আমাদের সকলকে সচেতনভাবে এবং স্বেচ্ছায় করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে বিষয়টিকে সকলের গোচরে আনা। আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে কী ধরনের ভারতীয় নরনারী সৃষ্টি করতে চাই আমরা? আমরা চাই সেই ধরনের জাগ্রত জনমত এবং মানুষ যাঁরা চারটি বর্ণের উপযোগিতা উপলব্ধি করে প্রত্যেক শ্রেণির মানুষকে তাঁদের চারিত্রিক বিকাশে সাহায্য করবেন এবং যে সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সেই বিকাশের অন্তরায়, তা সমূলে উৎপাটিত করবেন। শ্লোকটি আপাতদৃষ্টিতে সরল হলেও, এর তাৎপর্যটি গভীর। কারণ *ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য* এবং *শূদ্র,* এই চারটি শব্দ শোনামাত্রই আমাদের মনে বর্তমান জাতিবৈষম্যের চিত্রটি ভেসে ওঠে। কিন্তু বর্ণবিভাগ ও জাতিবৈষম্য এক জিনিস নয়। তাই মন থেকে ঐ ভাবটি ঝেড়ে ফেলুন। শ্লোকে মানুষের পৃথক পৃথক চারটি বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার কথাই বলা হয়েছে। গুণগত প্রবণতার এই বৈচিত্র্য থাকুক, কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ সুযোগ সুবিধার উৎপাত যেন না থাকে। সেই

পক্ষপাত প্রবৃত্তির বিষটিকে দূর করে দিতে হবে। এই কাজটিই আধুনিক যুগে করা হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে আমাদের খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

বর্তমান শ্লোকে আমরা চারটি বর্ণের প্রথম দুটির, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আলোচনা করেছি। কিন্তু শুধু এই দু-ধরনের মানুষ দিয়ে তো আর সমাজ চলতে পারে না। যাঁরা কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত, তাঁদেরও চাই; যাঁরা সেই উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে দূর দূর স্থানে সকলের কাছে পৌঁছে দেন, তাদেরও চাই। শেষের কাজটিতে যারা নিযুক্ত তাদের *বৈশ্য* বলা হয়।

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

—'কৃষি, গোপালন এবং বাণিজ্য *বৈশ্যের* স্বাভাবিক কর্ম; এবং *শূদ্রেরও* সেবারূপ কর্ম স্বভাবজাত।'

চাষবাস, শিল্পোৎপাদন, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের মানসিকতা যাঁর, তিনিই *বৈশ্য*। ঐ জাতীয় কর্মের মধ্য দিয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। বৈশ্যের এই কর্মগুলি কী? *কৃষি* অর্থাৎ 'চাষবাস'; *গোরক্ষ্য*, অর্থাৎ 'গরুর লালনপালন'; *বাণিজ্যং* অর্থাৎ 'ব্যবসা' বা ভোগ্যপণ্যের লেনদেন। বস্তুতপক্ষে আধুনিক সভ্যতার হাতেখড়ি বৈশ্যদের কাছেই। ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে এর হোতা ছিল 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী'। ব্যবসাই তাদের লক্ষ্য ছিল এবং সেই সূত্রে তারা সারা বিশ্বে তাদের উদ্যোগকে প্রসারিত করেছিল। আজ দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেখবেন এই আন্তর্জাতিক বৈশ্য সম্প্রদায়ের কী জয়জয়কার! এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই আমাদের চলতে হবে, কারণ তা মানব-বিকাশ ও মানব কল্যাণের পক্ষে প্রয়োজন। অতএব, এটা স্পষ্ট যে সমাজে বৈশ্যদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

সবশেষে আসছে *শূদ্র*-দের কথা। *শূদ্র*, অর্থাৎ আজকের পরিভাষায় যাঁদের আমরা শ্রমজীবী বলে থাকি। বহুবিধ সামর্থ্য না থাকলেও এঁরা কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করতে পারেন। এঁদের মনোভাব হলো, 'অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান—সবকিছুই আমি শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে জোগাড় করব।' এই ধরনের মানুষ সর্বত্রই দেখা যায়, আমেরিকাতেও তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে আছেন। তাঁরা *পরিচর্যাত্মকং কর্ম*, অর্থাৎ 'পরিচর্যার কাজ' করেন। সেবা করেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো—

আমি আমার শ্রম ও সেবা দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমি তোমার দাস নই। আমি তোমার কাজ করব, কিন্তু তুমি আমার প্রাপ্য সম্মান দেবে। সুন্দর ভাব। আমি আমার শ্রম দেব; তার বিনিময়ে তুমি তোমার অর্থ দেবে। এইভাবেই আমি বাঁচব। কিন্তু পারস্পরিক এই লেনদেন হবে সম্মানের ভিত্তিতে। অতীতে ভারতীয় সমাজে *শূদ্র* শব্দটি নিন্দার্থেই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, কিন্তু ঐ শব্দের অনর্থক বিকৃত ব্যঞ্জনাটি এখন দূর করা দরকার এবং আমার বিশ্বাস, তা চলেও যাবে। বিদেশে শ্রমজীবী মানুষদের কতটা সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়, তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তাঁরাও *শূদ্র*। কিন্তু আমাদের দেশে যাঁরা *শূদ্র* বলে অভিহিত, তাঁদের মতো ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে তাঁরা থাকেন না; নিজেদের দীনহীন ভেবে কারো কাছেই মাথা নত করেন না তাঁরা। আমাদের দেশের শূদ্ররা আত্মবিশ্বাস হারিয়েছেন। ওরকম হলে চলবে না। এখনকার শূদ্র বা শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাসী হতে হবে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হতে হবে। তাঁরা বলবেন ঃ 'দেখুন, আমার প্রচুর শক্তি। আমি কাজ করতে পারি। আমার শক্তিকে দয়া করে কাজে লাগান। কারণ আমাকে সমাজের প্রয়োজন আছে।' এই ধরনের মনোভাবসম্পন্ন মানুষই নবযুগের *শূদ্র*।

ভারতে আজ এইরকম আত্মবিশ্বাসী শূদ্রের সংখ্যা বাড়ছে। ভবিষ্যতে আরো বাড়বে, কারণ শ্রম ছাড়া সমাজ অচল। তাই তাঁদের সংখ্যা বাড়ুক, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তাঁদের যেন আমরা হীন না ভাবি। আর কেনই বা ভাবব? সমাজে তাঁদেরও মর্যাদা আছে। ভবিষ্যতে দেখবেন, বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগগুলিতে তাঁরাই পরিচালকমণ্ডলীতে স্থান পাবেন। আধুনিক ভারতে এই পরিবর্তন আসছে এবং ভবিষ্যতে আরো আসবে। এই যে পরিবর্তন, তা ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফল। আগে এই ভাব ছিল না। পাশ্চাত্যের সঙ্গে মিলন না হলে, আজ আমরা যা ভাবছি, তা কখনও ভাবতেই পারতাম না। এর জন্য পাশ্চাত্যকে আমাদের ধন্যবাদ দিতেই হবে। তাঁরাই আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। তাই মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখুন, সম্পূর্ণভাবে দূর করে দিন তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব।

তাহলে আমরা দেখলাম যে *ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য* এবং *শূদ্র* এই চার প্রকৃতির মানুষ সব দেশেই আছে—রাশিয়া, আমেরিকা, চিন, ভারত, ইউরোপ—সর্বত্র। তফাৎ শুধু এই, আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যের দেশগুলি প্রতিটি মানুষ এবং প্রত্যেক জীবিকাকে সম্মান করতে শিখেছে। এর ফলে ঐসব দেশে গণতন্ত্র দৃঢ়মূল হতে

পেরেছে। ঐ গণতান্ত্রিক চেতনা অতি সম্প্রতি আমাদের মধ্যে এসেছে এবং তা আয়ত্ত করতে তুলনামূলকভাবে আমাদের অনেক বেশি সময় লেগেছে। আগে এ চেতনা আমাদের ছিল না। অথচ এই চেতনা ছাড়া মানুষের বিকাশ অসম্ভব। প্রত্যেকেরই তো একটা মর্যাদা আছে, আত্মসম্মান আছে, নিজস্ব গুণ আছে। তাকে স্বীকার করতেই হবে। আমরা কী কাজ করছি, সেটা বড় কথা নয়; বিচার্য আমরা কী ধরনের মানুষ। শুধু কর্ম কাউকে কৌলিন্য দিতে পারে না; তারও আগে তার একটা প্রাথমিক পরিচয় থাকে। তা হলো, সে মানুষ। অন্য সবকিছু আসে যায়, কিন্তু মানুষ হিসাবে তার যে পরিচিতি, সেটা অপরিবর্তনীয়। গণতন্ত্রের পরিভাষায় আমরা বলি, ভারতীয়দের প্রত্যেকের একটি সাধারণ পরিচিতি আছে। তা হলো, তারা ভারতীয় নাগরিক। তা সে তিনি নেতা হতে পারেন, প্রশাসক হতে পারেন, আবার সাধারণ শ্রমজীবীও হতে পারেন। পরিচয় কিন্তু সকলেরই এক—নাগরিক। যে যে-কাজই করুন, নাগরিক হিসাবে মর্যাদা সকলেরই সমান। নাগরিক হিসাবে কেউ খুব সম্মানিত ব্যক্তি হতে পারেন, আবার ঝাড়ুদারের মতো সাধারণ কর্মীও হতে পারেন। ঝাড়ুদার! তাতে কী? তিনিও তো নাগরিক। কাজটা তাঁর ঝাড়ু দেওয়া—এই তো! আপনি হয়তো সরকারি দপ্তরে কাজ করেন। তিনি ঝাড়ু দেন। কাজের ভিন্নতা থাকলেও নাগরিক হিসাবে দুজনের মূল্যই সমান। এই মূল্যবোধ কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্রের সামাজিক—রাজনৈতিক চিন্তার অবদান। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে আমরা তাই আরো উন্নত করব। শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেই চলবে না, এদেশে সামাজিক গণতন্ত্রের ভিতটিকেও মজবুত করতে হবে। এটাই এখন আমাদের কাছে অগ্নিপরীক্ষা এবং একাজে গীতার শিক্ষা আমাদের প্রভূত সাহায্য করতে পারে। সাহায্য করতে পারে এই জন্য যে, গীতা মানুষে-মানুষে বৈষম্যের ঘোর বিরোধী। এর পরের শ্লোকেই এই বিষয়টিকে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে।

প্রশ্ন এই : বুঝলাম, আপনি সাফাইওয়ালা; পথঘাট পরিষ্কার করেন। কিন্তু এই জীবিকায় থেকে কি আপনি নিজেকে উন্নত করতে পারেন? গীতার মতে তার উত্তর হবে : হ্যাঁ, আপনার ভিতর যদি সম্ভাবনা থাকে, যোগ্যতা থাকে, তাহলে আপনি সাফাইওয়ালার কর্ম থেকে প্রধানমন্ত্রীর পদেও উন্নীত হতে পারেন। জীবিকা যাই হোক, সেইখান থেকেই আপনি আপনার ব্যক্তিত্ব ও আন্তর জীবনের বিকাশ ঘটিয়ে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার চরম অবস্থায় পৌঁছতে পারেন। এইটিই পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকের মর্মবাণী।

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

—'নিজ নিজ কর্মে নিরত থেকে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে; নিজ কর্তব্যে নিযুক্ত ব্যক্তি যেভাবে সিদ্ধিলাভ করে, তা শোন।'

স্বে স্বে কর্মণি অভিরতঃ, 'উৎসাহের সঙ্গে নিজের নিজের কর্মে নিযুক্ত থেকে'; *স্বে স্বে কর্মণি* মানে 'নিজ নিজ কর্মে'; *অভিরতঃ,* সেই কর্মে 'সুখী'। কিন্তু মানুষ আধ্যাত্মিক পূর্ণতা কী করে লাভ করবে? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সে উত্তর আমি দিচ্ছি, শোন। *সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ, যেকোন* কর্মে নিযুক্ত থেকেই 'মানুষ সিদ্ধিলাভ করে'। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যে কর্মেই আমরা নিরত থাকি না কেন, তার মাধ্যমেই আমরা পূর্ণতা লাভ করতে পারি। কত বড় আশ্বাসের কথা, একবার চিন্তা করে দেখুন! কারণ, জীবিকা না বদলালে যদি সিদ্ধিলাভ করা না যায়, তাহলে বেশিরভাগ মানুষ কস্মিন্‌কালেও অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করে সিদ্ধ হতে পারবেন না। আপনি যে পেশায় নিযুক্ত আছেন, তাকে অবলম্বন করেই অন্তর্জীবনকে পুষ্ট করুন, বিকশিত করুন। আপনার যদি যোগ্যতা থাকে এবং সেই সঙ্গে আপনি যদি নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রাম করে যান, তবে আপনি সিদ্ধির চরম শিখরে অবশ্যই পৌছতে পারবেন। *স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু,* 'কেমন করে মানুষ নিজের নিজের কর্মে নিযুক্ত থেকে পূর্ণতা লাভ করে, শোন।' আপনি আপনার মনের প্রবণতা অনুযায়ী নিজের জীবিকা বেছে নিন। তা নিলে, আপনি কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারবেন। এটি হলো প্রথম সিদ্ধান্ত। সেই সঙ্গে এও বলা হচ্ছে, ঐ কর্মের মাধ্যমেই আপনার আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব। এই ভাবটি সম্পূর্ণ নতুন এবং এক কথায় অপূর্ব! হাঁ, সত্যিই, আপনার কর্ম করেই আপনি আপনার আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটাতে পারেন—তার জন্য আপনাকে জীবিকা বদলাতে হবে না। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত। কিভাবে এই বিকাশ সম্ভব হবে তা পরের শ্লোকে বলা হবে।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬॥

—'যাঁ থেকে সর্বভূতের উৎপত্তি, যাঁর দ্বারা এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত, তাঁকে মানুষ নিজের কর্ম দ্বারা অর্চনা করে সিদ্ধিলাভ করে।'

যতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাং, 'যাঁর কাছ থেকে এই বিশ্ব আবির্ভূত হয়েছে।' এই

বিশ্ব কার কাছ থেকে এসেছে? পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের কাছ থেকে। *যেন সর্বম্ ইদং ততম্,* 'যাঁর দ্বারা ব্যক্ত জগতের সবকিছুই পরিব্যাপ্ত'। কার্যের মধ্যেই কারণ নিহিত থাকে। তাই জগৎ যদি ব্রহ্ম থেকে এসে থাকে, তাহলে ব্রহ্ম জগৎ জুড়ে রয়েছেন। ভাষাটি একবার লক্ষ্য করুন—*যতঃ প্রবৃত্তিঃ ভূতানাং। প্রবৃত্তিঃ* অর্থাৎ 'মহাজাগতিক কর্মধারা'; সেই পরম সত্তা থেকে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়েছে। *যতঃ* মানে 'যেখান থেকে', অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম থেকে। এবং 'সেই ব্রহ্ম জগতের প্রত্যেক বস্তুকণার মধ্যে বর্তমান, *যেন সর্বম্ ইদং ততম্*। সেই ব্রহ্মের স্বরূপ কী? ব্রহ্ম শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ, অনন্ত এবং অদ্বিতীয়। সেটি কোন জড়বস্তু নয়, তা অনন্ত চৈতন্য বা *চিৎস্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্*-এ ব্রহ্মকে *সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম হলেন 'সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত'। সেই ব্রহ্মই এই জগৎ প্রকাশ করেছেন। আপনি, আমি সকলেই সেই ব্রহ্ম থেকে এসেছি। জগতের ভিতরে, বাহিরে, প্রতিটি অণু পরমাণুর মধ্যেই সেই ব্রহ্ম বিরাজ করছেন। তাই যদি হয়, তাহলে ব্রহ্ম তো আমাদের থেকে দূরে নন। তা আপনার, আমার সবচেয়ে কাছের বস্তু। *স্বকর্মণা তম্ অভ্যর্চ্য,* 'তাঁকে [অর্থাৎ সেই ব্রহ্মকে] নিজের কর্ম দ্বারা অর্চনা করে'। এখানে অর্চনা মানে স্মরণ মনন করা, উপলব্ধি করা। কীভাবে অর্চনা করেন আপনি? আপনার কাজের মধ্য দিয়ে। এ এক অপূর্ব ভাব! *সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ,* এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে 'মানুষ সিদ্ধিলাভ করে'। প্রত্যেক কর্মীর কাছেই এ এক পরম আশ্বাসবাণী! আধ্যাত্মিক দিক থেকে তথাকথিত ছোট এবং বড় কাজের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। সব কাজই ঠিক ভাবে করলে আপনার সিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে, আপনাকে সরাসরি চরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে। এটিই গীতার মহত্তম অভয়বাণী। এ দেশের মানুষ আমরা এই বাণীর তাৎপর্য এতকাল হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। এখন পারছি এবং মেনে চলছি: কালে অন্যান্য দেশের মানুষও এই শিক্ষার আলোকে সত্তার একত্ব উপলব্ধি করবে। কারণ এই শিক্ষা সর্বজনীন—কোন দেশের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য নয়। আধ্যাত্মিক হওয়ার অধিকার সকলের আছে। এটি আমাদের জন্মগত অধিকার, কারণ আপনার, আমার সকলের ভিতরেই, এমনকি প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই সেই শাশ্বত সত্তা অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই—কীভাবে তাঁর কাছে পৌঁছাব? গীতা বলছেন, আপনার নিজস্ব জীবিকার মাধ্যমেই আপনি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারেন। তার জন্য অন্য কারো জীবিকা গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। *আপনার নিজস্ব জীবিকাই ঈশ্বর ও মানুষের মিলনক্ষেত্র হয়ে*

উঠবে। জীবিকাকে ঈশ্বরমুখী করে তুলতে পারলে যে কেউ সিদ্ধি বা পূর্ণতালাভ করে ধন্য হতে পারেন। এটিই গীতার অনবদ্য শিক্ষা।

সকলের কাছেই আজ এই শিক্ষার অশেষ প্রাসঙ্গিকতা, বিশেষত আমাদের দৈনন্দিন জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে, যে জীবনদর্শন থেকে সবরকমের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে নির্বাসিত করে তাকে মাত্রাতিরিক্ত জাগতিক করে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়েছি আমরা। এই অপপ্রয়াস মানুষের সর্বনাশ করে ছাড়বে। তাই জীবিকাকে মূল্যবোধের রঙে কি করে একটুখানি রাঙানো যায় সেই চেষ্টাই এখন আমাদের করতে হবে এবং সুখের কথা সেই প্রয়াস চলছে। তাই বলছিলাম, আজকের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মকে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক বিকাশের উপায়ে রূপান্তরিত করার যে শিক্ষা গীতা দিয়েছেন, তার ব্যাপক উপযোগিতা আছে। জীবিকা আপনাকে কী দেয়? হিন্দীভাষী মানুষ বলবেন—*রোটি, কাপড়া* এবং *মকান,* অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। ভাল কথা। কারণ এগুলিরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু জীবিকা আপনাকে আরো কিছু দিতে পারে। সেই 'আরো' বস্তুটি কী, তা আমাদের জানতে হবে এবং যেদিন তা জানতে পারব সেদিনই আমাদের পূর্ণতালাভের পথে যাত্রা শুরু হবে। তখনই আমরা গীতার বাণীর মহিমাটি ভাল করে উপলব্ধি করতে পারব।

কর্ম, মানুষের বিকাশ এবং পূর্ণতালাভ—এই তিনটি বিষয়ে সকলেরই মাথাব্যথা আছে, সকলেই এগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই এই শ্লোকে ইঙ্গিত দিয়েছেন কিভাবে কর্ম পরমেশ্বরের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে সংযুক্ত, দেখিয়েছেন, ঈশ্বর আরাধনার উপায় হিসাবে কর্ম করলে সেই কর্ম কী প্রবল শক্তিসম্পন্ন হয়ে কর্মীকে পূর্ণতাপ্রাপ্তির চরম স্তরে তুলে দিতে পারে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

—'ত্রুটিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত নিজের ধর্ম সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; স্বভাবজাত কর্ম করে [কারো] পাপ হয় না।'

মনে করুন, আমার একটা *ধর্ম* [বর্ণ ও আশ্রমবিহিত ধর্ম] আছে, কিন্তু তা হয়তো আমি নিখুঁতভাবে পালন করছি না; অথচ অন্যের *ধর্ম* আমি যথাযথভাবে পালন করি। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এটি ঠিক নয়। *স্বধর্ম* কথাটি আমরা আগে পেয়েছি এবং তার আলোচনাও হয়েছে। 'অন্তরের প্রবণতা দ্বারা আদিষ্ট হয়ে' আমরা

যা করি, *স্বভাবনিয়তং,* তাই *স্বধর্ম।* বাস্তবিক, আমরা যা করি, তা স্বভাবের প্রেরণাতেই করি। এর অর্থ হলো আমাদের আত্মা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছেন। এই ধরনের কাজে প্রাণের একটা যোগ থাকে, তাই এধরনের কাজই আমাদের করা উচিত। অন্যের কাজ, তা যত ভাল বা আকর্ষণীয়ই মনে হোক না কেন, তার মধ্যে যাওয়া ঠিক নয়। নিজের কর্তব্যকর্ম বা ধর্ম ছেড়ে অন্যের কর্ম অনুসরণ করা অনুচিত। তাই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমেই আমাদের আত্মাকে আমরা প্রকাশ করব। তাতে যদি কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি হয় হোক; তবুও আমরা আমাদের কর্তব্যকর্ম ছেড়ে অন্য কিছুর পিছনে ছুটব না। *স্বভাব নিয়তং কর্ম কুর্বন্,* 'স্বভাবজাত কর্ম করে'; *ন আপ্নোতি কিল্বিষম্,* 'কারো পাপ হয় না।' অন্যের *ধর্ম* অনুসরণ করতে যাওয়া ভাল নয়; তার ফল বিষময় হয়। তাছাড়া এক *ধর্ম* ছেড়ে অন্য ধর্মের অনুসরণ—এর কোন শেষ নেই। এই যে অবিরাম পরিবর্তন, এর থেকে বোঝা যায় আমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব, আমাদের *স্বভাব,* অর্থাৎ নিজের ভাবকে আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখিনি। এটা খুবই খারাপ। আমাদের মধ্যে একটা চলতি কথা আছে ঃ নদীর এপারে চরে খাওয়া গরু সর্বদা ওপারেই বেশি ঘাস দেখে। সে বলে, 'ওপারে গিয়ে আমি ঘাস খাব। "এখানকার" ঘাস তত ভাল নয়, "ওখানকারটা" আরো ভাল'। এই করে আর কোন ঘাসই তার খাওয়া হয় না। চরাও হয় না। তাই আমরা যেখানে, যে অবস্থায় আছি, সেখান থেকেই ঘাস খাওয়া শুরু করতে হবে। আত্মবিশ্বাস খুইয়ে, নিজের কর্মক্ষেত্রের ওপর আস্থাহীন হয়ে, অন্যের কর্ম অনুসরণ করলে চলবে না। তৃতীয় অধ্যায়ে (৩৫ নং শ্লোকে) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন *পরধর্মো ভয়াবহঃ,* 'অন্যের ধর্ম বিপজ্জনক।' নিজের ধর্মে বিশ্বাস রাখ। তাই মানুষকে পথনির্দেশ দিয়ে এখানে বলা হচ্ছে, অন্য ধরনের কর্ম করার চেষ্টা না করে নিজের স্বভাবজাত কর্ম করা ঢের ভাল। মানুষের মন এত চঞ্চল যে এই দিগ্‌দর্শন করানোর প্রয়োজন ছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, স্বভাবজাত কর্ম তো করব, কিন্তু তার আগে আমার স্বভাবটি কি, তা বুঝতে হবে না? অবশ্যই হবে এবং তার জন্য নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, 'কোন্ কর্মক্ষেত্রে গেলে আমি নিজেকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পারব?' আপনি যদি সদুত্তর পান তো ভাল এবং আরো ভাল হয় যদি নিজের প্রবণতা অনুযায়ী কর্ম করার সুযোগ আপনি পান। বর্তমানে আমাদের সমাজে এ ধরনের সুযোগ সর্বদা মেলে না; তাই অন্য ধরনের কাজ নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। *সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ যেখানে প্রত্যেকে তার স্বভাব অনুযায়ী কর্ম করার সুযোগ*

পায়। এদিক থেকে বিচার করলে আমাদের দেশ সবদিক দিয়েই পিছিয়ে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, স্বভাব থেকে সামান্য বিচ্যুত হতে বাধ্য হয়েও আমরা যে কর্ম করব, তাতেও একটু তৃপ্তির স্পর্শ থাকা চাই। তারপর একদিন সমাজ যখন আরো উন্নত হবে, তখন আমরা মনের মতো কাজ করতে পেরে নিজেকে মেলে ধরতে পারব। পরের শ্লোকে এই শিক্ষাটিকেই শ্রীকৃষ্ণ আরো একটু সম্প্রসারিত করে বলছেন ঃ

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥

—'হে কুন্তীপুত্র, দোষযুক্ত হলেও সহজাত কর্ম ত্যাগ করা অনুচিত, কারণ ধোঁয়ার দ্বারা আগুনের মতো সকল কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত।'

কী সরল উপমা! কী অব্যর্থ ইঙ্গিত! *সহজং* বা *সহজ* মানে 'জন্মগত'। যে কর্ম জন্মনির্দিষ্ট, তাই *সহজং কর্ম*। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক কর্ম। যে কর্ম নিজের প্রকৃতি দ্বারা আদিষ্ট, প্রণোদিত বা উৎসাহিত, সেটিই *সহজং কর্ম*। কৌন্তেয়, 'হে অর্জুন'; এই জাতীয় কর্ম *সদোষম্ অপি,* 'দোষযুক্ত হলেও'; *ন ত্যজেৎ,* 'ত্যাগ করো না।' কেন? কারণ, 'সব কর্মই কোন না কোন দোষের দ্বারা আবৃত', *সর্বারম্ভা হি দোষেণ আবৃতাঃ*। কোন কাজই দোষ থেকে একেবারে মুক্ত নয়। এটি চরম সত্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, কিরকম জানো? *ধূমেন অগ্নিঃ ইব,* 'ধোঁয়ার দ্বারা আগুন যেমন আবৃত থাকে'—আগুনও আছে, আবার তার চারপাশে কিছু ধোঁয়াও আছে। অর্থাৎ, আগুন জ্বাললে তার সঙ্গে কিছু ধোঁয়াও লেগে থাকে। সেইরকম, নির্দোষ কর্ম বলে কিছু নেই। এই ত্রুটিপূর্ণ জগতে একটি বস্তু ছাড়া নিখুঁত কিছুই নেই। কী সেই বস্তু? অনন্ত আত্মা। এই সত্যকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অপূর্ণতার মধ্য থেকেই অবিকৃত, বিশুদ্ধ সেই পূর্ণ সত্তাকে আবিষ্কার করতে হবে। আশ্চর্য ব্যাপার! আমাদের দেহের কথাই ধরুন। এই শরীরের তো বিকার আছে, বিনাশ আছে, হাজার দোষ আছে; কিন্তু তার সাহায্য নিয়েই আমরা অবিকারী, বিশুদ্ধ আত্মা বা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি। সীমার মধ্য দিয়েই আমরা অসীমে পৌঁছতে পারি। কালের দ্বারা সীমিত যন্ত্রের সাহায্য নিয়েই যা কালের অতীত, যা শাশ্বত, তাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। চৈতন্যের এ কী অপূর্ব মহিমা! মহাভারতের একটি শ্লোকে আছে ঃ

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ মনীষা চ মনীষিনাম্।
যৎ সত্যম্ অনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মাং অমৃতম্ ॥

ভগবান বলছেন, 'সেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান যে দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়গুলির মতো বিনাশশীল ও সীমিত যন্ত্র দিয়ে অবিনাশী ও অনন্তস্বরূপ আমাকে লাভ করে।'

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ, 'বুদ্ধিমানের এইটিই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা'; *মনীষা চ মনীষিনাম্,* 'জ্ঞানীদের প্রজ্ঞা'; *মর্ত্যেন,* 'এই মরণশীল দেহ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে', তাঁরা অনন্ত, শাশ্বত, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেন। আমরা ভাবি, কী করে তাঁরা এটি করেন? কিন্তু করেন যে, তা তো দেখা যায়। এখানে তাই ঈশ্বরলাভের উপযুক্ত যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। *মর্ত্যেন,* 'বিনাশশীল বস্তুর দ্বারা'; *অনৃতেন,* 'যা অসত্য, তার মাধ্যমে'; *আপ্নোতি,* 'লাভ করে'; *যৎ সত্যম্,* 'যা সত্য, তাকে'; মাম্ অমৃতম্, 'অবিনশ্বর আমাকে'। দেহ *অসত্য, অনৃত, অনিত্য* হলেও এই দেহ দিয়েই আমরা অবিনাশী, অক্ষয়, অনন্ত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, কাজলের ঘরে থাকলে যত সেয়ানাই হও, কালি গায়ে একটু লাগবেই লাগবে। তাই কর্মজগতে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত হওয়ার দুরাশা যেন আমরা না করি। সকলের কাজেই কিছু না কিছু দোষ থেকেই যায়। অতএব এ ব্যাপারে মন খারাপ না করে ত্রুটি যত কম হয় সে দিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে বলছেন যে কর্ম স্বভাবতই দোষযুক্ত, তাতে খুঁত থাকবেই থাকবে; কিন্তু এই ত্রুটিযুক্ত কর্মের মাধ্যমেই, ভঙ্গুর ও অনিত্য শরীরের সাহায্য নিয়েই আমরা আমাদের অখণ্ড, অনন্ত স্বরূপ যে শুদ্ধ পরমাত্মা, তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি। এই কারণেই কর্মের ব্যাপারে আমাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের কাজকর্ম করতেই হয়, কাজ করেই আমরা দেহধারণ করি। আবার এই কাজের মধ্য দিয়েই জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য অভিমুখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

—'যাঁর বুদ্ধি সব বিষয়ে অনাসক্ত, যিনি সংযতচিত্ত, যাঁর স্পৃহা চলে গেছে, ত্যাগের দ্বারা তিনি কর্মবন্ধনক্ষয়রূপ পরমসিদ্ধি লাভ করেন।'

অসক্তবুদ্ধিঃ হলো মনের একটি অবস্থা। এর অর্থ এমন 'বুদ্ধি যা আসক্তিশূন্য' অর্থাৎ বুদ্ধি কাজ করে চলেছে, কিন্তু নির্লিপ্তভাবে। মন তাই শান্ত। আসক্তি মনকে উত্তেজিত করে এবং অনাসক্তি মনকে শান্ত করে। *সর্বত্র,* 'জীবনের সব ক্ষেত্রে' এই বুদ্ধি অনাসক্তির দ্বারা উজ্জীবিত হওয়ায়, প্রভূত দায়িত্ব নেওয়া সত্ত্বেও, দায়িত্বের ভারে তা কখনও ক্লিষ্ট হয় না। আপনি ভার বইছেন, কিন্তু তাকে আপনি ভার মনে করছেন না। কী অপূর্ব একটি অবস্থা, চিন্তা করে দেখুন! এই হলো *অসক্ত বুদ্ধি* । আমি এমন অনেক মানুষ দেখেছি যাঁদের তেমন কোন দায়িত্ব বহন করতে হয় না; অথচ তাঁরা সর্বদাই উত্তেজিত, দিনরাত গজগজ করছেন। আবার এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁদের কাঁধে প্রচুর দায়িত্বের বোঝা, অথচ তাঁদের মুখে হাসিটি লেগে আছে। এই যে দু-ধরনের মানুষ, এঁদের পার্থক্যটি কল্পনা করুন। যাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ, তাঁদের বুদ্ধি এতটাই সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিণত যে তাঁরা অক্লেশে ও প্রসন্নমনে প্রচুর দায়িত্বপালন করতে পারেন। কিভাবে তাঁরা নিজেদের গড়ে তুলেছেন, ভাবুন!

জিতাত্মা, 'তিনি নিজেকে জয় করেছেন'; *বিগতস্পৃহঃ,* 'সমস্ত স্পৃহা জয় করেছেন'। *স্পৃহা* মানে বাইরের বস্তু ভোগ করার আসক্তি। এমন যে মানুষ, তিনি *নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি,* অর্থাৎ 'চরম নিষ্ক্রিয় অবস্থা' লাভ করেছেন। সেই অবস্থায় সব কর্ম করেও তিনি বোধ করেন তিনি প্রকৃতপক্ষে কিছুই করছেন না। যখন মানুষের মনে কোনরকম বাসনা থাকে না, তখন সে এই *নৈষ্কর্ম্য* বা 'কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি'-র অবস্থা লাভ করে, কারণ বাসনাই তো বন্ধন, বাসনাই তো মানুষকে কর্ম করতে বাধ্য করে। এমন মানুষ যদি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পরেও কাজ করেন, তাহলে তা অন্য এক ধরনের শক্তির প্রেরণায়। সে শক্তি প্রেমের শক্তি, করুণার শক্তি। তাই তাঁর কর্মে উত্তেজনার লেশমাত্র থাকে না। *নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি* তাই বেদান্তের এক অসাধারণ চিন্তা, যে চিন্তার সৌরভ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন যাতে আমরা সেই মহৎ অবস্থায় পৌঁছতে পারি। গৃহবধূ থেকে শুরু করে, সাধারণ কলকারখানার কর্মী পর্যন্ত সকলেই *অসক্ত বুদ্ধি* ও *বিগতস্পৃহ* হওয়ার চেষ্টা করে *নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি* লাভ করতে পারেন। এ যেন ক্যাঁচকোঁচ করা দরজার কবজায় এক ফোঁটা তেল দেওয়া। তেল দিলেন তো উৎকট শব্দ থেমে গেল! এটা মানুষের জীবনেও সম্ভব। কাজ করার সময় আমরা এত হৈ চৈ, এত চিৎকার করি কেন? তার কারণ আমরা কর্মকুশল নই। এই কর্মনিপুণতার শক্তি কর্মযোগ বা কর্মের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আসে। *সন্ন্যাসেন,* 'সন্ন্যাসের দ্বারা' লাভ করা যায়।

এইটিই প্রকৃত *সন্ন্যাস।* এই সন্ন্যাস তখনই হয়, যখন আমরা সব স্পৃহা ত্যাগ করি, সব আত্মকেন্দ্রিক ভাব বিসর্জন দিই। তার ফলে পরিণত *বুদ্ধি* থেকে আমাদের ভিতর এক নতুন শক্তি জেগে ওঠে। এই যে *বুদ্ধি,* তা অনন্ত আত্মার খুব কাছাকাছি। এই বুদ্ধিই মানবজীবনের মহত্তম সম্পদ। শ্রীকৃষ্ণ তাই এই *বুদ্ধি* বিকশিত করে, সবাইকে তার ওপর নির্ভর করতে বলছেন। আগের একটি অধ্যায়ে ভগবান বলেছিলেন—*দদামি বুদ্ধিযোগং তং,* 'আমি তাঁদের *বুদ্ধিযোগ* দিয়ে থাকি'। বাস্তবিক, সেই বুদ্ধিই সব, কারণ তার সাহায্যেই মহত্তম বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে।

অসক্ত বুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ—এই মহৎ ভাবগুলির এত শক্তি যে তা জগতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে, যে পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ এখন আছে তার আমূল পরিবর্তনসাধন করতে পারে। অনাসক্তির কথাই ধরুন না। কী অপূর্ব এই শিক্ষা! আমরা কাজকর্ম সব করছি, মানুষের সঙ্গে মিশছি, কিন্তু মনের গভীরে এক গভীর অনাসক্তির ভাব। জীবনে উৎসাহের কিছু কমতি নেই, অথচ অনাসক্ত! দুটি ভাবই এখানে গাঁটছড়া বাঁধা যা সচরাচর হয় না। জীবনের ব্যাপারে আমি যদি উৎসাহিত হই, তাহলে আসক্তির বন্ধনে আমি বাঁধা পড়ে যাই; আবার অনাসক্ত হলে আগ্রহ বা উৎসাহ চলে যায়। তখন আর কারো কথা আমি ভাবি না, কারোর জন্য আমার উদ্বেগ নেই। এ হলো নিম্নস্তরের অনাসক্তি যা হামেশাই সংসারে চোখে পড়ে। মনস্তত্ত্বে একে 'apathia' বলে। অ্যাপাথিয়া মানে কোন বিষয়েই আমার উৎসাহ নেই; তাই ঘর অন্ধকার করে বসে থাকি। বাইরে থেকে দেখলে একে মনের উচ্চ অবস্থা মনে হয়; কিন্তু আদপেই তা নয়। এ হলো মনের চরম দুরবস্থা। সে যাই হোক, এই যে আপাতবিরুদ্ধ দুটি অবস্থা, উৎসাহ ও অনাসক্তির কথা এখানে বলা হচ্ছে, মানুষ একই সঙ্গে তা আয়ত্ত করতে পারে। দ্বাদশ অধ্যায়ে তা আমরা দেখেছি। সেখানে এই প্রশ্ন উঠেছে—আমরা কি একই সঙ্গে নির্ভীক এবং নম্র হতে পারি? শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তরে বলেছেন : অবশ্যই এবং এমন মানুষই আমার প্রকৃত ভক্ত। সংসারে সাধারণত আমরা এমন মানুষ দেখতে পাই না, যিনি যুগপৎ নির্ভীক এবং বিনত। সাহসী হলে আমরা অন্যের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াই। আবার যদি বিনীত হই, তাহলে যে কেউ আমাদের ভয় দেখাতে পারে। এই দুটি অবস্থাই সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু সত্য এই, দুর্দমনীয় অকুতোভয়তার সঙ্গে নিবিড় মৃদুতার সহাবস্থান সম্ভব। এই দুটি বিপরীত ভাব আমরা একই সঙ্গে আয়ত্ত করতে পারি। ঠিক সেইরকম, তীব্র

অনাসক্তির পাশাপাশি সকলের কল্যাণ ও সুখের ভাবনাও আমরা ভাবতে পারি। এই ধরনের মানসিক গঠন আমাদের হোক, শ্রীকৃষ্ণ এটাই চাইছেন। এই গুণগুলি যদি বেশ কিছু মানুষের মধ্যে আসে, তাহলে আগামিকালই এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে। একথা শ্রীকৃষ্ণ পরে বলবেন। আপাতত এই কথাটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, জীবন ও কর্মের সুস্থ দর্শন জীবনচর্যায় প্রতিফলিত করে আমরা একটি নিখুঁত সমাজ গড়ে তুলতে পারি। এই সিদ্ধিলাভ করলে কি হয় তা পরবর্তী শ্লোকে বলা হচ্ছে।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

—'হে কুন্তীপুত্র, এইরকম সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেভাবে জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, অর্থাৎ পরম ব্রহ্মকে লাভ করেন, তা সংক্ষেপেই আমার কাছে জানো।'

দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে সিদ্ধিলাভ করে, [যে কথা আগের আগের শ্লোকে বলা হয়েছে] মানুষ কী করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে? *নিবোধ মে,* তা তুমি 'আমার কাছ থেকে শোন'; *সমাসেনৈব,* 'সংক্ষেপেই'; *সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা,* 'সিদ্ধিলাভ করে কিভাবে'; *ব্রহ্ম তথা আপ্নোতি,* 'তার দ্বারা কেউ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন'; *নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা,* যা 'জ্ঞানের চরম পরাকাষ্ঠা' বা পরিসমাপ্তি। ব্রহ্ম কী? *জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা,* 'জ্ঞানের চরম পরিসমাপ্তি।' শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'যে প্রণালী অনুসরণ করে জ্ঞান ব্রহ্ম অনুভূতিতে পরিসমাপ্ত হয়, তা আমার কাছে শোন'। এটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা। দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি বোঝবার সুবিধা হবে। একটা নবজাত শিশুকে লক্ষ্য করুন। দেখবেন সে সর্বদা সুখ আর আরাম চাইছে। কিন্তু কিছুদিন পর সে আর ওতে সন্তুষ্ট থাকে না। সে তখন জ্ঞানের অন্বেষণ করে—তার দুচোখে তখন শুধুই বিস্ময়। সে এখানে সেখানে ছোটাছুটি করে নানা জিনিস জানতে চায়। সে ভাবে মায়ের পেট থেকে এ আমি কোথায় এসে পড়লাম! এই যে জগৎটাকে আমি চারপাশে দেখছি, এটা কী? দুচোখভরা বিস্ময় নিয়ে শিশু কেবল এইসব ভাবতে থাকে। ইংরেজিতে বলে, wonder is the beginning of knowledge ; অর্থাৎ বিস্ময় থেকেই জ্ঞানের শুরু। বিস্ময় না থাকলে কেউ জ্ঞানলাভ করতে পারে না। শিশুর ক্ষেত্রেও তাই। বিস্ময় তাকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। সে তার মাকে এটা সেটা অজস্র প্রশ্ন করে। তারপর একদিন সে স্কুলে যায়, স্কুল পেরিয়ে কলেজ। তারপর হয়তো একদিন সে বিজ্ঞানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। একেই

জ্ঞানের অন্বেষণ বলে। এই জানার শেষ কোথায়? ব্রহ্মজ্ঞানে। ব্রহ্ম অনুভূতিতে। বেদান্ত বলে ব্রহ্মজ্ঞান চরম পরিণতি বা পরাকাষ্ঠা। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই সত্যের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন—*আত্ম একত্ব বিদ্যা প্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে,* 'সব উপনিষদের (অর্থাৎ বেদান্তের) প্রতিপাদ্য আত্মার একত্বের জ্ঞান'। অর্থাৎ আমরা যে স্বরূপত এক, তা জানা। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এক অনন্ত আত্মাই আছেন এবং এই সত্য শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানলেই হবে না, তা অনুভব করতে হবে। তারপর বলা হয়েছে *অনুভব অবসানম্ ব্রহ্ম বিজ্ঞানম্,* 'ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপূর্ণতা ব্রহ্ম অনুভূতিতে।' কী সেই অনুভূতি? এই মহাবিশ্ব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। শিশুর ব্রহ্মজ্ঞানের অন্বেষা আরম্ভ হয়েছিল জগতের টুকরো-টাকরা বা খণ্ড বস্তু দিয়ে—নিজের ক্ষুদ্র দেহ এবং তার পারিপার্শ্বিক জগৎ দিয়ে, তাদের বোঝার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বোধের পরিধিও সম্প্রসারিত হয়। শেষপর্যন্ত তার জ্ঞানতৃষ্ণার পরিসমাপ্তি হলো ব্রহ্ম অনুভবে। *অনুভব অবসানম্,* 'জ্ঞানের পর্যবসান অনুভবে'। তখন কী অনুভব হলো? অদ্বয়, অনন্ত ব্রহ্মের উপলব্ধি হলো। অতএব দেখা যাচ্ছে, আমাদের যতকিছু অনুভব, তার চূড়ান্ত পরিণতি হলো ব্রহ্ম উপলব্ধি যা সর্বাত্মক এবং অসীম। শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে বলছেন, 'এই জ্ঞান ও উপলব্ধি কি করে লাভ করা যায় তা আমি তোমাকে বলব'। অনাসক্তির ভাব আয়ত্ত করে, স্পৃহাশূন্য হয়ে, কর্ম করেও কর্মফল ত্যাগ করে, কর্মে সিদ্ধ হয়ে মানুষ কিভাবে শেষপর্যন্ত ব্রহ্মের সাথে একত্ব অনুভব করে; *নিবোধ মে,* তা তুমি 'আমার কাছ থেকে শোন', এই কথা শ্রীকৃষ্ণ বললেন।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥

—**'বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হয়ে** এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে ধৈর্যের সঙ্গে সংযত করে; শব্দ এবং ইন্দ্রিয়ের অন্যান্য বিষয়গুলি ত্যাগ করে এবং আসক্তি ও দ্বেষ পরিহার করে';

মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনার জন্য কয়েকটি সাধনের কথা এখানে বলা হচ্ছে। *বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো,* 'বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হয়ে' অর্থাৎ সমৃদ্ধ হয়ে; *ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ,* 'ধৈর্যের সঙ্গে দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে'; *শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা,* 'শব্দ ও অনুরূপ ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়গুলিকে ত্যাগ করে', অর্থাৎ তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে; *রাগ দ্বেষৌ ব্যুদস্য চ,* 'এবং

আকর্ষণ ও বিদ্বেষ বর্জন করে'। এসব করার একটিই উদ্দেশ্য—মনকে দ্বৈতভূমি বা বিপরীত অভিজ্ঞতাগুলি থেকে সরিয়ে আনা। তারপর বলা হচ্ছে।

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥

—'যিনি নির্জনে বাস করেন; অল্প খান; যাঁর বাক্য, দেহ ও মন সংযত; যিনি সদা ধ্যানযোগপরায়ণ এবং বৈরাগ্যবান';

সাধকের মানসিক অবস্থার ছবিটি এখানে আঁকা হয়েছে। তিনি কীরকম? বলা হচ্ছে, তিনি *বিবিক্তসেবী,* 'নির্জনস্থানে থাকেন', অর্থাৎ সাধন করার জন্য একটি নির্জনস্থানে তিনি বাস করেন; *লঘ্বাশী,* 'অল্প খান'; *যতবাক্কায়মানসঃ,* তাঁর 'কথাবার্তা, শরীর এবং মনটি সংযত'; *ধ্যানযোগপরো নিত্যং,* 'তিনি সদাধ্যানযোগপরায়ণ'; *বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ,* 'বৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন'। ব্রহ্ম উপলব্ধি করতে হলে মনটিকে তো উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে। যেসব কথা এতক্ষণ বলা হলো সেগুলি তারই উপায়। তারপর ঃ

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

—'যিনি অস্মিতা, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও বৈভব ত্যাগ করেছেন; যিনি 'আমার' বোধ থেকে মুক্ত এবং শান্ত, [তিনি] ব্রহ্মত্ব লাভের উপযুক্ত হন।'

বিমুচ্য, 'পরিত্যাগ করে'; *অহঙ্কারং,* 'আমিত্বভাব'—অর্থাৎ ভিতরের স্থূল অহংভাব ত্যাগ করে; *বলং,* 'শক্তিভাব' ত্যাগ করে; *দর্পং,* 'দম্ভ' জয় করে; এবং *কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্,* 'কাম, ক্রোধ এবং বৈভব অন্বেষণের মনোভাব'; *নির্মমঃ,* '[এটি] "আমার", এই বোধ থেকে মুক্ত'; এবং *শান্তো,* 'প্রশান্ত'। 'আমি' ও 'আমার', এই ভাব আমাদের সঙ্কীর্ণ করে এবং এই ভাবটি বর্জন করতে পারলেই মন শান্ত হয়। এইসব গুণসম্পন্ন ব্যক্তি *ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে,* 'ব্রহ্মত্বলাভে সক্ষম হন'। কর্ম ও জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই এই দুর্লভ অবস্থাটি লাভ করা যায়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

—'যিনি ব্রহ্মস্বরূপলাভ করেছেন এবং যিনি প্রশান্তচিত্ত, [যিনি] শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্বভূতে সমদৃষ্টি, [তিনি] আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন।'

ব্রহ্মভূতঃ, এমন ব্যক্তি 'ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন'। এটি অসাধারণ চিন্তা। কিন্তু এমন মানুষের আবির্ভাব হলো কোথা থেকে? তিনি কি আকাশ থেকে পড়লেন? না, তা নয়। সাধারণ মানুষ থেকেই তিনি অসাধারণ হয়ে উঠেছেন। তিনি যখন সাধারণ ছিলেন, আর পাঁচজন মানুষের মতো ছিলেন, তখন তিনি *ব্যক্তিভূতঃ*। তখন 'আমি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি'—এই অহংবোধ তাঁর ছিল। এইভাবেই আমাদের যাত্রা শুরু হয়। তারপর ধীরে ধীরে মনকে নিয়ন্ত্রণে এনে, অহংবোধের বিলোপ সাধনের জন্য সচেষ্ট হই আমরা। গীতার আঠারোটি অধ্যায় জুড়েই এই প্রসঙ্গ রয়েছে। তবে এখানে চরম পর্যায়টির কথা বলা হচ্ছে। সেই পর্যায়টি কী? *ব্রহ্মভূতঃ,* 'যিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নতা লাভ করেছেন।' কিন্তু সেই পর্যায়ে তিনি পৌঁছলেন কেমন করে? আজকের মানুষ যদি এই বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করেন, তাহলে তাঁদের অশেষ কল্যাণ হবে। যে অহংবোধের দরুণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য এসে গেছে, সেই অহংবোধটিকে কব্জা করা যায় কী করে? এইটিই প্রশ্ন। 'দ্য সায়েন্স অফ লাইফ' (*The Science of Life*) এর রচয়িতা এইচ. জি. ওয়েলস্ এবং জুলিয়ান হাক্সলে এই অহং দমনের কলাকৌশলটিকে 'provisional delusion of considerable strategic value in evolution' বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ বিবর্তনের ক্ষেত্রে অহংরূপ সাময়িক মোহটির এবং তা দমন করার কৌশলের একটা বিশেষ মূল্য আছে। বাস্তবিক, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের মুখোমুখি হওয়ার যে কৌশল, তার ওপরই কিন্তু সব সুখশান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করছে। জীবনের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাবো বহু মানুষের সঙ্গে বহুবার সংঘর্ষ বা ঠোকাঠুকি হয়েছে আমাদের। এটি তখনই হয়, যখন আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন থাকি। যত রক্তপাত, হিংসা, অপরাধ, ভুলবোঝাবুঝি, নিরানন্দ ও অশান্তি—সব কিছুর জন্ম এক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আর এক ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব থেকে। এ জাতীয় সংঘর্ষ সত্ত্বেও অবশ্য কখনও কখনও কারো কারো সাথে আমাদের একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম। সাধারণত যা ঘটে তা সংঘাত। ব্যক্তিত্বে-ব্যক্তিত্বে এই যে লড়াই তাকে বার্ট্রান্ড রাসেল বিলিয়ার্ড বলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সত্যি কথা! বিলিয়ার্ড বলগুলির কাজই তো একে অন্যকে ধাক্কা মারা। তাই মানব-বিকাশ ও তার পরিপূর্ণতা লাভের দৃষ্টিকোণ

থেকেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উগ্রতাকে কিভাবে পেলব করা যায়, সেটিই মূল প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নের সদুত্তরের ওপর নির্ভর করছে সকলের সঙ্গে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা। আমরা যদি শান্তিতে থাকি, তবে সেই শান্তি বাইরের জগতেও প্রতিফলিত হতে বাধ্য। তাই এ বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেকেরই চিন্তাভাবনা করা দরকার। হতে পারে স্বাতন্ত্র্যবোধ দিয়েই একদা আমাদের জীবনের পথচলা আরম্ভ হয়েছিল এবং সেই পথ চলতে গিয়ে অন্যের সঙ্গে অনবরত দ্বন্দ্বও হয়েছে; কিন্তু সেখানেই যে থেমে থাকতে হবে তার তো কোন মানে নেই। ধীরে ধীরে আমাদের ভিতর পরিবর্তনও তো আসে। হৃদয়ের সেই বিস্তার, চেতনার সেই ঊর্ধ্বায়ণ, তাকেই সংস্কৃতে আমরা *বিকাশ* বলি। *বিকাশ* মানে রূপান্তর। প্রথমে 'আমি' একক, পৃথক ব্যক্তি। তারপর 'আমি' যখন 'আপনার' সঙ্গে যুক্ত হলাম, তখন আমার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের একটু প্রসার হলো। বিবাহিত জীবনে এইভাবেই একজন আর একজনের সঙ্গে যুক্ত হন। আমার জীবন ও চিন্তায় 'আপনি' স্থান পেলে আমার ব্যক্তিত্ব একটু প্রসারিত হলো। তখন আমি আপনাকে ভালবাসি, সেবা করি। শুরু শুরু এরকমই হয়ে থাকে। কিন্তু কি করে সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়, তা আমরা জানি না বলেই মাধুর্যের এই সম্পর্ক অচিরেই তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। গীতা সেই মানবিক বিকাশের মনস্তত্ত্ব ও দর্শনটি আমাদের উপহার দিয়েছে। আগের সতেরটি অধ্যায় জুড়ে যে আলোচনার স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, এখন তা এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে পরিণতির মুখে। এখানে আমরা *ব্রহ্মভূতঃ* বা ব্রহ্মস্বরূপতার কথা পাচ্ছি। এ অবস্থায় সাধক 'ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন'। শৈলশিখর থেকে একদা যে স্রোতস্বিনী উৎসারিত হয়েছিল, তা যেন বিছিন্ন এক ব্যক্তি। তারপর বয়ে চলার পথে বহু জলধারার সম্মিলনে সে বিরাট তরঙ্গিনীতে রূপান্তরিত হলো; কিন্তু তখনও সে নদী— সমুদ্রকান্তা মাত্র, কারণ সাগরের সঙ্গে তার মিলন হয়নি। তারপর একদিন সেই মিলন হলো। নদী ও সাগরের সেই মিলন অনির্বচনীয়। প্লেন থেকে গঙ্গার বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ আমি দেখেছি। বার্মার খরস্রোতা ঐরাবতী নদীও ঐভাবে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। সে দৃশ্যও আমি দেখেছি। বেশ কয়েক মাইল নদীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও তার বয়ে চলা চোখে পড়ে। কিন্তু তারপর হঠাৎ একসময় নদী কখন যেন সাগরে লীন হয়ে গেছে। স্বরূপত সে সমুদ্রই ছিল, কিন্তু এখন সে সমুদ্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে। এই শ্লোকে যে *ব্রহ্মভূতঃ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার তাৎপর্যও এই।

প্রসন্নাত্মা, যাঁর ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তি হয়েছে, সেই যোগীর 'অন্তর্জীবন সম্পূর্ণ

প্রশান্ত'। কেন? তার কারণ, তাঁর আর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নেই এবং সেইজন্য কারো সাথে তাঁর কোন দ্বন্দ্বও নেই। সব দ্বন্দ্ব তিনি জয় করেছেন। *ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি*, 'দুঃখ এবং বাসনা থেকে তিনি মুক্ত'। জীবনের যত বিপরীত বা বিরুদ্ধ অবস্থা—মাত্রাতিরিক্ত আনন্দ, মাত্রাতিরিক্ত শোক, তীব্র অবসাদ—এসব কোনকিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। তাঁর মনটি এমন সুবিন্যস্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, যে সমস্ত উগ্র আবেগ সাধারণ মানুষকে বিহ্বল করে, সেসব তাঁর মনে প্রবেশ করতে পারে না। এত শান্ত, এত স্থির সেই মন।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু, 'সকল জীবের সঙ্গে তিনি একাত্মবোধ করেন'; সাম্য ও ঐক্যবোধে তিনি প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম অনুভূতি হলে তাই তো হয়। তখন আমি সকলের সঙ্গে এক হয়ে যাই। তখন আর আমি আলাদা ব্যক্তি নই। অতএব সংঘর্ষ আর কার সাথে হবে? একত্বের অনুভূতি হলে সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়। তখন আমরা একসূত্রে গাঁথা, তখন সকলের সঙ্গে শুদ্ধ প্রেমের সম্পর্ক।

মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্, যে, আমি পরমাত্মা, সেই 'আমাতে তিনি পরাভক্তি লাভ করেন'। মানুষের মধ্যে সাধারণ যে *ভক্তি* আমরা দেখতে পাই, তা যেন হিসেবি চুক্তি-করা-ভক্তি। তিরুপতি মন্দিরে গিয়ে পাঁচটাকা দিলাম, কিন্তু *মনে মনে আশা করছি তার বিনিময়ে কিছু পাব*, অর্থাৎ মনের কোন সুপ্ত কামনা পূর্ণ হবে। আর প্রতিদান যদি না পাওয়া যায়, তাহলে হয়তো জীবনে আর ঐ মন্দিরের ছায়া মাড়াব না! এই তো আমাদের ভক্তির দশা! কিন্তু এখানে যে পরম ভক্তির কথা বলা হয়েছে, তা একাগ্র ভক্তি; তার মধ্যে কোন হিসেব নিকেশ নেই, কোনরকম দোকানদারি নেই। যা আছে তা হলো ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভালবাসা।

সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে চারশ্রেণির ভক্তের কথা বলেছেন, তার মধ্যে চতুর্থ হলো *জ্ঞানী*, অর্থাৎ যে-ধরনের ভক্তের কথা এখন এখানে বলা হচ্ছে। অবশিষ্ট তিন শ্রেণির মধ্যে আছেন *আর্তঃ, জিজ্ঞাসু* এবং *অর্থার্থী*। ভগবান সেখানে বলেছেন, জ্ঞানীর সঙ্গে তিনি অভিন্ন; জ্ঞান তাঁর স্বরূপ। জ্ঞানীর সেই অবস্থাটিই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কীরকম সে অবস্থা? ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ একাত্মতা—সেখানে আর তুচ্ছ ব্যক্তিসত্তার কোন চিহ্ন নেই। নৈতিক জীবন মানেই তো এই বিচ্ছিন্ন কাঁচা আমিত্বের সঙ্গে লড়াই, সেই সংগ্রামের মাধ্যমেই তো মনকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হয়। বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা তাই এইঃ পৃথক আমিত্ব বলে কিছু নেই; ওটা একটা বিভ্রম, মোহ। যত শীঘ্র তার হাত

থেকে নিস্তার পাই, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। একমাত্র এইরকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমরা নৈতিক হয়ে উঠতে পারি, আমাদের কাজকর্ম নৈতিকতার গুণে সম্পৃক্ত হতে পারে।

নীতিশাস্ত্রের মূল কথা তাই *ব্যক্তি-বিকাশ*। এই বিকাশ সম্পূর্ণ হলে তখন আমরা সবার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করি। তখন আর কারো সাথে বৈরীতা নেই, *ততো না বিজুগুপ্সতে*। একথা *ঈশোপনিষদ্* বলেছেন। 'যখন আমরা এক আত্মাকে সকলের মধ্যে দেখি এবং সকলকে আত্মাতে'—তখন কী হয়? তখন আমাদের মধ্য থেকে শুধু ভালবাসাই স্ফুরিত হয়; *ততো ন বিজুগুপ্সতে*, 'তখন আর কারো প্রতি ঘৃণার ভাব থাকে না।' এখানে গীতায় বলা হচ্ছে, *মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*, 'তিনি সেই পরম ভক্তি লাভ করেন যা আমাতে নিবদ্ধ'। পরপর কয়েকটি শ্লোকে এই মূলভাবটিকেই বিস্তারিত করা হয়েছে এবং এই ধারা চলবে অন্তিম শ্লোক পর্যন্ত, রামানুজাচার্য যাকে *চরম শ্লোক* বলে বর্ণনা করেছেন, যার সার কথা ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি।

শ্রীমদ্ভাগবত-এর একাদশ স্কন্ধে প্রকৃত *ভাগবত* বা ভক্ত কে, তা নিয়ে বহু সুন্দর শ্লোক আছে। শ্লোকগুলি প্রায়শই শেষ হয়েছে এই বলে—'এই হলো ঠিক ঠিক ভক্ত'। সেখানে প্রকৃত ভক্তের যেসব গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার যদি কিছুমাত্র আমরা আয়ত্ত করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এলে, সবকিছু এবং সকলের প্রতিই ভালবাসা এসে যায়, কারণ ভগবানই তো সব হয়েছেন, তিনিই তো সবার হৃদয়ে বিরাজ করছেন। ভগবানের ভক্ত তাই সকলকে ভালবাসেন, অর্থাৎ সকলের মধ্যে উপস্থিত সেই এক ঈশ্বরকে ভালবাসেন। *নারদভক্তিসূত্র* এবং অনুরূপ অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রেও সেই এক কথা বলা হয়েছে—প্রকৃত ভক্ত দেখেন ভগবান সর্বভূতে বিরাজ করছেন। এমন ভক্তের মনে ঘৃণার স্থান নেই—শুধুই প্রেম আর করুণা। সকলকে না ভালবেসে তিনি করবেন কী? কারণ তিনি প্রত্যক্ষ দেখছেন, তাঁর প্রাণের দেবতা সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন। এটিই তাঁর বিচার ধারা, এটিই তাঁর সাধন। এই *ভক্তি* এলে তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না ঈশ্বর কী বস্তু! জীবনের উদ্দেশ্যই বা কী! সব তখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কেবল চরম সত্যকে 'বোঝার' প্রচেষ্টা।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

—'স্বরূপত আমি কে এবং কেমন, [সাধক] ভক্তি দ্বারা তা জানতে পারেন; তারপর আমাকে যথার্থরূপে জেনে তৎক্ষণাৎ [আমাতে] প্রবেশ করেন।'

আমাদের মধ্যে শুদ্ধাভক্তির উদয় হলে তখনই কেবল আমরা বুঝতে পারি ভগবানের সত্যিকারের স্বরূপটি কী, আমাদের জীবনে কী তাঁর প্রাসঙ্গিকতা অথবা কী অসীম তাঁর মহিমা। *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি তত্ত্বতঃ,* 'ভক্তিদ্বারা [ভক্ত] আমার যথার্থ স্বরূপ জানতে পারেন'; *যাবান্ যশ্চাস্মি,* 'আমি কে এবং কী'। অর্থাৎ, যে ভগবান বা ঈশ্বরকে আমি ভালবাসি, তিনি কী কী ভাবে অভিব্যক্ত হয়ে থাকেন? তাঁর স্বরূপটিই বা কী? ইত্যাদি। *যাবান্* এবং *যশ্চ অস্মি,* এই শব্দগুলির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর বলেছেন যে, *যাবান্* বলতে 'ঈশ্বরের *লীলা*-র দিকটি, অর্থাৎ জগৎরূপে তাঁর উপাধিবিশিষ্ট প্রকাশের দিকটি বোঝায়' এবং *যশ্চ অস্মি,* এই কথার অর্থ, *'নিত্য* বা নির্বিশেষ অবস্থাটিও ঈশ্বরের।' শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, *নিত্য* এবং *লীলা* একই বস্তুর। যা *নিত্য,* তাই *লীলা;* আবার যা *লীলা,* তাই *নিত্য*। একই ব্রহ্ম—তিনিই *সগুণ,* আবার তিনিই *নির্গুণ*। তাই সর্বত্র তিনিই বিরাজ করছেন, তিনিই একমাত্র অনন্ত, শাশ্বত সত্তা। তিনি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই—*সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।* তাই এই ভক্তির সাহায্যে ঈশ্বর স্বরূপত যেমন, ঠিক সেইভাবে তাঁকে আমরা জানতে পারি।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা, 'এইভাবে আমাকে যথার্থরূপে জেনে'; *বিশতে তদনন্তরম্,* 'তক্ষুনি আমাতে প্রবেশ করেন।' অর্থাৎ তিনি আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান; প্রবেশ করা মানে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাওয়া। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্যাখ্যায় বলছেন, প্রবেশ করা মানে শারীরিকভাবে ঢুকে যাওয়া নয়। একাত্মবোধের যে প্রতিবন্ধকটি ছিল, সেটি কেবল দূর হয়ে গেল। অহং হলো সেই প্রতিবন্ধক বা বাধা। সেটি দূর হলে, সাধক দেখেন এখানেও যা, সেখানেও তা; নিত্যেও যিনি, লীলাতেও তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুপম উপমা দিয়ে বলেছেন : জলে একটা বাঁশ ফেলে দাও; দেখবে জল যেন দুভাগ হয়ে গেছে। আসলে জল আলাদা হয়নি, ঐরকম *দেখাচ্ছে,* এই যা! বাঁশটা *যেন* জলকে দুভাগ করে ফেলেছে। বাঁশটা তুলে নাও, তাহলেই দেখতে পাবে জল যেমন অখণ্ড ছিল তেমনি আছে। এই শ্লোকেও সেই কথা বলা হচ্ছে। যে কল্পিত স্বাতন্ত্র্যবোধ বা ভেদবুদ্ধি এতকাল আমাদের অশেষ যন্ত্রণা দিয়েছে, এবার তা তিরোহিত হয়েছে। তাই আমরা পরমেশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারছি। আগেও আমরা ঈশ্বরের

সঙ্গে অভিন্নই ছিলাম, কিন্তু *কল্পনা* করতাম আমরা তাঁর থেকে আলাদা। সেই ভ্রম চলে যাওয়ায় এখন আমরা তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গেলাম।

খ্রিস্টান, সুফি, হিন্দু, বৌদ্ধ, এক কথায় সব ধর্মশাস্ত্রেই এই চূড়ান্ত পরিণতির ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরই আমাদের গন্তব্যস্থল বা লক্ষ্য; তাঁর মধ্যেই আমরা শেষমেশ প্রবেশ করি, তাঁর সঙ্গেই আমরা একাত্ম হয়ে যাই। ঈশ্বর আমাদের থেকে আলাদা—এইরকম ভাবি বলেই এখন আমরা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। কিন্তু এরকম ভুল ধারণা সত্ত্বেও আমাদের মনের তলায় তলায় একটি প্রেরণা কাজ করেই চলে। কী সেই প্রেরণা? 'আমাকে তাঁর কাছে ফিরে যেতেই হবে'। এই প্রেরণা ভিতরে আছে বলেই আমরা এত সংগ্রাম করি। ঐ দিব্য প্রেরণাই জাগতিক ব্যাপারে আমাদের অতৃপ্ত করে তোলে। আমরা প্রচুর অর্থ পেয়েও অসুখী। প্রচুর ক্ষমতালাভ করেও অসন্তুষ্ট। মন সর্বদাই যেন কি একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে! সেই 'কি একটা' যে কি বস্তু, তা আমরা জানি না। সেটি হলো 'সত্য', যা আমাদের ভিতরেই আছে। কিন্তু আমরা তাকে হন্যে হয়ে বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সব মরমিয়া সাহিত্যেই দেখা যায়, এই অন্বেষার পরিসমাপ্তি উপলব্ধিতে। যে মুহূর্তে আপনার উপলব্ধি হলো, সেই মুহূর্তেই পরম শান্তি ও পরিপূর্ণতাবোধে প্রতিষ্ঠিত হলেন আপনি। কেন? তখন যে আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করেছেন, পরম ঐক্যে পৌঁছেছেন! তখন যে আপনি উপলব্ধি করেছেন—ঈশ্বর, যিনি অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ, তিনি চৈতন্যরূপে সীমিত জীবের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান! 'এই' চৈতন্য আর 'সেই' চৈতন্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই!

তাই এখানে বলা হয়েছে, *ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা,* 'অনন্তর আমাকে যথার্থরূপে জেনে'; *বিশতে তদনন্তরম্,* 'আমাতে প্রবেশ করেন,' আমার সঙ্গে এক হয়ে যান। গঙ্গোত্রী থেকে উদ্ভূত হয়ে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, অবশেষে গঙ্গা এসে মেশে বঙ্গোপসাগরে। সাগর হয়েই নদীর পরিপূর্ণতা। সাগরের জল বাষ্পীভূত হয়েই একদা যে নদীর সৃষ্টি হয়েছিল, তা আবার এখন সাগরেই প্রত্যাবর্তন করল। সাগরে মিলে আবার সাগর হয়ে গেল। আমরাও তাই; তাঁর কাছ থেকে এসে আবার তাঁর কাছেই, সেই পরম সত্তার কাছেই ফিরে যাই। সব অধ্যাত্মদর্শনেই মানবজীবনের লক্ষ্যকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একদিন না একদিন *সকলেই* ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হবে। সেটিই আমাদের ভবিতব্য, সেটিই আমাদের লক্ষ্য। যে বস্তু আমরা চাইছি, সেই

দিব্যসত্তা এখনই আমাদের ভিতরে আছেন এবং তিনিই আমাদের অগোচরে তাঁর দিকে টানছেন আমাদের। তিনিই আমাদের অতৃপ্তি দিচ্ছেন যাতে আমরা ক্রমশ মহত্তম প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারি। অতৃপ্ত হওয়াই মানুষের প্রকৃতি। অন্য জীবজন্তুর এই ধরনের অতৃপ্তিবোধ নেই। এ কেবল মানুষের, কারণ সে জানে মূল্যাতীত একটি পরশমণি, অকল্পনীয় একটি রত্ন আছেই; শুধু কোথায় আছে তা সে জানে না। এই অজ্ঞতাই তাকে এধার ওধার ছুটিয়ে মারে। আমাদের সাহিত্যে কস্তুরীমৃগের কথা আছে। তার নাভিতে যে কস্তুরী থাকে তার এমন তীব্র সুগন্ধ যে, সেই গন্ধের উৎসের সন্ধানে সে পাগলের মতো চারদিকে ছোটাছুটি করে। তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে সে এক জায়গায় চুপ করে বসে পড়ে এবং আবিষ্কার করে সুগন্ধ তার ভিতর থেকেই আসছে। আমাদের ধর্মশাস্ত্র বলছে, আমাদের অধ্যাত্ম সত্যের অন্বেষণ এবং তার সার্থক পরিসমাপ্তিও ঐরকম।

অনন্তরম্ বলতে এখানে বিশেষ কোন নির্দিষ্ট কালকে বোঝাচ্ছে না। পরমার্থ তত্ত্ব বা ঈশ্বর কালাতীত সত্তা; তিনি সর্বত্র সমভাবে রয়েছেন। শুধু সেই জ্ঞানের প্রতিবন্ধকটি দূর করতে পারলেই হলো। তাহলে যা ছিল, তাই রইল। জলের ওপর থেকে লাঠিটা তুলে নিন, তাহলে আর জল ভাগ হয়ে গেছে মনে হবে না; তখন এক অখণ্ড জলরাশি! তার আর বাঁদিক ডানদিক নেই; এদিক ওদিক নেই। বোঝার সুবিধের জন্য অবশ্য 'এখানে', 'ওখানে' এই সব শব্দ আমরা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু তা দেয়াল তুলে আকাশকে খণ্ড করার মতো হাস্যকর। চতুর্দিকে দেয়াল গেঁথে ঘর তৈরি করলে তার একটা ভিতরের দিক এবং একটা বাইরের দিকে থাকে বটে; কিন্তু আকাশ এসব পার্থক্য জানে না, কারণ আকাশ এক ও অনন্ত। ঠিক সেইরকম, পরম সত্তাও এক এবং অ-দ্বৈত। আমাদের কল্পিত অহংবোধ বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের দরুন আমরা প্রথমে তাঁর মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করি, পরে আবার বিভিন্ন কর্মের দ্বারা সেই মিথ্যা ভেদবোধ দূর করার চেষ্টা করে থাকি।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করুন। প্রথমে কিন্তু আমরা আমিত্বের ধারণাটিকে পুষ্ট করি। শিশুকে আমরা একথা বলি না—তোমার 'আমিত্ব' দূর করে দাও—কারণ তাঁর আদৌ কোন 'আমিত্ব' নেই। শিশুর ভেতর এই 'আমিত্ব' আমরাই গড়ে দিই, প্রশংসার মাধ্যমে সেই আমিত্ববোধকে শক্তিশালী করি। তারপর সেই শিশুই যখন বড় হয়, তখন তাকে বলি—তোমার 'আমিত্ব' বর্জন

কর। এটা খুব সত্যি যে, আমাদের যদি সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হয়, তাহলে 'আমিত্ব'-কে দূর করতে হবে; নিদেনপক্ষে ঐভাবটিকে অনুগ্র বা কোমল করতে হবে। কী করে তা করা যায়? নিজের সম্পর্কে এখন আমার যে ধারণা, তাকে সম্প্রসারিত করে; ছোট-আমিকে বড় আমিতে রূপান্তরিত করে। তারপর আসে সেই শুভলগ্ন যখন আমার সঙ্কীর্ণ আমিত্ব অনন্ত একত্বে বিলীন হয়ে যায়। তখন 'আমি' নই, 'তুমি'; তুমিই একমাত্র সত্য। এই জ্ঞান এলেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই পরম সত্তার মধ্যে প্রবেশ করি।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

—'সর্বদা আমার শরণাগত হয়ে সকল কর্ম করেও [ভক্ত] আমার অনুগ্রহে শাশ্বত, অক্ষয় স্থিতিলাভ করেন।'

'যদিও সর্বক্ষণ আপনি কাজ করছেন', *সর্ব কর্মাণি অপি সদা কুর্বাণো।* এখানে একথা বলা হচ্ছে না, জ্ঞানলাভের জন্য আপনি সব কাজ বন্ধ করে দেবেন। না, তা নয়। কাজ করুন। তাতে কোন ক্ষতি নেই। বরং জীবনযাপন ও কর্মের মাধ্যমেই আপনি চরম উপলব্ধিতে পৌঁছতে পারেন। গীতার এটিই *মূল* সুর। আপনি গৃহবধূই হন, শ্রমিকই হন, অথবা প্রশাসকই হন, প্রত্যেকেই তাঁর নিজের নিজের কর্মের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করতে পারেন। বস্তুতপক্ষে, জীবন ও কর্মই অগ্রগতির উপায়। জীবন ও কর্মের সদ্ব্যবহার করেই অধ্যাত্মজীবনে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে—এখনকার এই সীমিত, সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিত্বকে পরম সত্তায় উন্নীত করতে হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে *যোগ*-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেছিলেন, *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্,* তখনই এই ভাবের সংস্পর্শে আমরা এসেছিলাম। অতএব, অসীম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে আমাদের *ব্রহ্মভূতো* হতে হবে। এ পথে একটু এগোতে পারলেই আমাদের মধ্য থেকে ঘৃণা ইত্যাদি যতসব নেতিবাচক মনোভাব, তা বিদায় নেবে; অসীম অনুভূতির অনির্বচনীয় আনন্দের কথা না হয় বাদই দিলাম।

এই শ্লোকে খুব জোর দিয়ে বলা হচ্ছে ঃ *সদা কুর্বাণো,* 'সর্বদা কাজ করেও' কেউ ব্রহ্মচেতনায় ডুবে থাকতে পারেন। ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়ার জন্য কর্ম ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। তবে একটি কথা ভগবান গীতায় অক্লান্তভাবে বলে চলেছেন, কাজ কর, তবে *মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ,* 'আমার, অর্থাৎ পরম সত্তার

শরণাগত হয়ে'। এখানে শ্রীকৃষ্ণ *মৎ*, 'আমি', বা আমার শব্দটি ব্যবহার করছেন এই কারণে যে তিনি সকলের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মা হিসাবেই কথাগুলি বলছেন। *মৎপ্রসাদাৎ অবাপ্নোতি*, 'আমার কৃপায় [ভক্ত] লাভ করেন'; *শাশ্বতং পদম্ অব্যয়ম্*, 'শাশ্বত স্থিতি যা অক্ষয়'। সেই যে স্থিতি বা অবস্থা, তা চিরন্তন ও অসীম। এতদিন পর্যন্ত আমরা স্ফুলিঙ্গ ছিলাম; কিন্তু এখন পুরোপুরি অগ্নি। এখন আর কোনরকম তুচ্ছতা, সীমাবদ্ধতা, জীব ভাব আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমার অনুগ্রহেই ভক্ত তাঁর অনন্ত স্বরূপে স্থিত হতে পারেন। এই সত্য আমরা জানতাম না; কিন্তু জীবনই শেখাল যে, 'আমি সামান্য দেহধারী ক্ষুদ্র জীব নই; আমার একটা বিরাট পরিচয় আছে। আমি অসীম ও শাশ্বত।' এই বোধ থেকেই যতকিছু মহত্ত্বের জন্ম। কিন্তু এই সত্য ঠিকঠাক না বোঝার ফলেই আমরা আমাদের অহংকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলি। তার ফলে নিজেরও সর্বনাশ ডেকে আনি, অন্যেরও ক্ষতি করি। *যে স্ফীত অহং দিয়ে আমরা অন্যের আত্মসম্মান নষ্ট করি*, তা বিপজ্জনক—*অহং-এর বিপত্তিকর বিস্তার। কিন্তু অহং-এর সেই অনন্ত বিস্তৃতি সঠিক ও অভিপ্রেত, যার দ্বারা আমরা অন্যদের উৎসাহিত করি এবং তাদের আত্মসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করি।* এই দুটি জিনিস ঠিক মতো বুঝতে হবে। এর মধ্যেই বৈদান্তিক মহামানবের ধারণাটি প্রচ্ছন্ন আছে। এখন আমরা যে ধরনের মানুষ, তার মধ্যে বহুরকমের সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে। কিন্তু বেদান্ত মতে যিনি মহামানব, তিনি অসীম, কারণ তিনি *ব্রহ্মভূতঃ*। সেই কারণেই তিনি শান্তি, প্রেম এবং সংহতির প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছেন।

পাশ্চাত্যেও এই মহামানবের ধারণা আছে। তবে তা অন্যরকম। জার্মান দার্শনিক নিৎসে 'সুপারম্যান' বা অতিমানবের যে ছবি এঁকেছেন তা ভয়ঙ্কর। এই অতিমানব অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক, উদ্ধত, ক্ষমতাবান এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। নিৎসে-র ভাষায়, 'সুপারম্যান হিংসাত্মক কাজকর্ম ও আচরণের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন'। এই অতিমানবের অহং এতটাই স্ফীত যে তা সকলের আতঙ্কের কারণ। নিৎসে যেমনটি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন তেমনই ঘটেছিল। হিটলারের মধ্যে আমরা সেই অতিমানবকে দেখেছি এবং তার ফল কি হয়েছিল তা সকলেরই জানা।

ভারতীয় চেতনায় যে অতিমানবের ছবিটি বিধৃত, তা কিন্তু একেবারেই অন্য ধরনের। তিনি আমাদের সুখ ও শান্তির উৎস, আধ্যাত্মিক শক্তির আধার।

সাধারণ অবস্থা থেকেই ধাপে ধাপে অসাধারণ হয়ে ওঠেন তিনি। কীভাবে? নিজের ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করে। ঐ উপলব্ধির বলে তিনি *ব্রহ্মভূত* হয়ে গেছেন। তাই, *ততো ন বিজুগুপ্সতে,* তাঁর মধ্যে 'কোন বিদ্বেষ' এবং নেতিবাচক মনোভাব নেই। তার মধ্য থেকে কেবল প্রেমই বিচ্ছুরিত হয়, যা আশা জাগায়, ভরসা দেয় এবং সৃজনশীলতাকে উদ্দীপিত করে। শ্রীকৃষ্ণ যে অতিমানবের কথা বলেছেন তাঁর প্রকৃতি এইরকম। উপনিষদেও এই কথা আছে। তবে গীতার এই অংশে এই ভাবটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এরপর *প্রসাদ* বা অনুগ্রহের কথা আসছে—*মৎ প্রসাদাৎ,* 'আমার অনুগ্রহে'। কিন্তু এই অনুগ্রহ আসে কোত্থেকে? এতক্ষণ পর্যন্ত প্রসাদ বা কৃপার কথা আমরা খুব বেশি পাইনি। কোথাও কোথাও আভাসে ইঙ্গিতে একটু আধটু বলা হয়েছে, এই যা। কিন্তু অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ দিকে ভগবদ্‌কৃপাই গীতার মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। হয়তো তার কারণ এই, আমরা এখন অনেকটা পরিণত হয়েছি, কৃপা উপলব্ধি করতে গেলে যা একান্ত প্রয়োজন। দেহ, মন যথোপযুক্তভাবে বিকশিত ও উন্নত না হলে 'ভগবানের কৃপা' বলে যে একটি মহামূল্য সত্য আছে তা আমরা অনুভব করতে পারি না। কিন্তু পরপর সতেরোটি অধ্যায়ের প্রশিক্ষণ পেয়ে এখন আমরা এমন একটা উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছি যখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি—হ্যাঁ, ভক্ত হিসাবে 'ভগবানের কৃপা এবং তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণের' মূল্য আমরা বেশ বুঝতে পারছি। ভগবৎকৃপা এবং শরণাগতি—গীতা নামক দিব্য মহাসঙ্গীতের এটিই অন্তিম সুর। প্রথম দিকে আমরা প্রচণ্ড শক্তিমত্তা, ব্যক্তিত্ব ও পুরুষকারের কথা পেয়েছি। ওগুলির ওপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। এখন সেইসব গুণগুলি বিকশিত করে আমরা এই সত্য অনুধাবন করতে পারছি যে—'একমাত্র ব্রহ্মই আছেন এবং আমরা যেন তাঁরই এক একটি স্ফুলিঙ্গ। আমরা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। এছাড়া আর আমাদের পৃথক কোন পরিচয় নেই।' বোধের এই পর্যায়েই কৃপা ফলপ্রসূ বা কার্যকর হয় এবং তা থেকে আমরা লাভবান হতে পারি। এর আগে কৃপার মর্ম আমরা বুঝতেও পারি না, আর তা কোন কাজেও আসে না।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

—'মনে মনে সব কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে, বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করে, সর্বদা আমাতে চিত্ত সমাহিত কর।'

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ,* অর্থাৎ 'মনে মনে তোমার সব কর্ম আমাতে সমর্পণ করে এবং নিজেকেও আমার কাছে সমর্পণ করে।' শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, শুধু কর্ম সমর্পণ করলেই হবে না, ব্যক্তি হিসেবে নিজেকেও সমর্পণ করা চাই। প্রথমে কর্মের কথা বলছেন। সব কর্ম মনে মনে ত্যাগ কর। চেতস্ বা চিত্ত হলো মন। আসলে শ্রীকৃষ্ণ বলতে চাইছেন—কর্ম ছেড়ো না, কর্ম করে যাও; কিন্তু মনে মনে তা ত্যাগ কর। বাহ্যত আপনি কাজ করছেন, অথচ করছেন না—এ মনের এক অদ্ভুত অবস্থা! এ অবস্থায় কর্মকে বোঝা মনে হবে না, কাজের মধ্যে কোন উদ্বেগ থাকবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই অবস্থাটি বুঝিয়েছেন। তিনি বলছেন ঃ পশ্চিমে মেয়েরা মাথায় জলভর্তি ঘড়া নিয়ে হাসতে হাসতে, কথা বলতে বলতে পথ চলে। মাথায় অত বোঝা, কিন্তু ভারবোধ নেই! অন্যের সঙ্গে কথা বলছে, কিন্তু মুখে হাসিটি লেগে আছে; মুখের কোন বিকৃতি নেই! বোঝা বইবার এটিই কৌশল। ঠিক সেইরকম, জীবনের সব বোঝাও কি আপনি সরলভাবে, শান্তির সঙ্গে, নিরুদ্বিগ্ন হয়ে বহন করতে পারেন? তা যদি পারেন, তবে এটাই *যোগ* হয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ না আপনি অন্তরে নিহিত দিব্য স্বরূপের স্পর্শ অনুভব করছেন, ততক্ষণ ঐ শক্তি আসবে না। এটি শারীরিক শক্তি নয়, বৌদ্ধিক শক্তি নয়, এটি আধ্যাত্মিক শক্তি যা অন্তর্যামী ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে।

বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য, অর্থাৎ 'বুদ্ধি-যোগের সাহায্য নিয়ে'। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ সংখ্যক শ্লোকে এই *বুদ্ধিযোগ*-এর কথা আমরা প্রথম পেয়েছিলাম। সেখানে বলা হয়েছে—*বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি।*

এই *যোগ-বুদ্ধি* জাগাতে হবে; এই যোগ-বুদ্ধির সাহায্যে জীবনযাপন করতে হবে। তা করলে আমরা আর কর্মের বন্ধনে পড়ব না। যা যা করণীয়, সে সমস্ত কর্মই আমরা করব; কিন্তু মনে মনে তা ত্যাগ করব। তা যদি করতে পারি তাহলেই আমরা মুক্ত। দ্বিতীয় অধ্যায় আমাদের সেই আশ্বাসবাণীই শুনিয়েছে। দু-ধরনের মানুষ আছেন। প্রথম দলের যাঁরা, তাঁরা তপস্বী। তাঁরা কর্মত্যাগ করে বনে চলে যান এবং সেখানে সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম উপলব্ধির চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় দলের যাঁরা, তাঁরা সমাজে থাকেন। স্বভাবতই তাঁদের কাজকর্ম করতে হয়। কিন্তু ওরই মাঝে তাঁরা পরম সত্যটি উপলব্ধি করতে চান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এটা কি সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'হ্যাঁ, সম্ভব'। কিন্তু কেমন করে? তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'বুদ্ধি-যোগ আশ্রয় করে'। দু-ধরনের যোগ

আছে ঃ এক, *সাংখ্য যোগ*; দুই, *বুদ্ধি-যোগ।* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আমার বুদ্ধি-যোগ সেই সব মানুষের জন্য যাঁরা সংসারে থেকে নানা কাজকর্ম করবেন, অথচ যাঁদের মনে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা রয়েছে, যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তুলতে ইচ্ছুক। তাঁদের জন্যই আমি সামগ্রিক আধ্যাত্মিকতার এই দর্শন উপহার দিয়েছি। অতএব এই *বুদ্ধিযোগ* বা *সমত্বযোগ*-এর অভ্যাস কর। *সমত্বযোগ*-এর উদ্দেশ্য এমন মন তৈরি করা যা 'উজ্জ্বল, সবল এবং অবিচলিত', যা সকলের সঙ্গে একাত্ম ভাবনায় অনুরঞ্জিত। এমন যে *বুদ্ধি,* সকলের সেবা ছাড়া তা আর কী করবে? তখন সেই বুদ্ধিপ্রসূত সব কর্মই সেবার আকার ধারণ করে।

ঐ ৩৯ সংখ্যক শ্লোকে বুদ্ধিযোগের শুরু। এখন গীতার এই অন্তিম পর্বে তা আবার উল্লেখ করা হচ্ছে। এই বিষয়ক আগের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে, *বুদ্ধি* এমন মানসিক শক্তি যা পরিশীলিত, নির্মল ও শুদ্ধ। শুদ্ধ ও দ্যুতিমান হওয়ায় তা মানুষের প্রকৃত উন্নতির সহায়ক। এই এক মানসিক শক্তি ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়েও কাজ করে। আমি চোখ দিয়ে দেখছি, কান দিয়ে শুনছি, চিন্তা করছি, ইচ্ছা করছি—সব করছি। এগুলি মানসিক শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া। শুরুতে এই মানসিক শক্তি স্থূল অবস্থায় থাকে। একটু সূক্ষ্ম হলে তা থেকে সাধারণ চরিত্রশক্তির বিকাশ হয়। তা যখন আরো সূক্ষ্ম হয়, তখনই *বুদ্ধির* উদয়। তাই *বুদ্ধি* হলো অসম্ভব সূক্ষ্ম মানসিক শক্তি। এই বুদ্ধির এমন দীপ্তি, এত প্রচণ্ড শক্তি তার যে, তার সামনে থেকে সব বাধা অপসারিত হয়ে যায়। এই যে বাধা দূর করার ক্ষমতা, তা আসে বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির সংযোগের ফলে। তাই *বুদ্ধি* বলতে ইচ্ছাশক্তিসমন্বিত বুদ্ধিকেই বোঝায়। এই বুদ্ধি এত শুদ্ধ যে কারো কোন অনিষ্ট করতে পারে না। এই বুদ্ধি কেবল কল্যাণ করতে পারে। বেদান্ত চিন্তায় এইটিই বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

তাই শ্রীকৃষ্ণ আগেই বলেছেন, *বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ,* 'বুদ্ধির আশ্রয় নাও'। কেন? না, বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ সব কিছু লাভ করতে পারে। দশম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ একথাও বলেছেন, *দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে,* 'আমি যখন কৃপা করতে চাই, তখন তাঁদের *বুদ্ধি-যোগ* দিয়ে সাহায্য করি, যে বুদ্ধির দ্বারা তাঁরা আমাকে লাভ করে থাকেন।' অতএব বুদ্ধির বিকাশ ঘটান। বুদ্ধি বিকশিত হলেই চরিত্র তৈরি হবে। পাঁচ-শতাংশ বুদ্ধি বিকশিত হলেই একজন মানুষ সাধারণভাবে চরিত্রবান ও সৎ নাগরিক হয়ে উঠতে পারেন যিনি তাঁর আপন কর্মক্ষেত্র থেকে সকলের সেবা করবেন। এই ধরনের

মানুষ তাঁর মানসিক শক্তিভাণ্ডারের সামান্য একটু বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েই এত দূর সাফল্য অর্জন করতে পারেন! এই বুদ্ধিকে ক্রমাগত শুদ্ধ করে যেতে পারলে একদিন এমন অবস্থা আসে যখন *বুদ্ধি-যোগ* লাভ করা যায়। নিজে চেষ্টা করেই মানসিক শক্তিকে শুদ্ধ করতে হয়। অপরিশোধিত, ক্লেদাক্ত তেলকে শোধন করে নিয়ে তার থেকে আমরা যেমন সুন্দর সব জিনিস তৈরি করি, তেমনি আমরা আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে পরিশুদ্ধ করে তার থেকে অপূর্ব চারিত্রিক গুণগুলিকে উন্মোচিত করতে পারি। কী ধরনের গুণ? যেমন ধরুন, কর্মকুশলতা, সকলের কল্যাণচিন্তা, নিরবচ্ছিন্ন মানসিক শান্তি, ইত্যাদি। মানসিক শক্তির কী অপূর্ব উত্তরণ, কী অসাধারণ ফলশ্রুতি! যে শক্তি দিয়ে এখন আমরা অন্যের সর্বনাশ করছি, অন্যকে শোষণ করছি, সেই শক্তিকেই শুদ্ধ করতে পারলে তা চরিত্রশক্তি, সম্ভাবনাপূর্ণ নাগরিকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ভক্তের কী অপরিসীম শক্তি—একবার ভেবে দেখুন তো! তাই মানসিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে ক্রমশ উচ্চ উচ্চ চিন্তা ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত করতে হবে। তবেই সেই শক্তি একদিন *বুদ্ধি* বা বৌদ্ধিক শক্তিতে পরিণত হবে।

যোগ-বুদ্ধি হলো সেই '*বুদ্ধি* যা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত'; বুদ্ধির ঠিক পিছনেই আত্মা বিরাজ করছেন। ইন্দ্রিয়গুলি অনেক দূরে রয়েছে, কিন্তু *বুদ্ধি* আত্মার খুব কাছে। শঙ্করাচার্য তাই বুদ্ধিকে *নেদিষ্ঠম্* ব্রহ্ম বা 'আত্মার নিকটতম' বলেছেন। বেদান্তের প্রথম শিক্ষাটি হলো, আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই দিব্যসত্তা রয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্যটিকেই তাঁর অনুপম ভাষায় বলেছেন, 'Each soul is potentially divine' অর্থাৎ 'প্রত্যেকেই স্বরূপত ঈশ্বর'। তা যদি হয়, তাহলে সেই দিব্যস্বরূপকে আমরা প্রকাশ করব কীভাবে? তার উত্তর এই, ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের সত্তা থেকে বহু দূরে রয়েছে; তাই তাদের ওপর নির্ভর না করে তাদের সংযত করুন এবং *বুদ্ধি* বা যুক্তির অধীনে নিয়ে আসুন। বুদ্ধি বিকশিত হলে তবেই চরিত্র তৈরি হবে। আমরা মূল্যবোধের শিক্ষার কথা বলি। তার অর্থ কী? তার অর্থ প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যাতে এই *বুদ্ধি* বা *যোগ-বুদ্ধি* জাগ্রত হয়, তার জন্য তাদের সাহায্য করা। প্রথমে হয়তো তাদের মধ্যে পাঁচ শতাংশ বুদ্ধি জাগ্রত হলো, তারপর দশ শতাংশ, তারপর হয়ত আরো বেশি। কিন্তু ঐটুকুও যদি হয়, তাও চমৎকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বুদ্ধির নামগন্ধ নেই। কোন কোন মানুষের আচার-আচরণ এমন যে, দেখলে মনে হয় তারা যেন স্নায়ু আর আবেগের তালগোল পাকানো একটা পিণ্ড মাত্র। একটু এদিক-ওদিক হলেই তারা আক্রোশে ফেটে

পড়ে এবং বাস-ট্রাম পোড়াতে শুরু করে। এসব দুষ্কর্মের পিছনে কোন *বুদ্ধি* কাজ করে না, যা করে তা দুর্বুদ্ধি! আমাদের রাজনৈতিক জীবনের চেহারাটাই একবার লক্ষ্য করুন! অন্তত সেখানে কোন বুদ্ধির প্রকাশ আছে বলে মনে হয় না, যা আছে তা অমার্জিত শক্তির স্ফুরণ। আজ যারা সরকার চালাচ্ছেন, আগামিকাল তাঁরাই যদি বিরোধীপক্ষের আসনে বসেন, তাহলে দেখা যাবে তাঁরা বাস পুড়িয়ে গায়ের ঝাল মেটাচ্ছেন। অথচ তাঁরাই যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁরা বাস জ্বালানোর বিরোধিতা করে এসেছেন। এ কোন্ দেশীয় বুদ্ধি? অশুদ্ধ, অমার্জিত, আসুরিক বুদ্ধি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই হচ্ছে বর্তমানে আমাদের দেশের অবস্থা।

দেশের মানুষ যেদিন গীতার শিক্ষাটি ধরতে পারবেন, সেদিন তাঁরা এই শক্তিকে উত্তরোত্তর শুদ্ধ করে সমাজের সকলের *সুহৃৎ* হয়ে উঠবেন, জাতির শক্তিস্তম্ভ হয়ে উঠবেন। এই রূপান্তর এখনও ঘটেনি। তবে ঘটতেই হবে। না ঘটলে বিপর্যয় অনিবার্য। গীতা তাই এত করে *বুদ্ধিযোগ* অনুসরণ করার কথা আমাদের বলে চলেছেন।

এরপর এসেছে *মচ্চিত্তঃ* প্রসঙ্গ। *মচ্চিত্তঃ,* অর্থাৎ 'মদ্গতচিত্ত'—মনটি সম্পূর্ণভাবে আমাতে, অর্থাৎ অসীম অদ্বয় সত্তা যা আপনার, আমার সকলের মধ্যে নিহিত, তাতে নিবদ্ধ। এরকম হলে কারো সাথে আমাদের বিরোধ থাকে না। বিরোধ থাকলেও তা নামমাত্র; সম্পূর্ণ বিরোধিতার ভাব সেখানে থাকে না। এটি হলো খেলোয়াড়ি মনোভাব যা আজ রাজনীতির ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, প্রয়োজন হলে, বিরোধিতা আমরা অবশ্যই করব, কিন্তু তা কখনও শত্রুতায় পর্যবসিত হবে না; অন্য দলগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টায় আমরা মেতে উঠব না। গণতান্ত্রিক রাজনীতি যদি সুস্থ হয়, তবে বিরোধীপক্ষ এবং সরকার, উভয়ের মধ্যেই মেলামেশা ও আদান প্রদান সম্ভব। এবং সেটাই হওয়া উচিত, কারণ তাঁরা সকলেই তো মানুষ, একই দেশের নাগরিক। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, বিশেষ পরিস্থিতিতে, কিছু মানুষ হয়তো বিপক্ষদলে আছেন। ঐ পর্যন্ত। কিন্তু ভারতবর্ষে আজ বিরুদ্ধ দলগুলির একটাই কাজ—বিরোধিতা করা। আমি প্রায়শ বলি—এ যেন আমেরিকান ফুটবল! বল ফেলে শুধু এ ওর দিকে তেড়ে যাচ্ছে; কেবল অন্যকে দাবিয়ে, মাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা! আমাদের মোহনবাগানের ফুটবল কিন্তু তা নয়। সেখানে আপনি বলটাকে নিয়েই খেলেন, অন্যের দিকে তেড়ে যান না। বল নিন এবং গোল করুন—

এটাই তো ঠিক ঠিক ফুটবল খেলা। তাই বলছিলাম, আমাদের রাজনীতির আমূল পরিবর্তন দরকার।

মচ্চিত্তঃ মানে *'বুদ্ধি* আমাতে সমাহিত', ঈশ্বরে সমর্পিত। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, ভারতীয় বেদান্ত কখনও বলে না ঈশ্বর দূরের ঐ আকাশে বসে আছেন। যখনই 'ঈশ্বর' শব্দটি আমরা ব্যবহার করি, অথবা যখনই শ্রীকৃষ্ণ 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন তিনি অসীম ও অদ্বিতীয় সত্তা যে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, যিনি সকলের অন্তর্নিহিত সত্তা, তাঁরই উল্লেখ করেছেন। কী গভীর চিন্তা! *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*-এ বলা হয়েছে, *যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরঃ। যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম,* 'যে পরম ব্রহ্ম শুদ্ধ বোধস্বরূপ—যিনি সর্বগত ও সর্বব্যাপী'; *য আত্মা সর্বান্তরঃ,* 'যে আত্মা সকলের আত্মা'— তিনি দূরের কোন বস্তু নন। শিষ্য গুরুকে বলছেন— আমি এই ব্রহ্মকে জানতে চাই। এই প্রশ্ন এবং তাঁর উত্তর—এটিই উপনিষদের প্রাণবস্তু বা মূল উপজীব্য। আপনার এবং আমার মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁকে আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তারূপে জানি; কিন্তু যে আত্মা সকল জীবের আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মা, আমি তাঁকেই জানতে চাই—এইটিই শিষ্যের প্রার্থনা। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*-এ আছে—*ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামঃ*। শিষ্য আচার্যকে বলছেন—'উপনিষদে যে *পুরুষ*-এর কথা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমাকে বলুন।' শঙ্করাচার্য এখানে তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, *উপনিষদস্বেব বিজ্ঞায়তে, ন অন্যত্র,* 'কেবল উপনিষদেই এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, অন্য কোথাও নয়', পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে নয়। সেখানে হয়তো অতিজাগতিক এমন এক ঈশ্বরের কথা আছে যিনি স্বর্গে থাকেন। কিন্তু একমাত্র উপনিষদ্ বা বেদান্তই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছে, ঈশ্বর হলেন সর্বভূতের অন্তরাত্মা। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখনই 'আমি' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, তখন তিনি সকলের থেকে, জগতের থেকে নিজেকে আলাদা করে নেননি, বরং তিনি সকলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে বলেছেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে এক'। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে তিনি বলেছেন, 'আমাকে তোমাদের বন্ধু বলে জেনো।' সুহৃদং সর্বভূতানাং, 'আমি সকল প্রাণীর বন্ধু'; *জ্ঞাত্বা মাং শান্তিম্ ঋচ্ছতি,* 'আমাকে আত্মরূপে জেনে, [যোগী] পরম শান্তি লাভ করেন'। অতএব দেখুন, বেদান্তে এই হচ্ছে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা, যে ঈশ্বর অনুভববেদ্য, অর্থাৎ যাঁকে অনুভব করা যায়। *য আত্মা সর্বান্তরঃ,* 'যে আত্মা সকলের অন্তরাত্মা'; তাই আমরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারি, কেবল *বিশ্বাস* করে ক্ষান্ত হওয়া নয়।

আপনি বিশ্বাস করতে পারেন ঈশ্বর বহুদূরে বসে আছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঐ বিশ্বাসটুকু ছাড়া আপনি আর বেশি কিছু করতে পারবেন না। আমরা তাঁকে জানতে পারব না; মহাকাশযানে চেপে তাঁর কাছে যেতে পারব না। কিন্তু বেদান্তে যে ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে, তাঁকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, কারণ তিনি আমাদের আত্মা; বুদ্ধির ঠিক পিছনেই তিনি রয়েছেন। শঙ্করাচার্য তাই তাঁর *সূত্র ভাষ্যে* বলছেন, *অনুভব অবসানম্ ব্রহ্ম বিজ্ঞানম্*, 'ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতা ব্রহ্ম উপলব্ধিতে'। ব্রহ্মজ্ঞান বাইরের জ্ঞান নয়, তা হলো নিজের আত্মস্বরূপের অনুভূতি। আমরা কি সত্যিই ব্রহ্মকে অনুভব করতে পারি? অবশ্যই পারি, কারণ তিনিই আমাদের আত্মা, আমাদের আত্মার আত্মা—পরমাত্মা। আত্মার মাধ্যমেই ব্রহ্মানুভূতি হয়। যেহেতু সেই ব্রহ্ম সকলের আত্মা, তাই তাকে উপলব্ধি করতে হবে। *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্*-এ পরিষ্কার বলা হয়েছে (২.১৫) ঃ

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥

'যে অবস্থায় যোগী, এই দেহেই স্বয়ংপ্রভ আত্মসত্যের মাধ্যমে ব্রহ্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করেন, সেই অবস্থাতেই তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, প্রকৃতির বিকার দ্বারা অসংস্পৃষ্ট পরমাত্মাকে জেনে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান।'

কোরানেও পির পয়গম্বর মহম্মদের উক্তিতে এই ধরনের একটি কথা আছে যা *হাদিথ্-এ-সুইদ্সি* নামে পরিচিত। জালালুদ্দিন রুমি তাঁর বিখ্যাত 'মসনভি' নামক গ্রন্থে এই বাণীটিকে অনেকবার উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, 'মন অরফ নৈ সহূ / ফকো অরব নব্ বহূ', অর্থাৎ 'যে নিজের আত্মাকে চিনতে পারে, সেই ভগবানকে চিনতে পারে।' যিশুও বলেছেন, 'স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরেই আছে'। জালালুদ্দিন রুমিও এই সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই একজন করে ক্রাইস্ট লুকিয়ে আছেন। তাঁকে সাহায্য করতে পার, আবার বাধাও দিতে পার; আঘাত করতে পার, আবার শুশ্রূষাও করতে পার। মানুষের আত্মার ওপর থেকে আবরণটি যদি সরিয়ে দাও, নিশ্চিত সেখানে একজন ক্রাইস্টকে দেখতে পাবে।'

প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপর জোর দেওয়ায় ভারতীয় ধর্মজগতে করুণার ধারাটি

নিত্য বহমান। সেইজন্য আমরা নিরীশ্বরবাদী, অজ্ঞেয়বাদী অথবা অন্য কাউকেই উৎপীড়ন করি না। কেন করব? মৌখিক বিশ্বাসের মূল্য কতটুকু? মানলুম, ঈশ্বর যে আছেন তা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু সেই বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের জীবনটিকে যদি দিব্য করে গড়ে না তুলি, দিব্য জীবনযাপনে যদি আমাদের রুচি ও বিশ্বাস না থাকে, তবে 'ঈশ্বরে বিশ্বাস করি'—এ কথার অর্থ কী? ও তো কথার কথা! তাই, আমাদের কাছে মৌখিক বিশ্বাসের কোন দাম নেই। আমাদের দেশের অনেক মহাত্মাই তো প্রথম দিকে নিরীশ্বরবাদী অথবা অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যৌবনে অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। অধ্যাত্মজীবন শুরু হওয়ার আগে শ্রীরামকৃষ্ণও তো তাই ছিলেন। এসব নিয়ে তাই আমরা মোটেই মাথা ঘামাই না। আমাদের কাছে অনুভূতিই অপরিহার্য, আগাম বিশ্বাস নয়। 'আমরা বিশ্বাস করি'—শুধু এই বলে যদি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি, তাহলে আমরা ঐখানেই আটকে যাব; সুখনিদ্রা ছাড়া আর অন্য কিছু প্রাপ্তি হবে না। ওটা এক ধরনের আয়েশ, ধর্ম নয়; অন্তত ভারতবর্ষে নয়। ধর্ম একটা প্রচণ্ড শক্তি যা প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে দেবে; যদি 'সত্য' বলে কিছু থাকে, তবে সেই সত্যলাভের জন্য প্রাণকে ব্যাকুল করে তুলবে। এই হলো ভারতবর্ষের মানুষের মনোভাব। শ্রীকৃষ্ণ তাই, সকলের অন্তরাত্মা, এই অর্থেই 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। দশম অধ্যায়ের ২০ সংখ্যক শ্লোকে তিনি বলেছেন, *অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ*, 'হে অর্জুন, আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত প্রত্যগাত্মা।' শ্রীকৃষ্ণের 'আমি' হলো ঐ আত্মা।

সততং ভব, 'সর্বদা থাক'। অর্থাৎ, তোমার মনটি আমাতে স্থির করে রাখ; সেখান থেকে আর যেন সরে না যায়। আত্মা স্থির। মন যদি সেই আত্মায় নিবদ্ধ থাকে, তাহলে মনও স্থির হবে। এই মনোভাব নিয়ে আমাদের সব কাজ করে যেতে হবে। গীতার এই দর্শন দৈনন্দিন জীবনের খেটেখাওয়া মানুষের জন্য। আমাদের কর্মের মধ্য দিয়েই আমরা আত্মোপলব্ধি করতে পারি, এমন কিছু লাভ করতে পারি যার মূল্য অপরিসীম।

কুঁড়ে লোকের কোনরকম দর্শনের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন তাঁদের, যাঁরা কাজ করেন। সেই দর্শনটি শ্রীকৃষ্ণ সর্বদেশের, সর্বকালের মানুষকে উপহার দিয়েছেন। এই দর্শন সর্বজনীন; এর মধ্যে স্থান-কাল-পাত্রের বিচার নেই, নারী-পুরুষের ভেদ নেই, শিশু-বৃদ্ধের বৈষম্য নেই। যিনি যে অবস্থায় আছেন, যে কর্মে নিযুক্ত আছেন, সেই কর্মের মাধ্যমেই তিনি জীবনকে কেমন করে পরিপূর্ণ

করে তুলতে পারেন, এই দর্শনে সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সর্বজনীন শিক্ষার এই নির্যাসটি ফুটে উঠেছে এডুইন আর্নল্ড (Edwin Arnold) -এর বর্ণনায়। ইংরেজিতে গীতার যে অনুবাদ তিনি করেছেন, সেই গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'দ্য সঙ সেলেস্টিয়্যাল' (*The Song Celestial*)। কী অপূর্ব ভাবসমৃদ্ধ অনুবাদ—দিব্য সংগীত! সত্যিই তাই। এ এমন সংগীত যার দিব্য সুরমূর্ছনা বিশ্বের যেকোন প্রান্তের মানুষের হৃদয়ে অনুরণন জাগাবেই। শ্রীকৃষ্ণ সুরের জাদুকর। যখন তিনি কিশোর, তখন ব্রজবাসীদের প্রাণ মাতিয়েছিলেন তাঁর বাঁশির সুরে। সেই প্রথম। তারপর যখন তিনি বয়সে পরিণত হলেন, তখন শোনালেন গীতার মহাসংগীত। এই সংগীত পৃথিবীর সকল নরনারীকে এমন অনুপ্রাণিত করবে যে, কালে তাঁরা মহাকর্মী, মহাপ্রেমিক হয়ে উঠে মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবেন। গীতার বাণী এই ঐক্য ও সমন্বয়ের বাণী। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে এই বাণী তিনি অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিস্তার করেছেন। এখন আমরা সেই মহতী ব্যাখ্যার শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছি।

আগেই বলেছি, এই আলোচনা শেষ হবে একটি *চরম* শ্লোকের মধ্য দিয়ে যার উপজীব্য অহং-বিসর্জন এবং ঈশ্বরের পাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগতি। সমাপ্তিপর্বে এসে পড়ার দরুণ, লক্ষ্য করলে এখন আমরা দেখতে পাব, শ্লোকের ভাষা কেমন যেন কোমল হয়ে এসেছে যা কৃপা ও শরণাগতির সৌরভে আমোদিত। সকলের বন্ধু, সকলের অন্তরাত্মা যে কৃষ্ণ, তাঁর কৃপা এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এর মধ্য দিয়ে একটি মহৎ ভাব ফুটে উঠছে। যেখানে আমরা দেখব 'আমিত্ব' বা 'আমি' ভাব সম্পূর্ণ মুছে যাচ্ছে, থাকছেন একমাত্র ভগবান। এর ফল শরণাগতি। আগে এই ভাব দেওয়া হয়নি কেন? দিলে হয়তো আমরা ভুল বুঝতাম। কিন্তু এখন আমরা যে অবস্থায় পৌছেছি তাতে বুঝতে পারছি, *এই অনুপম আত্মনিবেদন পরাজয় নয়, এটি যথার্থ জয়*। কাঁচা অবস্থায় আত্মসমর্পণ করা মানেই পরাজয় স্বীকার করা; তখন ঠিক ঠিক আত্মনিবেদনের ভাব আসতে পারে না। কিন্তু ভক্তির বর্তমান পরিণত অবস্থায় আত্মনিবেদনই জয়। পরের শ্লোকগুলিতে আমরা তা দেখতে পাব।

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি ।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

—'আমাতে চিত্ত অর্পণ করলে, আমার কৃপায় সব বাধা অতিক্রম করবে; কিন্তু অভিমানবশত আমার কথা যদি না শোন, [তুমি] বিনষ্ট হবে।'

এখানেও একই বিষয়ের আলোচনা চলছে। আগের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, শরীর দিয়ে কাজ করে যাও, কিন্তু *চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য,* 'মনের দ্বারা সব কর্ম আমাতে সমর্পণ করে।' শ্রীকৃষ্ণ আরো বলেছিলেন, *মচ্চিত্তঃ সততং ভব,* 'সর্বদা মনটিকে আমার সঙ্গে যুক্ত করে রাখ।' যিনি তা করেন, তাঁর কি হয়, এখানে শ্রীকৃষ্ণ সে কথা বলছেন। *মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি,* 'ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এমন ব্যক্তি জীবনের সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যান।' অর্থাৎ মন ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সব সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। *সর্বদুর্গাণি,* এই কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলেছেন, *দুর্গ* মানে দৈনন্দিন জীবনের বাধাবিঘ্ন। বাস্তবিক, *সংসারে* প্রত্যেককেই বহু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সেসব সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে শক্তি চাই। সেই শক্তি দেবার জন্যই এখানে বলা হচ্ছে—ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাও। তা হতে পারলে দেখব আমাদের ভিতর প্রচণ্ড শক্তি আসছে। সাধারণ ব্যাঙ্ক 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' থেকে প্রয়োজনমতো প্রচুর টাকা তুলতে পারে বলে কেউ ব্যাঙ্কের কোন ক্ষতি করতে পারে না। কেন? তার কারণ, তার পিছনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শক্তি কাজ করছে। ঠিক সেইরকম, অনন্ত ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে পারলে আমাদের শক্তির ভাণ্ডারে ঘাটতি পড়বে না। *মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি,* 'আমার কৃপায় তুমি সব বিঘ্ন কাটিয়ে উঠবে।' তুমি যেহেতু আমার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছ, সেইহেতু জীবনের সব ওঠাপড়া, সব ঢেউ কাটিয়ে উঠবে। *দুর্গ* শব্দটির আরো অর্থ আছে। একটি অর্থ হলো 'কেল্লা' বা 'গড়'। আবার *দুর্গ* বলতে দুর্গম স্থানকেও বোঝায়। সর্বোপরি মা দুর্গা তো আছেনই। যিনি সকল *দুর্গ* অর্থাৎ দুর্গতি নাশ করেন, তিনিই 'দুর্গা'।

শ্রীকৃষ্ণ একথা বলছেন, তার কারণ প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে অর্জুন বলেছিলেন, 'আমি যুদ্ধ করব না।'। অর্জুনকে পরিস্থিতিটি বোঝাবার জন্য এবং তাঁকে কর্তব্যপালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তাঁর উপদেশ শুরু করেছিলেন। এখানে আমরা সেই আগের কথাতেই ফিরে আসছি। শ্রীকৃষ্ণ এখানেও বলছেন, *অথ চেৎ ত্বম্ অহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি,* 'অভিমানবশত তুমি যদি আমার কথা না শোন তাহলে তুমি বিনষ্ট হবে।' এই কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সাবধান করে দিচ্ছেন। তিনি যেন ঠারে ঠোরে বলছেন, হে অর্জুন, তোমার প্রবল অভিমান হয়তো বলছে—'এসব উপদেশ আমি মানব না।' তা বেশ, সে তোমার সিদ্ধান্ত। তবে, আমার কথা না শুনলে তুমিই মুশকিলে পড়বে, জীবন-সমুদ্রে তলিয়ে যাবে। *বিনঙ্ক্ষ্যসি* মানে, 'তুমি

ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে'। খুব সত্যি কথা। যা করা উচিত, তা না করলে আপনিই ভুগবেন। কিন্তু প্রশ্ন—আমাদের এই দুর্মতি হয় কেন? হয়, তার কারণ আমাদের উগ্র অভিমান বা আমিত্ববোধ। আমাদের কিছু বাঁধাধরা পছন্দ অপছন্দ থাকে যা আমরা কোনমতেই ছাড়তে পারি না। এগুলির জন্ম আমিত্ববোধ থেকে। এর ফলে আমরা অন্যের মতামত গ্রাহ্য করি না। কিন্তু অন্যের মতামত শোনারও দরকার আছে। এটি মহৎ গুণ। আমাদের সব প্রাচীন শাস্ত্রই বলছে—শুনতে শেখ। সর্বদা নিজেই কথা বলো না। বাস্তবিক, অন্যের কথা ধৈর্যসহকারে শোনা একটা চারিত্রিক বৈভব। বহু মানুষ আছেন যাঁরা কারো কথা শুনতে চান না। তাঁদের ভাব—আমিই বলব, আমিই উপদেশ বা নির্দেশ যা দেবার দেব, তোমরা শুনবে। না, এটা ঠিক নয়; অন্যের কথাও শুনতে হয়। না হলে আমরাই বিপদে পড়ব। তাহলে দেখা যাচ্ছে, উদগ্র আমিত্বই মানুষে-মানুষে দূরত্ব রচনা করে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যুক্ত হতে দেয় না। এই আমিত্বকে তাই ক্ষীণ করে ফেলতে হবে, ক্রমশ দুর্বল করতে হবে। তাহলেই আত্মা আপন মহিমায় প্রকাশ পাবেন। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বোচ্চ শিক্ষাই এই ঃ আমিত্বকে অতিক্রম কর। কেবল শৈশবেই আমিত্বকে পুষ্ট করা ভাল; কিন্তু তারপর থেকে ঐ আমিত্বের মেদ ঝরানোই আমাদের প্রধান কাজ। আমিত্বের ঐ বোঝা আমাদের জীবন এতদূর দুর্বিষহ করে তোলে যে আমরা কিছুতেই আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারি না। ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা বলতে গিয়ে এই আমিত্ব-বর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা আগেও বহুবার আলোচনা করেছি। 'ব্যক্তি' থেকে 'ব্যক্তিত্বে' রূপান্তরিত হতে হবে আমাদের এবং তা আমরা তখনই হতে পারব যখন আমরা অন্যের ভাবনা ভাবতে শিখব, যখন সকলের প্রতি আমাদের ভালবাসা আসবে। তা না হলে সকলের সঙ্গে আমাদের ঠোকাঠুকি হবে। তাই অহংবোধকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শৈশবে পুষ্ট করে, বড় হয়ে আবার তাকেই মুছে ফেলা। চরিত্র বিকাশের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় পর্যায়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, 'আমার কল্যাণকর উপদেশ যদি না শোন, তুমি তোমার সর্বনাশই ডেকে আনবে।' শ্রীকৃষ্ণ পরে বলবেন, 'আমি তোমাকে আদেশ করছি না, কেবল সদুপদেশ দিচ্ছি। কি করবে তা তুমিই ঠিক কর।' ভেবে দেখুন, ভগবান স্বয়ং, তিনিও আদেশ করেন না!

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে ।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

—'অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে যদি তুমি ভাব, 'যুদ্ধ করব না', তবে তোমার এই সংকল্প বৃথা; তোমার প্রকৃতিই তোমাকে বাধ্য করবে।'

যৎ অহঙ্কারম্‌ আশ্রিত্য, 'যদি তুমি অহংকার আশ্রয় করে' কারো উপদেশে কর্ণপাত না কর এবং *ইতি মন্যসে,* 'এরকম মনে কর'; *ন যোৎস্যে,* 'যুদ্ধ করব না'; *মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে,* 'তোমার সেই সংকল্প বৃথা'। কেন? কারণ, *প্রকৃতিঃ ত্বাং নিযোক্ষ্যতি,* 'তোমার [ক্ষত্রিয়] প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধ করাবে।' অর্থাৎ যুদ্ধ করাই তোমার প্রকৃতি, সেই রজোগুণই তোমাকে কর্মে প্রবৃত্ত করবে। আমি এমন বহু মানুষ দেখেছি যাঁরা সংসার ছেড়ে তীর্থে গেছেন ঈশ্বরচিন্তা করবেন বলে। কিন্তু ও মা! অচিরেই তাঁরা সেইখানে নতুন সংসার ফেঁদে বসেছেন! এরকমই হয়। কারণ ভিতরে তো *রজোগুণ* গজগজ করছে। একটা সংসার ছাড়লে হবে কী? আরেকটা গজিয়ে উঠবে। এইরকম মর্কটবৈরাগ্যধারী এক স্বামীকে তাঁর স্ত্রী বলছেন, 'সাধু হয়ে তো তোমাকে পাঁচবাড়ি থেকে ভিক্ষে করে খেতে হবে; তা এখানে থাকলে তো তুমি সবকিছু এক বাড়ি থেকেই পেয়ে যাবে!' অভ্রান্ত যুক্তি! কারণ *রাজসিক সংস্কার* নিয়ে বনে গেলে সেখানেও আপনি নতুন সংসার পেতে ফেলবেন। *সংসার* আপনার মনের ভিতরে রয়েছে, ফলে যেখানেই যাবেন সেখানেই আপনি *সংসার* পাতবেন। তাই, এই প্রবণতার মোকাবিলা এখানে থেকেই করা ভাল নয় কি? এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'তোমার প্রকৃতি অতিমাত্রায় রাজসিক—কর্ম ও আধিপত্য করার প্রেরণা তোমার মধ্যে প্রবল'। তা যদি হয়, তবে সেই প্রবণতাকে দশের কল্যাণে, জাতির সেবায় কাজে লাগাও। সেটিই হবে রাজসিক প্রবণতার সদ্ব্যবহার। *মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে,* 'তোমার সংকল্প একেবারেই অর্থহীন'। এ বৃথা সংকল্প। কারণ, *প্রকৃতিঃ ত্বাং নিযোক্ষ্যতি,* 'তোমার নিজস্ব *প্রকৃতি* বা *স্বভাব* তোমাকে বাধ্য করবে'। প্রকৃতি যে বাধ্য করে, এই অমূল্য শিক্ষা পাশ্চাত্যও মানে। তাছাড়া এতো আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা! আপনি হয়তো কোন কাজ এড়াতে চাইছেন, কিন্তু দেখবেন, প্রকৃতি ঠিক আপনাকে ঐ কাজ করতে বাধ্য করবে। আমরা সকলেই *স্বভাব* বা 'প্রবণতার' দাস। ভিতরকার এই ব্যাপারটা আমাদের বুঝতে হবে, বিবেচনা করতে হবে। না হলে শুধু বাইরে ত্যাগ করলুম—ওতে কিছু হবে না; কারণ ঐ প্রবণতা তো ঘুরে ফিরে আবার আসবে। একজন লেখক বেশ বলেছেন—'প্রকৃতিকে গলাধাক্কা দিয়ে দরজার বার করে দিন, দেখবেন সে ঠিক জানলা দিয়ে আবার ঢুকে পড়েছে।' তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন। তাই ভেবেচিন্তে, যুক্তির সাহায্য নিয়ে এই প্রবণতার মোড় ঘুরিয়ে

দিতে হবে, এই শক্তিকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে হবে। তবে এ কাজ সময় সাপেক্ষ। ধীরে ধীরে করতে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা ।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥

—'হে কুন্তীপুত্র, মোহবশত যা করতে ইচ্ছা করছ না, স্বভাবজাত কর্ম দ্বারা বদ্ধ হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা করতে বাধ্য হবে।'

নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা, সকলেই 'নিজ কর্মের নিগড়ে বাঁধা'। কীরকম কর্ম? *স্বভাবজেন,* যা 'স্বভাবজাত'। অর্থাৎ আমার *স্বভাব* আমার কর্ম নির্ধারণ করে দেবে। *স্বেন স্বভাবজেন কর্মণা,* 'স্বভাবজাত কর্ম দ্বারা' আমরা বাঁধা। অতএব, *কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ,* 'মোহের বশে যদি তুমি সে কাজ না করতে চাও'; তাহলে কী হবে? *করিষ্যসি অবশোঽপি তৎ,* 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাকে সে কাজ করতে হবে'। তুমি চাও আর নাই চাও, তোমার প্রকৃতিই তোমাকে ঐ কাজ করতে বাধ্য করবে। স্বভাবের এত জোর! সে তোমার সম্মতির ধার ধারবে না। *অবশঃ* কথাটির অর্থ, 'অসহায়ভাবে'। অসহায়ভাবে কর্ম করার চাইতে, জেনে বুঝে করাই তো ভাল। কাঠ চেরাই করার সময় তার গায়ের রেখা বরাবর চেরাই করলেই কাজটা সহজ হয়। সেরকম, আমাদের সংস্কারটি নিজেদেরই খুঁজে বার করতে হবে এবং তারপর সেই বরাবর চলা। শ্রীকৃষ্ণ এখানে আর একবার অর্জুনকে একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কী সেই সত্য? শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তোমার ক্ষত্রিয়ের সংস্কার। কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই তোমার স্বভাব। এই স্বভাবের শৃঙ্খলে তুমি বাঁধা। এই যে বাস্তব পরিস্থিতি, একে মোহবশত অস্বীকার করো না।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

—'হে অর্জুন, পরমেশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে, তাঁর মায়ার দ্বারা সকল জীবকে (যেন) যন্ত্রে চাপিয়ে ঘোরাচ্ছেন।'

আগে সপ্তম এবং নবম অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত এই অমৃতবাণী আমরা পেয়েছি। এখানেও আবার তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই ভগবান লুকিয়ে আছেন। বেদান্ত যে ঈশ্বরের কথা বলে,

তিনি আকাশে থাকেন না; তিনি আছেন সকলের হৃদয়ে। *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি,* 'অর্জুন, সকল জীবের হৃদয়েই পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান।' বলা হয়েছে *সর্বভূতানাং,* 'সব জীবের', এমনকি কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়, জীবজন্তু—সকলের। কিন্তু মানুষ ছাড়া আর কোন জীব এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। মানুষের সঙ্গে এইখানেই তাদের তফাত। ঈশ্বর কোথায় আত্মগোপন করে আছেন? মানব-ব্যক্তিত্বের নিভৃততম প্রদেশে। ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক হলে আমরা এই সত্য বুঝতে পারব। শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে বলা হয়েছে, *ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া,* 'তাঁর মায়ার দ্বারা তিনি যেন সকল জীবকে যন্ত্রে চাপিয়ে ঘোরাচ্ছেন।' অর্থাৎ ঈশ্বর সকলের জীবন ও কর্মকে এমনভাবে পরিচালনা করছেন যে মনে হয় জীব যেন যন্ত্রে আটকানো একটা পাখি—যন্ত্রও ঘুরছে, সেই সঙ্গে পাখিটাও ঘুরছে। যন্ত্র পাখিটাকে আবর্তিত হতে বাধ্য করছে; এ ব্যাপারে পাখির কিছু বলার নেই। ঠিক সেরকম, আমরাও ভাবি আমরাই সব কাজকর্ম করছি। প্রকৃতপক্ষে তা কিন্তু নয়; আমাদের কর্মের পিছনে সক্রিয় ঈশ্বরের শক্তি। ঈশ্বরই আমাদের ভালমন্দ নানা ধরনের কাজ করান। কিন্তু এই বোধ শিশুর আসে না। সে সবে হাঁটতে শিখছে। তাই তাকে প্রথমে বলতে হবে—আত্মনির্ভর হও; কঠোর পরিশ্রম করে নিজের ভাগ্য নিজে গড়। প্রথম পর্যায়ে *পুরুষকার* বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ওপর জোর দেওয়া হয়: ঈশ্বরকে তখন আমরা সামনে আনি না। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলতেন, 'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'। অর্থাৎ তুমি আমাকে যেমন করাও আমি তেমনি করি। এ একেবারে শেষের কথা। উচ্চতম আধ্যাত্মিক চেতনায় সম্পৃক্ত না হলে এ কথা আমরা বলতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটি গান গাইতেন। 'কথামৃতে' পাবেন। গানটি এই ঃ *'তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি'।* অর্থাৎ হে ঈশ্বর, যা করার তুমিই কর, কিন্তু লোকে তা বলে না। লোকে বলে 'আমিই সব করছি'। কিন্তু সত্য হলো, তিনি অর্থাৎ ঈশ্বরই সব, আমি কিছু নই। অধ্যাত্মজীবনে সাধকের হৃদয়ে যে সুরটি সব শেষে ধ্বনিত হয় তা হলো—'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক'। শরণাগতিই অধ্যাত্মজীবনের শেষ কথা। সেন্ট পল বলতেন, 'আমি নই, ক্রাইস্ট, যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন', তিনিই সব। কিন্তু এই ভাব কখন আসে? কখন এই সত্য উপলব্ধি করা যায়? যখন আমাদের আমিত্ব বোধটি ঠিক ঠিক পরিপক্ক হয়, সংযমের আগুনে শুদ্ধ হয়। জীবনের প্রথম পর্বে

পুরুষকার ও শক্তির পাঠ নিতে হবে। তারপর অধ্যাত্মজীবনের চরম পর্যায়ে পৌঁছালে প্রকৃত সত্যটি আমরা উপলব্ধি করি এবং বলি—আমি নই, তুমি; হে ঈশ্বর, তুমিই সব। এখানে গীতায় সেই সত্যটিই বলা হচ্ছে, যা ইতঃপূর্বে বলা হয়নি। একাদশ অধ্যায়ের ৩৩তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখিয়ে বলেছিলেন—*তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্*, 'অর্জুন, উঠে দাঁড়াও; শত্রুদের জয় করে যশলাভ কর এবং সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর।' ওখানে শ্রীকৃষ্ণ ঐ কথা বলেছেন। কিন্তু এখন তিনি নতুন একটি সুর ধরেছেন এবং বলছেন—'তুমি কিছুই নও, যে ঈশ্বর তোমার ভিতর আছেন, তিনিই সব।' অর্থাৎ—তোমার নিজস্ব কোন শক্তি ও স্বাধীনতা নেই। স্বাধীনতা যে একেবারে নেই তা নয়, *আছে*, তবে সে স্বাধীনতা সীমিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দর একটি উপমা দিয়ে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলছেন ঃ মনে কর একটা গরুকে ৩০ ফিট লম্বা দড়ি দিয়ে একটা খোঁটার সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো। এক্ষেত্রে গরুটা ৩০ ফিটের মধ্যে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করে ঘাস খেতে পারবে; কিন্তু তার বাইরে সে এক পা যেতে পারবে না। পারবে, যদি রাখাল এসে দড়িটাকে আরো লম্বা করে দেয় অথবা তাকে ঠাঁইনাড়া করে অন্যত্র বাঁধে। তেমনি আমাদেরও স্বাধীনতা আছে, তবে সীমিত; সে সীমার বাইরে গিয়ে কিছু করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের অবস্থানের পরিবর্তন এবং স্বাধীনতার পরিমাণের হেরফের ঘটাতে পারেন একমাত্র ঈশ্বর, যিনি তাঁর শক্তি দিয়ে জগৎ চালাচ্ছেন। যাঁরা মননশীল, তাঁদের মনে ধীরে ধীরে এই সত্যটি ভেসে ওঠে। তাঁরা বুঝতে পারেন, মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং দৃশ্যমান এই জগতের পিছনে এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করে চলেছে। শ্রীকৃষ্ণ এখন সেই বোধটিই অর্জুনের মধ্যে জাগানোর চেষ্টা করছেন। সেই সঙ্গে আমরাও এই শিক্ষার পরিপূর্ণ রূপটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে বুঝতে পারব যে, পুরুষকার, শক্তি, সাহস, চরিত্রবল সবকিছুই শেষপর্যন্ত পর্যবসিত হয় এক গভীর অসাধারণ অনুভূতিতে, যার নাম *শরণাগতি*। এই শরণাগতির ভাব এলে আমরা বলে উঠব—'আমি নই, তুমি'। হে প্রভু; তুমিই একমাত্র বস্তু, আমি তোমার সন্তান ছাড়া আর কিছু নই। ভগবানের কাছে আমরা সব শিশু হয়ে যাই। শিশু আর কী করতে পারে? তার কতটুকু ক্ষমতা? যা করার বাপ-মাই করেন।

ইংরেজ কবি টেনিসন জীবনের রহস্য ব্যক্ত করতে গিয়ে যা বলেছেন, তার তর্জমা করলে এই দাঁড়ায় ঃ

কিন্তু কে আমি? নির্বল
নিতান্ত শিশু এক কাঁদছি আঁধারে,
পেতে চাই উজ্জ্বল আলোকশিখারে।
ভাষাহীন, অশ্রুসজল!

মহাত্মারা, ঋষিরা, অধ্যাত্মজীবন যাপন করে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঈশ্বর দূরে নন। তাঁর নিবাস *আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে*। পরবর্তী শ্লোকে এই চরম বাণীর অনুরণন শোনা যাবে।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥

—'হে ভারত [অর্জুন], সর্বতোভাবে তাঁরই শরণ নাও; তাঁর কৃপায় [তুমি] পরম শান্তি [এবং] শাশ্বত পদ পাবে।'

তমেব শরণং গচ্ছ, 'একমাত্র তাঁরই শরণাগত হও'। কীভাবে? *সর্বভাবেন ভারত,* 'হে অর্জুন, সর্বতোভাবে'। এব্যাপারে কোন আপোস নেই; কোনরকম কুণ্ঠা রাখলে চলবে না। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে, মন-মুখ এক করে বলতে হবে, 'আমি নই, আমি নই, আমি নই—হে প্রভু, তুমিই সব, তুমিই সর্বস্ব!' কী অপূর্ব শিক্ষা! খ্রিস্টান ধর্মই হোক, বৌদ্ধধর্মই হোক, ইসলামই হোক অথবা আমাদের হিন্দুধর্মই হোক, সর্বত্রই দেখবেন চরম শিক্ষাটি হলো এই *পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের শিক্ষা,* শরণাগতির শিক্ষা। আমি কিছুই নই, ঈশ্বরই সব—এই ভাব। শরণাগতির এই ভাব এলে তবেই মানুষ মুক্ত হতে পারে। কারণ তখন তো আর আমিত্ব নেই। আমিত্ব চলে গেছে, জেগে আছেন শুধু ঈশ্বর। অদ্বৈতেও তাই হয়—জীবাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়, অভিন্ন হয়ে যায়। ভক্ত প্রথমে 'আমি', 'আমি' দিয়ে শুরু করেন বটে, কিন্তু শেষমেশ তাঁর এই 'আমি'-ভাব লুপ্ত হয়ে যায়, ঈশ্বর ছাড়া তাঁর মধ্যে আর কিছুই থাকে না। এই উপলব্ধির ফলেই তাঁর সব কষ্ট ও দুঃখের অবসান হয়।

তাই এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *তম্ এব শরণং গচ্ছ,* 'তাঁরই শরণাগত হও'; *সর্বভাবেন,* 'সব দিক থেকে'। সর্বতোভাবে এই আত্মসমর্পণের শিক্ষা উচ্চাঙ্গের সব ধর্ম উপদেশেই পাওয়া যায় এবং সেই শিক্ষা অনুসরণ করে বহু সাধক সিদ্ধ হয়েছেন।

তৎপ্রসাদাৎ, 'তাঁর কৃপায়'; *প্রাপ্স্যসি,* 'তুমি পাবে'; *পরাং শান্তিং,* 'পরম

শান্তি'; এবং *স্থানং*, মুক্ত পুরুষের 'উন্নত পদ' বা অবস্থা। অর্থাৎ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। *শাশ্বতম্*, এই যে অবস্থা, তা 'নিত্য'। এই যে মুক্ত অবস্থা, তা একবার লাভ করলে আর হারায় না; আপনি সর্বদাই মুক্ত, সব বন্ধন আপনার খসে গেছে। এই হলো আত্মসমর্পণের ফলশ্রুতি। কিন্তু এই আত্মসমর্পণ কার কাছে? আমাদের মধ্যে, সকলের মধ্যে যে উচ্চতম সত্তা বা পরমাত্মা আছেন, তাঁরই কাছে। তাঁর কাছ থেকেই আমরা এসেছি, আমাদের ক্ষুদ্র ভূমিকাটি পালন করে আবার সেই সত্তার কাছেই আমরা ফিরে যাই। এই হলো প্রকৃত অর্থে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অর্থাৎ নিজেকে ফিরে পাওয়া, স্বরূপত আমি যা, তাই হয়ে যাওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি কবে মুক্ত হব?' তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। অর্থাৎ 'আমিত্ব'-ভাব ঘুচলেই তুমি মুক্ত হবে। আমিত্ব থেকে মুক্তিই মুক্তি। কী অমোঘ সত্য!

এ এক বিরাট বিষয়। 'ডিভাইন গ্রেস' *(Divine Grace)* নামে আমার যে ছোট একখানা বই আছে, তাতে আমি এটি বিশদ্ভাবে আলোচনা করেছি। সে যাই হোক, এতক্ষণ যে আলোচনা হলো, তাতে দেখা গেল আমরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দিয়েই জীবন আরম্ভ করি। তারপর আসে 'আমি', 'আমি' ভাব—অর্থাৎ আমি কর্তা, আমিই সবকিছু করছি, এই মনোভাব। সবশেষে আমরা টের প'ই, 'আমি নই, আমি নই, তিনিই সব—তিনি ছাড়া আর কিছুই নেই।' ধর্ম জীবনের এইটিই অন্তিম কথা। ঈশ্বরের কৃপাতেই এই অনুভূতি হয়। তখন আমরা পুরোপুরি ঈশ্বরের কৃপার ওপর নির্ভরশীল, কৃপার মাধুর্য দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে বহু সুন্দর সুন্দর শ্লোক আছে, বহু কবিতা আছে। সেখানে দেখা যায় 'আমিত্ব' ভাবটি সম্পূর্ণ মুছে গেছে। এটি উচ্চ অবস্থা। কিন্তু সকলেই মানসিক ক্রমবিবর্তনের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এই অবস্থা লাভ করতে পারে।

আমাদের একটা ইচ্ছাশক্তি আছে। সে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আমরা জগতের উপর কর্তৃত্ব করতে চাই, তার জন্য হাজার লড়াই করি। কিন্তু একটা সময় আসে যখন আমরা অনুভব করি যে, আমাদের এই তুচ্ছ ইচ্ছাকে পরমেশ্বরের 'পরম ইচ্ছার' কাছে সমর্পণ করতে হবে, আমাদের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার মধ্যে মিলিয়ে দিতে হবে। কেবল ধর্মকেন্দ্রিক মরমিয়া সাহিত্যেই নয়, ইংরেজি, জার্মান বা অন্যান্য সাহিত্যেও এই ভাবটি মূর্ত হয়েছে। একটি ইংরেজি

কবিতায় বলা হয়েছে ঃ 'আমাদের ইচ্ছাশক্তি বটে; শুধু আমরা জানি না কি করে সে ইচ্ছাকে তোমার ইচ্ছায় পরিণত করে নিতে হয়।' এটিই পরিণত বোধ, যা একাধারে শুদ্ধ ও সুন্দর। এটিই গীতার অন্তিম সুর। দু-তিনটি শ্লোক পরে শ্রীকৃষ্ণ আরো একটু উদাত্ত স্বরে এই সত্যের পুনরাবৃত্তি করবেন।

পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলবেন ঃ 'দেখ, আমি আমার কর্তব্য করেছি; আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। তুমি এখন তা গ্রহণ করতে পার, আবার বর্জনও করতে পার। সে তোমার ইচ্ছা।' দেখুন, শিক্ষা দেবার কী অপূর্ব পদ্ধতি, বিশেষ করে শিষ্য বা ছাত্র যখন তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। তাকে পরনির্ভরশীল বা অনুগ্রহের পাত্র হিসাবে দেখা হচ্ছে না। তার সঙ্গে সম্মানসূচক আচরণ করা হচ্ছে, কারণ সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শ্রেষ্ঠ আচার্যরা এইরকমই হন। তাঁরা ছাত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। গ্রহণ বা বর্জনের দায়িত্ব তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের ওপরই ছেড়ে দেন।

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া ।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

—'এই গুহ্য থেকে গুহ্যতর জ্ঞান আমার দ্বারা তোমাকে কথিত হলো; এটি আদ্যন্ত বিচার করে যা তোমার ইচ্ছা, তা কর।'

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'অর্জুন, আমি তোমাকে *জ্ঞানম্* অর্থাৎ জ্ঞান দিলাম। জ্ঞান-এর প্রকৃত অর্থ দর্শন বা প্রজ্ঞা। ইংরেজিতে দর্শনকে বলা হয় 'ফিলজফি'। তারও অর্থ প্রজ্ঞা। মূলত ওটি গ্রীক শব্দ। গ্রীক ভাষায় 'সোফিয়া' (sophia) শব্দের মানে প্রজ্ঞা। শ্রীকৃষ্ণ যেন বলতে চাইছেন, অর্জুন আমি তোমার হাতে জ্ঞানের প্রদীপটি তুলে দিয়েছি, এখন সেই আলোয় তুমি তোমার পথ খুঁজে নাও। *জ্ঞানের* ধর্মই আলো দেওয়া। অজ্ঞানতার অন্ধকারে আমরা ভুল করে বসি, খানা-খন্দে পড়ি। কিন্তু সঙ্গে *জ্ঞান* বা আলো থাকলে গর্তে পড়তে হয় না। তাই আমরা জ্ঞানের পিয়াসী, আমরা *জ্ঞানালোক* বা জ্ঞানের আলো চাই। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন—*ইতি তে জ্ঞানম্ আখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া,* 'আমি তোমাকে গুহ্য থেকে গুহ্যতর জ্ঞানের কথা বলেছি।' গুহ্য মানে 'খুব গভীর'; কিন্তু যে জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ দিলেন তা গভীরতর।

বিমৃশ্যৈতদ্ অশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু। এই কথার মধ্যেই অলোকসামান্য আচার্যের মনোভাবটি ফুটে উঠেছে। তিনি বলছেন, 'আমি যা বলেছি তা বিচার

করে তুমি *নিজেই* তোমার কর্মপন্থা নির্ধারণ কর।' আদর্শ শিক্ষক কখনও হুকুম করে ছাত্রকে বলেন না—তুমি এটা কর। তিনি আপনাকে কোন্‌টি ঠিক আর কোন্‌টি বেঠিক, কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা, তা এমনভাবে বুঝিয়ে দেবেন যে আপনার মন তা ঠিক বুঝে নেবে। তারপর আপনার সিদ্ধান্ত আপনি নেবেন। কোন জোরাজুরি নেই, তাঁর কথা মেনে নেওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা আপনার নেই। এটিই ঠিক ঠিক দর্শন, যেখানে কোনরকম ফতোয়া দেওয়া নেই, একই আচরণ করতে মানুষকে বাধ্য করা হয় না। যিনি সংস্কৃতিবান মানুষ, তাঁকে সত্যটা একটু ধরিয়ে দিলেই হলো; তখন তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণও তাই এখানে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্জুনকে বললেন—'তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর।'

এখানে ভারতীয় অধ্যাত্মশিক্ষাদানের ধরনধারণের একটু আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত, শিক্ষক অযাচিতভাবে কাউকে উপদেশ দেন না। বিনামূল্যে অধ্যাত্ম উপদেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু কী সেই মূল্য? অধ্যাত্ম পিপাসা। এটি থাকতে হবে। আচার্যের কাছে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে চাইতে হবে। নাহলে উপদেশের কোন দাম থাকে না। এই শ্লোকে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে সেই ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে এরই পরিপূরক আর একটি ভাব আমরা পেয়েছি। সেখানে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন, 'অনুগ্রহ করে আমার সমস্যার ওপর আপনি একটু আলোকপাত করুন। আমি আপনার সাহায্য ও পথনির্দেশ চাই। আমি আপনার শিষ্য।' তিনি বলছেন, *কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাবঃ,* 'যুগপৎ আসক্তি ও অনীহায় আমি অভিভূত' এবং *ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ,* 'কর্তব্য বিষয়ে আমার মন বিভ্রান্ত'; তাই, *পৃচ্ছামি ত্বাং,* 'আপনাকে প্রশ্ন করছি।' *যচ্ছ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে,* 'আমার পক্ষে যা মঙ্গলকর, তা নিশ্চয় করে বলুন।' শেষে অর্জুন বলছেন, *শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্,* 'আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দিন।' অর্জুন বলছেন, আমার বুদ্ধি কাজ করছে না। আপনার প্রজ্ঞাই আমাকে পথ দেখাতে পারে। তাই, অনুগ্রহ করে আমাকে উপদেশ দিন।

এই (২/৭) শ্লোকটি থেকেই প্রকৃতপক্ষে গীতার শিক্ষা শুরু হচ্ছে। ঐ শ্লোকের আগের ছটি শ্লোক এবং প্রথম অধ্যায়ের সবকটি শ্লোক গীতার অংশ হলেও, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক থেকেই গীতার যে শিক্ষা, তার শুভারম্ভ। কেন? তার কারণ এখানেই অর্জুনের ব্যাকুল হৃদয়ে প্রশ্ন জেগেছে, যা তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিবেদন করেছেন। শিক্ষক তখনই উপদেশ শুরু করেন যখন

তিনি দেখেন শিষ্য তাঁর কথা শোনার জন্য এবং তা মেনে চলার জন্য উৎসুক ও প্রস্তুত। সেই কারণেই ভারতীয় অধ্যাত্ম পরম্পরায় দেখা যায়, কেউ ধর্মজগতের কোন প্রজ্ঞাবান মানুষের কাছে গেলেই যে তিনি গুরুগম্ভীর অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ শুরু করে দেবেন তা নয়। তিনি হয়তো ওসবের ধার কাছ দিয়েই যাবেন না। যতক্ষণ না আমরা আন্তরিক প্রশ্ন করছি এবং তাঁর উত্তরের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছি, ততক্ষণ তিনি মুখ খুলবেন না। এবং যদি খোলেনও, হয়তো আবহাওয়া বা অনুরূপ কোন বিষয়ে কথা বলবেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ যেমন অসাধারণ, তেমনি শঙ্করাচার্যের ভাষ্যটিও। সেখানে শঙ্করাচার্য বলছেন, *শাস্ত্রং জ্ঞাপকং ন তু কারকম্,* '*শাস্ত্র* বা বিজ্ঞান কেবল তথ্য সরবরাহ করে, কর্ম সম্পাদনে বাধ্য করে না।' তা *কারকম্* নয়। তা শুধু বলে : তোমাকে সত্য বলে দিলাম, এখন তোমার প্রবণতা অনুযায়ী এই সত্য জীবনে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা কর। আধুনিক বিজ্ঞানও বলে : এই এই খাদ্য খেলে আপনার শরীর ভাল থাকবে এবং এই এই খাদ্য আপনার শরীরের অনিষ্ট করবে। এটি তাই *জ্ঞাপকম্* । বিজ্ঞান আপনাকে কোন খাদ্য গ্রহণ বা বর্জন করতে বাধ্য করে না। তা আপনার উপর নির্ভর করছে— আপনিই ঠিক করুন কি খাবেন বা না খাবেন। তাই সব জ্ঞানই *জ্ঞাপকম্।* তথ্য কোন একটি বিষয় আপনাকে অবহিত করে; কিন্তু সেই জ্ঞান আপনি ভাল বা মন্দ, কি কাজে লাগাবেন, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার অন্তরের তাগিদ বা মানসিক অবস্থার ওপর। এখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য অর্জুনকে স্বাধীনতা দিয়ে বলছেন—আমার যা উপদেশ দেওয়ার দিয়ে দিলাম, এখন তুমি সব দিক বিবেচনা করে যা উচিত মনে কর, তাই কর। এই শ্লোকের এইটিই তাৎপর্য।

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

—'আমার গভীরতম বাক্য আবার শোন; যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেই হেতু তোমার যা হিতকর তা বলব।'

শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, আমি এখন তোমাকে গুহ্যতম সত্য বা রহস্যটি বলব। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি যা বলেছেন তা ছিল *সর্বগুহ্যতরং;* এবার তিনি যা বলবেন, তা *সর্বগুহ্যতমম্।* দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনামূলকভাবে কোন্‌টি ভাল, তা বোঝাতে আমরা তরম্ প্রত্যয়টি ব্যবহার করি এবং তমম্ প্রত্যয়ের ব্যবহার

চরম বা পরম এই অর্থে। এখানে *গুহ্যতমং* শব্দের অর্থ গভীরতম বা পরম রহস্যজনক। *শৃণু মে পরমং বচঃ,* 'আমার পরম বাক্য শোন'। কেন? *ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্,* 'তুমি আমার অতি প্রিয়, তাই তোমার পক্ষে যা হিতকর তা বলছি।'

কঠ উপনিষদ্-এ *প্রেয়* বা 'সুখকর' এবং *শ্রেয়* বা 'হিতকর', এই দুয়ের পার্থক্য বিচার করা হয়েছে। যা আপাতমধুর বা সুখকর তা সবসময় হিতকর নাও হতে পারে। সুতরাং *হিতম্* এবং *প্রিয়ম্,* এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। *শ্রেয়ঃ* মানে সেই বস্তু 'যা আমাদের জীবনের উত্তরণ ঘটাবে বা জীবনকে উন্নত করবে।' কিন্তু *প্রেয়ঃ* তা নয়। যা 'সুখকর', আকর্ষণীয়, উদ্দীপক বা মনোহর, তাই হলো *প্রেয়ঃ* । তাই সাবধান, আমরা যেন *প্রেয়ঃ*-র পিছনে না ছুটি। ছুটতে হলে *শ্রেয়ঃ*-র দিকে ছোটাই মঙ্গল, কারণ তা আখেরে আমাদের কল্যাণ করবে। গীতায় এখানে *হিতম্* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ 'আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা হিতকর'। *ইষ্টোঽসি মে,* 'তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়'; তোমার কথা আমি চিন্তা করি। তাই *বক্ষ্যামি তে হিতম্,* 'তোমার পক্ষে যা কল্যাণকর তা বলব'। সেই হিতকর কথা শ্রীকৃষ্ণ পরের দুটি শ্লোকে বলবেন।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥

—'আমার চিন্তায় তোমার মনকে ডুবিয়ে দাও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর, আমাকে প্রণাম কর। তাহলে তুমি আমার কাছেই আসবে; তোমার কাছে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করছি, [কারণ তুমি] আমার প্রিয়।'

ঈশ্বর স্বয়ং এখানে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। সেই মানুষটির নাম অর্জুন। বড় মধুর, রসঘন এই সংলাপ! কী বলছেন? *মন্মনা ভব,* 'তোমার মনটি আমার সঙ্গে যুক্ত হোক', অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে; *মদ্ভক্তো,* 'আমার ভক্ত হও'; অর্থাৎ ঈশ্বরই তোমার প্রেমের পাত্র হোক, কারণ তিনিই মুখ্য, বাকি সবকিছু গৌণ। *মদ্‌যাজী,* 'যা কিছু যাগযজ্ঞ বা অনুষ্ঠান করবে, আমাকেই তাদের পরম লক্ষ্য কর'; *মাং নমস্কুরু,* 'আমাকে প্রণাম কর'। অর্থাৎ, শিশু যেমন তার বাপ-মাকে প্রণাম করে, আমরাও তেমনি জগতের পরম শক্তি পরমেশ্বরকে যেন প্রণাম করি। *মাম্ এব এষ্যসি,* 'তাহলে তুমি আমাকেই পাবে'; *সত্যং তে প্রতিজানে,* 'আমি তোমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করছি'। কী ভাষায় ভগবান আশ্বাস দিচ্ছেন,

একবার লক্ষ্য করুন! কেন এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন? তার কারণ হিসাবে বলছেন, *প্রিয়োঽসি মে*, 'তুমি আমার প্রিয়'। ভগবান বলতে চাইছেন—আমি তোমাকে স্তোকবাক্য বলছি না, আমি তোমার বন্ধু। যে আপনার শুধু ভালই করে, তাঁকেই ইংরেজিতে 'ফ্রেন্ড' বা বন্ধু বলা হয়। তিনি আপনার দেহের ধুলো ময়লা নরম কাপড় দিয়ে এমন সযত্নে মুছিয়ে দেবেন যে আপনি এতটুকু ব্যথা পাবেন না; তিনি কেবল আপনার মঙ্গলই করবেন, কল্যাণই করবেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, 'তুমি আমার অতি প্রিয়জন।' তাই তোমার পক্ষে যা হিতকর হবে, আমি শুধু তাই বলব। তুমি ভাল করে শোন।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬॥

—'সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর; আমি সব পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করব; [অতএব] শোক করো না।'

এই শ্লোকটিকেই গীতার অধ্যাত্মবাণীর উপসংহার বলা যেতে পারে। এই শ্লোকটির মর্মবাণী উপলব্ধি করার সামর্থ্য যদি আমাদের হয়, তবে দেখতে পাব এর কী উত্তুঙ্গ মহিমা! কী গভীর তাৎপর্য! এই বাণী যদি ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে দিতেন, তাহলে অর্জুন এবং আমরা কেউই এর ব্যঞ্জনাটি ধরতে পারতাম না। এই বাণীর তাৎপর্যটি বুঝতে হলে প্রস্তুতি চাই। প্রথমে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব জাগাতে হবে, শক্তি সঞ্চয় করতে হবে এবং চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। তারপরই এই বাণীটি শোনার উপযুক্ত হব আমরা এবং তার মর্মোদ্ধার করতে পারব। শিক্ষাদানের প্রথম পর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—তুমি শক্তিমান ও তেজস্বী হও। কিন্তু এখন শেষ করছেন এই বলে—সব কিছু ত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। এই যে সর্বস্ব ত্যাগের শক্তি, তা পরিণত অবস্থায় আসে, প্রথমদিকে এ শক্তি আমাদের থাকে না। মনে রাখতে হবে, *যে শক্তি আমাদের আত্মসমর্পণ করতে সাহায্য করে, তা উচ্চাঙ্গের শক্তি। এ জগতে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করেই সে শক্তি সঞ্চয় করা যায়।* প্রথম দিকের যে সংগ্রাম, তা জগতে নিজের স্থান করে নেবার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের পরিণতি চূড়ান্ত আর এক ধরনের সংগ্রামে, যখন প্রাণ থেকে আমরা বলে উঠি: হে প্রভু, আমার 'আমিত্ব' দূর কর। সবকিছুই তখন থাকে, শুধু 'আমি'-ভাবটা চলে যায়।' 'আমি-র' জায়গায় 'তুমি'। এটিই অধ্যাত্মজীবনের চরম জ্ঞান। এই কারণেই এই শ্লোকটিকে *চরম শ্লোক* বলা হয়েছে।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য, 'সকল ধর্ম ত্যাগ করে'; *মামেকং শরণং ব্রজ,* 'একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর'; *অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি,* 'আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব'। এখানে 'পাপ' বলতে ধর্ম ও অধর্ম দুটিকেই বোঝানো হয়েছে। শরণাগতির এই চরম মুহূর্তে পাপ ও পুণ্যের আপেক্ষিক ধারণাগুলি আমরা অতিক্রম করে যাই। *মা শুচঃ,* 'শোক করো না'। তোমার শোক বা দুঃখের কোন কারণ নেই। পাপ এবং পুণ্য থেকে ভক্তকে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও ভগবান একটি কথা জুড়ে দিয়েছেন—'শোক করো না'। এটি বাড়তি পাওনা।

শঙ্করাচার্য বলছেন, *ধর্ম* বলতে এখানে *ধর্ম* এবং *অধর্ম* দুটিকেই বোঝানো হয়েছে। এই দ্বৈতভাব আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ধর্মাধর্ম প্রসঙ্গে বলেছেন, অধর্মের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যই প্রথমে ধর্মের প্রয়োজন। তারপর সেই ধর্মের পারেও চলে যেতে হবে। দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন, পায়ে কাঁটা ফুটলে যেমন আমরা আর একটা কাঁটা দিয়ে প্রথম কাঁটাটি তুলে ফেলি এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় কাঁটাটিও ফেলে দিই, এও ঠিক তেমনি। প্রথম কাঁটাটি তুলে ফেলার পর আর দ্বিতীয় কাঁটার কী প্রয়োজন? তাই *অধর্মকে* জয় করার জন্যই *ধর্মের* দরকার, তারপর ধর্মকেও অতিক্রম করে যেতে হবে। উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে ধর্মও নেই, অধর্মও নেই—কোনরকম দ্বৈতভাব সেখানে থাকে না; থাকে শুধু শুদ্ধ অধ্যাত্ম চেতনা, যাতে নিত্য স্পন্দিত হয় এই মহাসত্য যে, এই জগত ব্রহ্ম থেকেই প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁর কাছেই আবার আমরা ফিরে যাব। এই পরম সত্য বুঝতে জগতের কোটি কোটি বছর লেগে যাবে, কিন্তু আপনি বা আমি এই জীবনেই তা উপলব্ধি করতে পারি। পরমেশ্বরের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ থেকেই এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করা যায়। এই উপলব্ধি হলে আমরা বুঝব, *এক ব্রহ্ম থেকেই এই জগৎ এসেছে এবং সেই একেই (আমাতেই) এই জগৎ এখন মিশে যাচ্ছে।* সেই পরম সত্তার সঙ্গে তখন আমরা একাত্ম হয়ে যাই। জগৎ যখন ব্রহ্মের মধ্যে মিলিয়ে যায় তখন তাকে আমরা *প্রলয়* বলি। যুগ যুগ পরে জগতের এই প্রলয় হবে। কিন্তু ব্যক্তির অধ্যাত্মজীবনে এই প্রলয় এখনই ঘটতে পারে। কীভাবে? আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা, উপলব্ধির দ্বারা। সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান হলো ঃ সবই স্বরূপত ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছুই নেই। যখন আমি এই মহাসত্য উপলব্ধি করলাম, তখনই আমার *প্রলয়* হলো, কারণ আমার চেতনায় তখন সমস্ত জগৎ পরম ঈশ্বরের মধ্যে লীন হয়ে গেছে। তখন ঈশ্বরের থেকে পৃথক আর কোন

বস্তুই নেই। যেদিকেই চোখ মেলে তাকাই, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না—সর্বত্রই তাঁর দিব্য উপস্থিতি। যাঁর এই অনুভূতি হয়, সেই *জ্ঞানী*-র অন্তর অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। অধ্যাত্মজীবনের প্রারম্ভে, যখন আমাদের জ্ঞান সামান্য, তখনও আমাদের ভিতরে একটু জ্যোতির প্রকাশ দেখা যায়; কিন্তু সে জ্যোতি মোমের আলোর মতো—তা সামান্য একটু স্থানকেই আলোকিত করে। কিন্তু ব্রহ্মানুভূতির জ্যোতি, যার কথা এখন বলা হচ্ছে, তা এমন প্রচণ্ড সর্বপ্লাবী যে, সেই প্রভায় চতুর্দিক ডুবে যায়। এই হলো আদি পরম সত্তার উপলব্ধি যার ফলে এই জীবনেই সব বিচ্ছিন্নতা, সব পার্থক্যবোধ কর্পূরের মতো উবে যায়! *ধর্ম* ও *অধর্ম* এভাবেই আমরা অতিক্রম করে থাকি।

এবার শরণাগতির কথা। ভজন গাইতে গিয়ে কতবার যে আমরা *শরণম্* শব্দটি উচ্চারণ করি তার ইয়ত্তা নেই। কোন ভক্ত বলবেন, *স্বামীয়ে শরণম্ অইঅপ্প*, অর্থাৎ, 'আমি স্বামী অইঅপ্প-র শরণ নিলাম।' খ্রিস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ সব সম্প্রদায়ের ভক্তদের মধ্যেই এই শরণ নেবার রেওয়াজ আছে। ঈশ্বর সম্পর্কে যাঁর যেমন ধারণা, তিনি সেই অনুসারে ঈশ্বরের বিশেষ একটি প্রকাশের কাছে আত্মনিবেদন করে বলেন 'আমি তোমার শরণ নিলাম।' বৌদ্ধরা বলেন, *ধম্মং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।* এ কথা উচ্চারণ করেই একজন বৌদ্ধ বৌদ্ধ হন। তাহলে দেখা যাচ্ছে সব ধর্ম সাহিত্যই এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ব্যক্তিসত্তা চরম সত্যের মধ্যেই তার পূর্ণতা উপলব্ধি করে। গীতার এই অংশে সেই উচ্চ অবস্থাটির উল্লেখ করা হচ্ছে। এখন আমাদের সংগ্রাম সমাপ্ত; আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ পদক্ষেপটি নেবার উপযুক্ত হয়েছি আমরা। আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা ও শক্তি, সব ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করে দেবার মতো শক্তি সঞ্চয় করেছি আমরা। আমাদের মনোভাব এখন এই যে, সব কিছু ঈশ্বরের, কারণ ঈশ্বরই একমাত্র সত্য।

অর্থ উপার্জন করতে অনেক শক্তির প্রয়োজন হয়, একথা আমরা সকলেই জানি। যা জানি না তা হলো, ঐ উপার্জিত অর্থ ত্যাগ করতে আরো অনেক শক্তির দরকার। চরিত্র শক্তি বিকশিত করতে হলে প্রভূত ক্ষমতার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের আমিত্বকে ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করতে গেলে তার চেয়েও বহুগুণ বেশি শক্তির দরকার। ঐটি চরম শক্তি। ঐ শক্তি ছাড়া নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করা যায় না। জাগতিক জীবনে এই ধরনের আত্মসমর্পণ দেখা যায় না। সাংসারিক জীবনে আত্মসমর্পণ আমরা কেবল তখনই

করি যখন আমরা দুর্বল। যুদ্ধক্ষেত্রেও তাই। যখন আমরা শক্তিমান তখন কিছুতেই আত্মসমর্পণ করি না। আত্মসমর্পণ তখনই করি যখন দেখি তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। পাকিস্তানী সৈন্যদল ১৯৭১ সালে সেই কারণেই ঢাকায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিল। ধর্ম জীবনে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। এখানে যখন আমরা সবচেয়ে বেশি শক্তিমান তখনই বশ্যতা স্বীকার করি। *এটা দুর্বলের আনুগত্যস্বীকার নয়, সবলের আত্মনিবেদন।* কী গভীর ভাব! স্বামী বিবেকানন্দ কী বিপুল কর্ম ও বৌদ্ধিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তার সাহায্যে তিনি প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে কী অভূতপূর্ব কাজই না করেছেন। কিন্তু ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' শীর্ষক বক্তৃতায় সেই স্বামীজীই বলেছেন![১]

'সুতরাং আমাকে ভারতীয় সকল মহাপুরুষের পূর্ণপ্রকাশস্বরূপ যুগাচার্য মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে—এই মহাপুরুষের উপদেশ আধুনিক যুগে আমাদের নিকট বিশেষ কল্যাণপ্রদ। ঐ ব্যক্তির ভিতর যে ঐশ্বরিক শক্তি খেলা করিত, সেটি লক্ষ্য করিও।...

'এখন কেবল এইটুকু বলিতে চাই, যদি আমার জীবনে একটিও সত্য কথা বলিয়া থাকি, তবে তাহা তাঁহার—তাঁহারই বাক্য; আর যদি এমন অনেক কথা বলিয়া থাকি, যেগুলি অসত্য, ভ্রমাত্মক, যেগুলি মানবজাতির কল্যাণকর নহে, সেগুলি সবই আমার, সেগুলির জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।'

এই ধরনের আত্মসমর্পণ যা নির্দ্বিধায় বলতে পারে যে, ভাল যা কিছু তা ঈশ্বরের কৃপায় হয়েছে এবং মন্দ যা কিছু তার জন্য আমি দায়ী, তা বাস্তবিকই অসাধারণ। এই শরণাগতি দুর্বলতা থেকে আসে না, আসে প্রচণ্ড শক্তি থেকে। পূর্ণতাই আত্মসমর্পণের দিকে নিয়ে যায়, শূন্যতা তা পারে না। 'শরণাগতি কথাটি উচ্চারণের সময় যেন আমরা এই সত্যটি মনে রাখি। জাগতিক জীবনে পরাজয় স্বীকার নিন্দার্হ। আমরা তাই বলি 'লড়াই চালিয়ে যাও।' ঠিক কথা। কিন্তু অধ্যাত্মজীবনের চরম পর্যায়ে 'শরণাগতিই' শেষ কথা। তাই শিক্ষাদানের এই পর্বে শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতির জয়গান করছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত *গীতাঞ্জলি* নামক গ্রন্থের বহু কবিতায় তাই শক্তির প্রার্থনা করেছেন যাতে তিনি দরিদ্র ও দুর্বলকে অস্বীকার না করেন এবং সেই সঙ্গে অসংযত শক্তির দর্পের কাছে তাঁকে নতজানু না হতে হয়। যাতে দৈনন্দিন তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে তাঁর মন উঠতে পারে, তার জন্য জীবনদেবতার কাছে বারবার তিনি প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু এই প্রার্থনা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে হৃদয়ের

১ বাণী ও রচনা, ৫ খণ্ড, ১ সং, পৃঃ ১৬২

সেই আকৃতিতে যেখানে তিনি ঈশ্বরের কাছে শক্তি প্রার্থনা করে বলছেন ঃ আমার সব শক্তি যেন পরম ভালবাসার সঙ্গে তোমার ইচ্ছার পায়ে সমর্পণ করতে পারি।[১] এই হলো সর্বোত্তম শক্তি। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজের শক্তিকে বলি দেওয়া, এ কি চাট্টিখানি কথা! আমাদের সাধারণ সাংসারিক অভিজ্ঞতা থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই আলাদা। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিই অধ্যাত্মজীবনের সেরা মূলধন, গভীর তার মহিমা। ঋষি ও মহাত্মাদের কেউ কেউ সাধনার শেষ মুহূর্তে, পূর্ণ শক্তির অধিকারী হয়ে তবেই পরমেশ্বরের পাদপদ্মে সর্বস্ব সমর্পণ করে বলতে পেরেছেন—'আমি নই প্রভু, তুমি।' এ কথা তাঁদের কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হয়েছে।

দুঃখ ও মোহ অর্জুনের মনকে কিভাবে গ্রাস করেছিল, তা আমরা গীতার শুরুতে দেখেছি। এ ধরনের দুঃখ ও মোহে আমরা সকলেই প্রায়শ আক্রান্ত হই। কখনও কখনও আবার এই দুঃখ ও মোহই আমাদের মনকে ওপরে তুলে দেয়, উন্নততর জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ জাতীয় দুঃখকে সৃষ্টিধর্মী দুঃখ বলা যেতে পারে, যা সর্বদা কপালে জোটে না। দৈবাৎ কখনও সখনও হয়তো জুটে যায়। কোন একটি বিশেষ দুঃখ অথবা মোহভঙ্গের পর হয়ত আমরা উচ্চতর মূল্যবোধের সন্ধানে ব্রতী হই এবং তখনই আমাদের নতুন জীবন শুরু হয়। অর্জুনও এতক্ষণ পর্যন্ত মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বললেন ঃ 'মন থেকে এখন সব দুঃখ তুমি ঝেড়ে ফেলে দাও। আমি তো আছি; আমিই তোমাকে এসব থেকে রক্ষা করব। এখন থেকে আর শোক করো না। শান্ত হও। শান্ত হয়ে নিজের দায়িত্ব পালন কর, কর্তব্যকর্ম করে যাও। আগে যেমন ছিলে, তেমনভাবেই জীবনযাপন কর, কেবল নতুন জ্ঞানের আলোয় পথ চল।'

দর্শন মানুষের জীবনে প্রজ্ঞা সঞ্চারিত করে, সে কথা ঠিক; কিন্তু সে দর্শন হলো সত্য সম্পর্কে গভীর বোধ বা চেতনা যা পাঠ্যপুস্তক থেকে পাওয়া যায় না। ঐখানেই দর্শনের মূল্য। এমন যে দর্শন তার সাহায্যে মানুষ জীবনের পথ খুঁজে পায়, প্রদীপের মতো তা আমাদের চলার পথকে আলোকিত করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্তিশাস্ত্র 'ভাগবতে' এই *অধ্যাত্ম দীপম্* বা 'অধ্যাত্ম দীপ'-এর কথা আছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই দীপিকা ভক্তকে ভগবানের দিকে এগিয়ে দেয়। সমস্ত *ভাগবত* গ্রন্থখানিই যেন অনন্য

১ "বীর্য দেহো ক্ষুদ্রজনে / না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে / না লুটিতে। বীর্যদেহো চিত্তেরে একাকী / প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।" —কবির এই প্রার্থনা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে হৃদয়ের সেই আকুতিতে, যেখানে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে বলছেন ঃ "বীর্যদেহো তোমার চরণে পাতি শির / অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।"—নৈবেদ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১৯৬৮, পৃঃ ১০৬। ["নৈবেদ্য" কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতা ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে]

এক *অধ্যাত্ম দীপ* যা মহর্ষি ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব প্রজ্বলিত করেছিলেন, যে-আলো শুধু পথটিকেই আলোকিত করে না, আমাদের প্রাণকেও উদ্ভাসিত করে। *ভাগবত*-কে অধ্যাত্ম দীপের সঙ্গে তুলনা করে একটি শ্লোকে (*ভাগবত*, ১/২/৩) বলা হয়েছে ঃ

যঃ স্বানুভাবম্ অখিলশ্রুতি সারম্ একম্
অধ্যাত্মদীপম্ অতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্;
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুম্ উপযামি গুরুং মুনীনাম্—

'এই অসাধারণ পুরাণ, গভীর শাস্ত্র *ভাগবত* যিনি প্রকাশ করেছিলেন, তিনি মুনিগুরু শুকদেব।' কোথা থেকে তিনি এই জ্ঞান পেয়েছিলেন? 'তাঁর নিজস্ব অনুভূতি থেকে', *যঃ স্বানুভাবম্।* যে সত্য তিনি নিজে অনুভব করেছিলেন, তাই তিনি প্রকাশ করেছেন। *অখিল শ্রুতিসারম্*, এই শাস্ত্র 'সমস্ত বেদের সার'; এবং *একম্ অধ্যাত্ম দীপম্*, 'অদ্বিতীয় অধ্যাত্মদীপ'। নিজের অনুভূতিতে সমৃদ্ধ এই দীপ তিনি উপহার দিয়েছেন। কাদের? *সংসারিণাং*, 'যাঁরা সংসারে বাস করেন, তাঁদের', যাঁদের জীবন অজ্ঞানতার অন্ধকার, দুঃখ ও মোহে দীর্ণ। তাঁরা পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, তাই প্রদীপের সন্ধান করছেন। এঁদের ডেকে শুকদেব বলছেন, 'এস, আমি তোমাদের এমন প্রদীপ দেব যার দ্বারা তোমরা পথ খুঁজে পাবে।' কোন্ প্রেরণায় তিনি এই কাজ করলেন? *করুণয়াহ*, 'করুণাবশত'; অর্থ উপার্জনের জন্য নয়, নাম-যশের জন্য নয়। শুধু করুণাই তাঁকে এ-কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কী কাজ? *পুরাণগুহ্যং*, 'পুরাণ-রহস্য' প্রকাশ করতে। *তং ব্যাস সূনুম্ উপযামি গুরুং মুনীনাম্*, 'আমি সেই ব্যাসপুত্র মুনীগুরু শুকদেবের শরণাপন্ন হচ্ছি।'

শ্রীমদ্ভাগবত-এর শ্লোকে এই কথাই বলা হয়েছে। ধর্মশিক্ষা তখনই অর্থবহ হয় যখন তা অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি থেকে আসে, কেতাবী জ্ঞান থেকে নয়। পড়াশুনার মূল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু অধ্যাত্মজীবনে তা বড় একটা কাজে লাগে না। কাজে লাগে অধ্যাত্ম অনুভূতি। শ্রুতি যে শিক্ষা দেয় তা অনুভূতিপ্রসূত। আমরাও সে অনুভূতি লাভ করতে পারি। অতএব, *শ্রুতি*-র কথা যেমন আমাদের নিজস্ব অনুভূতির সঙ্গে মিলে যাবে, তেমনি আমাদের অনুভূতিও শ্রুতির সত্যতা প্রমাণ করে দেবে। তাই আমরা শ্রুতির ওপর নির্ভর করি না, নির্ভর করি আপন অনুভূতির ওপর। আমরা কেবল ঐ অনুভূতিলাভ করার জন্য শ্রুতির সাহায্য নিয়ে থাকি।

শ্রীকৃষ্ণও গীতায় জ্ঞানদীপ জ্বেলে আমাদের উদ্দেশ্যে বলছেন : 'এই নাও আলো, ইচ্ছে হলে এই আলো কাজে লাগাতে পার।' কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কারা আলো চায়? আলোর তৃষ্ণা তাদেরই হয়, যারা অন্ধকার ভালবাসে না। যারা অন্ধকারে থাকতে পারলেই খুশি, তারা আদৌ আলোর সন্ধান করে না। তারা বলে, 'আমরা অন্ধকারেই বেশ আছি, আমরা অন্ধকার উপভোগ করব।'। কিন্তু যারা অন্ধকারে কষ্ট পাচ্ছে, তারাই একটু আলো চায়; বলে 'আমাদের আলো দাও! আমাদের আলো দাও!' অর্থাৎ তাদের মধ্যে আলোর পিপাসা জেগেছে। কিন্তু আলোর তো অভাব নেই। টর্চ আছে, ঘরে ঘরে বাল্বের আলো আছে। তবুও আলোর অভাব কেন? তার কারণ, ঐ আলো প্রাণের অভাব মেটাতে পারে না, হৃদয়ের অন্ধকার দূর করতে পারে না। অধ্যাত্মজীবনে ঐ আলোর কোন দাম নেই। তার জন্য চাই আত্মার আলো, যাকে *জ্ঞানম্* বলা হয়েছে। জ্ঞানের আলোই আমাদের জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে, যাত্রাপথের শেষ সীমায় নিয়ে যেতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনের হাতে এবং তাঁর মাধ্যমে আমাদের সকলের হাতে, সেই আলোকবর্তিকা তুলে দিচ্ছেন। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যের ভূমিকায় এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, *অর্জুনং নিমিত্তীকৃত্য*, 'অর্জুনকে নিমিত্ত করে'। যে আলো কয়েক হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, বাস্তবিক, আজ সেই আলোয় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আলোকিত হচ্ছে।

রামানুজ আচার্য তাঁর ভাষ্যে এই শ্লোকটিকে চরম গুরুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ *শরণাগতি*-র ভাবটি তাঁর বড়ই প্রিয়। *শরণাগতি-গদ্য* নামে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। বস্তুত, দক্ষিণ ভারতের শ্রীবৈষ্ণব আন্দোলন এই শরণাগতির ভাব আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। ভক্তজীবন আর শরণাগতি—এই দুটি যেন অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বিধৃত। হনুমানের শরণাগতি ছিল। বিভীষণ, তিনিও শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছিলেন। *রামায়ণ* পড়ে দেখুন, এসব সেখানে দেখতে পাবেন। রামায়ণে শ্রীরাম বলেছেন, 'যাঁরা আমার শরণাগত, আমি তাঁদের আগলে রাখি, রক্ষা করি'। মরমি খ্রিস্ট সাহিত্যেও এই ভাবের ছড়াছড়ি।

এরপর *জ্ঞান* বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন। কারা এই জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করতে পারেন? যাঁরা উপযুক্ত কেবল তারাই। সকলেই এই জ্ঞানের মূল্য বুঝতে পারে না। যাঁদের মধ্যে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা জেগেছে, যাঁরা

গতানুগতিক একঘেয়ে জীবন নিয়ে তৃপ্ত নন, তাঁরাই শুধু এই শিক্ষার সমাদর করতে পারেন এবং জীবনে সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে কৃতার্থ হতে পারেন। নির্বিচারে সকলকে এই জ্ঞান দেওয়া বেনা বনে মুক্তা ছড়ানো। তা অর্থহীন। সব ধর্মেই অবশ্য একথা বলা হয়েছে। পরবর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণও তাই বলছেন :

ইদং তে নাঽতপস্কায় নাঽভক্তায় কদাচন ।
ন চাঽশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

—'এই [গীতাশাস্ত্র] তপস্যাহীন ও ভক্তিহীন ব্যক্তিকে কখনও তোমার বলা উচিত নয়; যে কারো সেবা করে না এবং যে আমাকে দ্বেষ করে, তাকেও না।'

ইদং তে ন অতপস্কায় বাচ্যং, 'এই উপদেশ, যে অধ্যাত্মজীবনে কোন সংগ্রাম করেনি, তাকে তোমার দেওয়া উচিত নয়'; *ন অভক্তায় কদাচন,* 'যে ঈশ্বরের ভক্ত নয়, তাকেও কখনও দিয়ো না'; *ন চ অশুশ্রূষবে,* 'যে সেবা করে না', তার কাছে বোলো না; এবং *ন চ মাং যো অভ্যসূয়তি,* তাকেও বোলো না 'যে আমাকে দ্বেষ করে', অর্থাৎ যে ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করে। এরকম মনের অধিকারীরা এ শিক্ষা থেকে লাভবান হতে পারে না। তাই তাদের কাছে এই শিক্ষার কথা না বলাই ভাল। বললে, আমরাই মনে ব্যথা পাব। তাই ধর্ম উপদেশ দেওয়ার ব্যাপারে সর্বত্রই এই বিধিনিষেধের চল আছে। শুধু ধর্ম কেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখুন—যে মূর্খ, অঙ্ক শেখার যার কোনরকম আগ্রহ নেই, তার কাছে অঙ্কের কথা বলে কী লাভ? তাতে শক্তির অপচয় করাই হবে—তার বেশি কিছু নয়। একটু বোধ এবং জানার আগ্রহ থাকলে তবেই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। ধর্মও তার ব্যতিক্রম নয়; বরং বলা যায় অধ্যাত্মশিক্ষার ক্ষেত্রে জানার ব্যাকুলতা আরো বেশি, আরো তীব্র হওয়া প্রয়োজন।

ইন্দ্রিয় স্তরের ঊর্ধ্বে কোন্ সত্য লুকিয়ে আছে তা জানার জন্য একটু তপস্যা, একটু আত্মসংযম চাই। এই সত্য ঈশ্বর সম্পর্কিত, যিনি ইন্দ্রিয় স্তরের ঊর্ধ্বে। তাই ইন্দ্রিয়গুলিকে একটু সংযত না করলে এই সত্য আমরা বুঝতে পারি না। এই কারণে *তপস্যা*-কে ভগবান বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়নিগ্রহের প্রতিটি প্রচেষ্টাই তপস্যা, কেবল উৎকট আত্মপীড়নই যে তপস্যা তা নয়। আমরা যখন সমাজে আছি, তখন নিজেদের এমনভাবে সংযত করতে হবে যাতে আমাদের আচরণে অন্যরা আঘাত না পায়, অন্যের স্বাধীনতায় যেন আমরা হস্তক্ষেপ না করি। এই সাধারণ *তপস্যাটুকু* মানবজীবনে থাকা চাই। পুলিশ আমাকে সংযত

থাকতে বাধ্য করছে, আর আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে সংযত রাখছি—এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। পুলিশি বাধ্যবাধ্যকতার মধ্যে কোন নৈতিকতা নেই; কিন্তু আমি যখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তখন তা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সামর্থ্য। তাই তপস্যা হলো মনের এমন অনুশীলন যার ফলে আমাদের চেতনা এক ঊর্ধ্বভূমিতে উঠে গিয়ে সকলের সঙ্গে সংঘর্ষের বদলে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। একেই *আধ্যাত্মিক বিকাশ* বা হৃদয়ের বিস্তার বলা হয়।

মহাভারতের 'শান্তিপর্বে' (১২/২৫৪/৯) তুলাধার এবং জাজলি-র সুন্দর একটি কাহিনি আছে। জাজলি ব্রাহ্মণ তপস্বী এবং তুলাধার একজন ব্যবসায়ী। কাহিনিতে দেখা যায় তুলাধার জাজলিকে অধ্যাত্মজীবন সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন। এতো অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! কারণ সাধারণত ব্রাহ্মণরাই তখন উপদেশ দিতেন। মহাভারতে অবশ্য দেখা যায় কখনও কখনও অব্রাহ্মণও ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। তা তিনি বৈশ্যও হতে পারেন, শূদ্রও হতে পারেন। তাঁদের মুখ থেকে ধর্মজীবনের সর্বোচ্চ তত্ত্ব বেরিয়ে আসছে—এ আমরা দেখতে পাই। সেই যাই হোক, কাহিনিতে আছে তুলাধার তপস্বী জাজলিকে জিজ্ঞাসা করছেন : 'এসব কী ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান আপনি করছেন? এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে *তপস্যার* আছেটা কি? আসল কথা হলো দেহ, মন, প্রাণ দিয়ে সকলের সেবা করা। অন্যদের সুখী করুন। এটিই প্রকৃত *ধর্ম।*' বিখ্যাত ঐ শ্লোকটিতে বলা হয়েছে :

সর্বেষাং যঃ সুহৃন্ নিত্যং সর্বেষাং চ হিতে রতঃ;
কর্মণা মনসা বাচা স ধর্মং বেদ জাজলে।

অর্থাৎ হে জাজলি, সেই ব্যক্তিই ধর্ম কি তা জানেন, *সঃ ধর্মং বেদ জাজলে।* কে সেই ব্যক্তি? *সর্বেষাং যঃ সুহৃন্ নিত্যং,* 'যিনি সর্বদা সকলের মিত্র'; *সর্বেষাং চ হিতে রতঃ,* 'সর্বদা সকলের কল্যাণ ও সুখের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন'; কীভাবে এই সেবা তিনি করেন? *কর্মণা মনসা বাচা,* 'কাজের মাধ্যমে, চিন্তার মাধ্যমে এবং কথার মাধ্যমে'। কী অপূর্ব ভাব। বাস্তবিক, একটা সুন্দর কথা বললে যদি কারো কল্যাণ হয়, তবে কেন সে কথা আমরা বলব না? যদি কাউকে সেবা করে একটু সুখী করা যায়, কেন সেই সেবা করব না? তুলাধারের ভাব থেকে বোঝা যায়, তিনি সত্য উপলব্ধি করেছিলেন।

এ ব্যাপারে *যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি* কী বলছে? *মনসশ্চ ইন্দ্রিয়াণাং চ হৈকাগ্র্যং*

পরমং তপঃ, 'মন ও ইন্দ্রিয়গুলির শক্তিগুলিকে একাগ্র করাকেই চরম *তপস্যা* বলে।' এটি তপস্যার অসাধারণ সংজ্ঞা যা বিশ্বের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বলা যেতে পারে। এই সংজ্ঞা সকলের কাছেই সমাদৃত হবে। কারণ এর পিছনে এক গভীর সত্য নিহিত আছে। কী সত্য? সত্যটি এই যে, মনঃসংযম বা একাগ্রতাই সব সাফল্যের চাবিকাঠি। ইন্দ্রিয়জ শক্তিগুলি এখন সব এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। মানসিক শক্তিও একইরকম বিক্ষিপ্ত। এই শক্তিগুলিকে একমুখী করতে পারলেই সাফল্য সুনিশ্চিত, তা সে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রেই হোক, পড়াশোনার অথবা জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রেই হোক, সমাজসেবা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের ক্ষেত্রেই হোক। সর্বত্র এই একই নিয়ম—*তপস্যার* জয়। তপস্যা আর কী? বুদ্ধিদীপ্ত কঠোর পরিশ্রম। বলা হয়েছে, *তজ্জ্যায়ঃ সর্ব ধর্মেভ্যঃ,* 'সব ধর্মের মধ্যে সেটিই শ্রেষ্ঠ' যার দ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়গুলির সমস্ত শক্তি সংহৃত করে, সেই শক্তি দিয়ে জীবন-সমস্যার সমাধান করতে পারা যায়। *স ধর্মঃ পর উচ্যতে,* 'সেই ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়'। এইটিই *তপস্* বা তপস্যা।

জীবনের সব ক্ষেত্রেই তপস্যার বিশাল ভূমিকা। তপস্যা বিনা বড় হওয়া যায় না। জাগতিক বিষয়ে, নৈতিক জীবনে, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে—তপস্যা চা-ই চাই, তপস্যা অপরিহার্য। ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখুন অথবা পাশ্চাত্যের ইতিহাসই দেখুন, সর্বত্রই দেখবেন যাঁরা ইতিহাসের পাতায় দাগ রেখে গেছেন, তাঁরা সকলেই প্রচুর তপস্যা করেছেন। যোড়শ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যে ব্রিটেন যে উন্নতির শিখরে উঠেছিল, তার মূলেও ছিল তপস্যা বা কঠোর ঐকান্তিক প্রয়াস। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প উদ্যোগ, সর্বক্ষেত্রেই এই প্রচেষ্টা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এই প্রচেষ্টা সে দেশের মানুষই করেছিল এবং সেই কঠোর পরিশ্রমের ওপর ভিত্তি করেই ব্রিটেন তাঁর কৃষ্টি ও সভ্যতাকে গড়ে তোলে। আমেরিকাও তাই করেছিল। ভারতের ঋষি মুনিরাও বহুযুগ আগে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এদেশের মাটিতে এক অসাধারণ সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর থেকেই আমরা *তপস্যা* শব্দটি ভুলে গিয়েছি। একমাত্র যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন ছাড়া আর সব তপস্যা জীবনের অঙ্গন থেকে আজ নির্বাসিত। অতীতের সেই তপস্যার ভাব ফিরিয়ে

আনতে হবে। শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি তপস্যার ভাব প্রবেশ করে, তবে শিক্ষা ও দেশের রাজনৈতিক চেহারাটাই বদলে যাবে। আজ তারস্বরে চিৎকার করতে পারলে এবং ঢিল ছোঁড়ায় সিদ্ধহস্ত হলে যে-কেউ রাজনৈতিক নেতা বনে যান। এই কারণেই জীবন ও কর্মের এক সামগ্রিক ও অখণ্ড দর্শন গীতা আমাদের উপহার দিচ্ছেন। যাঁরাই একটু আধটু ইন্দ্রিয় ও মানসিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস করেছেন, তাঁরাই এই গভীর দর্শনের মহিমা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং এর ভিতর এমন বাণীর সন্ধান পাবেন যার স্পর্শে তাঁদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন, *ন অতপস্কায় বাচ্যং,* 'তপস্যা করেনি এমন কাউকে এ সত্য বলো না।'

ন অভক্তায়, এবং তাকেও বলবে না 'যার হৃদয়ে ভালবাসা নেই'। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা মনে আসছে। একদিন এক যুবককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, মা, বোন, অথবা অন্য কাউকে কি তুই ভালবাসিস?' 'আমি কাউকে ভালবাসি না', ছেলেটি উত্তর দিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ কথা শুনে বললেন, 'তুই তো বড্ড নীরস রে!' পৃথিবীর একজন কাউকে অন্তত ভালবাস; এটা খুব প্রয়োজন। আর কিছু না হোক আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসুন, আপনার স্বামীকে ভালবাসুন। ঐ দিয়েই ভালবাসার হাতেখড়ি হোক; তারপর ধীরে ধীরে তা সম্প্রসারিত হবে। এখন আমাদের কোন মূলধনই নেই, তো কী লাভ করব আমরা? তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, সেই ঈশ্বরকে একটু ভালবাসা চাই; তারপর সেই ভালবাসাই ক্রমশ সর্বভূতে ছড়িয়ে যাবে। এখন নিজের নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বই আমাদের প্রেমাস্পদ। এরকম হলে চলবে না। অন্য কাউকে ভালবাসা চাই। নিজেকে তো আমরা সবাই ভালবাসি। একটি শিশুও নিজেকে ভালবাসে। তাতে কী হলো! নিজেকে ছাড়া অন্য অন্তত একজন কাউকে ভালবাসা চাই। তাহলে এই সীমিত ভালবাসাই একদিন বাড়তে বাড়তে অনন্ত হয়ে *ভক্তিতে* রূপান্তরিত হবে। আত্মবিকাশের কী অনিন্দ্য মধুর উপায়! এই কারণেই বলা হয়ে থাকে, *ভক্তিযোগ* সেই সব মানুষের জন্য যাঁদের হৃদয়ে অন্তত একটু ভালবাসা আছে। হোক না সে ভালবাসা জাগতিক, তাই বা কম কী?

ন চ অশুশ্রূষবে, গীতার এই শিক্ষা তাকেও দেওয়া উচিত নয় 'যে অন্যের সেবা করে না'। *শুশ্রূষা* মানে 'সেবা'। অধ্যাত্মজীবনে প্রবেশ করলে এই সেবার ভাবটি জাগ্রত হয়। যারা উদ্ধত প্রকৃতির মানুষ তারা সেবা-দর্শনের তাৎপর্য

বুঝতে পারে না; কিন্তু আমাদের মধ্যে একটু সেবার ভাব অবশ্যই থাকা চাই। 'আমি আপনার সেবার জন্য আছি, আমি আপনাকে সাহায্য করার জন্য সর্বদা আপনার পাশে আছি'—এ কথা যিনি বলতে পারেন, তাঁর মনের সৌন্দর্যটি একবার কল্পনা করুন! এ ভাব কারো কারো মধ্যে থাকে, আর সেটাই প্রমাণ করে যে আমরা সীমিত, দেহসর্বস্ব, আত্মকেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্ন সত্তা নই। আমরা তারও অতিরিক্ত কিছু যা দেহের সীমায় আবদ্ধ নয়। আবদ্ধ নই বলেই আমরা অন্যের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করি। এই বৃহত্তর চেতনাই সেবার রূপ ধরে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের মন যখন দেহের সীমা অতিক্রম করে ঊর্ধ্বমুখী হয় তখনই আমরা বুঝতে পারি নিজের সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, তার চাইতেও আমরা কত বড়! আমার দেহ সীমিত হতে পারে, কিন্তু তা বলে *আমার মন কেন* সীমিত হবে? মনের বিস্তার তো আমি ঘটাতে পারি, মনকে তো আমি অনন্ত, অসীম করে তুলতে পারি। চেতনা এভাবে সম্প্রসারিত হলে সকলের প্রতি সহানুভূতি বেড়ে যায়, সকলকে বোঝার ক্ষমতা বেড়ে যায়; এবং তখনই আমাদের মধ্যে সেবার ভাবটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আসে, তার জন্য আর সংগ্রাম করতে হয় না।

ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, 'যতক্ষণ না মানুষ নিজেকে অতিক্রম করতে পারে, ততক্ষণ সে তুচ্ছ ও অসহায়'। তাই, যে ব্যক্তিসত্তা নিয়ে আমরা জন্মেছি, তার ঊর্ধ্বে আমাদের ব্যক্তিত্বকে টেনে তুলতে হবে। আসুন, আমাদের এখনকার এই সঙ্কুচিত আত্মাকে প্রসারিত করার কাজে আমরা লেগে যাই; সেটাই মানুষের উপযুক্ত কাজ হবে। যাঁরা এ কাজটি এখনও শুরু করেননি, তাঁরা গীতার শিক্ষাগ্রহণের অনুপযুক্ত। তাঁরা এখনও আমিত্বের নিগড়ে বদ্ধ। তাঁরা গীতার বাণী বুঝতে পারবেন না। তাই তাঁদের সর্বপ্রথম সেবার ভাবটি আয়ত্ত করার শিক্ষা দিতে হবে, সেবার মধ্য দিয়ে কেমন করে নিজেকে ব্যক্ত করা যায়, সেই শিক্ষা দিতে হবে। যেই সেবার ভাবটি আসবে, তখনই তাঁরা বলতে পারবেন, 'আমরা মানুষকে ভালবাসতে চাই, আমরা মানুষের সেবা করতে চাই, আমরা আমিত্বের গণ্ডী অতিক্রম করতে চাই।' কোন মানুষের হৃদয় যখন এমন বেড়ে যায়, দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর ঘটতে শুরু করে, তখন তিনি গীতার শিক্ষা গ্রহণের অধিকারী হলেন।

শ্লোকে আরো বলা হয়েছে, *ন চ মাং যঃ অভ্যসূয়তি,* তাকেও এই গীতার শিক্ষা দেওয়া চলবে না 'যারা আমাকে এবং সবধরনের মহৎ মূল্যবোধকে

উপহাস করে।' একথা অবশ্যই সত্য ঈশ্বর অমূল্য; কিন্তু ঈশ্বর ছাড়া অন্যান্য মূল্যবান বস্তু ও ভাবগুলিও তো আছে। যে সব উন্নাসিক মানুষ তাদের কদর জানে না, তারা কখনও গীতার মর্মোদ্ধার করতে পারবে না। তাদের মনটি মৃত, তাতে এতটুকু সৃজনশীলতা নেই। তাই তাদের কাছে গীতা না বলাই ভাল।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ।। ৬৮।।

—'যিনি আমাতে পরম ভক্তিসহকারে, আমার ভক্তদের কাছে [গীতার] এই গুহ্য দর্শন ব্যাখ্যা করবেন, তিনি আমার কাছে আসবেনই—তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

ইমম্ পরমং গুহ্যং, 'এই চরম গুহ্য তত্ত্ব', এই মহা রহস্য। *গুহ্যং*-এর অর্থ গোপনীয় বা রহস্য। রহস্য বলতে আপনারা যেন আবার ম্যাজিক বা ইন্দ্রজাল মনে করবেন না; এই তত্ত্ব অতি গভীর বলেই রহস্যাবৃত। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার তাঁর একখানি গ্রন্থে এই শব্দটিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, রহস্য মানে ধোঁয়াটে ব্যাপার বা বুজরুকি নয়। ধর্মের গভীর তত্ত্বগুলির মধ্যে কোনরকম প্রহেলিকা নেই। বরং তা দুর্বোধ্য জিনিসগুলিকে সহজ করে বুঝিয়ে দেয়। ধর্মতত্ত্ব অতি গভীর, তাই *গুহ্যম্।* শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন, *পরমং গুহ্যম্। মদ্ভক্তেষু যঃ অভিধাস্যতি*, 'যিনি আমার ভক্তদের কাছে এই গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন', ভক্ত, অর্থাৎ যাঁদের হৃদয়ে ভালবাসা আছে, দেহসুখই যাঁদের কাছে সর্বস্ব নয়; *ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা*, 'আমাতে পরম ভক্তিলাভ করে'; *মাম্ এব এষ্যতি অসংশয়ঃ*, 'আমাকেই লাভ করেন, সংশয় নেই।' এভাবেই ভক্তিভাব পুষ্ট হয়। ভক্তির মাধ্যমেই এক ভক্ত আর এক ভক্তের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তার ফলে অন্যদের ভক্তিও যেমন বাড়ে, তেমনি তাঁর নিজের ভক্তিও বৃদ্ধি পায়। এভাবেই ভক্তদের মধ্যে *দিব্যভাবের* মধুর এক আদান প্রদান চলে। তাঁদের ভাষা এক। তা কোন মুখের ভাষা নয়, প্রাণের ভাষা। যাঁরা প্রেমিক তাঁরা প্রেমের ভাষা ঠিক বুঝতে পারেন। সে ভাষা রসকষহীন মানুষ বুঝবেন কী করে? ভক্তরা কিন্তু এই শুদ্ধ ভালবাসা, শুদ্ধ ভক্তির বোল ধরতে পারেন। ভক্তিপথে আমাদের যাত্রা শুরু হয় গৌণী ভক্তি দিয়ে, শেষে সেই প্রারম্ভিক ভক্তিই রূপান্তরিত হয় *পরাভক্তি* বা প্রেমাভক্তিতে—বলা হচ্ছে *ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা।* আগের আগের অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এই পরাভক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে

নানাধরনের ভক্তির কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ভক্তিই যখন চরম পর্যায় পৌঁছায়, তখন *মাম্ এব এষ্যতি,* তখন ভক্ত 'আমার কাছেই আসেন'; *ন সংশয়ঃ,* এ ব্যাপারে 'কোন সন্দেহ নেই'। এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাণীর উপসংহার করেছেন এবং বলেছেন কিভাবে তাঁর শিক্ষা প্রচারিত হওয়া উচিত।

ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি এই—আম খেয়ে আমি মুখ মুছে ফেলব কেন? যা আমার ভাল লেগেছে, সেই বস্তু আমি অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেব। ঠিক কথা। এটিই তো সঠিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। আপনার যদি ভাল কিছু থাকে আপনি স্বাভাবিক কারণেই তা অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে উপভোগ করতে চাইবেন। গ্রামে দেখা যায়, কারো বাগানে ভাল আম হলে তা কিন্তু প্রতিবেশীর বাড়িতে পাঠানো হয়। এই আদানপ্রদানের মাধ্যমেই পরিবারে-পরিবারে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেইরকম, একটা ভাল বই পড়ে কিছু মহৎ ভাব পেলে আপনি অন্যদের বলেন, 'এই বইতে একটা সুন্দর কথা পেয়েছি।' তাঁরাও উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠেন, 'তাই? আমরাও পড়ব।' শ্রীকৃষ্ণও এখানে তাঁর শিক্ষাটি অন্যদের কাছে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া উচিত, সে কথা বলছেন। কেবল রেডিও বা টেলিভিসন-এর মাধ্যমেই যে প্রচার করা যায়, তা নয়। এগুলি তো হালে হয়েছে। আসলে *প্রত্যেক ব্যক্তিই এক একটি প্রচারকেন্দ্র।* আজকের দুনিয়ায় 'যোগাযোগ' বা 'প্রচার' একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, প্রচারের জন্য শুধু টেলিভিসন, রেডিও বা পত্র-পত্রিকার ওপর নির্ভর করে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। মানুষ স্বভাবতই আর পাঁচজন মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, ভাবের আদান প্রদান করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই আলাপ-আলোচনা বা ভাব-বিনিময় যেন সকলের হিতকর হয়, তা যেন মানুষের মনকে ঊর্ধ্বগামী করে। আমরা অনেক সময় এমন সব আলোচনা করি, যা মানুষকে ওপরে তোলা তো দূরের কথা, মানুষের মনকে নিম্নমুখী করে। কিন্তু গীতার শিক্ষায় তা বলা হচ্ছে না। এখানে বলা হয়েছে, আলোচনা এমন হবে যা মানুষকে পূর্ণতালাভের পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, 'যে গভীর সত্য আমি তোমাকে জানালাম, যাঁরা পরমভক্তির সঙ্গে সেই সত্য ভক্তদের মধ্যে প্রচার করবেন, তাঁরা যে আমাকে লাভ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

ভাব-বিনিময় সম্পর্কে আরো কিছু সুন্দর কথা আমরা বাকি কয়েকটি শ্লোকে পাব। বাস্তবিক, সত্যের প্রচার দরকার। কিন্তু সেই সত্যকে কেমন করে প্রচার

করব? প্রচার নিয়ে এবং প্রচার বিষয়ক সমস্যা নিয়ে আজকের পৃথিবী বিস্তর মাথা ঘামাচ্ছে। কিন্তু প্রচার ব্যাপারটা আজকের নয়, ধর্মজগতেরও এক অপূর্ব প্রচারশৈলী আছে যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এই শ্লোকে তারই ইঙ্গিত দিয়ে বলা হলো, যাঁরা অধ্যাত্মভাব প্রচার করেন, তাঁরা মহৎ। এই কথার জের টেনে পরের শ্লোকে বলা হচ্ছে ঃ

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

—'অতএব মানুষের মধ্যে তাঁর [গীতা ব্যাখ্যাতার] মতো আমার মহত্তম সেবা আর কেউ করেন না এবং এ জগতে তাঁর থেকে প্রিয়তর আর কেউ হবেনও না।'

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, যে ব্যক্তি ধর্মমতের গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িক ভাব নয়, যথার্থ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার করেন, তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয়। ধর্মজগতের সব মহাপুরুষই এই কথা বলে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, বুদ্ধ বলেছেন, যিশু বলেছেন। যিশু বলেছেন, আমি তোমাদের জীবনদায়ী রুটি দিয়ে গেলাম; তোমরা সকলের সঙ্গে ভাগ করে খাও। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'সব মানুষের মধ্যে তাঁর মতো প্রিয়জন আর আমার কেউ নেই, যিনি সকলের কাছে এই জীবনপ্রদ বাণী প্রচার করেন।' এমন মানুষ আমার *প্রিয়তরঃ*, 'অত্যন্ত প্রিয়'। অতএব এই সুস্থ চিন্তাগুলি অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ভাল চিন্তা ও সৎ ভাবনাগুলি নিজের কাছে আগলে রাখবেন না, তা অন্যের মধ্যেও ছড়িয়ে দিন। অন্যরাও এই সব মহৎ ভাব নেওয়ার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। অবশ্য ভাবপ্রচার করতে হলে যে আমাদের আগ্রাসী হতে হবে, তা নয়; আমরা শান্ত হয়েই ভাববিনিময় করতে পারি। অসার বাক্যালাপে মত্ত না হয়ে মহৎ ভাবগুলি আদান প্রদানের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। সমাজে ঐক্য ও সংহতি আনতে হলে ভাবের এই আদান প্রদানের অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই বলা হয়েছে, গীতার যে শিক্ষা তা অন্যদের কাছেও তুলে ধরুন। কিন্তু সেই শিক্ষাটি কী? সেই শিক্ষা হলো মানুষকে সুখী করা, মানুষের কল্যাণ করা। এই শিক্ষার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব নেই—এই শিক্ষার লক্ষ্য সকলের সুখ, সকলের কল্যাণ। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'যিনি এই শিক্ষা প্রচার করেন, এ জগতে তাঁর মতো প্রিয় আমার আর কেউ নেই।' সত্যি কথা। ভাবের সূক্ষ্ম গতি—তা এক মানুষ থেকে আর

এক মানুষের কাছে নীরবে চলে যায়। এ যেন এক প্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপ জ্বালানো। সুস্থ সমাজজীবনে এরকমই তো হয়ে থাকে।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

—'এবং যিনি সামাজিক স্থিতি ও সমৃদ্ধিজনক আমাদের দুজনার কথোপকথন অধ্যয়ন করবেন, তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হবো, এই হলো আমার দৃঢ় অভিমত।'

অধ্যয়ন এবং মহৎ ভাবাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া—এটিই একধরনের মস্ত *যজ্ঞ।* আমরা একে *অধ্যয়ন* ও *অধ্যাপনা* বলি। *অধ্যয়ন* মানে চর্চা 'পড়াশোনা' এবং *অধ্যাপনা* হলো 'শিক্ষা দেওয়া' বা পড়ানো। দুটিই এক সঙ্গে চালাতে হবে। এই ধারণা সেই উপনিষদের যুগ থেকে এখনও চলে আসছে। *তৈত্তিরীয়োপনিষদ্*-এ ছাত্রদের সমাবর্তনে ভাষণ দিতে গিয়ে আচার্য বলছেন, *স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্,* অর্থাৎ 'অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছেড়ো না।' এখানে গীতাতেও সেই সুর। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদম্ আবয়োঃ,* যিনি আমাদের উভয়ের ধর্মজনক কথাবার্তা অধ্যয়ন করবেন; *জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহম্ ইষ্টঃ স্যাম্ ইতি মে মতিঃ,* 'তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হবো'; এই নতুন ধরনের *জ্ঞানযজ্ঞে* নিযুক্ত থাকার জন্য এই ব্যক্তি আমার অতি প্রিয়। আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা নানারকম যজ্ঞের কথা পড়েছি; সেখানেও দেখেছি এই *জ্ঞানযজ্ঞ*-কে সব চাইতে উচ্চাসন দেওয়া হয়েছে। এই *জ্ঞানযজ্ঞ* বাস্তবিকই অসাধারণ। এই যজ্ঞের উপচার দুটি জিনিস—জ্ঞান আহরণ এবং সেই জ্ঞান বিতরণ করা।

এই *জ্ঞানযজ্ঞ* যিনি করেন, তাঁর মনোভাবটি কীরকম? তিনি যেন প্রার্থনার সুরে সদাসর্বদা বলেন—আলো চাই, আরো আলো চাই। এই জন্যই যে জাতি জ্ঞানের পিয়াসী, জ্ঞানকেই ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছে, জ্ঞানের মাধ্যমে যজ্ঞ করে চলেছে, সে জাতির উত্থান অনিবার্য। সে উঠবেই উঠবে। পৃথিবীতে মানুষ আজ যে পশুর মতো জীবনযাপন করছে, তার হাত থেকে একমাত্র জ্ঞানই আমাদের উদ্ধার করতে পারে। তাই জ্ঞানের অনুশীলন দরকার। *জ্ঞানযজ্ঞ* মানে জ্ঞান আহরণের প্রতি নিষ্ঠা। তার মধ্যে গবেষণা, অধ্যয়ন, আলোচনা—সবই পড়ে। এর থেকে অভাবনীয় উন্নতি হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি তাই বরাবর

জ্ঞানযজ্ঞের সমাদর করেছে, তাকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছে। আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতার যে শক্তি, সে শক্তি তাঁরা কোথা থেকে পেলেন? এই জ্ঞানযজ্ঞ থেকে। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ অথবা গবেষণাকেন্দ্রগুলিকে লক্ষ্য করুন, তাহলেই এই জ্ঞানযজ্ঞের মহিমা বুঝতে পারবেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, এই *জ্ঞানযজ্ঞই* সব কৃষ্টি ও সভ্যতার ভিত্তি।

শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে বলছেন, 'যিনি আমাদের [শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের] পবিত্র কথাবার্তা অধ্যয়ন করবেন, তাঁর সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারাই আমি পূজিত হব।' এ কথার তাৎপর্য কী? তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এক মহত্তম চিন্তা-মণি উপহার দিয়ে গেছেন; সেই চিন্তার মননে যেন আমরা প্রবৃত্ত হই। এইটিই আমাদের মনোভাব হওয়া উচিত। ভারতীয় সমাজতত্ত্ব বড় গভীর। সেখানে আছে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক শিশুর তিনটি ঋণ থেকে যায়। প্রথমটি হচ্ছে *পিতৃঋণ*। অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই আমরা আমাদের শরীরটি পেয়েছি। এই যে জন্মধারা বা জন্ম-প্রবাহ, এটি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা স্বীকার করতেই হবে। পিতৃপুরুষের এই যে ঋণ, তা আমরা কীভাবে পরিশোধ করব? সাধারণত সুস্থ, সবল ও সৎ সন্তানের জন্ম দিয়েই আমরা এই ঋণ শোধ করে থাকি। সেই বেদ উপনিষদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত জন্মের একটি পরম্পরা বা ধারাবাহিকতা চলে আসছে। এটি জন্মগত উত্তরাধিকার। এটি দৈহিক। এর থেকেও বড় ঋণ হলো *ঋষিঋণ*, অর্থাৎ ঋষি-মুনি ও মনীষীদের কাছে আমাদের যে ঋণ বা দায়বদ্ধতা। তাঁরা নিজেদের চেষ্টায় বহু তপস্যা করে যে জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন, সে ঋণ আমরা চোকাব কী করে? তাঁদের গচ্ছিত জ্ঞান আয়ত্ত করে এবং তাকে আরো সমৃদ্ধ করে। স্কুল-কলেজে গিয়ে, প্রাচীন ও সমকালীন চিন্তাবিদদের দেওয়া ভাবনাগুলি অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করে, সেগুলিকে আরো সম্প্রসারিত করে, পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে যেতে হবে। এভাবেই আমরা ঋষিদের ঋণ কিছুটা পরিশোধ করতে পারি। এতকাল পর্যন্ত আমরা কেবল ভারতীয় ঋষি ও মনীষীদের কাছে আমাদের যে ঋণ, তার কথাই চিন্তা করেছি। কিন্তু আজ বিশ্বের সব ঋষিদের কথাই ভাবার সময় এসেছে। তাঁদের কাছেও আমরা ঋণী। তাঁরাও কত কি করেছেন! সেগুলিও আমাদের বুঝতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে। এই অদ্ভুত প্রচেষ্টাই ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা হবে। জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা প্রাচীন ও নবীন সব ঋষিদের ঋণ এভাবে মেটাতে পারলে আমরা মুক্ত হয়ে যাব।

তৃতীয় হলো *দেবঋণ* বা দেবতাদের কাছে আমাদের দেনা। কিছু বৈধী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং চারপাশের প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করে আমরা এই ঋণ মেটাই এবং মেটাতে পারি। সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলাও আমাদের একটি কর্তব্য, যা আমরা এতকাল সুচারুভাবে পালন করিনি। এখন এদিকে নজর দেবার সময় এসেছে। গাছপালা, জীবজন্তু, নদ-নদী ও জলাধারগুলিকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আগে *দেবঋণ* বলতে দেবতাদের কাছে আমাদের যে ঋণ, সেটিই বুঝতাম। আজ আমরা দেবঋণের ধারণাটিকে প্রসারিত করে প্রকৃতিকেও তার অন্তর্ভুক্ত করেছি। প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলকে তাই রক্ষা করতে হবে। আজ চোরাশিকারীরা নির্বিচারে হাতি মারছে, এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। দেবঋণের দায় মেটাতে গেলে প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে তাকে রক্ষা করতেই হবে। নাহলে আমাদের জীবনও বিপন্ন হবে। তাই এই ঋণের কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে এবং আমাদের দায়িত্বটি পালন করতে হবে। ঋণের যে সনাতন ধারণা সেটি তো আছেই, কিন্তু তার তাৎপর্য আজ অনেক প্রসারিত হচ্ছে এবং তা হওয়াই কাম্য। আগে আমরা *ঋষি ঋণ* বলতে ভারতীয় ঋষিদের কাছে ঋণকেই বুঝতাম। কিন্তু আজ আমাদের পাশ্চাত্যের বা অন্যান্য দেশের মনীষীদের কথাও ভাবতে হবে; তাঁদের কাছেও আমাদের ঋণ আছে। এইভাবে ধারণাগুলি ক্রমশ বিশ্বাত্মক হয়ে উঠছে। *ঋণ* শব্দটি যথার্থ। অতীতের কাছে আমরা সবাই ঋণী এবং সেই ঋণ আমাদের মেটাতে হবে। তাহলেই আমরা অনেকটা দায়মুক্ত। এই গেল ভারতীয় সমাজতত্ত্বের ঋণ সম্পর্কিত শিক্ষা।

শ্রীকৃষ্ণ তাই এখানে জ্ঞানযজ্ঞের কথা বলছেন। *জ্ঞানযজ্ঞ* অর্থাৎ গভীর চিন্তাসমূহের মনন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গীতায় অমূল্য সব উপদেশ ও চিন্তার মণিমাণিক্য দিয়েছেন। সেগুলি অধ্যয়ন করলে জ্ঞানযজ্ঞের মাধ্যমে তাঁকে উপাসনা করা হলো। সেটিও পূজা। তাই গীতা অধ্যয়ন এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন ঈশ্বরেরই আরাধনা। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, 'যে আমার উপদেশের কথা মুখে বলবে, অথচ তা পালন করবে না, আমি তার ভার নিই না।' যিশুও বলেছেন ঃ যে আমার কথা শুনেও তা জীবনে পালন করে না, সে নির্বোধের দুরবস্থা ঐ হতভাগ্য লোকটির মতো, যে বালির ওপর তার বাড়ি তৈরি করেছিল। যেই বৃষ্টি এলো, অমনি সে বাড়ি হুড়মুড় করে ধসে পড়ল। কিন্তু যে যিশুর বাণী শুনে তা জীবনে কাজে লাগিয়েছিল, সেই ঠিক ঠিক বুদ্ধিমান। সে তার বাড়ি তৈরি করেছিল পাহাড়ের শক্ত পাথরের ওপর। ঝড়, বৃষ্টি সে বাড়ির কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি। যিশুর বলা এই গল্পটি *নিউ*

টেস্টামেন্ট-এ আছে। শ্রীকৃষ্ণও ঠিক এই কথা দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলেছেন। অতএব, কেবল পটের সামনে কিছু অনুষ্ঠান পালন করলেই যে পূজা হলো, তা নয়। অন্যভাবেও ঈশ্বরের আরাধনা হতে পারে। বস্তুত ভগবানের মুখের কথাগুলি নিজের জীবনে ফুটিয়ে তোলাই প্রকৃত পূজা। পূজার এই তাৎপর্য আজ ভারতবাসীদের বিশেষ করে বুঝতে হবে, কারণ পূজা বললেই আমাদের মনে কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানের কথাই ভেসে ওঠে। বাস্তবে পূজা কিন্তু তা নয়। *উপাসনা* শব্দটি উপনিষদ্‌ বা বেদে আছে, যার অর্থ চিন্তার দ্বারা সত্য উপলব্ধির চেষ্টা এবং সেই উপলব্ধ সত্যকে জীবনে রূপায়িত করা।

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদম্, 'যিনি এই কথোপকথন, যা ধর্ম্যং, অধ্যয়ন করেন'। গীতার এই শিক্ষাকে *ধর্ম্যং* বলা হচ্ছে কেন? এইজন্য যে, এই শিক্ষা সমাজকে সমৃদ্ধ করে, দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে। যা সমাজের উৎকর্ষসাধন করে তাই *ধর্ম*। যা এই ধর্মের অনুকূল, তাই *ধর্ম্যম্*। গীতার শিক্ষা *ধর্ম্যম্*। এই শিক্ষা থেকে সুস্থ সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হতে পারে। আজ শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা বিশ্ব এমন এক জীবনদর্শন অন্বেষণ করছে যা সর্বজনীন এবং যা সব মানুষকে পরিপূর্ণতালাভের দিকে এগিয়ে দিতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে গীতার জুড়ি নেই। গীতার অভীষ্ট সামগ্রিক মানবকল্যাণ। এর মধ্যে কোন খণ্ডভাব নেই, সংকীর্ণতা নেই। এই কারণেই তা গোটা বিশ্বের মানুষকে আজ এত আকৃষ্ট করছে।

জ্ঞানকে *যজ্ঞ* শব্দে অভিহিত করতে আমার খুব ভাল লাগে। মনে করুন একটি ছাত্র পড়ছে। প্রকৃতপক্ষে সে কি করছে? সে *জ্ঞানযজ্ঞ* করছে। *যজ্ঞ* শব্দের কী গভীর ব্যঞ্জনা! আমরা দর্শন পড়তে পারি। বিজ্ঞান চর্চা করতে পারি, চিকিৎসাশাস্ত্র বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারি; যাই পড়ি না কেন, সঠিক মনোভাব নিয়ে পড়লে সবই *জ্ঞানযজ্ঞ*। কিন্তু আপনি যদি শুধু পেট ভরানোর জন্য বা মোটা মাইনের চাকরি পাওয়ার জন্যই পড়াশুনা করেন, তাহলে তা আর *জ্ঞানযজ্ঞ* হলো না। মনে রাখতে হবে পেট ভরানোটা অবান্তর ফল, বাড়তি পাওনা। লক্ষ্য হলো জ্ঞানলাভ। সেই জ্ঞানের দ্বারা জীবনকে উর্ধ্বমুখী করতে হবে।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্‌ লোকান্‌ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্‌ ॥ ৭১ ॥

—'এমনকি শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য ব্যক্তিও যদি [এই কথোপকথন] শোনেন, তিনিও মুক্ত হয়ে পুণ্যকর্মাদের শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হন।'

শৃণুয়াদপি যো নরঃ, 'যে ব্যক্তি এই শিক্ষা' কারো মুখ থেকে 'শুধু শোনেন'; *শ্রদ্ধাবান্,* যিনি 'শ্রদ্ধালু'; *অনসূয়শ্চ,* 'এবং বিদ্বেষমুক্ত', অর্থাৎ যাঁর মধ্যে নেতিবাচক ভাব নেই; *সোঽপি মুক্ত,* সব পাপ থেকে 'তিনিও মুক্ত হয়ে যাবেন'; *শুভাল্লোঁকান্ আপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্,* 'এবং পুণ্যকর্মকারীদের শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হবেন' অর্থাৎ এই জীবনেই তিনি উচ্চতম নৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবেন। অতএব, যাঁরা গীতার শিক্ষা শুধু কানে শুনবেন, তাঁদেরও এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। আসলে আলোচনার বিষয় যদি মহামূল্যবান ও অসামান্য হয় তবে বক্তা *এবং* শ্রোতা উভয়েই ধন্য হন। তাতে উভয়েরই মঙ্গল। কেবল গীতা প্রসঙ্গ কেন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়েও যখন কেউ কোন কথা বলেন, আমরা তখন মন দিয়ে শুনি এবং তা শুনে লাভবান হই। হাজার হোক, জ্ঞান তো! আর জ্ঞান মাত্রই পবিত্র। কোন্ জ্ঞান পবিত্র নয়, বলুন? সব জ্ঞানেরই কিছু না কিছু উপযোগিতা আছে, সব জ্ঞানই জীবনকে প্রসারিত করে। তাই অধ্যাত্মজীবন বা উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথাই হোক অথবা শরীরবিজ্ঞান বিষয়ক কথাই হোক, সবকিছুর মধ্যেই একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে যা জানা কল্যাণকর।

আমাদের লাইব্রেরিতে একটি বই আছে যার নাম আমি দিয়েছি 'শরীর-বেদ'। যাঁরা 'রিডার্স ডাইজেস্ট' ছাপেন, তাঁরাই এই বইটি প্রকাশ করেছেন। বইতে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মনোরম আলোচনা আছে, যা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। প্রথম আলোচনার শিরোনাম—'আমি আপনার থাইরয়েড'। সেখানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বলছে সে আমাদের জন্য কি করতে পারে, অর্থাৎ কি করে। আলোচনাটি পড়লে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সম্পর্কে আমরা অনেককিছু জানতে পারি। আর একটি আলোচনার শিরোনাম 'আমি আপনার পাকস্থলী'। সেটি পড়লেই পাকস্থলীর ব্যাপারস্যাপার সব জানা যায়। এইভাবে স্নায়ু ইত্যাদি অন্যান্য প্রসঙ্গ পরপর এসেছে। গোটা বইটাই এইসব তথ্যে ঠাসা। বইটিকে 'বেদ' বলেছি এই জন্য যে, তা পড়লে ভালভাবে বাঁচার, অর্থাৎ দেহটাকে সুস্থ রাখার প্রণালীগুলি জানা যায়। অনুরূপভাবে, যখন আমরা কোন বক্তৃতা শুনি—তাও চমৎকার। শোনার মূল্য বলার চাইতে কিছু কম নয়। শুনতে শুনতে আমাদের মনে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়, আমরা বক্তার বক্তব্য উপভোগ করি এবং ঐ বিষয়ে

আরো জানতে চাই। এই যদি দৃষ্টিভঙ্গি হয় তো খুব ভাল। তাতে বোঝা যাবে আমাদের জীবন মানসিক স্তরে উন্নীত হয়েছে, অর্থাৎ মানসিকভাবে আমরা বাঁচতে শিখেছি। শিশুর জীবন দেহের সীমাতেই আবদ্ধ—খাওয়া আর আরাম, এইটুকুই সে চায়। এছাড়া আর অন্য বিষয়ে তার আগ্রহ নেই। কিন্তু দু-তিন বছর পর তার চেতনা একটু বাড়লে সে নানা জিনিস জানতে চায়। তখন তার হাতে খড়ি দিয়ে বর্ণ পরিচয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। ঐ যে তার মধ্যে জ্ঞানের অন্বেষণ শুরু হলো, তা চলতেই থাকবে। এইটি মানবপ্রকৃতির অনুপম বৈশিষ্ট্য। সে ক্রমাগত জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে যেতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আত্মজ্ঞানলাভ না করছি, ততক্ষণ আমাদের এই *জ্ঞানযজ্ঞ*-এর অগ্নি নির্বাপিত হবে না। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানেই জ্ঞানের পরিপূর্ণতা, সেটিই জ্ঞানের চরম অবস্থা। সব অনুভূতির শ্রেষ্ঠ এই ব্রহ্মানুভূতি, কারণ ব্রহ্ম হচ্ছেন সত্যের সামগ্রিক রূপ।

এরপর বলা হচ্ছে, *শ্রদ্ধাবান্*। কারা *শ্রদ্ধাবান্*? যাঁরা আত্মবিশ্বাসী, যাঁদের এই বিশ্বাস আছে যে, 'হ্যাঁ, আমি সত্যের বা জ্ঞানের সন্ধান করছি।' প্রত্যেক বিজ্ঞানীর, প্রত্যেক অধ্যাত্ম পথের পথিকের মধ্যেই এই *শ্রদ্ধা* থাকতে হবে। শ্রদ্ধার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে জ্ঞানলাভ করা যায় না। *শ্রদ্ধা* বস্তুটি কী? *শ্রদ্ধা* হলো সেই প্রত্যয় যা আমাকে বুঝিয়ে দেয় যে, আমি যে-জ্ঞানের সন্ধান করছি তার একটা তাৎপর্য আছে; যা বুঝিয়ে দেয় যে, প্রকৃতির ভেতর এমন একটা কিছু আছে যা আমার জানা উচিত এবং আমি তা জানবই জানব। একেই প্রাথমিক শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস বলা হয়, অর্থাৎ যে কর্মে আমি নিযুক্ত রয়েছি তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি নিঃসংশয়। যাঁর শ্রদ্ধা নেই, তিনি কস্মিনকালেও জ্ঞানের অন্বেষণ করবেন না, কারণ তিনি আগে থেকেই জেনে বসে আছেন যে এই পৃথিবীতে জানার কিছু নেই! তা যদি হবে, তাহলে একজন মানুষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ব্রতী হন কেন? কারণ তিনি নিশ্চিত যে জ্ঞাতব্য একটি কিছু আছে। তিনি সেই সত্য প্রত্যক্ষ করেননি বটে, কিন্তু তাঁর স্থির বিশ্বাস সেই সত্য আছে। সেই সত্যটি আবিষ্কারের জন্যই তিনি বিজ্ঞানের পথ বেছে নিয়েছেন। বিজ্ঞানী হয়েছেন। ধর্মজীবনেও তাই। ধর্মজগতের মানুষ বিশ্বাস করেন, এই জড় জগতের ঊর্ধ্বে একটি সত্ত্ব আছেন। তাঁকে আমি দেখিনি, কিন্তু তিনি আছেন। আমি তাঁকেই খুঁজছি। এইরকম মানুষই কালে অধ্যাত্মজগতের এক বিরাট দিকপাল হয়ে ওঠেন। যে পথেই যান, *শ্রদ্ধা* থাকতেই হবে। তা না থাকলে আপনি বিজ্ঞানী হতে পারবেন না, আবার ধর্মজগতের মানুষও হতে পারবেন না। মনে করুন,

একজন লোক মাছ ধরতে যাচ্ছেন। তাঁর এই কর্মের পিছনে কোনরকম শ্রদ্ধা আছে কী? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। যদিও এখনও পর্যন্ত তিনি একটি মাছও ধরেননি, তাঁর স্থির বিশ্বাস জলে মাছ আছেই। তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি এই উত্তরই দেবেন। যদি তিনি জানেন যে লেকে কোন মাছ নেই, তাহলে কি তিনি আর ছিপ হাতে মাছ ধরতে যাবেন? যাবেন না, কারণ তিনি জানেন ওখানে যাওয়া মানে পণ্ডশ্রম। তাই *শ্রদ্ধা* থাকা চাই। আগের একটি অধ্যায়ে তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন *শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং,* 'শ্রদ্ধাযুক্ত হলে তবেই জ্ঞানলাভ করা যায়।' পার্থিব বা লৌকিক জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান—দুই জ্ঞান সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য।

অনসূয়শ্চ, আমাদের মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব যেন না থাকে। যিনি সন্দেহপ্রবণ, তিনি আর যা হোক জ্ঞানের অন্বেষণ করতে পারেন না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান দুর্দশার কারণ কী? কারণ হলো আমাদের জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ লুপ্ত হয়েছে। থাকলেও তা তলানিতে এসে ঠেকেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী গত কুড়ি-তিরিশ বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠক্রমের বহির্ভূত বিষয়ে যে-সমস্ত বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়, তাতে শ্রোতা হয় না বললেই চলে। বিশিষ্ট বক্তা এলেও হয়তো সব মিলিয়ে পাঁচ-ছজন উপস্থিত থাকেন এবং তাঁদের বেশিরভাগই বাইরের মানুষ। ছাত্র ও অধ্যাপকদের এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ কাণ্ড আমি বহুবার ঘটতে দেখেছি। ভাবগতিক দেখে একদিন আমি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে বললাম—'আপনারা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের বিবেকানন্দ হলে তো এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে পারেন।' তা তিনি সেই কথামতো একটি অনুষ্ঠান করলেন। দু-তিনশো শ্রোতা হলো। শ্রোতাদের মধ্যে অবশ্য ছাত্র এবং অধ্যাপকরা ছিলেন না। যাই হোক, এইভাবে বেশ কয়েক বছর চলেছিল। অথচ ষাট বছর আগে, আমার সাধু জীবনের সূচনাপর্বে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি, বক্তৃতা হলে হল কানায় কানায় ভর্তি হয়ে যেত। কিন্তু আজ দিন একেবারেই পাল্টে গেছে। জ্ঞানের প্রতি কোন ভালবাসা নেই। মনীষীদের প্রতি এবং তাঁদের কথা শোনার প্রতি আগ্রহ নেই বললেই চলে। একটা সবজান্তা আত্মতৃপ্তির ব্যাধি আজ ছাত্রসমাজকে পেয়ে বসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পা দেওয়া মাত্রই ছাত্র-ছাত্রীরা মনে করে তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার পরিপূর্ণ—তাদের আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। তাদের মনোভাব হলো ঃ আমাদের একটা ডিগ্রি প্রয়োজন। ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই যদি সেটা দিয়ে দেন, তাহলে আর দু-দুটো বছর এখানে মিছিমিছি নষ্ট করতে হয় না।

এই ধরনের মনোভাব যেকোন সমাজের পক্ষেই ক্ষতিকর, ভারতবর্ষের পক্ষে তো বটেই। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সুনাম ও মহত্ত্ব আমরা তিলতিল করে গড়ে তুলেছিলাম, আজ তা অতীতের স্মৃতিতে স্থান পেতে চলেছে। বর্তমানে যে ইতিহাস আমরা রচনা করছি, তা মোটেই গৌরবের নয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে *যজ্ঞের* ভাবটি যত শীঘ্র ফিরিয়ে আনা যায়, ততই মঙ্গল। আমার স্থির বিশ্বাস এ ভাব ফিরে আসবেই এবং তখনই সমগ্র জাতির অভাবনীয় প্রগতি শুরু হয়ে যাবে। এই শুভ সূচনার জন্য যেটি সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তা হলো মনের বিকাশ। আজ 'মন' বলে যেন কোন পদার্থ নেই—আছে শুধু শরীর। আমেরিকার মতো দেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও আজ এই মন নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। 'টাইম'-এর মতো পত্র-পত্রিকাতেও সেদেশের মর্মহীন, মন-মরা শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষার সঙ্গে আজ আর মনের কোন যোগ নেই। হৃদয়হীন মানুষ অন্তঃসারশূন্য শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে! ভারতবর্ষেও আজ চতুর্দিকে এই এক দৃশ্য। মনের যোগ না থাকায় আমাদের আচার আচরণও কিম্ভূতকিমাকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু যেদিন সমগ্র জাতির মধ্যে আবার জ্ঞানের ক্ষুধা জাগবে, সেদিন এসব অশুভ ভাব দূরে চলে যাবে। সেদিন কাতারে কাতারে মানুষ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটে যাবে জ্ঞানের পিপাসা মেটাতে। যে কোন জাতির, যে কোন উন্নতির পূর্বশর্ত এই জ্ঞানতৃষ্ণা। কি ভারতবর্ষের ইতিহাস, কি পাশ্চাত্যের ইতিহাস সর্বত্রই এই সত্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আমরা এই সত্য সাময়িক ভুলে গেলেও অতীতের জ্ঞানলিপ্সাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। এ কাজে ভগবদ্গীতা আমাদের প্রভূত সাহায্য করতে পারে। শুধু চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে বা সেবার ভাবটি জাগ্রত করতেই নয়, বিদ্যানুরাগ সঞ্চারের ক্ষেত্রেও তা সহায়ক হবে। শ্রীকৃষ্ণ বারবার বলেছেন, জ্ঞানই সর্বোত্তম, *ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে* (৪/৩৮)—'জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছু নেই।' সাবান জামাকাপড় পরিষ্কার করতে পারে, দেহ নির্মল করতে পারে। কিন্তু জীবনকে শুদ্ধ করতে পারে একমাত্র জ্ঞান। গীতায় সর্বত্রই তাই জ্ঞানের প্রশস্তি। ভারতীয়দের মন জ্ঞানের জন্য ব্যাকুল হোক। এই জ্ঞানোন্মত্ততা আসা খুব দরকার। তা এলে তাদের অধ্যাত্মজীবনও উত্তরোত্তর উন্নত হবে। ভারতীয় চিন্তার আলোকে আজকের জাগতিক ধর্মবর্জিত শিক্ষাও ধীরে ধীরে অতিজাগতিক মাত্রায় মণ্ডিত হবে। শিক্ষা তো এক জায়গায় থেমে থাকতে পারে না। জাগতিক শিক্ষাক্ষেত্রেও কি আমরা থেমে থাকি? থাকি না। একটি পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে এগিয়ে যাই। প্রাথমিক স্কুল থেকে হাইস্কুল, সেখান থেকে কলেজ, সেখান

থেকে আবার বিশ্ববিদ্যালয়—ধাপে ধাপে এভাবেই আমরা বাসযাত্রীর মতো এক স্টপেজ থেকে আর এক স্টপেজের দিকে এগিয়ে চলি। প্রতিটি ধাপে সাময়িক বিরতি, তারপর আবার এগিয়ে চলা। আমরা কোন পর্যায়ে থেমে গেলেও জ্ঞান কখনও থেমে থাকবে না। এই মনোভাবটি আমাদের ভিতর আসা চাই। তা যদি আসে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ হয়ে গেলেও আমরা জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখব; অন্তর্জগতে ডুব দিয়ে আমাদের প্রকৃত স্বরূপটি কি তা বুঝতে চেষ্টা করব, জীবনে উচ্চতর মূল্যবোধগুলিকে রূপ দেবার জন্য সচেষ্ট হবো। জ্ঞানযজ্ঞ চালিয়ে যেতেই হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন, 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'। আজ ইউনেসকো (UNESCO) সে কথারই প্রতিধ্বনি করে বলছে, শিক্ষা যে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক তা নয়; শিক্ষা প্রবাহ চলবে জীবন জুড়ে। স্কুল-কলেজের শিক্ষা নিতান্তই সীমিত। বি.এ, এম.এ পাশ করলেই যে জীবন শেষ হয়ে গেল, তা তো নয়। জীবন তো চলতেই থাকে। তাই সেই বাকি জীবনকেও শিক্ষা-অভিমুখী করে তুলুন। একেই আজ জীবনব্যাপী শিক্ষা বা lifelong education বলা হচ্ছে, যা বেদান্ত বহুকাল আগে থেকেই বলে আসছে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সেই ধারণাটিকেই বিস্তারিতভাবে বললেন।

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

—'হে পার্থ, একাগ্রচিত্তে তোমার এই [গীতাশাস্ত্র] শোনা হলো তো? তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট হয়েছে?'

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সরাসরি একটি প্রশ্ন করছেন। *কচ্চিৎ এতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়া,* যে সব কথা আমি এতক্ষণ বললাম, 'অর্জুন, তুমি কি তা শুনেছ; *একাগ্রেণ চেতসা,* 'একাগ্রচিত্তে'? তারপরই আবার জিজ্ঞাসা করেছেন, *কচ্চিৎ অজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়,* 'এখন কি তোমার অজ্ঞানতাপ্রসূত মোহ বিনষ্ট হয়েছে?' গীতায় এটিই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শেষ কথা। এবার অর্জুনের উত্তরটি শোনা যাক। ভারী চমৎকার উত্তর দিচ্ছেন অর্জুন।

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ।। ৭৩।।

অর্জুন বললেন—'হে অচ্যুত (কৃষ্ণ), আপনার কৃপায় আমার মোহ দূরীভূত হয়েছে এবং আমি আত্মস্মৃতি ফিরে পেয়েছি। আমার অস্থিরতা ও সন্দেহ চলে গেছে। আমি আপনার উপদেশ পালন করব।'

শ্রীকৃষ্ণ আগে অর্জুনকে বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে সর্বোচ্চ সত্য বলেছিলাম; এখন তুমিই সিদ্ধান্ত নাও।' *যথেচ্ছসি তথা কুরু,* 'যা উচিত মনে কর, তাই তুমি কর।' শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এখন অর্জুন বলছেন, *নষ্টো মোহঃ,* 'আমার অজ্ঞানতা দূর হয়েছে'; *স্মৃতির্লব্ধা,* 'আমার আত্মস্মৃতি ফিরে এসেছে'। অর্থাৎ স্মৃতি স্থির হয়েছে। অজ্ঞানতায় আমরা স্মৃতি হারাই। কিন্তু স্মৃতি যখন স্থির হয়, তখন অজ্ঞানতা বা মোহ চলে যায়। *ত্বৎ প্রসাদাৎ ময়াচ্যুত,* 'হে কৃষ্ণ, আপনার কৃপায়', আপনার উপদেশে আমার সমস্ত অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয়েছে। *স্থিতোঽস্মি,* 'এখন আমি স্থির'; অর্থাৎ আমার মন এখন স্থির হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার মধ্যে এই *স্থিত* কথাটি বারবার এসেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে *স্থিতপ্রজ্ঞ* অর্থাৎ 'আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি'-র লক্ষণগুলি বিস্তারিতভাবে দেখেছি আমরা। বাস্তবিক, যে মানুষের মন সর্বদা অস্থির, তাকেও স্থির করা যায়। এ এক অমূল্য চিন্তা! অবশ্য তার জন্য মনকে স্থিরতার তালিম দিতে হবে। ঐভাবেই মানুষ মানসিক শক্তিগুলিকে সংহত করে অতি উজ্জ্বল স্থির *বুদ্ধি* বিকশিত করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে এটি আমরা দেখেছি। এখন অর্জুন বলছেন, *গতসন্দেহঃ,* 'আমার সব সন্দেহ চলে গেছে; *সন্দেহঃ* মানে 'সংশয়' এবং *গত* মানে 'চলে গেছে'। সব শেষে বলছেন, *করিষ্যে বচনং তব,* 'আপনি যা করতে বলেছেন আমি তাই করব।' আমার আর অন্য কোন বিচার নেই, কোন সংশয় নেই, আমি নিশ্চিন্ত। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম দিকে অর্জুনকে বলেছিলেন, *উত্তিষ্ঠ,* 'উঠে দাঁড়াও', তোমার সামনে যে পরিস্থিতি, যে সংকট, তার মোকাবিলা কর। এই দুর্বলতা কেন? এই সংকটমুহূর্তে কাপুরুষতা কি তোমার শোভা পায়? এই মিথ্যা, অশোভন দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াও! সমস্যার মুখোমুখি হও। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু থেকেই এই মহা তেজ ও বীর্যের বজ্রবাণী শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে আসছেন। উদ্দেশ্য একটাই—অর্জুনকে বোঝানো এবং তাঁর সংবিত ফিরিয়ে এনে তাঁকে কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত করা। তার জন্যই এত উপদেশ।

শুধু অর্জুন নয়, আমাদের সকলেরই একটি জীবনদর্শন থাকা চাই, এমন একটি দর্শন যা প্রাত্যহিক জীবনে পথ দেখাতে পারে। দর্শন বলতে এখানে

পুঁথিগত দর্শনকে বোঝানো হচ্ছে না। দর্শন বলতে বোঝাতে চাইছি এমন এক গভীর চিন্তা, সদ্ ভাবনা বা আদর্শ যা সামনে রেখে, যার আলোয় আমরা জীবনের দৈনন্দিন ছোট ছোট কর্মগুলি সম্পাদন করতে পারি। চিন্তা, ভাবনা এবং আদর্শ—সব মিলিয়েই দর্শন। এই দর্শনই যেন আমাদের জীবন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। আদর্শ একটা সামনে থাকা ভাল—তা নির্ভুলই হোক, আর ত্রুটিপূর্ণই হোক। একটু ত্রুটিবিচ্যুতিতে কিছু যায় আসে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আদর্শ আছে এমন মানুষ যদি একশোটা ভুল করে, আদর্শহীন মানুষ এক হাজার ভুল করবে।' অতএব, একটি মতাদর্শ, একটি দর্শন সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে এবং সেই সঙ্গে সেই দর্শনকে যতটা সম্ভব নিখুঁত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। অর্জুনের কপাল ভাল; তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ দর্শনটি লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমরাও অভাগা নই; আমরাও একই শিক্ষার সাহায্য নিয়ে নিজের নিজের জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারি এবং পরে যদি উৎকৃষ্টতর শিক্ষার আলো পাওয়া সম্ভব হয়, সেই আলোয় নিজেদের ভুলত্রুটিগুলি সংশোধন করে নিতে পারি। *কিন্তু কর্ম ও সার্থক জীবনধারণের জন্য দর্শন একটা থাকতেই হবে।* দিনগত পাপক্ষয় করে গেলে হবে না। উদ্দেশ্যহীন জীবন নীরস, কারণ তাতে কোনরকম সৃজনশীলতা থাকে না। মানবজীবনে এইখানেই দর্শনের সার্থকতা। দর্শন না থাকলে সন্দেহ নিরসন করবে কে? যখন আমাদের সত্যিকারের জীবন শুরু হয় তখন নানা সংশয় পেয়ে বসে আমাদের, যে সমস্যা শিশুর নেই। কিন্তু যতই সে বড় হতে থাকে, ততই তার জীবনে সমস্যা ও সন্দেহ আসে। তার ফলে সে ক্রমশ জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জাগে তার। যতই তার জ্ঞানের পরিধি বাড়বে এবং সে জ্ঞান যত নিখুঁত ও নিবিড় হবে, ততই তার জীবন সমৃদ্ধ হবে, ততই সে ভালভাবে বাঁচতে পারবে। এই দিক থেকে দেখলে আমরা বুঝতে পারি সারা জীবন ধরেই বিকাশের প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। মন যদি সজাগ ও সক্রিয় হয়, তবে অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে নতুন নতুন চিন্তার দিগন্ত আমাদের সামনে উন্মোচিত হতে থাকে। কিন্তু মন নিষ্প্রভ ও নিষ্প্রাণ হলে ঘুরে ফিরে আমরা বারবার একই কর্মে প্রবৃত্ত হই; জীবনে নতুন কিছু আসে না। তাই দেখা দরকার, মনটি যেন মরে না যায়; মানসিকভাবে আমরা যেন সতেজ থাকতে পারি।

বহু মানুষ কিন্তু মানসিক দিক থেকে অল্পবয়সেই বুড়িয়ে যায়। সংসারজীবনে প্রবেশ করে একটি-দুটি সন্তান হওয়ার পর তাদের মানসিক মৃত্যু হয়, অর্থাৎ তাদের মনের আর কোনরকম উন্নতি হয় না। তাদের জীবনের বাকি তিরিশ-

চল্লিশটা বছর যেন গতিহীন, স্পন্দনহীন বদ্ধ জলা—সেখানে নতুনত্ব কিছুই নেই। এরকম হলে চলবে কেন? মনকে সতেজ ও সৃষ্টিশীল রাখতে হবে; একটা উৎসাহ ও সপ্রাণতার ভাব বজায় রাখতে হবে। বার্ধক্য এলে দেহের মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু মনকে মারব কেন? আমি তাকে সতেজ ও সজাগ রাখব। তা রাখতে পারলে সেই মনে *চিন্তাশীলতা* আসবে। এটিই *মনুষ্য* শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দর বলতেন—*মানহুঁশ* যে, সেই *মানুষ।* ঐ কথারই প্রতিধ্বনি একটি হিন্দী বচনে পাওয়া যায়, যার অর্থ 'মনের দিকে যার খেয়াল থাকে, সেই মানুষ। যার হুঁশ শুধু দেহের ব্যাপারে, পেটে—সে অমানুষ।' বাস্তবিক, সব দিক থেকে সে জন্তু ছাড়া কিছু নয়।

অসাধারণ ভক্তিশাস্ত্র *শ্রীমদ্ভাগবত*-এ পাঁচবছর বয়সী ভক্ত প্রহ্লাদের একটি কাহিনি আছে। একদিন শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর সতীর্থদের বলছেন ঃ

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতান্ ইহ।
দুর্লভং মানুষং দেহং তদপি অধ্রুবম্ অর্থদম্ ॥

প্রায় দু-হাজার বছর আগে রচিত এই মহাপুরাণ; কিন্তু লক্ষ্য করুন এখনও তার বাণী কতটা প্রাসঙ্গিক, কত সতেজ ও সপ্রাণ! ছোট্ট ছেলে প্রহ্লাদ বলছেন, *কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতান্ ইহ। ইহ,* অর্থাৎ এই জীবনেই, এই জগতেই, শৈশব থেকেই, বয়স যখন বারোর নিচে থাকে, তখন থেকেই *ভাগবতধর্ম* অনুশীলন করা উচিত। কিন্তু এই *ভাগবতধর্ম*-টি কী? এই ধর্ম কী বলে? এই ধর্ম বলে, আমি স্বরূপত শাশ্বত আত্মা। অন্যদের স্বরূপও তাই। আত্মদৃষ্টিতে দেখলে আমরা সকলেই এক। এই কারণেই প্রেম, করুণা, সেবা ও অহিংসার অনুশীলন আমাদের করা উচিত। এই ভাগবতধর্ম *ভাগবত* এবং গীতারও উপজীব্য। আমরা যখন কুমার বা কুমারী, যখন আমাদের দেহে ও মনে প্রচুর শক্তি ও উৎসাহ থাকে, তখন থেকেই এইসব সদ্‌গুণ আয়ত্ত করার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই জীবন শুরু করতে হবে। *ইহ,* 'এই জগতেই', এই সমাজে থেকেই সেই অনুশীলন করে যেতে হবে। কেন? তার কারণ, *দুর্লভং মানুষং দেহং,* 'মানুষের দেহ পাওয়া অতি দুর্লভ'। আর যদিই বা পান, তা তো বেশিদিন থাকবে না। যেকোন মুহূর্তেই দেহ চলে যেতে পারে। দেহের এই অনিত্যতাবোধ থাকলে তবেই ব্যাকুলতা আসে। এই কারণেই প্রহ্লাদ 'কুমার' বয়স থেকেই ভাগবতধর্ম অনুশীলনের ওপর এত জোর দিয়েছেন। এই বিরাট পৃথিবীতে মানুষ কত জন? বড় জোর ৪০০ কোটি। সেখানে যেকোন প্রজাতির কীট-পতঙ্গের

সংখ্যাই হয়তো ৪০০ কোটি হবে। অতএব মনুষ্যজন্ম সুদুর্লভ। মনুষ্যজন্ম পেয়েছি বলেই একথা ভাবা উচিত হবে না যে এই শরীর চিরকাল থাকবে। যে কোন মুহূর্তে এই দেহ নষ্ট হতে পারে। *তদপি অধ্রুবম্,* 'এদেহ অনিত্য'; কিন্তু *অর্থদম্,* ভালভাবে কাজে লাগালে এই দেহই আবার 'শ্রেষ্ঠ ফল দিতে পারে', আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে।

প্রহ্লাদ তাই বলেছেন, অল্পবয়স থেকেই একটি দর্শন বা জীবনাদর্শ অবলম্বন করে, জীবনযাপন করার চেষ্টা করতে হবে। চলার পথে ভুলত্রুটি কিছু হতেই পারে, কিন্তু ওগুলোকে বিশেষ আমল দিতে নেই। ভুল যদি হয়, আমরা নিজেদের শুধরে নেব। কিন্তু ভুল হতে পারে এই ভেবে গালে হাত দিয়ে বসে থাকার কোন যুক্তি নেই। এই বিশেষ ব্যাধিতে এদেশের মানুষ একটু বেশি পরিমাণে ভোগেন। তাঁরা ভাবেন, 'আমি ঐ কাজটি করতে গেলে হয়ত বা কিছু ভুল করে বসব। অতএব কাজে হাত না দিয়ে চুপচাপ থাকাই ভাল!' এই 'চুপচাপ থাকার দর্শন' আমাদের দেশে আগে খুব চালু ছিল। *কিন্তু ওটি ভ্রান্ত দর্শন।* কাজে হাত লাগানো সব সময়েই ভাল। সে কাজের জন্য যদি আমার সমালোচনা হয়, হোক। সে সমালোচনা আমি ভাল মনে গ্রহণ করে বিচার করে দেখব, সত্যিই আমার তরফে কোন ত্রুটি হয়েছে কিনা। যদি হয়, ভুল সংশোধন করে নেব; নাহলে ঐ সমালোচনা উপেক্ষা করব। ব্যস, সব গোল মিটে গেল। কিন্তু ভাল কাজে হাত লাগানো চাই। কাজ না করে, অলস হয়ে কেন জীবন কাটাব? সেটা হওয়া অনুচিত। কাজের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের নিখুঁত করে গড়ে তুলব। প্রহ্লাদ তাই বলছেন, *অর্থদম্,* অর্থাৎ শুভ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা মহৎ ফললাভ করব। এই জন্মেই আমরা অনুভব করব আমরা কৃতকৃত্য হয়েছি, আপ্তকাম হয়েছি; অর্থাৎ মানুষ হয়ে যা লাভ করার ছিল তা লাভ করেছি। এ অবস্থায় আমাদের জীবন আর জৈবস্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না, তার অনেক ঊর্ধ্বে উঠে যায়। তখন আমরা সকলের সঙ্গে একাত্ম—অন্যের সুখে সুখবোধ করি, অন্যের কষ্ট দেখলে কষ্ট পাই। তখন আমাদের জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেঙে গেছে, দেহের সীমাবদ্ধতা আমরা অতিক্রম করেছি; আমরা আর কারো থেকে আলাদা নই তখন। *একেই আধ্যাত্মিক বিকাশ বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলা হয়।* এই একাত্মতার অনুভূতি আমরা এই জীবনে এবং এখনই লাভ করতে পারি। কী অসাধারণ অবস্থা একবার কল্পনা করুন! বাস্তবিক, এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগা চাই ঃ দেহের গারদে কেন আমি চিরকাল বন্দি থাকব? যন্ত্র হিসাবে দেহটা কাজের। এটি ভৃত্য হিসাবে ভাল, কিন্তু এটি যদি প্রভু হয়ে

বসে তো সর্বনাশ। দেহ প্রভু হলে আমরা পশুর স্তরেই থেকে যাব, আমাদের আর ঊর্ধ্বগতি হবে না। তাই দেহকে দাস করে রাখতে হবে, কারণ দেহ ছাড়াও আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যার বিকাশ দরকার। এগুলি সম্ভব হতে পারে যদি গীতার মতো একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন সম্বল করে জীবনযাপন করার চেষ্টা করি। তাহলে যখনই সংশয় আসবে তখনই ঐ দর্শনের সাহায্য নিতে পারব এবং তার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারব। পথনির্দেশ পাওয়ার জন্য আমরা অন্যান্য মূল্যবান বইপত্রও পড়ি, অন্যান্যদের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনাও করি। তাতে আমরা বুঝতে পারি আমাদের জীবনের যেসব সমস্যা, সেগুলি তাঁদের জীবনেও এসেছিল এবং কিভাবে তাঁরা সব সমস্যার সমাধান করেছেন! আমাদের শাস্ত্রে ভারি সুন্দর একটি কথা আছে। সেখানে বলা হয়েছে *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা,* 'মহাজনরা যে পথ ধরে গেছেন, সেটিই পথ', অর্থাৎ সমস্যা সমাধানের সেটিই রাস্তা। আমরাও সেই পথ ধরে চলে উপকৃত হতে পারি। তাঁদের দৃষ্টান্ত তো সামনেই রয়েছে; তাঁদের অভিজ্ঞতাই আলোকস্তম্ভের কাজ করবে। এই যে অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া, তা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন আমাদের মন সজীব ও সচেতন থাকে। মন গাছের মতো। গাছ সজীব হলে মাটি ও বাতাস থেকে পুষ্টি নিতে পারে। কিন্তু মৃত গাছ তা পারে না। অর্জুনের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে দর্শন কেমন করে আমাদের মনের সন্দেহ ও সংশয় নিরসন করে কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করে দেয়। এই কর্মপন্থা ঠিক করে দেওয়াই দর্শনের কাজ—আলো জ্বেলে পথ দেখিয়ে দেওয়া। বাকিটা আমাদেরই করতে হবে। পথ আমাদেরই চলতে হবে। কিন্তু আলোটি আসে কোথা থেকে? আমাদের অন্তরাত্মা থেকেই। সেই আলো সম্বল করে আমরা যাত্রা শুরু করি এবং চলতেই থাকি। পথে সন্দেহ এলে এই দর্শনের দিকে আবার ফিরে তাকাই। এই জ্ঞানদীপ হাতে নিয়ে দুর্গম ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যেও আমরা পথ খুঁজে পাই। অর্জুনেরও এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এক অনবদ্য জীবনদর্শন উপহার দিয়েছিলেন। মনে রাখবেন, সেই দর্শন এই পৃথিবীতে জীবনযাপনের দর্শন, *পর-জীবনের* নয়।

তাই অর্জুন বলছেন, *নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ প্রসাদাৎ ময়াচ্যুত।* যিনি মহান আচার্য, তিনি হয়ত অসাধারণ কিছু আলোচনা করলেন যা শুনে শ্রোতাদের মন এমন আলোকিত হলো যে তাঁদের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। এমন শিক্ষককে আমরা কত না শ্রদ্ধা করি! কারণ তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুটি আমাদের উপহার দেন। সেটি কী? জ্ঞান। জ্ঞান দানকেই ভারতীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দান বলা হয়েছে।

মনে করুন এক ব্যক্তি কাউকে বেশ কিছু অর্থ অথবা জ্ঞান, এই দুটি জিনিসের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বললেন। যিনি উন্নত মনের মানুষ, তিনি জ্ঞানকেই বেছে নেবেন। কারণ টাকা দু-দিনের; আজ নিলে কালই ফুরিয়ে যাবে। অন্য দিকে জ্ঞান আমাদের জীবনকে উন্নত থেকে উন্নততর করে তুলবে। তাই কিছু অর্থলাভ করার চাইতে জ্ঞানলাভই শ্রেয়। একটি সংস্কৃত শ্লোকে বলা হয়েছে, *বিদ্যাধনং সর্বধন প্রধানম্*, 'বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য'। যত টাকাই আপনার থাকুক তা কখনও জ্ঞান বা প্রজ্ঞারূপ ঐশ্বর্যের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। অর্জুন সেই মহামূল্য ঐশ্বর্য শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে উপহার পেলেন, যার ফলে তিনি জানতে পারলেন কঠিন সংকটে, জীবনের দুরূহ পরিস্থিতিতে কিভাবে চলতে হয়।

অর্জুন তাই বললেন, *স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব,* 'আমি স্থির হয়েছি, আমার সব সন্দেহ চলে গেছে এবং যে পথনির্দেশ আপনি দিয়েছেন, আমি তা অনুসরণ করব।' অর্থাৎ, আপনি বলেছেন বলেই যে আমি আপনার নির্দেশ পালন করব তা নয়, আমি ভেবেচিন্তে তা সত্য বলে মনে করছি বলেই তা মেনে চলব। শ্রীকৃষ্ণও তাই চান। তিনি না-বুঝে-ঘাড়-নাড়া শিষ্য চান না; তিনি চান তাঁর ভক্তরা বুদ্ধিমান হবে। গুরু যত মহান হবেন, শিষ্যকে তিনি তত বেশি স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ দেবেন। গুরু যত সামান্য হবেন, শিষ্যের স্বাধীনতাও সেই অনুপাতে খর্ব হবে। সেক্ষেত্রে, গুরু যা বলবেন, শিষ্যকে তা মুখ বুঁজে মেনে চলতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুকে সাপের সঙ্গে তুলনা করতেন। কোন গুরু হয়তো ঢোঁড়া সাপ, আবার কোন গুরু হয়তো কেউটে। কথামৃতে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ 'আমি একদিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলাম। শুনতে পেলুম যে, একটা কোলা ব্যাঙ খুব ডাকছে। বোধ হলো সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি, তখনও দেখি, ব্যাঙটা খুব ডাকছে। একবার উঁকি মেরে দেখলুম কি হয়েছে। দেখি, একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙটাকে ধরেছে—ছাড়তেও পাচ্ছে না—গিলতেও পাচ্ছে না—ব্যাঙটার যন্ত্রণা ঘুচছে না। তখন ভাবলাম, ওরে! যদি জাতসাপে ধরত, তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেত। এ-একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কি না, তাই সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাঙটারও যন্ত্রণা!... যদি সদ্‌গুরু হয়, জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে। গুরু কাঁচা হলে গুরুরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা! শিষ্যের অহংকার আর ঘুচে না, সংসারবন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।'[১]

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অখণ্ড সংস্করণ, ২০০১, উদ্বোধন, পৃঃ ১১৯

তাই বলছিলাম, যিনি সদ্গুরু, তিনি আমাদের নিজস্ব বুদ্ধি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোয় পথ চলার স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরকম গুরু ছিলেন। শঙ্করাচার্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণও এইরকম গুরু ছিলেন। তাঁরা একদিকে যেমন গগনচুম্বী আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন প্রচণ্ড স্বাধীনতা। মানুষের প্রকৃত উন্নতির জন্য এই স্বাধীনতার একান্ত প্রয়োজন। বেদান্তে এই স্বাধীনতার ওপর প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজে দেওয়া একটি বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন, 'উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতা।'[১] বাস্তবিক, স্বাধীনতা হরণ করুন, দেখবেন উন্নতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। স্বাধীনতা শব্দটি তাই বেদান্তের এত প্রিয়।

এখানেই শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের যে দিব্য সংলাপ, তার পরিসমাপ্তি হয়েছে। বাকি যে কটি শ্লোক, সেখানে আর আমরা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের বলা কোন কথা পাব না। সেখানে প্রতিবেদক সঞ্জয় কিছু বলবেন, সেই সঞ্জয় যাঁকে আমরা প্রথম অধ্যায়ে পেয়েছিলাম। তাঁর কথা দিয়েই গীতার ইতি হবে।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরের প্রাসাদে উপবিষ্ট। হস্তিনাপুর দিল্লীর কাছেই। একশো মাইল দূরে কুরুক্ষেত্র। সেখানে যুদ্ধ আসন্নপ্রায়। যুদ্ধক্ষেত্রে কি ঘটছে তা জানার জন্য দৃষ্টিহীন ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল। এমন সময় সেখানে ঋষি ব্যাসদেবের আগমন হলো এবং তিনি সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দিলেন যাতে হস্তিনাপুরে বসেই তিনি যুদ্ধের দৃশ্যাবলী দেখতে পান এবং ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে পারেন। সে যুগে তো আর এখনকার মতো টেলিভিশন ছিল না। শুধু মানসিক শক্তির জোরেই তিনি বর্ণনা দিয়ে গেলেন! গীতা শুরু হয়েছিল ধৃতরাষ্ট্রের একটি প্রশ্ন দিয়ে। তিনি সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে সঞ্জয়, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার পুত্রদের সঙ্গে পাণ্ডবদের কী হলো?' আর তিনি কোন প্রশ্ন করেননি। তার উত্তরে সঞ্জয় যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তা তো আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এখন সমাপ্তিসূচক অংশে সঞ্জয় আপ্লুত হয়ে কিছু বলবেন।

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।
সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

---

১ বাণী ও রচনা, ৫ খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ১০৬

সঞ্জয় বললেন—'আমি বাসুদেব (কৃষ্ণ) এবং মহাত্মা অর্জুনের এইরকম অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কথাবার্তা শুনলাম।'

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ; সংবাদম্ ইমম্ অশ্রৌষম্, 'শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাত্মা অর্জুনের মধ্যে এইরকম কথাবার্তা আমি শুনতে পেলাম'। *মহাত্মনঃ* মানে 'মহানুভব'। অর্জুন তো তাই ছিলেন। *ইমম্,* 'এই'; *সংবাদম্,* 'কথোপকথন' বা কথাবার্তা; *অশ্রৌষম্,* 'আমি শুনতে পেলাম।' সে কথাবার্তা কীরকম? *অদ্ভুতং,* 'বিস্ময়কর'; *রোমহর্ষণম্,* 'রোমাঞ্চকর', অর্থাৎ যা শুনলে তীব্র আনন্দে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। এখানে এটিই সঞ্জয়ের প্রথম মন্তব্য। এরপর ভাবাবিষ্ট হয়ে তিনি আরো বলছেন ঃ

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্ ।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

—'ব্যাসদেবের কৃপায় যোগেশ্বর কৃষ্ণের মুখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে আমি এই অতীব গুহ্য যোগতত্ত্ব শুনেছি।'

ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবান্ অহং, 'ব্যাসদেবের কৃপায় আমি' এই অসাধারণ কথাবার্তা 'শোনার সুযোগ পেয়েছি।' একথা বলার কারণ ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন, যাতে তিনি হস্তিনাপুর প্রাসাদে বসেই কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধের ঘটনাবলি দেখতে পান এবং সেই বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে দিতে পারেন। *ইমম্ গুহ্যম্ পরম্,* 'এই পরম গুহ্য'; কী গুহ্য বিষয় তিনি শুনলেন? *যোগং,* 'যোগের তত্ত্ব'। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কী শিক্ষা দিলেন? যোগের দর্শন। এই 'যোগং' বা যোগ শব্দটির মধ্যেই গীতার আঠারোটি অধ্যায়ের নির্যাস ধরা আছে। ঐ একটি শব্দের মধ্য দিয়েই সব কথা বলা হয়ে গেল। তাই যোগ শব্দটির অসামান্য তাৎপর্য, যদিও যোগ শুনলে সাধারণ মানুষের মনে যোগব্যায়াম অথবা অলৌকিক কাণ্ডকারখানার ছবিটিই ভেসে ওঠে। কিন্তু যোগ তা নয়। যোগ যে কত গভীর তা তাঁরা জানেন না। গীতায় যোগের সেই অপূর্ব আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে এবং এই তত্ত্ব জানতে আজকের.মানুষ উদ্গ্রীব। আমি দেখেছি লোকে ব্যায়াম-ট্যায়াম দিয়েই যোগ শুরু করেন, কারণ এর বেশি কিছু তাঁরা জানেন না। যখন তা জানতে পারেন, তখন একেবারে মুগ্ধ হয়ে যান।

আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৭০ সাল। আমেরিকা যাওয়ার পথে আমি জেনিভার একটি হোটেলে আছি। নিউইয়র্কের 'টেম্পল্

অফ আনডারস্ট্যান্ডিং' (Temple of Understanding) সফরের সব ব্যবস্থা করেছেন। হঠাৎ একদিন দেখি ডঃ রমা পোল্ডারম্যান (Dr. Rama Polderman) তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হাজির। পোল্ডারম্যান হল্যান্ডের মানুষ। ভারতবর্ষকে খুব ভালবাসেন। তাঁর সঙ্গে আমার আগে থেকেই পরিচয় ছিল, কারণ তিনি ভারতে এসেছিলেন। সে যাই হোক, পোল্ডারম্যান আমাকে ধরে বসলেন হল্যান্ড যেতে হবে এবং তাদের কাছে যোগ-এর ওপর বলতে হবে। তাঁরা ইতোমধ্যেই 'Stichting Yoga Netherlands' নামে যোগ অনুরাগীদের একটি দল তৈরি করে যোগচর্চা শুরু করে দিয়েছিলেন। আমি বললাম, 'এবছর হচ্ছে না, সামনের বছর, অর্থাৎ একাত্তর সালে যাব।' আমি এও বললাম: দেখুন, আমি যোগ-ব্যায়ামের (তখন তাঁরা ঐ ধরনের যোগ অভ্যাস করতেন) ওপর বলব না, আমি যোগের আধ্যাত্মিক এবং দর্শনের দিকটি, অর্থাৎ বেদান্ত নিয়ে বলতে পারি। ওঁরা বললেন: 'আমরা তো সেইটিই চাই'। এই বলে তাঁরা চলে গেলেন এবং আমিও আমেরিকায় পাড়ি দিলাম।

এই কথা মতো ১৯৭১-এ ওঁরা আমাকে প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দিলে আমি হল্যান্ড যাই। তিন সপ্তাহ ছিলাম। তার মধ্যে প্রথম দুটি সপ্তাহ বিভিন্ন শহরে এবং অ্যামস্টার্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতেই কেটে গেল। শেষ সপ্তাহে ডঃ রমা ও তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা একটা রিট্রিট-এর (বেদান্ত বা যোগশিবির) আয়োজন করেন। উস্টারবিক্ (Oosterbeek) গ্রামে একটা গোটা হোটেল ওঁরা ভাড়া করেছিলেন যেখানে ৬০জন এক সঙ্গে থাকতে পারেন। পুব দিকের শহর 'আর্নেম' (Arnehm)-এর কাছেই ছিল সেই হোটেলটি। ডাচ ভাষায় 'উস্টার' মানে পুবদিক এবং 'বিক্' মানে নদী। আসলে ওটি জার্মানীর পশ্চিম কোল ঘেঁসে বয়ে যাওয়া 'রাইন' নদী।

রিট্রিটে প্রায় ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ অধ্যাপক, কেউ ডাক্তার; অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে এবং গৃহবধূও বাদ যাননি। সকালের দিকে এবং বিকেলে উপনিষদ্ এবং গীতার ওপর শ্লোক ধরে ধরে আমি বক্তৃতা করতাম। ওঁরাও বই সঙ্গে রাখতেন। বক্তৃতার পর এক ঘণ্টা বা তারও বেশি প্রশ্নোত্তরপর্ব চলত। সেই একটা সপ্তাহ যে আমরা কী আনন্দে কাটিয়েছিলাম তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই! রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য ও বেদান্ত বিষয়ক বইপত্র ঐ সময় বেশ বিক্রি হয়েছিল।

সপ্তম দিন সন্ধ্যায় আনন্দের হাট ভাঙার আগে একটি বিদায়ী সভা অনুষ্ঠিত

হলো। দুজন আমাকে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে বললেন, 'আপনি যে মূল্যবান ভাব ও আদর্শগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই।'

শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে *যোগ*-এর কথা শুনে তাঁর কী ধরনের অপার্থিব অনুভূতি হয়েছিল, তা সঞ্জয় এই শ্লোকে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই ধরনের অনুভূতি হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। কারণ *যোগ* ব্যাখ্যা করেছেন কে? স্বয়ং যোগেশ্বর। *কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্,* 'সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণের মুখ থেকে'। সঞ্জয় বলছেন ঃ 'তিনি অর্জুনকে এই যোগের বাণী দিয়েছেন এবং *তা শোনার সুযোগ আমার হয়েছে।'* সঞ্জয়ের এই অভিজ্ঞতা আজ বিশ্বের বহু মানুষের, বিশেষ করে বিদেশীদের হচ্ছে। এদেশের মানুষদের ততটা হচ্ছে না, কারণ তাঁদের মনোভাব 'এসব তো আমরা জানি—এর মধ্যে আর নতুন কী আছে?' নতুন নয়, তাই অর্থহীন—বুঝুন আমাদের অবস্থা! কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে তা নয়, তাঁদের কাছে চিন্তাগুলি নতুন। তাঁরা সর্বদা নতুন চিন্তার *খোঁজে* থাকেন, যা আমরা করি না। *মূল্যবান* বস্তু তখনই *মূল্যবান হয় যখন আমরা তার অন্বেষণ করি।* ভারতবর্ষের বহু মানুষের ভাব হলো—বাড়িতে তো শ্রীকৃষ্ণের ছবি আছে, বই-এর তাকে একখানা গীতাও আছে; এর বেশি আর কী প্রয়োজন!

এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *সাক্ষাৎ ভগবান* শ্রীকৃষ্ণ যোগের শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমি সঞ্জয়, তা শুনেছি। কী পরম সৌভাগ্য একবার কল্পনা করুন! পরের শ্লোকে সঞ্জয় তাঁর আনন্দের অনুভূতি আরো একটু উচ্ছ্বাসভরে প্রকাশ করছেন।

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

—'হে রাজা, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের এই পবিত্র ও বিস্ময়কর সংলাপ বার বার স্মরণ করে আমি মুহুর্মুহু পুলকিত হচ্ছি।'

ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে সঞ্জয় বলছেন, *রাজন্,* 'হে রাজা'; *সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য,* 'বারংবার স্মরণ করে'। কী স্মরণ করে? *ইমম্ অদ্ভুতম্ পুণ্যং সংবাদম্,* 'এই আশ্চর্য পুণ্য সংলাপ'; *কেশব অর্জুনয়োঃ,* 'শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের মধ্যে'; *হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ,* 'আমি বারবার পুলকিত হচ্ছি'।

যা সত্যিই ঘটেছিল, সেই অনুভবটিকেই সঞ্জয় আবার এই শ্লোকে মেলে ধরেছেন। বার্লিনে এক জার্মান যুবকের এমনটিই হয়েছিল। বক্তৃতা দিয়ে মঞ্চ

থেকে নেমে আসছি, ঠিক এমনি সময় সে আমার কাছে এসে, আমার দিকে বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল, 'স্বামীজী, আজ আপনার মুখে অদ্ভুত কথা শুনলাম, যা আমার জীবনে আগে কখনও শুনিনি।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী কথা?' সে বলল, 'ঐ যে আপনি বললেন—"প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটি দিব্য স্ফুলিঙ্গ আছে।" একথা আমি কখনও শুনিনি। কিন্তু আজ শোনামাত্র মনে হলো, এ এক অপূর্ব শিক্ষা। আমি মুগ্ধ। আমি এ বিষয়ে আরো জানতে চাই।' তখন বুঝলাম সে আমার দিকে অমন করে তাকিয়েছিল কেন! বলুনতো, ঐ যুবকের মুখটি আমি কেমন করে ভুলব? ভোলা যায়? তার মুখে সেদিন যেন সঞ্জয়ের অভিব্যক্তিটিই ফুটে উঠেছিল। সঞ্জয় এখানে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন প্রসঙ্গে বললেন, 'আমি সেই বিস্ময়কর কথাবার্তা শুনেছি।' তারপর বললেন, সে কথা স্মরণ করে 'আমি বারবার পুলক অনুভব করছি।' বলছেন—'বারবার'। কথাটি লক্ষ্য করার। এরপর সঞ্জয় একাদশ অধ্যায়োক্ত শ্রীকৃষ্ণের *বিশ্বরূপ* দর্শনের অভিজ্ঞতাটি বলছেন ঃ

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

—'হে মহারাজ, শ্রীহরির [শ্রীকৃষ্ণের] সেই অতি অদ্ভুতরূপ বারবার স্মরণ করে আমার মহা বিস্ময় [হচ্ছে] এবং বারবার [আমি] পুলকিত হচ্ছি।'

সঞ্জয় বললেন, আমি সেই সময় শ্রীহরির, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের, অতি অদ্ভুত রূপ দর্শন করেছি। সেই রূপ দেখার ফলে তাঁর কী অনুভূতি হচ্ছে? *তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য,* 'তা যখন বারবার স্মরণ করছি'; কী স্মরণ করছেন? *রূপম্ অত্যদ্ভুতং হরেঃ,* 'শ্রীহরির অতি অদ্ভুত রূপ' শ্রীকৃষ্ণের *বিশ্বরূপ; বিস্ময়ো মে মহান্,* 'আমার মহা বিস্ময় উপস্থিত হচ্ছে'; *হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ,* 'আমি প্রতি মুহূর্তে আনন্দে পরিপূর্ণ হচ্ছি।'

শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপের কথা জেনে আজকের বহু মানুষও অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। একাদশ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, তবুও সে কথা এখানে আবার বলছি। বিখ্যাত পরমাণুবিজ্ঞানী ওপেনহাইমার যখন আমেরিকার মরুভূমিতে বিশ্বের প্রথম আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ দেখেছিলেন, তখন গগনচুম্বী লেলিহান অগ্নিশিখাটি দেখে গীতার একাদশ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকটিই তাঁর মানসলোকে ভেসে উঠেছিল ঃ

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥

শ্লোকটির অর্থ ঃ 'পূর্ব আকাশে যদি একসঙ্গে সহস্র সূর্যের উদয় হয়, তার যে সম্মিলিত প্রভা, তাও সেই বিশ্বরূপের দীপ্তির তুলনায় কিছুই নয়।' ওপেনহাইমার সেই দৃশ্য দেখেছিলেন। ভাবুন তো, এক হাজার সূর্য একসঙ্গে উঠলে সেই দীপ্তি কীরকম হতে পারে!

সঞ্জয়ও এই শ্লোকে সেই বিশ্বরূপ দর্শনের অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা ও তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। এই কথা বলার পর তিনি গীতার সর্বশেষ শ্লোকে একটি সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, গীতার *যোগশিক্ষা* যদি ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি উপলব্ধি করতে পারে এবং তা জীবনে বাস্তবায়িত করে, তাহলে একই সঙ্গে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে এক মহা আশীর্বাদ নেমে আসবে। এই শ্লোকটি আমার বিশেষ পছন্দ। অন্তিম এই শ্লোকে সঞ্জয় বললেন ঃ

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮॥

—'যেখানেই যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেখানেই গাণ্ডিবধারী অর্জুন, সেখানেই সমৃদ্ধি, জয়, কল্যাণ এবং অবিচল নীতি—এই আমার দৃঢ় প্রত্যয়।'

যত্র, 'যেখানে'; *যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো,* 'যোগবিশারদ শ্রীকৃষ্ণ'; *যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ,* 'যেখানে গাণ্ডিবধারী অর্জুন'। অর্জুন মস্তবড় তিরন্দাজ ছিলেন, তাঁর হাতে সর্বদা গাণ্ডিব থাকত। এর অর্থ তিনি কর্মবীর ছিলেন। আক্ষরিক অর্থে, এর অর্থ প্রচণ্ড কর্মবীর। আর শ্রীকৃষ্ণ? তিনি অতুলনীয় শান্ত ব্যক্তিত্ব; অন্তরটি তাঁর প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ; সমগ্র মানবজাতির প্রতি করুণায় ভরপুর; এবং সর্বোপরি মহান আচার্য। *তত্র,* 'সেখানে', তাঁরা যেখানে থাকেন, তা সে পরিবারই হোক, সমাজই হোক অথবা জাতি হোক; সেখানে কী আশীর্বাদ নেমে আসে? বলা হচ্ছে, *শ্রী,* অর্থাৎ 'সমৃদ্ধি'। *শ্রী*-র বিপরীত অবস্থাটি কী? দারিদ্র্য এবং চরম দুর্দশা, যাকে শ্রীহীন বলি আমরা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'বাড়ির সামনে আলো জ্বেলে রাখতে হয়'। কেন? তাতে বোঝা যায় গৃহে *শ্রী* আছে। আলো না জ্বললে তা *শ্রী*-হীন। এই কারণে সাধারণত আমরা বাড়ির সামনের দিকে একটা আলো জ্বেলে রাখি। বিজলিবাতি যদি নাও হয়, নিদেনপক্ষে একটি প্রদীপ। অতএব দেখা যাচ্ছে, যদি ব্যক্তি চরিত্রে, সমাজ জীবনে এবং জাতির জীবনে শ্রীকৃষ্ণ

এবং অর্জুনের মিলিত শক্তির প্রকাশ হয়, তবে প্রথম যে বস্তুটি আমরা লাভ করব তা হলো *শ্রী।*

এরপর আসছে দ্বিতীয় আশীর্বাদের কথা। সেটি কী? *বিজয়ো,* 'সাফল্য'। আমাদের কর্ম করতে হবে, তবেই তো সাফল্যের প্রশ্ন। তা যদি করি, তাহলে সাফল্য আসবে, জয় হবে। তা যদি না করি, ভাল কাজ করার শক্তি ও আগ্রহ যদি না থাকে, যদি আবোল তাবোল এটা-ওটা করে বেড়াই, তবে বার বার পরাজয় আসবে, ব্যর্থতা আসবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শক্তি সম্মিলিত হলে, তা থেকে বারবার সাফল্যই আসবে।

তৃতীয় সুফল হচ্ছে *ভূতিঃ* বা 'অভ্যুদয়'; সর্বত্র কল্যাণ বা উন্নতি হবে। চতুর্থ সুফল হলো *ধ্রুবা নীতিঃ,* সমাজে 'সর্বদা নীতি ও ন্যায়বিচার' থাকবে। তাহলে দেখছি *শ্রীঃ, বিজয়ঃ, ভূতিঃ* এবং *ধ্রুবা নীতিঃ,* অর্থাৎ যথাক্রমে আর্থিক সমৃদ্ধি, সব কাজে সাফল্য, রাষ্ট্রীয় কল্যাণ সম্পর্কে উচ্চ মূল্যবোধ এবং সবশেষে নৈতিক চেতনা—এই চারটি ফলের কথা এখানে বলা হয়েছে।

আমার ছাত্রজীবনে দেখেছি, বইপত্র, জ্যামিতির বাক্স ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস টেবিলে রেখেই আমরা অন্যত্র যেতে পারতাম। সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখতাম যেখানকার জিনিস সেখানেই আছে। এতটুকু নড়চড় হয়নি। আজ পাঁচমিনিটও থাকবে না! এটি সমাজব্যবস্থার দোষ। আজ সমাজে *ধর্মভাবটি* ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ফলে, অন্যের জন্য চিন্তা, আত্মসম্মান সব আমরা খুইয়ে বসেছি। কেন? তার একটিই কারণ—অর্থপ্রীতি। *অর্থলালসা মানুষের সব গুণ নষ্ট করে দিতে পারে।* আজ ভারতীয় সমাজ সেই ব্যাধিতেই ভুগছে। গীতায় যে *যোগের* শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তার সামান্য এক বিন্দু যদি এ দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তাহলে সমাজের গোটা চিত্রটাই বদলে যাবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ একথা বলেছিলেন। যোগের এই শিক্ষা শুরু করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ,* 'এই ধর্মের সামান্য একটু আচরণও আমাদের মহাভয় থেকে রক্ষা করবে'। এখানে বলা হচ্ছে না, হয় পুরোপুরি কর, না হয় মর। বলা হয়েছে—এই ধর্মের সামান্য একটু অনুষ্ঠানও কল্যাণকর।

তাই সঞ্জয় বলছেন, গীতার *যোগ* অনুসরণ করলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সব কাজে সাফল্য, উন্নতমানের রাষ্ট্রীয় কল্যাণাদর্শ, নৈতিক সচেতনতা, অবিচল নীতি এবং নীতিপরায়ণতা সমাজে আসবে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারতবর্ষ থেকে যে বস্তুটি উধাও হয়েছে তার নাম সামাজিক সুবিচার বা ন্যায়পরায়ণতা। সমাজের সর্বস্তরে আজ অন্যায়ের দুঃশাসন মাথা চাড়া দিয়েছে। আইন আছে, কোর্ট-কাছারি আছে, বিচার আছে— যা যা থাকা প্রয়োজন সবই আছে। কিন্তু আইন এবং ন্যায়ের মুখ দেখাদেখি নেই বললেই চলে। কোনকিছু আইনসম্মত হলেই যে ন্যায় হবে, তা নয়। কারণ আইন তো টাকা দিয়ে কেনা যায়! ন্যায় কিন্তু কেনা যায় না। আজ আমাদের দেশের মানুষকে এই সত্যটি বুঝতে হবে। যে সমাজে আইন এবং ন্যায় হাত ধরাধরি করে চলে, সেই সমাজই ঠিক ঠিক উন্নত বা প্রগতিশীল। আদালত যা সঠিক বলে রায় দেবে, তাকে সব দিক থেকেই ন্যায় সংগত হতে হবে। প্রগতিশীল সমাজে এইরকমই হয়ে থাকে। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হয়? তার উত্তর *ধর্ম*-এর সাহায্যে। যেখানে *ধর্ম* আছে, সেখানে আইন ও ন্যায়-এর সহাবস্থান। যেখানে *অধর্ম*, সেখানে আইন এক দিকে যায়, ন্যায় আর এক দিকে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্-এ একটি সুন্দর কথা আছে। সেখানে বলা হয়েছে, *ধর্ম* নামক মূল্যবোধটি বিশ্বপ্রকাশক স্বয়ং মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। ফলে, সকলের ভিতরেই *ধর্ম* নিহিত আছে। কিন্তু ধর্মের কী প্রয়োজন? ধর্মের প্রয়োজন এইজন্য যে তা দুর্বলকে সবলের সমান করে তোলে। ধর্মের এইটিই অর্থ। ধর্মের সংজ্ঞাটি একবার চিন্তা করে দেখুন! সাধারণত যে দুর্বল, সে দুর্বলই থাকে এবং যে সবল, সে সবলই থেকে যায়। কিন্তু জীবনে বা সমাজে যখন *ধর্ম* প্রবেশ করে, তখন দুর্বল আর দুর্বল থাকে না; সে সবলের সমকক্ষ হয়ে যায়। কী অসাধারণ ভাবনা! যেখানে *ধর্ম* বর্তমান, সেখানে শক্তিমান দুর্বলকে বলে— আমি তোমার সঙ্গে এই অন্যায় আচরণ করতে পারি না, আমার ন্যায়বোধ বা *ধর্ম* আমাকে বাধা দিচ্ছে। এটি হওয়া সম্ভব বলেই একজন সাধারণ মানুষও সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে, সে মামলা *জিততে* পারেন। সরকারের হাতেই তো সব ক্ষমতা। তাহলে দুর্বল জেতে কী করে? ধর্মের জন্য। *ধর্ম* যদি না থাকে, তাহলে দুর্বল কখনও জয়ী হতে পারে না; যার শক্তি আছে, যার অর্থ আছে, সেই জেতে। কিন্তু ধর্ম থাকলে তা হবে না। তখন দুর্বল ও সবল সমান। সমাজ থেকে এই *ধর্ম* চলে গেলে বিচার একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়, আইন পরিহাসের বস্তুতে পরিণত হয়। আমরা এখন সেইরকম একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছি। কিন্তু আমার আশা এ অবস্থা বদলে যাবে।

সমাজে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শক্তিসমূহকে সমন্বিত করতে হবে। সেই

শক্তিগুলি কী? সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয়—দৃষ্টিশক্তি এবং কর্মশক্তি। এই দুটি শক্তিকে একত্রিত করতে হবে। মহাভারতে যে যুদ্ধের কথা আছে, তাতে শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন। তিনি সারথি মাত্র। যুদ্ধে তিনি অংশ নেননি। যুদ্ধের আগে আমরা দেখতে পাই দুর্যোধন এবং অর্জুন দুজনেই শ্রীকৃষ্ণের কাছে সাহায্য চাইতে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বললেন, 'দেখ, আমি তোমাদের প্রচুর সৈন্য দিতে পারি, অথবা আমাকেও দিতে পারি। এখন তোমরা কোন্‌টা চাও? বল। দুর্যোধন বললেন, 'আমি আপনাকে চাই না, আপনার সৈন্যদের চাই'। তাই তিনি কৃষ্ণের সৈন্যদের নিয়ে চলে গেলেন। অর্জুন বললেন, 'দেবসেনা আমার চাই না, আমি শুধু আপনাকে চাই। আপনাকে যুদ্ধটুদ্ধ করতে হবে না; আপনি কেবল আমার সারথি হন।' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এই ছিল শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা। তিনি শুধু অর্জুনকে পথ দেখিয়েছিলেন। তাই যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রজ্ঞা দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে কর্মবীর অর্জুনের কর্মকে বাস্তবায়িত করার প্রচণ্ড শক্তি সংযুক্ত হবে, তখন যে কোন জাতি *শ্রীঃ, বিজয়ঃ, ভূতিঃ* এবং *ধ্রুবা নীতিঃ*-র আশীর্বাদে পুষ্ট হয়ে ধন্য হবে। মানবজাতির কাছে এই হলো গীতার মর্মবাণী।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শক্তিকে তাই একত্রিত করতে হবে; তবেই মহত্ত্ব আসবে। শুধু কেঁদে এবং বিলাপ করে কোন জাত বড় হতে পারে না। শত শত বছর আমরা শুধু চোখের জল ফেলে এসেছি। চোখের জল আর আমাদের শুকায় না—সব কিছুতেই কান্না! এমনকি আনন্দের সময়ও আমরা চোখ মুছি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন ঃ 'এখন কান্নার সময় নয়, এমনকি আনন্দেরও নয়। কান্নাকাটি ঢের হয়েছে। এখন আর না কেঁদে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হও।' একথাটি পড়ে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ এত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, 'স্বর বিবেকানন্দ' (Svara Vivekananda) নামক স্বামীজীর বাণীসংবলিত একটি গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্বামীজীর বাণীর প্রতিধ্বনি করে লিখেছিলেন, 'আমরা দীর্ঘকাল কেঁদেছি। আর কান্না নয়। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এখন মানুষের মতো মানুষ হন।—আপনাদের সুকর্ণ।' আমি যখন জাকার্তা যাই, তখনই গ্রন্থটি রাষ্ট্রপতির বাসভবনে প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রপতি ভবনে আমি এক ঘণ্টা ছিলাম। বই-এর ভূমিকায় সুকর্ণ যে কথাগুলি লিখেছিলেন ওগুলি ছিল তাঁর প্রাণের কথা।

তাই বলছি, গীতার এই অপূর্ব বাণী আমাদের জীবনে প্রবেশ করলে চোখের জল সেচের জলে রূপান্তরিত হয়ে সমাজকে সমৃদ্ধ করবে। দুঃখ, যন্ত্রণা—

এসব তো আছেই। কিন্তু দুঃখের সে তাপকে নষ্ট করবেন কেন? মানুষের কল্যাণে তা কাজে লাগান। এটিই গীতার বাণী, এটিই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী। অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্রীকৃষ্ণের প্রজ্ঞাদৃষ্টি এবং অর্জুনের কর্মশক্তি, অর্থাৎ চিন্তা ও বাস্তবায়নের শক্তি সমন্বিত হলে কী অসাধ্যসাধনই না করা যেতে পারে! দুটিই চাই। ধ্যান ও কর্ম একসঙ্গে চালাতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে ভারতবর্ষে এক নতুন ধরনের মানুষের অভ্যুদয় হবে। এ ধরনের লক্ষ লক্ষ মানুষ যেদিন জন্মাবেন, সেদিন ভারতীয় সমাজের আমূল রূপান্তর ঘটে যাবে। শুধু ভারতবর্ষ কেন, সমগ্র আন্তর্জাতিক সমাজের, সমগ্র মানবজাতির রূপান্তর ঘটবে। আজ মানবিক সম্পর্ক গোষ্ঠী বা জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, তা দিন দিন আন্তর্জাতিক স্তরে প্রসারিত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, সমস্ত মানবজাতির কাছেই গীতার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। মানবজাতির আজ একটাই অভীপ্সা—শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্থিতি, যেখানে মানুষ আত্মবিকাশের চরম পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। মানুষের ভিতর যে অনন্ত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তার বিকাশকে সম্ভব করে তোলার জন্য উপযুক্ত দর্শন আমাদের হাতের কাছেই আছে। সেই *মানব সম্ভাবনা বিকাশের বিজ্ঞান হলো বেদান্ত।* বেদান্ত বলে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সীমাহীন সম্ভাবনা আছে যা সঠিক জীবনযাপন করে বিকশিত করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন, যার সরল নাম *যোগ।* দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রথম এই যোগদর্শনের কথা উত্থাপন করেছিলেন এবং এখন শেষ অধ্যায়ে সঞ্জয় আবার যোগেশ্বর কৃষ্ণের সেই যোগশিক্ষার উল্লেখ করছেন। আমি রবিবারের এই ক্লাসে প্রায়শই বলি যে, আমরা যদি আমাদের চারপাশটাকে নরক করে তুলি, তবে তার জন্য *আমরাই* দায়ী এবং আমরা যদি আমাদের পরিবেশকে স্বর্গে পরিণত করি, তবে তার জন্যও আমরাই একমাত্র দায়ী। দুটিই আমরা করতে পারি; সে সামর্থ্য আমাদের আছে। এখন সমাজকে নরক করে তুলব কি স্বর্গে পরিণত করব, সে সিদ্ধান্ত আমাদেরই নিতে হবে। আমাদের দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, প্রশাসন, ব্যবসাবাণিজ্য—সবকিছুর একটিমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত—কি করে তুচ্ছতা ও সবরকম সঙ্কীর্ণতার ভাব দূর করে, নিজেদের ভুলভ্রান্তির ফলে দেশকে যে নরককুণ্ডে পরিণত করেছি, সেখান থেকে তাকে স্বর্গে রূপান্তরিত করা যায়। আজ তুচ্ছ মানুষ দূর হোক, আবির্ভাব ঘটুক মহৎ সব ব্যক্তিত্বের। মানুষ তো স্বরূপত মহৎ; সে তো একতাল রক্তমাংস নয়, সে অসীম আত্মা। সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে এটিই বেদান্তের

মহত্তম আশ্বাসবাণী। শুধু বাণী দিয়েই বেদান্ত ক্ষান্ত হয়নি, আশীর্বাদ জানিয়ে সকলকে আবাহন করে বলছে : 'ওঠ, জাগ; লক্ষ্যে যতক্ষণ না পৌঁছাচ্ছ, থেমো না'। *কঠোপনিষদের* উদাত্ত ঘোষণা (১/৩/১৪) :

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

তৃতীয় লাইনে বলা হয়েছে, 'এযেন ধারালো ক্ষুরের ওপর দিয়ে হাঁটা'; যে কোন মুহূর্তে আমরা টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারি। বাস্তবিক, জীবন তো এইরকমই! বীরের সাহস নিয়ে জীবনে প্রবেশ করে, সংগ্রাম চালিয়ে গেলে, তবেই মহৎ কিছু লাভ হতে পারে। যাঁরা সংগ্রাম করবেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলবেন, তাঁরাই সেই পরম বস্তু পাবেন, অন্যরা পাবেন না।

যজুর্বেদে সুন্দর একটি কথা আছে। সেখানে বলা হচ্ছে, 'যারা এগিয়ে যায়, তারাই শ্রেয়োলাভ করে। যারা এক জায়গায় থেমে থাকে, তাদের ভাগ্যে কিছুই জোটে না।' তাই 'এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন'—*চরৈবেতি, চরৈবেতি*। দেখুন না, সূর্য এগিয়ে যাচ্ছে। সর্বদা সক্রিয় বলে তার এত প্রচণ্ড শক্তি। গীতা তাই আপনাদের এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছেন। বাঁশী এবং বিউগল বেজে উঠলে যেমন সেনারা এগিয়ে যায়, আমাদেরও সেইরকম এগিয়ে যেতে হবে। আমরাও তো যুদ্ধক্ষেত্রেই রয়েছি। জনগণ নিয়েই তো সৈন্যবাহিনী। কিন্তু আমরা সাধারণ সেনানী নই, আমরা অধ্যাত্ম জগতের সৈনিক; আমাদের লক্ষ্য সত্য-দুর্গ জয় করা। বেদান্ত এই সত্যলাভের অভিযানে আমাদের সবাইকে আহ্বান করছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন, 'এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।' মনে রাখবেন, এক *মহাবীর* আর এক *বীরকে* এক যুদ্ধক্ষেত্রেই গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন। যাঁরা বীর, গীতার শিক্ষা তাঁদেরই জন্য। গীতা নেতিয়ে পড়া কাদার তালের মতো সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই বীরের সৃষ্টি করতে চান। সব মহান আচার্যরাই তাই করেছেন। তিনশো বছর আগে গুরু গোবিন্দ সিং সাধারণ মানুষকেই শূরবীরে পরিণত করেছিলেন। কেমন করে করেছিলেন? এই দর্শনের জাদুস্পর্শে। তিনি সাধারণ মানুষকে ডেকে বলেছিলেন : 'তোমাদের মধ্যে *অসীম* শক্তি আছে। *নিজের ওপর* বিশ্বাস রাখ। সেই সঙ্গে *অন্যদেরও* বিশ্বাস কর; তাহলে আর তোমাদের শক্তি অন্যদের ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হবে

না। তোমরা তাদের ভাল, আরো ভাল মানুষে পরিণত কর; তাদের মানবজাতির সেবকে রূপান্তরিত কর।'

কী মহান চিন্তা! কি প্রেমের ভাব! তাই আমাদের ব্রত হবে 'নিজে তৈরি হও, অন্যকেও তৈরি কর।' স্বামী বিবেকানন্দেরও এই সুর। তিনি বলেছেন, 'আগে নিজে মানুষ হও, তারপর অন্যদেরও যথার্থ মানুষ হতে সাহায্য কর।' এই বেদান্তের ভাব। এই গীতার দৃষ্টিভঙ্গি। গীতার আঠারোটি অধ্যায় আপনাদের সামনে বেদান্তের গভীর সারবস্তুটি তুলে ধরেছে এবং ইঙ্গিত দিয়েছে কিভাবে বেদান্তের তত্ত্বটিকে বাস্তব জীবনে রূপ দেওয়া যায়। দুবছর আগে গীতার ওপর এই বক্তৃতা যখন আমি শুরু করি (প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি একথা উল্লেখ করেছি), তখন চারটি প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিয়েছিলাম। প্রথম বক্তৃতাটি হয়েছিল গীতার *ধ্যানশ্লোকগুলির* ওপর। তারপর আলোচনা হয়েছিল শঙ্করাচার্যের দেওয়া গীতার ভূমিকার ওপর। আর আজ সঞ্জয়ের কথা দিয়েই আমরা গীতার এই সুদীর্ঘ আলোচনা শেষ করছি। সঞ্জয়ের উক্তিটি আর একবার স্মরণ করা যাক্। তিনি বলেছেন, যেখানেই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি (অর্থাৎ, তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টির শক্তি) এবং অর্জুনের শক্তি (অর্থাৎ তাঁর বীরোচিত কর্মশক্তি) একত্রিত হয়ে প্রকাশ পাবে, সেখানেই সমৃদ্ধি, জয়, অভ্যুদয় এবং অবিচল সুনীতির আশীর্বাদ নেমে আসবেই আসবে। আমরা সমগ্র ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীকেই মানবজাতি এবং অন্যান্য প্রাণীদের কাছে পরম আশীর্বাদের বস্তু করে তুলতে চাই। মানুষ ভাল হলে অন্যান্য জীবজন্তুরাও আনন্দে থাকবে। মানুষ যদি দুষ্টপ্রকৃতির হয়, তাহলে তারাও কষ্ট পাবে। আজকে আমাদের চোরাশিকারিরা কী করছে? অর্থের লোভে তারা জঙ্গলের হাতি, পাখি ও অন্যান্য প্রাণীদের নৃশংসভাবে হত্যা করছে। আজকে বহু প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন। এটা এইজন্য হচ্ছে যে, মানুষ আজ সব অর্থেই পশুর পর্যায়ে, অথবা তারও নিচে নেমে গেছে। অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি প্রাণে এতটুকু দরদ নেই। তাই বলছি, গীতার দর্শন এবং সঞ্জয়ের উক্তির তাৎপর্যটি যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং সেইভাবে জীবনকে প্রস্তুত করি, তাহলে শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সব প্রাণীই উপকৃত হবে, জাগ্রত হবে সকলের সঙ্গে, সবকিছুর সঙ্গে একাত্মতা। এইটিই অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি যা বলে, বিশ্বজুড়ে একটি সত্তাই বিরাজ করছে; আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নই—আমরা সব মিলে এক। উপনিষদ্ ও গীতায় এই সত্যই উচ্চারিত হয়েছে। বাস্তব জীবনে এই সত্যের তাৎপর্যটি কি হতে পারে, তা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কাছে এবং তাঁরই মাধ্যমে, আমাদের সকলের কাছে তুলে ধরেছেন।

গীতার সাম্রাজ্য ক্রমশ সারা বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে। এই সেই মহাগ্রন্থ যা আমরা বিগত দুবছর ধরে চর্চা করে ধন্য হয়েছি। আজ সেই আলোচনার পরিসমাপ্তি।

ইতি মোক্ষ সন্ন্যাস যোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

'এখানেই মোক্ষ-সন্ন্যাস-যোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।'

বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী

(আদিচরণ-ক্রমে)

নির্ঘণ্ট